

১৪২
২৪/০৪/২০২০
চলচ্চিত্র

কবিতার কাগজ

কবিপঙ্কের উপস্থাপন...

কবিতা □ অরুণ মিত্র ফণিতৃষন আচার্য অর্ধেন্দু চক্রবর্তী অমিতাভ ওপ্ত নিতাই
জানা কার্তিক মোদক সুব্রত রুদ্র গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পিনাকীনন্দন চৌধুরী
□ ব মাজী বীথি চট্টোপাধ্যায় মাহবুব হাসান দেবশিস প্রধান অলোক সেন
ব্রত চক্রবর্তী সুধাংশু বাগ প্রবীর দাস মেহাশিস পাল নীলাঞ্জন কুমার জীবন
কার অর্ণব কুমার পণ্ডা চিরঞ্জীব হালদার ঋত্বিক ত্রিপাঠী বিরূপাক্ষ পাণ্ডা
নীপ জানা মনোরঞ্জন ঝাড়া বিশ্বনাথ মাঝি আশিস মিশ্র মানবেন্দ্র চক্রবর্তী
নারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নির্মল বসাক প্রফুল্ল পাল অচিন্ত্য নন্দী এস. মহীউদ্দিন
দাদন মুখোপাধ্যায় মহঃ ইনাসউদ্দিন বিধান মাঝি সুমিত সাহা কালীপদ
ন কৌশিক গিরি আব্দুল মান্নান প্রমুখ

কবিতা □ তমালিকা পণ্ডা শেঠ অরিজিৎ চক্রবর্তী গোপাল মল্লিক
ব প্রিয় গিরি

এবং □ কৌশিক রায় সুধীর দত্ত সাগর চক্রবর্তী ডঃ মৃদুলা কুণ্ডু

□ প্রণবকান্তি ভট্টাচার্য

সম্পাদক □ দেবশিস প্রধান



সরকারি দপ্তরের জন্য



সস্তাব্য কিছু

বাংলা পরিভাষা

দীর্ঘদিন পড়াওনা বন্ধ অথবা উচ্চশিক্ষার জন্য
অনেকদিনের স্বপ্ন কিংবা কোন কর্মচারীর চাকুরীর উন্নতি
লাভের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আসুন
পঃবঙ্গ সরকার 'নিবন্ধীভুক্ত' কলেজ

আশা করেসপনডেন্স কলেজ

(গভঃ রেজিঃ)

স্কুলবাজার পোঃ-কাঁথি, জেলা-মেদিনীপুর, ফোন : (০৩২২৩) ৫৬০৪২

শাখা কলেজ : পাটপুর আড়াডাঙ্গা, পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া,

ফোন : (০৩২৪২) ৫৪০৬১

অনুমোদিত কোর্স

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (পঃবঙ্গ ও বিহার বোর্ড / কাউন্সিল)†

বি.এ. / বি.কম. / বি.এস.সি (কলিকাতা ও বর্ধমান
বিশ্ববিদ্যালয়)

এম.এ./এম.কম./এম.এস.সি

(কলিকাতা/বর্ধমান/বিদ্যাসাগর/উৎকল/উত্তর উড়িষ্যা/আগ্রা/মগঃ
বিশ্ববিদ্যালয়)

বি.পি.এড. ও এল.এল.বি. (উৎকল / উত্তর উড়িষ্যা
বিশ্ববিদ্যালয়)

পি.এইচ.ডি. (বাংলা / ইতিহাস) বর্ধমান ও কল্যাণী
বিশ্ববিদ্যালয়)

কবিতার কাগজ

আবহমান বাংলা কবিতা

ও

গদ্যের পদ্য পত্রিকা

২৬ বছর □ কবিপক্ষ □ বৈশাখ ১৪০৭,

মুখপাত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আর্থিক আরোজনে দ্বিতীয় বছরের লিটেল ম্যাগাজিন মেলা ২০০০, আলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং প্রাণবায়ুর বিগল উপস্থাপনা। ছোট পত্র পত্রিকার লেখক শ্রুতানুধ্যায়ীদের অনন্ত প্রেরণার অন্য নাম। আরও বেশি বেশি জেলা স্তরের তরুণ লেখক কবিদের আমন্ত্রণ জানানো জরুরী। সারা রাজ্যজুড়ে এই মেলার প্রাণময়তা ছড়িয়ে দিতে হ'লে চাই ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ মেদিনীপুর জেলা শাখা এবছরই শুরু করলো প্রথম ক্ষুদ্রপত্র পত্রিকা মেলা ও প্রদর্শনী। এভাবেই সারা রাজ্যের জেলা গুলিতে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসার প্রচার ও মানোন্নয়নের হাওয়া ছড়িয়ে পড়ুক অনন্য বিস্তারে। গণ মাধ্যমগুলি তাদের যোগ্য ভূমিকা পালনে তৎপর। এ বড় স্রবের সময়, লিটেল ম্যাগাজিন নিয়ে আন্দোলনের রক্তে ঘামে জরাজীবে লেখক শিল্পীদের সগব' বিপ্লবের ফসল তুলে ধরার ঈর্ষানয় গৌরবগাথার অমল আলোর উপস্থাপন। পশ্চিমে বৈশাখের রাবান্দিক আলো হাওয়া বোধে সম্পূর্ণ বাঙালি মননে চিরকালের ঐতিহ্যের চামর বুলিয়ে দিক কবি, আমাদের সার্বিক জীবন ও জীবিকায়। ছায়াংশ বছরে পা দিয়ে ও 'কবিতার কাগজ' এর পেছনের দিকে তাকাতে যেমন ভাল লাগে তেমন করে সামনের দিনগুলির অবিদ্যের চরাচর সৌগন্দ্যে ম'ম করুক সংস্কৃতির সবুজ অঙ্গন। বেজ্ঞে উঠুক নিম'ণের ধনি।

দেবাশিস প্রধান

সম্পাদক

জানার ইচ্ছে

অরুণ মিত্র

আমি একজন চিরকালের সবুজ এবং সর্বজনীন মানুষ
এ কথা আমার কোনো একদিন বলেছিল শ্বেতাঙ্গিনী আনুস—
কারা, কিন্তু আজ যদি সে দেখতে পেত বড় রাস্তার মাঝখানে
ছেঁড়াখোঁড়া দলামোচড়া হাঘরে এক মনুষ্যনামধারী
দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সে কী বলত, কোন কঠিন খবরদারি
চেঁচিয়ে উঠত তার গভীরে জানলে বেশ হত, না হয় সে তা বলত কানে কানে ।

ভাসিছি

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

একটি শিশু আমার ছোঁবে,
ডালই, ইহার চেয়ে কি আর ডাল !
লাল হয়েছে মন,
মন কি কোথাও ওভাবে হয় লাল ?
লজ্জাবতী জানে, তেমন জানা
আমারও হয়, তেমন জানা ...

রাত হয়েছে, মৃত্যু নাকি ?
কার রঙে যে ঘুরতে ঘুরতে
তৈরী হল জলাঞ্জলি
ভাসিছি, ভেসে ঘািছি রূপচাঁদা মাছ !

গাছকোটো

সুব্রত রুদ্র

কচিকাঁচাদের দরদ দিয়ে ডাকছে ফুটকড়াই
তার অস্পষ্ট ডাক আকালমৃত্যু
তার বেশি আর সাধ্য নেই স্নেহে

গাছ ডাকে গাছকোটো খুঁলে যারা অরণ্যে আছো তারা অন্তরঙ্গ
লক্ষ্যীর সঙ্গে থাকে গাছকোটো
লক্ষ্যীর চেয়ে উদার

চাঁদের আলোর ভিসা ও পাসপোর্ট ফণিভঞ্জন আচার্য

চল বেঁধে নাও ও শব্দরী খানিক পরেই চাঁদ উঠবে

কার গাড়ি যার অশ্বকারে হুটুটিচোপা কেছাতশ্রে
তোমার জানার কী প্রয়োজন আগ বাড়িয়ে শালবনে কি
একলা হঠাৎ উঠলো ডেকে রাত্রিঞ্জাগর নীড়ের পাখি
আমরা এখন চাঁদের আলোর রাশ্মি কাটতে দ্রুগমণে
ব্যস্ত থাকবো জীবনভাঙার দখল নেবো শান্তিসুখের

চল বেঁধে নাও ও শব্দরী খানিক পরেই চাঁদ উঠবে

দল বেঁধেছি গোষ্ঠীতশ্রে এবার ঝগড়া ছাতার পাখির
ভিতর-ঘরের গোপন পথে অস্ত্রঘাতে ঘাচ্ছি কেন
সবাই নিশ্চ এবাঁশ্বদ রাতদুপুরের প্রয়োগ কলার
ভিসা-পাওরা চাঁদের আলোর শ্বর্গ স্বর্জেছি নিবিশহাতে
মানুষকে কী দিয়ে ঘাচ্ছি ভাবতে জীবন ক'কিরে ওঠে

আশ্বযুগ্মে পরাবৃত্ত সকাল হলেই সকাল হবে
দূর জিরকাল দূরেই থাকে চোখের পাতার শ্বপ্ন রেখা
ভ্রম পেয়েনা আকাশধারে ভোরের আলো চোখ রাঙালে
সময় এখন ঢেউ ডাঙছে তোমার আমার ভাগ্যরেখার
আঁধার ভাঙা মানবতশ্রে ঘাচ্ছি কারণ যেতেই হবে
চল বেঁধে নাও ও শব্দরী খানিক পরেই চাঁদ উঠবে

সুখ

দেবপ্রী দাস

সুখ চাই না ; ওর বড় অশ্বকার ভ্রম
ভালোবাসা কে না চায় কিন্তু ভীষণ
অহংকারী আলোর
আলোও চাই চোখ জ্বালাও করে হার ।
শিক্ষা চাই, না কষ্ট হয়
বেশী ভাল ভালো নয়.
মৃত্যু ভালো শান্তি অপমৃত্যু নয় ।

মর্মরের

অমিতাভ গুপ্ত

রজনীগন্ধার

মালায় উপহার

রাগিনিগাঁথের

জ্যোৎস্না হয়ে থাকে

তোমার বুকে রাখে

আমিও পাই টের

সময় হয়ে এল অত্যাশ্চর্যের

আমারও জীবনবোধ জলজলনৌকোর তরঙ্গিত

তাই

মর্মরসোপান শীর্ষে রূপের মতন মর্মরিত

তুমি কী দাঁড়িয়ে আছ উবেগে নিহত

নৈশশব্দের মতো কোন্ আমাকে সেখানে নিয়ে যাই

বিরহ

কার্তিক মোদক

বহুদিন ভুলে গেছি তার কথা, কখন মনে পড়ে না আর

কেউ দৃশ্য জুড়াতে

ভালোবাসার কথা বলে না—পরতে সখ্যতার হার

এমনি করে ফুরিয়ে যায় দিন, তোমার গান

ভাবছি বসে পুরানো দিন

তুমি আছো আজ অন্তরীণ

বিরহ মেঘে উড়ছে আকাশ, পূর্ণবার দাঁড়াতে তার

ভাঙলো মেলা, পুতুল খেলা

দিন ফুরাতে এলো যে বেলা

তোমার আমার প্রণয় মগ্ন বিচ্ছুরিত আলো খুলতে ব্যর্থ

ফুরালো দিন ফুরায় তাপে

উঠল চাঁদ তরিয়ে লাফে

এত কাছে আছো, তবু ভুলে যাই স্থল আয়নাতে বার বার

কবিতার কাগজ ৪

একটি প্রেমের কবিতা

নিতাই জানা

বেতের ফলের মতো স্নান চোখের কেঁপে ওঠা গভীর ছায়া অথবা চাবির
কৌশলে তোমার প্রেমের কবিতা আঁতে গেছে যখন একখণ্ড জলভরা মেঘ
অলংকার দিকে উড়ে যেতে যেতে আবিষ্কার করে রোগা-কাষার চাঁদের মতো
তোমাকে যেন কান্দারি বাধা অথবা নগ্ন এক মেয়ের ক্ষিপ্ত নাচ ধুলোর এঁকে
দেয় শিতিকণ্ঠ তখনই রূপদান দেবদীনের মতো তুমিও পাখর খুঁদে আঁকো—
মল্লিকা ফোটার গন্ধ যেন ধুলার লুটানো নারিণ আমার বীণা বেজে উঠেছিল
অনাহত কী আঘাতে ।

হা-হা দিনের জীবনযাপন

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

রাতকে আমার উজাড় ঢালো চাঁদের থালায় ।
সাধ জেগেছে, দিনের রোঁরা ছড়িয়ে দিও
ভুণের চড়ায় । বৃষ্টি মাখো ওলট পালট,
হাওয়ার গারে বালক মূখের আঁচ লেগেছে ।

ঠোটে আমার চকমকি ঠোঁট ঘসবে ব'লে
বসন্তদিন পদ্পবিহীন সাজ ধরেছে ।
সেই আগুনের দহন সীমার জড় কর
সে সব নারী শ্বাদ পেলনা ভালোবাসার ।

এখন যদি, শোক ঢেলে দেয় ভাটিরাশি
নিশিলাগা নদীর শিরায় বৃক্ষে ভাঁজে,
চিরকালের কিরণমালার নকশা আঁকে—
তাহলে, হে-সিঙ্কনারী, হা-হা-দিনের
জীবনযাপন করবে এসো । আহলাদাঞ্জলি !
গা পুড়ে যাক কনকচাঁপার, চরাচরে
শ্বেচ্ছাচারী দহন জ্বালায় মশ্রুপুত্রে
সবশরীর উপড়ে কর । মেঘ গড়ে গড়ে
রাত কে আমার উজাড় ঢালো জলে স্থলে ।

সংঘর্ষে বিনাশে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কথা বলেনি কেউ সে কথা আজ যদি বলি
কেউ বিশ্বাস করবে না
যেন অনন্তের ছায়াছবি ক্রমে আরও কাছে আসে
মনে হয় গুরুবার যদি মুখ তুলে তাকে দেখি ।

একটি আশ্চর্য রাত আর ঝড়ো হাওয়া
কখনও কি এসবই ঘটিয়ে দিতে পারে
যার কাছে দীনতা সংক্য হয়ে ছোট হয়ে থাকে ।

কিছু কথা থাকে বলাও যাবে না কোনদিন
সংঘর্ষে বিনাশে কিছু ভুল হয়ে গেলে
একদিন সব অর্থহীন হয়ে যায় ।

যে কথা বলেনি কেউ সে কথা শুনবেও লাভ নেই
অনন্তের অক্সিম মূহূর্ত সে দেখেনি কোনদিন
আর কাছে দীনতাও ছোট হয়ে যায় ।

স্মৃতি ভ্রমণ

বিপ্লব মাস্কী

এক স্মৃতি থেকে হঠাৎ তুমি অন্য স্মৃতির দিকে
যাচ্ছো চলে পাগল পাগল
আমাকে একা রেখে

এরকম যে ঘটতে পারে—
ভেবেছি কি কেউ আগে ?
ভালবাসা অশ্ব ছিল প্রেমেরই সংরাগে

লক্ষবর্ষ হঠাৎ যেন এক লহমায় শেষ—
জীবন থেকে হারিয়ে গেছে
আবেগ—উজ্জলতার রেশ

যাকিছু যেন ঘটেছিল রূপকথারই ভেতর—
সত্যত স্রবের স্মৃতি থেকে বেরিয়ে অতঃপর
অশ্ব আমি, বলো এখন যাবো কার কাছে ?

কবিতার কাগজ ৬

সতী

বীথি চট্টোপাধ্যায়

এই শরীরে জমিদারি রাজ্যপাট, অশ্বশালা
নিষ্কর্ম রাত, প্রেমিক হাত মৃত্যুবান পদ্প মালা
একটি নুড়ি খুঁচরো টাকা খরচ করা মস্ত সুখ
দিনের শেষে কী সে মারা শূন্যহস্ত শূন্যবৃক
একটা মহাসমুদ্র পার একটা শূন্য ছায়াপথ
সতীসাধনী সাজানো হয় মস্ত পড়ে দেখাও সং
টকটকে রং আগুনপানা বললো এটা আগুনই নয়
মস্ততন্ত তুক করে দিই তাপকে কেন করবে ভয়

রাজ্যপাটে ভাঙন ছিলো বন্যা শূন্য ভাসার ঘর
সব আগুন সে নিভলো মেরের রাজ্য হল পর
শূন্য ক'ঠ বলছে মেয়ে সি'দুর দাও আমিই সতী
ফুল ঝোলানো মাথা বলে, সব হারানো মেয়ে তুমি কিসের সতী !
দোল বসন্ত হয়না রাজ্যে এইখানে সব বাসি
ফলফলন্ত রাজ্য পড়লে বাজনা বাজবে সেইতো তোমার কাশী ।

যোজন-যোজন

মাহবুব হাসান

মাত্র কয়েকশ' কিলো জ্যোৎস্না নিয়ে বসেছি খোলা বাজারে
'উহারা' জ্যোৎস্না কেনে না

তার বদলে তরতাজা ত্রিমি-স্তরা মাংসের কিম্বা
ওদের পছন্দ খুব—

ওরা নারীকে শাড়ির মতো মনে করে ।

এবং তাহাদের বোধ নীলিমার মোড়া
শূন্য-গর্ভ কৃষ্ণখাদ !

নিশ্চির মতন টানে তারা, ক্ষমতা যেমতি... !

জ্যোৎস্না আর নারী তাই কৈরী প্রবল সমাজে
আবেগ-বিবেক কেটে খায় তারা
বাজারে মাংসের কিম্বা ধারা কেনে
আর ধারা গেলে আক'ঠ জ্যোৎস্না
তাহাদের ব্যবধান

যোজন যোজন...

দেবাশিস প্রধান-এর কবিতা

কবি

তিনি আমাদেরই ভেতরের লোক । হাটা-চলা, কথা বলা, সমাজ সংসার
একানবর্তী সেই শিমূল মেঘের শীতল বৃষ্টি ঝরিরে,
সাদমাঠা গ্রামের সীমার ঘড়িরে থাকা আর-জন্মজন্মান্তর !
চাম উকুনের মতো, রক্ত রসের ধারায় । নিৰ্মাণে আত্মহননের
নিবেদে অহংকারীজন, আমাদের মধ্যকার শামখোল ভেঙে ভেঙে
রক্তাঙ্ক হতে হতে একদিন সম্ভ্রান্ত রোদ্দরে মেলে ধরবেন ঘনিষ্ঠ নিমোঁক...

সমুদ্র পাখির আনন্দ রচনা ডানা

বস্তুতই মেরেটি গাছের সঙ্গে, প্রকৃতি প্রেমিকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে,
সমুদ্রের ভাজে । এমন শিমূল মেঘ বালিকাকে চাই । আলো আশুক গলগল
অনুন্বব প্রবণতা সমাকীর্ণ ধূলোর প্রণাম গন্ধ মাটি, পাণ্ডুলিপি মতো
ঘড়িরে পড়ুক সমুদ্র প্রভাবে । অতলের নিশিডাক । মাছের শরীর বেন
চকচকে জীবনব্যাপনের ভেতর অন্য এক জীবনের ছবি ছুটোছুটে উঠে
আসছে তার শরীরের ছাণে । ঘূমের বর্ষা মাদকতার গতরাত
ঘূয়ে দিক অক্সাস আধার, সঞ্চারিত ঢেউ অনাবিল আনন্দ
খুশিতে দেদার বাজিরে যাচ্ছে শব্দের মাদল । তুমি শব্দঃ এমনই বর্ণ বৈভব
কামড়ে উড়ে মাছো মেরে পাখি গৈরিক বিকেলে ? আহা সোনা, তোমার
এমন সুন্দর সূর্যগোলাটিপ গাঁয়ের মাথায় জেনেলে ফের কেন টুপ
করে ছুবে যাছো নিঃস্ব চরাচরে, আনন্দ বস্তুগার ওড়ে জীবনব্যাপন... !

নিবেদন

অলোক সেন

কালি ও কলমে টাসা

বিনীত প্রার্থনা রাখে পাঠকের কাছে—

‘নির্মান ও সৃষ্টি’, ‘শব্দ আর সত্য’ এই ষ্ম

এই সাদা পৃষ্ঠাজুড়ে ক্ষয় থেকে জারমান হলে .

তবে কি বলবে এই শব্দমালা, ধ্বনিপুঞ্জ

কাগজে কলমে, আকাশে বাতাসে—উত্তরণে

হে পাঠক, অমল গরিমা যুগ তুমিই হয়েছ

চৈতন্য যে পথে চন্দ্রোদয় দেখে, সেখানে তুমিই

শিমূলের সাদা কাপাসবস্ত্রের ব্যবসারী জেনে

কবি আজও আগুন প্রার্থনা করে ।

ল'ঠনচর্চা

শুভ্রত চক্ৰবর্তী

বুড়ো বৃক্ষের শরীর জুড়ে একটানা বেজে চলছে বাকলসংযোগ
যার সাথে তুমি কখনো ওড়োনি
তুমি যাকে অজগর রক্ষণশালা আর কুণ্ঠিত ডানার গজ্ঞান ভেবে
নারায়ণত শূন্যই কে'পেছো ঠাণ্ডাতে ; তারপর চিঠি লিখেছো
আরামকেন্দ্রার বিগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে দু'-এক ছত্র
দু'-একটির ঠিকানা বিদেশে
সেইসব অনুবাদের ভাষা, অবহুঁ জেতে ক্ষরণপংক্তি
ঘন বৃষ্টি ধারায় মিশে ছুপচাপ ভিজিয়ে দিচ্ছিলো
অশ্রুকারের ভিতর ঝোলানো চোখ, অন্য এক ল'ঠন ল'ঠন ল'ঠন
কখনো জন্ম দিয়েছো কখনো মৃত্যু, বাকলের জীবন কোষ বাজিয়ে...

কে যার কোথায় যার,

সুধাংশু বাগ

সোনার বোতাম জ্বলে, উড়ছে আঁতর মধ্যমাসে
পশ্চিমের পরাগ রাতে অবিবেকী মৃদ্রা বিনম্র
দেহান্তর হাহাকারে মালিকের মৃত্ত মদ্যপানে
বাতাসের ফস্টিউনস্টি বলাৎকারের ব্যগ্র প্রণয়

অদূরের চাঁদ হাসে শরীরী সুখের সদ্যস্মানে
সোনালি শস্যের ক্ষেতে মেতেছে ই'দুর ও তক্ষর
দু'চোখে গড়ার জল মরদের কথা বস্খামে
ভেসে যার অদেখায়, তেলচিটে বালিশও প্রস্তুত

দীপ জ্বালে সারস্বতী গীর্জার মন্দিরে বাজে ঘণ্টা
কুধায় কাহিল রাত পরসার পান্না জ্বলে বটে
উষিড়াল দ্যার ছুব সুযোগ খোঁজে শিকারী মনটা
শাখা-ডাঙার শব্দে রক্ত ফুটেবে কার ললাটে

কে যার ? কোথায় যার ! মদের আঙার ডিসা যায়
প্রশ্ন ও সংবাদ । বলে যার, রাম নাম সত্য হয়

ডোবাচিটের ডোর রং

স্নেহাশিস পাল

শ্যাওলা গানের মধ্যে বোনা হয় পশ্মভোর...
পশ্মভোরের নাভি ঘিরে জলটোঁড়া নত'কী চুম্বন,
আঁশটে শিল্পের আলপনার সূর্য' বৃষ্টি—
নেচে ওঠে শিশির ময়ূর ; পাখি সিন্ধুসাইজারের
শ্রাবণ অবিকল ভাবে ডোর
হৃদয়ের অনুভব চুপটি করে
ডোবাচিটের ডোর রং ;
অনবরত হৃদয় মোচড় রোজ রোজ
পূরোনো একতারা...তবে, সুর গুলো রোজ অচেনা নতুন ।

নিরাশ্রয়/৮

প্রবীর দাস

সন্ধ্যোত্তর সকাল-রোদ,
ঝির ঝিরে বাতাস
বইতে বইতে
সকাল এগোলেও
হঠাৎ করে অবেলার
বৃষ্টির কোন কথা ছিল না
কারো অহংকারের বিন্যাসও না
অভিমানের প্রতিভ্রুতি ছিল না
কিন্তু
কমকম বৃষ্টি এলো
এবং নন্দিতা মাসীকে
এত কম বয়সেও কেমন যেন
বয়স্ক, ভারী এবং গম্ভীর দেখালো...
নন্দিতা মাসীর অলৌকিক স্বপ্নের কথাগুলি
প্রত্যহ সবার অলক্ষ্যে
ছারবার হ'য়ে যাচ্ছে ।

ধলেশ্বরী

জীবন সরকার

ধরেশ্বরী ! ধলেশ্বরী !
তুমি আমার মন পবন নাও
জ্বা ফুলের মালা গাঁথা
ভাটিয়াগী গাও

ঘার কৈলাশ !
বাইচের নৌকা তরতরিরে ঘার
জল দেলো অহগার মা
ওরা একুশের গান গায় ।

তোরা উলুধর্নি দেলো
সালামের মা
ওরা একুশের কথা কর

ওরা একুশের
গান গায় ।

সীমান্ত

অর্ণব কুমার পন্ডা

আলো-অন্ধকার, আমি তার আরু ।
কাত্তু'জ মাথা রেখে ঘুমিরে পড়ার আগে
চোখের অধেক আমি রেখে আসি বরফ-সীমান্তে
মাঝরাতে ঝুলে পড়ে তাঁবু । মন্থখোশের অন্তরালে
চোখের সবুজ শর, আমাদের ঘিরে রাখে
পাহাড়ের পিরা উপশিরা, বুনো বাস ।

একে বাই লোহার ভেতর । তার ছবি
এঁকে রাখো দেশ, মেঘপালকের গানে
গ্রামের পাহাড়ি পথ নেমে গেছে নদীকূলাশায়

আরু নিভে ঘার অন্তাচলে...

পাঠা রহস্য

নীলাঙ্গন কুমার

চিত্রকর যখন পাঠার ছবি আঁকেন তখন তিনি ভেবেও দেখেন না, এই পাঠার সামনে না পেঁছনে কোনদিকটি কেটে ফেলা উচিত। যেহেতু চিত্রকর সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা ভিন্ন তাই তিনি এ তথ্য নিয়ে কতটা মাথা খাটাবেন তা নিয়ে বেশ বিধা আছে, তবু যদি এর মধ্যে কোন রহস্যের সম্ভাবনা পেয়ে থাকেন তবে মজা করে এ নিয়ে ভাবতে পারেন। বলাবাহুল্য পাঠা ছাড়া আর কোন জন্তুর এই ধরনের কথা আসে না, এ এক আশ্চর্য। বস্তুত: পাঠা রহস্য ভিত্তিক এক গোলটেবিল আলোচনা করা যেতে পারে কবি মহলে।

কবিমহলের কেউ কেউ লুচি আর পাঠার মাংসের নাম শুনলেই দু'হাজার মাইল হেঁটে আসার বিষয়টি সমর্থন করেন। তাই তারা চাইবেন অবশ্যই পাঠার সামনেটি আগে কাটা হোক। পাঠা রহস্য মোকাবিলায় সাত দফা আলোচ্যসূচী চিত্রকরের ছবি সহ ভিটিপিতে ছেপে সুন্দর করে সাজানো থাকবে টেবিলে। তা দেখে সঠিক পরামর্শ দেবেনই দেবেন কবি মহল। সাধারণ মানুষ সেসব জেনে তাদের প্রবচন বদলে নেবে।

হামি জ্ঞানি এই রহস্য সম্বন্ধে আমারও আমন্ত্রণ থাকবে।

দিনলিপি

ঋত্বিক ত্রিপাঠী

আজ ২০-০-৯৮

হতে পারে বৃষ্টি হরোঁছিলো

বৃষ্টি হওয়া ভালো, ভিজোঁছি খুব

খুব এক ভালোলাগা

ঐ তো ক'দিন আগে তুমি না বলেছিলে —

বৃষ্টি ভেজা ভালো। যার জন্য এতো

অপেক্ষা, রাতজাগা। তুমি না বলেছিলে

কখনো কখনো রাত জাগো খুব...

আচ্ছা, ঐ প্রতিমা মেয়ে, টানা চোখ

মানসী - এই ধরনের নাম—সেও কী

রাত জাগে। বৃষ্টি ভেজে। হতে পারে

পরিচর ঘট্টোঁসে সেভাবে ...তবুও তো

আমার নিজস্ব বলে কিছু আছে

একান্ত সে ভাবনা বয়ঃক্ৰম।

কবিতার কাগজ

সর্ব'হারা

১ বিরূপাক্ষ পাণ্ডা

তোমাকে স্বপ্ন হতে বলেছিলাম
কারণ—

আমার দ্বন্দ্বের আছে সর্ব'হারার পাণ্ডুলিপি

তোমাকে আকাশ হতে বলেছিলাম
কারণ—

আমার দৃ হাতে গননা হয় বিস্ফোরণের প্রহর

তোমাকে বৃষ্টি হতে বলেছিলাম
কারণ—

আমার ঘরে ফেরা হয় পাখির ঝাঁকের সাথে

তোমাকে মাটি হতে বলেছিলাম
কারণ—

আমার জানা নেই আমার জন্মবৃত্তান্ত

ও মেয়ে

২ দিলীপ জানা

শ্যামবর্ণা মেয়ের জমাট প্রেম
সকালের নিরীহ রোদের জ্বালাম
লজ্জা মাখানো জল পুতুল !
ঝকঝকে হওয়ার এমন প্রস্তাবে
সুন্দরীর নিপুণ সাক্ষ গেছে থেমে
অনেক সময় পুড়ে গেছে, ভাবিয়েছে
চোখের পাতা... । পলক পড়ার শব্দে
ভাতঘুমে ডাকি শ্যামবর্ণাকে
আমি চাঁদ ঘর খুলে বসে আছি
আমাকে ভেজাবে না...

জলীক শ্বশন

চিরঞ্জীব হালদার

একদিন সব বিবর্ণতা ত্রাস্ত হলে
বরষক মেয়ের কালিপড়া চোখের ভাঙ্ক্ষর থেকে
নেমে আসবে অসংখ্য অংসরা
তখন রিক্সাঅলার সাথে
অধ্যাপকের বন্ধুত্ব নিয়ে
প্রশ্ন তুলবে না কেউ
যোজনা ছাড়াই শব্দমাঠ পাণীয় জল
হয়ে উঠবে শ্বশনের পরিপূরক ।

বিষাদ বিস্ফোভ

মনোরঞ্জন খাড়া

কতো সহজেই এসে যাই, যে দাঁড়ে তুমি ও তোমার জন্য
সে দাঁড়েই আমার স্থলন ।
যে লভ্য তোমার শিল্পিত মৃদু কিসাদের বৈভব
সে পাতার সবুজ রসে আমাকেই পাবে ।
যে উঠোনে রেখেছো ত্রাস্ত পা, যে ধূলোর কুটে এঠে
অগাধ শৈশব যৌবন লীলা চাঁদের
সে ধূলোর প্রতি কণায় আমারই বালক কাল
অনারাস লেখা থাকে !

যে বাতাস মূগ্ধ করে না, পরন্তু তোমাকে
আধময়লা ব্লাউজে জড়ায়, বয়ে আনে রক্তাক্ত অপরাহ্নের কোভ
অবশেষে দুর্নিবার ভাসায় কিম্বা ভাসানের ডেলার
লগি ছুঁড়ে ফেলে অগাধ সলিলে...

খুঁজে দেখো, ও বাতাস আর কেউ নয়, ঘামের গন্ধে ভেজা
আমারই প্রথম যৌবন
এখন চৈত্র মাস

উঠোনে মাধবীলতার অনামিক কেউ আর
পাগল কিশোর এক বিষাদ বিস্ফোভ ।

কাল্পা

কৃতিসুন্দর পাল

স্বপ্নেরে তো কাল্পা আসে

আমি পারি না

তাহলে কি বলবো অসুন্দরে কে'দেছি এতদিন

যেখানে বিষন্ন ডেউ ডাঙে প্রলম্বিত বিকেল

যেখানে নেমে আসে শতক শেষের অধার সূর্যাস্তের পংপে

সেখানে জড়ো হয় শোকগাথা উন্মুক্ত প্রান্তর ভুলে

যেখানে ঘিরে ধরে ভগ্নাত্ম সংশয় নিশীথ অশ্বকারে

তোমার চোখে কাল্প আসে

আমার আসে না

স্বপ্নেরে তো কাল্পা আসে

আমি পারি না ।

জলের ছায়ায়

দীপক হোতা

ঝলৎ বৃক্ষগুলো দাঁড়িয়ে আছে জলের কিনারে ।

বাতাসের আশ্বেদালনে জড়িয়ে ধরে একে অপরকে

‘ডেউ ভেঙে পড়ে’ বার বার, আত’নাগ উথালপাথাল

মর্মে ঢুকে পড়ে অকাতর স্নেহের প্রাণিমা ।

আমি অপলক তাকিয়ে থাকি —নদীর শরীরে

ঢুকে পড়ি দৃশ্য থেকে অন্যতর দৃশ্যের গভীরে ।

গ ছেরাও আশ্বেদালিত ঈর্ষার সূর্যকে উ’চু থেকে

নামিয়ে আনছে জলের তলায়, এসব দৃশ্যবহ স্বপ্ন

আমিও উপভোগ করি আর ক্রমাগত আচ্ছন্ন বোধে

ভুবতে ভুবতে ভাবি—শরীর ভেঙে বিস্মদ বিস্মদ হয়ে

যাচ্ছে তাবৎ সংসার । জল ও ছায়ায় খঁজি-বৃক্ষ,

খঁজি একান্ত আরনার নিজস্ব মূখ । চেনা ভূগোল-চেনা

হাড়গোড়, চেনা-ভালবাসা—এ সবই নিমেষের মধ্যে

অচেনাই হ’য়ে যায়, শুধু অন্য এক মূখ উ’কি মারে

অদৃশ্য পদাঙ্গ, চোখের জমিনে চলে মূহুর্মূহু ছায়া—

জল-বৃক্ষ-বাতাসের আশ্বেদালন ।

এতকাল ভাসিনি স্রোতে

বিশ্বনাথ মাঝি

এতকাল ভাসিনি স্রোতে

তাই কারা খেন চোখ পাকার

ঈশ্বর কটু কথা বলে

কত কাজ আছে, তবু কোনমতে

অজুহাতে সময় যায়

সন্দেহের কুরাশা আপনা দেওয়াল তোলো

এতকাল ভাসিনি স্রোতে

স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি ঠায়

শব্দ কাজ করে গেছি

কত প্রাণ আছে, তবু অবিকৃত স্বতে

প্রলেপ পড়ে না, হার

অদ্বয় আড়ম্বরে শব্দ চেঁচামেচি

রবিঠাকুর নয় অন্য এক আলমগীর

আশিস মিশ্র

তার মদ্য দেখে পক্ষীমাতা আঁকা হবে

এমন ঘটনা প্রচলিত প্যাস্টেলে

প্রকাশিত হলো ।

এলো চক্রবাক - অগ্নি নিয়ে গেল, তার প্রভাবে

আমাকে 'দাহ' শব্দ পাঠিও নীল খামে ।

কেননা এই পুরুষ কপট আশ্রয় করে আছে

তার কাছে এখন প্রকৃত বর্ণমালা নেই

তোমাকে ডেকে নেবে অগ্নির লোভ দেখিয়ে

ভূমি জারিত হ'য়ে তার কাছে যাও

রবিঠাকুর নয় অন্য এক আলমগীর

তোমাকে ভেবেছে অবলা ।

কবিতার কাগজ

দুদণ্ড কাছে গেতে

মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

দুদণ্ড সময় ত্রে

যার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকা যার

সে ছিল অনেক দূরে

মাটির কাছে আসেনি সে ।

একদিন সে মাটির কাছে এসেছিল

যার বিনয় নত হয়ে মিশেছিল

আজ সে দীক্ষণা বাতসে ভাসে

ফুলের স্রবাসে । বাসে, প্রতি নিঃশ্বাসে

অথচ আজ এক অবিশ্বাসী হাওয়া

আক্রমণাতী সময়ের স্রুনে মিশে আছে

দুদণ্ড কাছে গেতে বড় ভয় হয় ।

মাটির কাছাকাছি না এলে কেউ

তার কাছাকাছি না হওয়াই ভালো !

নিজস্ব যাত্রা

সুনীল মন্ডল

তোমাকে দেখি নি বহুদিন ।

বাতাসের গারে ছড়িয়েছি গরম নিঃশ্বাস

ফুলের গর্ভকোশে খুঁজেছি আরক্তিম মৃৎ

মেঘ-নিলীমার খিঞ্জে খিঞ্জে তোমার অভিজ্ঞান

চেউ ভেঙে ছুটে আসেনি ।

তবু উৎসুক রোদের ছাহননী দিয়ে

আজও বরাবর দৃষ্টি ঘোরাই,

যেখানে ভাবনা ক্লাস্ত, সেখান থেকেই

শূন্য হোক, তোমার নিজস্ব যাত্রা মঙ্গল ।

কবিতার কাগজ ১৭

চতুর্থ পদ্যবল্লভ

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১.

স্নেহের এখন অস্বপ্ন বদলে
বিস্ময় নিয়ে আছি
বিশ্বায়নের মারীচি মায়ার
হরে ষাচ্ছি মাছি ;

২.

কেউ জানে না
কাউকে বলতেও পারি না
তোমার সবুজ বদকে শ্বাসের শব্দে
জ্বর বাড়ে, গলার বেঁধে কথা
কেউ জানে না, ঘুম পার
স্বপ্নে আড়ি পাতি
খুঁজি স্পর্শ নিবিড়তা ।

৩.

তুমি কবিতা শোনাও
নাকি কবিতাই শোনে তোমাকে
বদলে ওঠার আগে, জলের ভিতরে জলে
তুমি কবিতা হরে যাও ।

নির্মোক্ষ

শঙ্খশুদ্ধ পাঠ

সবুজ ঘাসের মথমলে পড়ে আছে
স্মৃতির নির্মোক্ষ
মেঘের ওড়ানি ছুঁয়ে দৃশ্যত যা ভাবি
একমুঠো বাদাম পেলে ভালো হয়
জীবনের দাম—ওহো !
কে—কাকে ভালোবাসে সারাৎসার ।
এই তো তৈরী হলো গান
হেমন্তের মৃদু থেকে উৎসারিত ধ্বনি
শীতের বন্ধলে ঢেকে দিই গোপন প্রণয়
ধুমোয়িত কাপে উড়ে যায়
স্মৃতি-সস্তা-স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ ।

কবিতার কাগজ ১৮

প্রেমপত্র

নির্মল বসাক

পত্র আছে ।

প্রেম নেই, প্রেম গেছে নবান্ন উৎসবে...

তার চাই একশ' আট পঞ্চাশ' কিছু !

কে আছে স্ববক, এসো প্রাণ নিয়ে, ধ্যান নিয়ে ; ধনও তুমি দুহাতে ছড়াও...

আমি আছি ধর্মান, শব্দ । ছন্দ নিয়ে নাচের আসরে,

বাহাবা বাহাবা করে কতো আর উসকাবে আমাকে

আরামে মৎস্যকন্যা সাবলীল খেলে...

আমিও তাহার পিছু উপভোগ্য সম্ভরণ ছলে, জেনে গেছি

সমুদ্রের ডেউ সব'গ্রামী ক'ধা মিরে গিলে খাচ্ছে তোমাকে আমাকে

সামন্ত তান্ত্রিক রাতে নটনারী বীরভোগ্য ছিলে,

এখন চাতুরী-ভোগ্য সমাজতান্ত্রিক...

রাতের আধারে জ্ঞানি । রাহাজানি হয়ে গেছো কবে !

মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহসব অজানা অচেনা...

অশ্বকর প্রণয় চার একোন আলোর মহোৎসবে !

পত্র নেই, প্রেম তবু আছে ; এখনো আমার তুমি প্রীতি ভাজনেষু ।

ভাষা না বোঝার শতক

প্রফুল্ল পাল

এতদিন কাছে থেকেও ভালবাসা পেল না

তাই গাছপালাগুলি ঝড়ের তাণ্ডবে সান্নিধ্য

নদীগুলি দিশাহারা, দুঃস্থল ছাপিয়ে জনবসতি গ্রাস করতে

মৌসুমি বাতাসকেও অবজ্ঞার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ।

মানুষকে গভীর ভাবে ভালবাসতে, মানুষের সাথে লগ্ন থাকতে চেয়ে

প্রত্যাহাত হতে হতে মেঘ হয়েছে সি'দুরে,

বাতাস হয়েছে সুপারসাইক্লোনে উন্মাদ,

মানুষ ভাল না বাসলে আবহমান প্রকৃতি থেকে

এবার আঘাতের পর আঘাত ছাড়া কিছুই পাবে না ।

এক হাজার বছরেও মানুষ ফিরে তাকাল না যাদের দিকে

তারা আর মানুষের পাশে থাকতে চাইছে না, ভালবাসাহীনতার ।

শব্দ ভালবাসা দিয়েই একটা নতুন সহপ্রাণে চলে যাওয়া যেত

ভালবাসা নেই, উদ্ভিদ নেই, সবুজ নেই, মেঘ নেই মৌসুমীও নেই

এই শতক নির্বিকার মানুষের অবহেলার, সবুজের ভাষা না বোঝার শতক ।

পৃথিবী গ্রামে

অচিন্ত্য নন্দী

১.

এখন কুরান। রেখার ওপারে সপ্তর্ষিমণ্ডলের রাত মেতে থাকে
ভিডিও গেম, অন্তরীক্ষের সেই গান তোমার মানুষটিকে আরো
ভোরার্ক ভোরার্ক করে। পৃথিবী গ্রামে আমাদের দেশের মানুষ
খুঁজে বেড়াই। আর আমাদের বাক্স প্যাটরা ভেঙে উ'কি দিচ্ছে
লজ্জাজনক ভালবাসা। সেই অপরাধে আমরা রোষট কান্টমেনের—
হাতে ধরা পড়লাম। যেহেতু আমাদের নিষিদ্ধ দেশে ভালবাসা হেরোইন।

২.

'তুমি' এই শব্দটা পরসার মত ঠক করে গাড়ির পড়ে
মেঝেতে। তারপর প্রুত ঢুকে ঘর বাক্স খাটের নিচে। তখন
অফিস ও স্কুলটাইম। পরসা খুঁজতে হলে খাট সরাতে হবে।
দেওয়াল ঘড়িটাও এই তুমি শব্দের অর্থ না বুঝে দৌড় শুরু করে
অফিস ফেরত সম্মুখাসকুল আমি। 'তুমি' শব্দের মত পরসার কথা—
ভুলে যায়। পরদিন। কাছের মেয়েটাও 'তুমি' শব্দটা গ্রহণ করে না।
ঝাঁট দিতে গিয়ে পরসাটা ঠেকেছে যেই। বলে, 'এই নাও, এটা তোমার'।
লোকাল ট্রেনে সন্তর্পনে পরসাটা ফেলে দেখেছি, কেউ একজন
শুভানুধ্যায়ী হাই হাই করে ওঠে 'দাদা আপনার পরসাটা'।

রমান্নিরিজ / ২৮

শ্যামাপদ প্রামাণিক

রমার স্পর্শে সাপের ছোবল
রমার স্পর্শে আগুন হাওয়া
রমার স্পর্শে হাওয়া মেঘলা
রমার স্পর্শে ফণিমনসা
রমার স্পর্শে বাগান জুড়ে ফুল উৎসব
রমার স্পর্শে জঙ্গলে জঙ্গলে পাখিদের সভাঘর
রমার স্পর্শে ফুলে ফুলে ব্যস্ত প্রজাপতি
রমার স্পর্শে পথে পথে বাউলের গান
রমার স্পর্শে পাহাড়ের খাঁজে লেখা হরঃশব্দ অভিমান
রমার স্পর্শে শীতল মেঘের চুলে খরা

কবিতার কাগজ ২০

B/059.9144/K/112

ভূমি ও একদিন

অপূর্ব চক্ৰবর্তী

দূরে দাঁড়িয়ে নদপূর

গভীর গোপনীয়তা আড়াল করা ছাড়া ক'ইবা আছে ?

এই জামায় ঢাকা বৃকের ভেতরে একদিন

দেখবে ভালোবাসা ফাটিয়ে দেবে ফুসফুস ।

তোমার লোহিত অথবা ছুঁয়ে যাওয়া প্রেম

প্রতিবেশী পাড়াটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ।

কত কন্মবেণী পাওয়া না পাওয়া, কথা রাখা না রাখা

তার ওপর আমি দাঁড়িয়ে রইছি নদপূরের মতো ।

ঐ দূরে আল

নদপাশে ধানি জমি আমাদের মতো

সমস্ত কামনা-বাসনা ভুলে একদিন বর্ষা

ভূবে যাবে মা আমাদের ভুল বোঝাবুঝির মতো ।

এই ক্ষেত ধানের মরাই ও শ্যাওলা ঢাকা পুকুর

প্রচণ্ড নিশ্চিন্ততা পাতার পাতার

আজ এই রাখালের বাশির ফুঁরে

দেখবে একদিন ভূমি বাশি হয়ে যাবে

প্রেমে অপ্রেমে, প্রচণ্ড স্বপ্নে ও রাখালের স্বপ্নে ।

ব্যক্তিগত

কৌশিক গিরি

একটা অসমাপ্ত কথা

হাজার কথার কনসার্ট তোলে বলে

কুলুপ আঁটা আমার মূখ ।

তারপর ডেউয়ের মতো অবিপ্রাণ্ড আছাড়

টুকরো কথা । কথা টুকরো

ঝেড়ে মূছে সাজাতে গোছাতে

আনমনা হয়ে যার সতর্ক সময় ।

তখনও কুলুপ আঁটা আমার মূখ ।

নাজিরে তুললেও সব কথা তো নল

সবার জন্য কিংবা একজনের জন্যও ।

না বলতে পারলে কথারা কি মরে যায় !

মন খারাপের বিকেল

সদনীতা বর্মণ

বৃষ্টি তুমি এসো, আমার মাটিতে
প্রশান্তির ছায়া নামুক...
বৃষ্ণার ঘ্রানিতে দিশোহারা
ধ্বংসর এই মনের প্রত্যাশা গুচ্ছ
পুরোনো স্মৃতির আলবামটাকে
ফিরে পাই বৃষ্টির ভাজে ভাজে ।
তুলে আনি অতীত বতর্মানের কথাকলি
মন খারাপের বিকেলের স্মৃতি ডারে
জমে গেল একফালি বিন্দু বিন্দুজল
ধ্বংসর হৃদয়ে জমে থাকা অনুভূতি
শিউলির মতো টুপটাপ কান্নার
খসে পড়ে স্মৃতির মগডাল থেকে
ফিরে ফিরে পাই একরাশ রঙিন ইতিহাস ।

তমালিকা প্যাডাশেঠ'এর কবিতা

বসন্ত বিষয়ক অনন্দব

এখন প্রতিদিন মেঘ করে থাকে
সমস্ত রুটিন ছিঁড়ে ফেলে
প্রকৃতির বেনিময় বাড়াবাড়ি
এসব সবেও কখন
চুটেছে পলাশ কাণ্ডন ।

বিকেলের ছাদে রুগ্ম রোদ
জন্ডিস রোগীর চোখের
হলুদ আভার মত লুটোচ্ছে বখন
পশ্চিমে তাকিরে দোঁথ
কোন অনুমতি না নিয়েই
প্রকৃতির গোপন ষড়যন্ত্রের সঙ্গী
লাল হেলমেট পরা
পটলিশ সার্জেন
আলে আলে পলাশ কাণ্ডন ।

অন্য জীবন

হে ঈশ্বর,
আমাকে আর এক জীবন দাও
এক জীবনে আর কতটুকু
ভালবাসতে পারব আমি

হে আকাশ,
আমার হৃদয়কে আরও বিধাহীন কর
যাতে আমি শূন্য তার জন্যই
মরতে পারি

মাঠ একশ' বছর তোমার কাছে
চাইছি হে অনাদি অনন্ত
এই সময়টুকু আমার প্রিয়তমার—
পলাশ কলির মত চোখের তারার
ভূবে যেতে চাই ।

শত্ৰু

রাত বারোটা
এলাম' রকের মত
প'গাচা ডেকে উঠল ।

আমাকে জেগে থাকার ফরমান দিয়ে গেছে
আমার শত্ৰু ।

ঈর্ষা খরখরে সজারুর কাটার মত
জেগে থাকে সমস্ত শরীরে তার
তবু তার জন্যই প্রভাতের প্রথম আলোয়
সংরক্ষণ করে রাখতে হবে ।

তবু তার জন্যই দরজা খোলা রাখতেই হবে
সভি শত্ৰুও
এমন 'শত্ৰু' হয় ।

অরিন্দ্র চন্দ্রবর্মা'র কবিতা

খণ্ডচিত্র

পূজা

বসতে দিচ্ছে না তাকে ঘর
রাস্তাও উধাও হয়ে যায়
অঞ্জলিতে দগ্ধ বসে আছে
ফুলগুলো রাখবে কোথায়

২. অনুভব

চাইলে ছুঁতেই পারো মৌচাকে টিল
অথবা দিতেই পারো বোলতাকে খোঁচা—
কিন্তু সেটা নিতান্ত মর্থহীন
কেন—তা যন্ত্রনা জানে আর জানি আমি

শাস্ত

ভালোলাগা মূছে মূছে মূছে, রক্তে গিরে ফোটে ভালোবাসা ।

৪. অমৃত

দিঘির চৌকাঠে গিরে বিষরভা শেখে কি নয়ন ?
ধাপে ধাপে সিঁড়ি নামে খুঁজে পেতে অছিল জলের
কোনো দিন তুমি যাও ? পারে কাঁটা বিঁধেছে কখনো ?
রক্ত কি ঝরেছে যেন পাপড়ি-ছেঁড়া কামা গোলাপের ?

৫. লক্ষ্মী

হাতে তোমার লক্ষ্মমালা পশ্চপাতায় কড়ি
যেমন খুঁশি চাঁদ ছড়াবে এবার কোজাগরী

৬. বিবাহ

মাস্তার সবুজ বন তোমার শরীর
ও কাননে অন্তত একবার
যেতে হয়
অমৃতবর্ষা এক গৃহ্যর কোমলে
জমাগত উন্মোচিত জ্যোৎস্নার কুণাল
বিরল স্নানন্দ স্তনে
প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসে

৭. সূত্র

মেঘে মেঘে অশ্বমেধ, কপীপু হ্রুবার মতন বজ্রবাহার
জীবন তোমার চোখে ছায়া বোনা শূর্য হল প্রভুত মাকড়সার

৮. চিঠি

নিবু নিবু অশ্বকার তোমাকে লিখছি
রাত্রিতারা বিধে আছে পারুল গাছে
রূপোলি ফাগের রঙ ধরেছে পাতার
ভোর হবে দোর খোলো প্রকৃতি খাতার

৯. মিলন

কখনো কখনো প্রেম
কামনার কারসাজি করে
বৃষ্টির তুমুল কোলাহলে
রক্ত বরে পড়ে
তারপর সব শান্ত
সব স্থির চলে
মাঝি আসে চেনা নৌকো নিয়ে
বলে চলো চলে ঘাই
একসঙ্গে দূপের পেরিয়ে

১০. তথ্যপি

মেরেটি অমিত্যয়নী, বেহিসেবী মন
যখনই সে প্রেমে পড়ে তখনই কৃপণ

১১. মূহুত

প্রজন্ম জ্ঞানালার কাঁপছি সূর্যের আলোতে আমি মূক
নিজেকে নির্মীর্ণমাণ দেখে, চিন্তাবীজাণুরা বাড়ায় অন্তর

১২. স্থিরজীবন

আলো কি নিভেছে ? তবে দেখি অশ্বকারে
কিংবা অশ্বকার হয়ে থাকি
আকাশে আকাশ আছে, সংসার সংসারে -
তবে কেন মূঢ় ডাকাডাকি

১২. সূচক

ঠিকানা নির্ভুল ছিল না হে,
অগত্যা ভেসেছি আমি ঘাটে-ঘাটে প্রবাহে-প্রবাহে
নমস্কার, ফিরে চলে যাই তাড়াতাড়ি
প্রেরকের নিরাসক্ত বাড়ি

১৪. সমর্পণ

এত ডাকাডাকি কেন ? অদূরেই আরেকটি বধির
সন্তপ্ত কোকিল বসে আছে
বিশাল গম্ভীর আমবাগানের ছায়ার আমি স্থির
ধাকি বধিরতা আর অস্থিরতার কাছে

১৫. বোধ

রক্তের বদলে জ্বা দিয়ে মার ভাষা—মাতৃভাষা ।
কোথাও কোকিল আছে । কিন্তু কুট পাশা শব্দ করে
মনে রাখা ভালো, সব রক্তের ভিতরে
কোকিল বসন্ত আনে, বৃন্দ নিরে আসে কুট পাশা ।

১৬. বদল

সব রহস্যের জট ধীরে-ধীরে খোলে ।
কিছু দিয়ে কিছু নিয়ে যেতে চাও আজই ?
আমি হাত বাড়িয়েছি—রাজি,
আমার আপিস নেই কারও সঙ্গে বাগান বদলে ।

১৭. টাণ

সকল টাণের মূলে মধু আছে কিন্তু ছন্দে বিষ
অহরহ নিশ্চুর নাগিল

গোপাল মল্লিক'এর কবিতা

খিদে

সমস্ত ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি
সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি
সমস্ত ভালবাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি
সমস্ত রাগির মতো খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি

আমাকে বসতে বলবে না ? এখনো ভয় ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার ইচ্ছা চলে গেছে
আমাকে তোমার ইচ্ছা দেবে না ?
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার শক্তি নিঃশেষিত
আমাকে তোমার অমের শক্তি দেবে না ?
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাকে ভালবাসা ছেড়ে গেছে
কিন্তু । কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যার নি খিদে
আমার খুব খিদে পেয়েছে । খিদে সহ্য হয় না আমার
আমাকে খেতে দেবে না ? এখনও ভয় ?
কিসের এত ভয় ? আজ একুশে ডিসেম্বর-১৯২৯
ভরে ভরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
বীর্ষপাতের আনন্দটুকু আমাকে ছেড়ে গেছে...
অথচ গভ' সঙ্গারের ভরে কে'পে মরছো তুমি ।

আমাকে খেতে দাও, শোন, খুব খিদে পেয়েছে আমার
আমাকে ভালবাসো, শোন, আমি রাগির মতো একা
আমাকে ধারণ করো, শোন, শুনতে পাচ্ছো ?
অমৃত্যু আমি তোমাতে সঙ্গারিত হবো ।

ও ভালবাসা

চলে যাওয়ার দিকে হাত নাড়ছি, হাত নাড়ছি
সেই কবে থেকে দেখছি—চলে যাওয়া...
সকাল গেছে, দুপুর গেল, সন্ধ্যাও যার যার

কতো আর হাত নাড়বো ? রুমালে ধে গি'ট বে'ধে দিরেছিলাম —
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘেন খুলে গেছে তাও ।
তবে কি আমাদের শুবুই হাতনাড়া ।
ও মজদু, ও রীণা, ও আমার অলীন...
পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম

আমাদের নৌকা যাচ্ছে ভেসে...
ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে অঁধে পারাবারে
বাগিচাভি ভেঙে ভেঙে এই বে আমরা ক'জন হতমান
এগুতে পারছি না এক পা'ও—
আমাদের সামনে এক অসহ্য সাদা দেওয়াল
অঁচ এই দিকেই আমাদের মাতাল সরণী ।
আমাকে শতাব্দীর শেষ অভ্যুত্থান চাঁদ
শোকগাথার মতো জ্যোৎস্না ছুঁয়ে আছে মনের গ্রাস
আঃ করবকুচি, কতো আর ওষ্ঠ ছোঁরাবো
আমরা যাবো না ? দাঁড়িয়ে আছি পাড়ে...
আর আমাদের নৌকা যাচ্ছে ভেসে...

পরশর

কুরাশার ভিতর উ'ছু শিরীষ গাছের মাথা টপকে
কুরাশার মতো তোমার চলে যাওয়া...
নদী জল, সান্দ্র্যশীত, পাতা করার উশ্বশ
নাইলন জালের উপর টেমির আলো,
উলুনে ফুটে ওঠা কোল,

মৎস্যগন্ধার সঙ্গে

সহবাসের আগে পরাশর,

আপনি কি এমনই এক ছবির ভিতর

মগ্ন হ'য়ে ছিলেন...

বিপ্লবপ্রিয় গিরি'র কবিতা

হন্নতো রোমান্স

আমি কখনও কখনও, বিদ্যাহ, গোলাপ কুড়ি
দেখি ডেউরের ফেনামাথা, চৌচির, মৃৎ তুলছে
নীলে মৃৎ তুলে লালে লাল, সুস্থির, খোলে প্যাপড়ি.
ভিজ়ে ডেলভেট স্বরব্দ, জল
ঝরে ঝরে গড়িয়ে—গড়িয়ে—পড়ছে
চাতক সবুজ মাটির টুটিফাটা গায় ; আর
চোখদুটি কেবলই ডেকে চলেছে এ-ক-টা-না
আর আর আর ঢেউ আর ভাঙ
ভাঙ ভেঙে ভেঙে আর ঢেউ আর...

সেই চোখ

সাকুলার রোডের সন্ধ্যায় হাটতে-হাটতে-হাটতে
মাতাল গলির মুখে যখনই দেখেছি—দেখেছি
সেই চোখ : গলিতে ঢুকেছি
ঢুকেছি আমি, বড় রাস্তা ছেড়ে
আলোগলা ট্রামলাইন পেরিয়ে
টলমলে গলির ভিতর
দেখ নি কি তুমি ?
দেখ নি তো—গ্রেটভায়া তুলে
ছোট—ছোট—খুব ছোট মানুষের দিকে ।

চেনে-চেনে-চেনে—কি চেনেছিলে তবে
পদ্রবের কাছে ?
কিংবা গেরুয়া রঙ স্নাডের আলোতে ?
রক্ত বসনা

কালো কালো মিশকালো রাত্রির মাঝে
বুঝিবা
লাল লাল আরো লাল রক্তই হবে ।

মধুসূদন মধুখোপাধ্যায়'এর কবিতা
একটি (A) শ্রাব্য কবিতার খসড়া

সালেম শটগেলের মতো

ঝকঝকে সকাল

বিজ্ঞাপিত সুরক্ষাক্রমের বন্ডি ছুঁয়ে

চারের কাপ ও সংবাদপত্রের উপত্যকায়

তুড়ু তুড়ু লাফান, রোজ

আজ হঠাৎ খবরের পংক্তিভোজ

থেকে মূখে করে কাগজটুকরো

এনে বললে :

কী লেখা আছে ?

দ্যাখো তো উড়ে যাচ্ছিল

('উড়ে যাচ্ছিল, উড়ে তো যেতই

মনে না করিয়ে দিলে')

কাগজটুকরোর নিবেদন

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ : ২ × ৫

১. মহাশতীর মূর্তি উন্মোচন থেকে
পোখরান ফাটল কত আলোকবর্ষ ?

২. লিউনিংক ও বিন গাদেনকে নিয়ে
চন্দননগর লাইটিং কীভাবে ভাবছে ?

(খরে নাও : আলু ১০ টাকা কেজি

ডাক্তারদের মিনিমাম কী ১০০ টাকা

দিল্লীতে জলের অভাব ও ধর্ষণ বাড়ছে

আসেন'নিক জল নিয়ে সেমিনার হবে তাজবেঙ্গলে!)

উত্তর ভাষতে গিয়ে :

ভিটোরিয়া ভাঙা বেগু আঁখি তুলুতুলু

পরপর হামি খেয়ে নিদে গোঙায়লু ।

কবিতার কাগজ ০০

বীজগানিতক

এক্স আমাকে সহজপাঠ
এক্স আমাকে গুঁমঘর
এক্স আমাকে খুঁটখাট
অন্ধকারে পরস্পর

এক্স আমাকে বাজারনীতি
এক্স আমাকে ভেজস্ক্রী
এক্স আমাকে যুঁশ্বরীতি
গভ'পাত মার্জ'নীয়

এক্স আমাকে বাউ'ডারী
এক্স আমাকে স্বপ্নদোষ
এক্স আমাকে ফ্যাটবাড়ি
জ্ঞানমণ্ডে মালাকোষ

পদ্রুঘ

আমি আমার বিধবসী আত্মার মৃণ্মুখি এখন
যে আমাকে লালন করেছে বহু বছর ধরে
আলো অন্ধকারে
ঘনিষ্ঠ মৃত্যুর ঘনীভূত হাওয়ায়
সেই আত্মা আমাকে কালো বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে
প্রতিটি ভাস্কির পরে সে আমাকে হেসে বলে
লুডোর চাল যদি আবার গোড়া থেকে দিতে
সক্ষম হতে
যদি আবার
তার সেই কথা আমাকে টেনে নিয়ে গেছে
যে অস্তিত্ব একসময় আমার বিশ্বাসের নাগালের
বাইরে ছিল
অথচ থাকে এখন আমার অত্যন্ত কাছের মনে হয়
হাতের কাছে
চোখের ঠিক সামনে
বিরাট এক শক্তিময় পদ্রুঘ

লিটল ম্যাগাজিন

এস. মহিউদ্দিন

মাননীয় মহাশয়, একটু দাঁড়াবেন।

আপনাকে কিছুই দিতে না পারার নির্যাসে বাসনা

আমাদের সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে,

কী করি বলুন তো ! আমাদের তো কোনো চেয়ার নেই, কিংবা

অগ্রভাগে কোনো সম্পাদকীয় টেবিল বা ডেস্ক

নেই-বেখানে সাড়ে তিনটে বাই আড়াই ফুট

পারদহীন কাঁচের প্লেট আজানুলম্বিত চিংপাত শূরে

থাকবে। কিংবা আমরা দলবদ্ধ উবু হয়ে তুলু তুলু চোখে

বহির্দৃশ্যের আহা মরি ছায়া দেখবো ? তাই আপনাকে

কিছুই দিতে না পারার অক্ষমতা, ব্যর্থতা

আমাদের কাদাম না, চোখের জলে কাঁপায় না।

কেন না, মানুষের চোখের জলের দাম আজকাল

সূচক অনুযায়ী বৃদ্ধি হয় না। বরং বলতে পারেন :

মূল্য হ্রাসের পরিসংখ্যানে চোখের জল দাঁড়িয়ে থাকে

শুধু জল হয়ে থাকতে পারে

শুধুই জল হয়ে থাকতে পারে

জীবন হতে পারে না।

সুতরাং মাননীয় মহাশয়, একটু দাঁড়াবেন।

আমাদের সাংসারিক উৎসবে

মাঝে মধ্যে রঙিন কাগজ, ফুল, পতাকা উড়ে যায়

খুলো মাটি মাখা মানুষের ঢল নামে, বাগক বাগিকার

লতানো লাইন এঁকে বেকে হেঁটে আসে, বর্ণপরিচয়ের পাতায়-পাতায়

প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, বিদ্যাসাগর

শরৎ, সুভাষ, বিবেকানন্দ হেঁটে আসেন স্বর্গের আলোছায়া মেখে

দুশ্শোখাসের উঠানে...

শুধু আপনিই আসেন না।

লক্ষ্য রেখার গাঁড় ভেতরে হাটতে হাটতে

ব্যাকরণ বুলি শেখান : সমাস কাকে বলে ?

সন্ধি কাকে বলে ?

ফর্মি কাকে বলে ?

কবির কাছাকাছি

মধুরা মিত্র

মাথার পাশে এসে হাত রাখো মাথার আমার
আলতো ছুঁয়ে বলে যাও

—এখনো ততোটাই ভালো আছি
যেমনটা আগেও ছিলাম।

বন্দ্য শহর যেনো গ্রাস করে চাঁদ
আজ চাঁদ পৃথিবীর বড়-কাছাকাছি।
চাঁদের কালিমা আরও স্পষ্টতর হয়
শহর কলকাতা আজ শুধু কাড়বাতি।

ভয় হয়।

সহস্রাব্দে ভোর যদি রঙ বদলায়
কোথায় থাকবে তবে কবি ?
চাঁদতো আবার সরে যাবে
সরে যাবে আলতো ছোঁওয়া সময়
ভালো যদি নাই-ই থাকি আমি
এ হৃদয় থাকে যেনো কবির কাছাকাছি।

অন্যগ্রহ

বিপ্লব রায়

সম্পর্ক অশ্বকার। ছুঁতে পারিনি আলো
জীবন পূর্ণ করে সুনিশ্চিত শব্দে
শতাব্দী নস্রতো শুষ্ক—সুনিবিড় ছায়া

ক্ষিপের কাছে, যুদ্ধের কাছে—প্রজারা
একটি বাঁচ। পৃথিবী যেন অন্যগ্রহ

রূপান্তর

আনন্দ মোহন দাশ

পায়ে পায়ে ডেঙে গেছো রাগি-পাখর
দু' হাতে মেখেছো ভিজ়ে মেঘ, বৃষ্টি
আজ কেন গোব্দির ম্খোম্খি রাগি কুসুম
চৈত্ৰেয় খরতাপে খরা ধুলো ।
কোন সে না-পাওয়ার নীল অভিমানে
গল্ঘলতা ছুঁয়ে থাকে মাঠের অফলা চিবুক
মেঘালি সন্ধ্যার ধুলো ঝেড়ে উঠে আসে নতুন সকাল
তবু কেউ কেউ শতাব্দীর ধুলো মেখে
হেঁটে যায় একা একা...

ধোকা

আবদুল মান্নান

তিরিক্ষি বাউল বাতাস স্তনের পাড় ডাঙে
বেদনার জাল ছিঁড়ে যুগ যুগ ফেরারী যুবক ।
তোমার দৃষ্টিমি কালক্ষেপে সমকালীন
বাণিজ্যের ব্যস্ত বাজারে
আমি তো বহু তথাকথিত শূঙ্ক মান্সুল
মিছিমিছি শাসন না করে
বুক প্রসারিত হতে বাড়লে
চাঁদে বাড়ী ঘর বানাতে পারবে
যুগের চরণ ছুঁয়ে বুকের লেখার প্রকাশ
স্বহান্যেই পেঁছে দেবে বিমান বন্দরে
একদি ভূমি তো ঠাকুরদা হবে...

চিঠি

ব্যোমকেশ জানা

ফাদ পেতে বসে আছে খাশনবীশ দল,
গোপন জ্বাল হিঁড়ে হিঁড়ে টেনে আনে ফসল,
মগজের সুকুম্মাল ছড়ানো মগ্‌ডালে
রস পৌঁচানোর আগে শিকড় জানে সে খবর ।
চিঠি খোসার আগেই রণপায়ে এসে যায়
আলু-পেঁ'রাজ-তেল-নুনের বাজারে ফাগুন মাস ।
হাটে বাজারে হাসি কিনে—সপ্ন কিনে
মৃগচরে কানামাছি খেলে হে বনেদী-সংসার ।

হাওয়া

বিরথচন্দ্র মন্ডল

অকল্পনীয় ছায়াহীন প্রকৃতি—
বেঁচে থাকা প্রাণীর সমাজে
যতদূর চোখ যায় লীন শব্দের
হাওয়াই চিরন্তন ; তাই হাওয়া কখনো হাওয়া
হতে পারে না...

প্রতিবিশ্বে আমরা

অতনু পন্ডা

অসুখ লেগেই আছে বছর ভর
ব্যথা যন্ত্রণা—শুধু বিষ ধোঁয়া
এম টিভি গিলে খায়—অক্লান্ত শৈশব
ঘুনপোকা বাসা বাঁধে,
অস্থি, মজ্জার—

তবু কেমন স্বপ্ন সব ভেসে ভেসে ওঠে
প্রজন্ম জুড়ে মধ্যযুগ অধার
দুঃ' হাজার পেরিরে ও আছি
শুধু লাশ হয়ে

নির্বাসন দেবে আমার

রবীন্দ্র সিংহরায়

একের পর এক সময়ের সব গাঙ সব উপকূল পেরিয়ে

উড়ে আসে প্রজাহীন মৃত প্বপ্নের চিঠি

সে নাচে অবিরাম আমার চোখের শাখায়...

চিঠির ভাষা গাছের কিশলয়

আর আমার মধ্যে কোনো ওফাৎ দেখিনা আজ

তবুও জ্যামিতিক অক্ষরমালার বিষয় ছবিগ্দুলো

উথালপাথাল ঢেউ-এ নির্বাসন দেবে আমার !

তাই বিশৃঙ্খল জলের সব বৈভব-কলতান যেন

মহা মৌনতার মগ্ন তপস্বী,

সর্বাদ্বে নীরবতা মেখে দুরাগত নির্বাসন বাতী

সে শূন্য শোনে আর শোনে

শোনার না কিছুই ।

কবিতা সংবাদ

মহম্মদ ইনাসউদ্দীন

বিশেষ বিশেষ খবরে এবার কবিতা পাঠ হবে

যা সব শুনছি তা তো গদ্য হতে পারে না

ব্যাকরণে এতো অনিয়ম—অগছালো দুর্বোধ্য ভাষা

খবরের সব ভাষাই তাই পদ্য পদ্য লাগে

টি. ভি. স্ক্রীনে যা দেখি

মনে তো হয় না ক্যামেরার কোন ছবি

শিল্পীর আঁকা কোন বিমূর্ত কোলাজ

এসব কি সত্যি ঘটে, আমাদের আশেপাশে—এই একুশ শতকে ।

আইনেরা আইন অমান্য করে

ফাঁকা রাস্তার রাজা গান গেয়ে ওঠে—অ্যাই বতন অ্যাই বতন

এবার তাহলে কাব্যপাঠই হোক

খবর পাঠক,

বিশেষ খবরে তুমি কবিতা পাঠ কর ।

কবিতার কাগজ ৩

খুন করেছি

বিধান মাঝ

হ্যাঁ, ঠিকই আমি পাপ করেছি। জলের মাছ ব'ড়শি গে'থে
নিবি'বাদে খুন করেছি। যে দিন তাকে খুন করলাম,
দু'দিন ধরে খাইনি কিছু।

উপোষ ছিল মাগী আমার—আমার চেয়ে আরও দু'দিন,
তাই তো আমি খুন করেছি, এর ভেতরে দোষটা কোথায় ?
দু'হাত ভরে রক্তজবার লালটুকটুক প্রাণ লু'ফেছি,
জবার আবার প্রাণের দাম ?
—নিজে বাচলে বাপের নাম।

দু'হাত ভরে বুন করেছি, সুখ পেয়েছি সুখের উঠোন ফল জুড়ে।
যেদিন আমি মেয়ের বোঁপায় লটকে দিলাম লাল ধ্বাটি।
চোখের সামনে বস্ব হ'ল
অনাহারের কান্নাকাটি।
খুন করেছি। সুখ পেয়েছি
আলোর স্নানে—এর মধ্যে দোষটা কোথায় ?
দোষটা কোথায়, দোষটা কোথায়...

বাস্তবিকই

সন্মিত সাহা

মাথার উপর দিলে উড়ে গেল কালো পে'চা
বিল্লী কক'শ ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল সে...
অশ্রুকার কুপকাপ নামছে ঘাটির দেওয়ালে
পাশেই পু'ণ্য নদী গঙ্গা ঈশ্ব'র হেসে ঢলে ঢলে
বয়েই যাচ্ছে ছন্দে আনন্দে...

সংসারে সবাই কে কতোটা হাতাতে পারবে,
তারই কারনা কসরৎ করছে, সন্নিপ'ন চপলতার।
আর আমি ধু'ধু স্মৃশানের পাজরে আলিকালি চিতায় জ্বলছি
পু'ড়ে পু'ড়ে থাক হচ্ছি অস্থির আগুন শব্দায়। এ সময়ে এক কালো
কুকুর আমার গন্ধ শব্দেতে শব্দেতে আশ্রয় অবলম্বন বোঝে
বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে আর এক উলঙ্গ বাস্তব...

অগত প্রজন্ম

কালীপদ প্রধান

তোমাদের বলছি, যারা
এখনো এসে পৌছাওনি শেটনে
অনাগত ভার্তিথি
তোমাদের জন্যে রেখে যাওয়া হলো না
খোলা মাঠ,
দেখনিও গল্পের বই-এর ছবিতে
কিংবা কল্পনায়...
রেখে যেতে পারিনি মাথার উপর
খোলা আকাশও
ব্যালকনি থেকে যৌকু দেখা যায়
তাকে সহস্র কোটী গুণীতকে
নিরে কল্পনা করে নিও—
বিগত শতাব্দীর আকাশের পরিসীমা
একান্ত যদি চাও, তবে—
কণ্ট করে ধেতে হবে থর কিংবা
সাহারার বুকে।

তার মূখ □ কৌশিক রায়

গদ্য এবং

শূণ্যের মধ্যে আমাদের আলো পৃথিবীর নিজস্ব বাস আর পরম মৃত্যুর
দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হাত। নিজস্ব মৃত্যুর দিকে যেতে যেতে ছাগ মধ্যরাত্রির
ভরঙ্গ মেখে নেয়, চোখে আসে অন্য চাঁদ অন্য চিত্রের দীঘল দীঘল চোখ।
তার ঠোঁট থেকে করে পড়া মরা ইন্দুর যেখানে নামে সে ধানখেত এক
স্নোতহীন নদী। নদী তো নারীরই মূখ—বসন্ত উৎসব। অচ্চ ক্যাম্পে
বসে ঘুম আসেনা বসন্ত রাতে। রাতে রাতে চিত্রের বাতাস, আগুনে ঝলসানো
হরিণের মাংস তবু ঘুম নেই—ঘুম নেই। হাঁটুর ওপর ধূতি ছিল তোমার,
আমার জিন্স টি শার্ট অচ্চ মাস্তাতাড়িত মাতাল বেলুনের মত সে পথেই
হাটাটাটি, এভাবেই ঢুকে পড়ি এক মানচিত্র-সীমা-সীমারেখায়। সমস্ত
অশ্রুপবনান্ত জল খুইয়েও পারব না এ সীমা অতিক্রম-অশ্ব ক্রোধ তোমার
উপর—কেন এত ধূসর পাণ্ডুলিপি। মাথার উপর সূর্যতামসী আকাশ-
আড়ালে দৃষ্টি, দৃষ্টিতে অনুকম্পা। আমারও কিছুর নতুন দেওয়ার আছে

কি বিচিত্র আনন্দে মাতোরা দৃষ্টি। চোখের কোনে হাজার বছরের
 ক্রান্তিময় স্বপ্ন, স্বপ্নের ধূসর রঙে তোমার কুরাপালক ওড়ে—আমি ছুটে বাই
 কেবল মাত্র একটা পালক-একটা পালক চাই আমার, সে পালকে অপলক
 ছোঁয়া। আলগা চুল মুখে এসে পড়ে বৃষ্টি, এখন চিত্রের হাওয়া একসনেই
 স্বপ্নের আগুন—অন্তর্গত দূর কল্পলোক। খানিক আগে পেরিয়ে এসাম এক
 আশ্রয়ণ, ঘন কুরাশার আশ্রয়ণ। ভারী বাতাসে প্রাণের গন্ধ। গন্ধ থেকে
 অন্ধ বাদল চিনে যায় পলি-মাটির দেশে তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হাত,
 যে হাত স্পর্শাতীত কোনদিনের জন্যও নয় স্পর্শ অথচ সে দিকেই আমাদের
 অনন্ত বাত্মা—মাঠ নদী খেত পেরিয়ে পেরিয়ে গায়ে কুরাশার উত্তাপ, পায়ে
 শিশিরের শব্দ—এক অনন্ত বাত্মা। যেতে যেতেই প্রেম নৌকা নদী—এ
 নদীতেই মৃণালিনী ঘোষের শব্দ ভাসে। শবের ভিতর শবের ভিতর ভিজে
 রূপালী জ্যোৎস্না। অথচ আমরা যেতে পারতাম অন্য নদী কিন্তু সে
 জলসেখার বিন্যাস কোথায়? এখানে বৃষ্টি উঠে আসে রঙীন সাপ। হাটু
 মূড়ে বসি আকাশের দিকে মুখ। আকাশের ওপারে বিন্দিশার মূখশ্রী—এ
 আলো আধারিতে বোকা যায় না, সে সব সাদা ফেনা না ডানার উল্লাস।
 এ বিধা-বন্দের কোন আড়ালের নাম নেই। মাথার এক বোধ কাজ করে—
 নির্লিপ্ত বোধ। কর্তৃদীন সহ্য করা যায় হানাদারী—হতে পার জীবনানন্দ।
 তোমাতেই রাগ তোমাতেই কোভ। কেননা তার সাথে তো আবার কুড়ি কুড়ি
 বছরের পর মেঠো রাস্তার অথবা মৃধোমুখি ট্রেনের সীটে হঠাৎই। ততদিন
 কাকে বলব কাকে? জানেনা কি অসহ্য কোভ আমার, সে সব ইতিহাস
 অস্বস্ত্যে কামাঙ্ক্ষর এক মহান শোক। অবুধ ক্রান্তিতে সম্মুখা নামে সাতটি
 তারার তিমির পেরিয়ে পাশে ব্যাবীলনের রাণীর ড্রেসিং গাউন আর বনলতা
 সেনের নুপুড়ের শব্দ আসে, স্মৃতি গভীর হলে বেড়ে যায় সন্দের বনব।
 চিত্তার আগুনের মত শব্দ পোড়াতে থাকে তরুণ কনিকে সে শব্দের কোন
 মাত্মা নেই সতি নেই—শব্দের সাথে যোগ দেয় মহীনের ঘোড়াগুঁলি, জিরাগ
 জ্বলে অন্ধকার নেভেনা হাজার খরের দাপট, ছুটে চলা মহীনের ঘোড়া-
 গুঁলি... ধুলোর ঢাকা পথ আর ধূসর ধূসর পাখুলিপি...

রাফিক উল ইসলাম'এর 'খেলা' □ স্মৃতির দূত

সারাটা রাত আকাশটাকে বাড়ির মতন উড়িয়েছি। জ্ঞানভিক্রে
 বলি : একজন ছাড়া একথা জানেনা কেউ ! তারও কটিদেশ মেঘের
 সাথে উড়েছিল ; দূর্বোধ্য কোনো ইশারার সাথে। উড়তে উড়তে
 এক একসময় চড়ার ওপর ছত্রখান। আকাশ তখন আমার স্রোতার

পাক খাচ্ছে দূরন্ত এক কবুতর যেন। ইঞ্জেনতন ছুটিরে তুলছি
 নিভিরে দিচ্ছি তারাগুলিকে। দশ আঙুলে ছিঁড়ে কুটে ভাসিরে দিচ্ছি
 কাগজকুচি। কাগজ তো নয়, সহস্র নীল ছাড়িয়ে পড়ছে রোমাণ
 লুড়ে। একটি ভুবন ভেঙেছুরে দশটি ভুবন জেগে উঠছে !
 খেলার পারে দিগন্তব্যাপী শূন্য লাটাই। দীর্ঘ স্রতোর কঁকে আছে
 মগ্ন আকাশ। ছেঁড়াখোঁড়া নয়, শূন্য কিছু রঙ হুঁইয়ে নেমেছে।
 জনান্তিকে বলি : একজন ছাড়া একথা জানে না কেউ !

সময়কাল—রাতি। প্রহর বিচনের মধ্যেই ফুটে উঠেছেন কাক রায়কউল
 এবং তার আকাশ-ঘড়ির তাৎপর্যমণ্ডিত সম্পর্ক। বৃষ্টিতে অনুবিধা হয় না—
 কে এই ‘একজন’, যে একজন শূন্য কবির ঘড়িধর আকাশ ওড়ানোর প্রটাই
 নয়, হয়ে উঠেছে স্বয়ং আকাশ। এই ওড়া এবং ওড়ানোর মাঝখানের যে
 নৈশেন্দ্র্য তা কোনো এক দূর্বোধ্য ইশারার বাহ্যিক। উড়তে উড়তে চড়ার
 উপর একসময় ছত্রখান হয়ে যায় কবির নারী। ছত্রখান হয়েও সে হারিয়ে যায়
 না। কবির আকাশ হয়ে বেঁচে থাকে সে আর দূরন্ত কবুতরের মতো পাক
 খেতে থাকে আকাশে। কবির এই আকাশ এবং নারী এক অনুসঙ্গমর নক্ষত্র-
 পুঞ্জের সঙ্গে, ছিঁড়ে কুটে ভাসিরে দেওয়া উড়িয়ে দেওয়া কাগজকুচির সঙ্গে
 কবির অনুভূতিপুঞ্জের সঙ্গে একাত্মতা লাভে অন্যতর ব্যাঞ্ছনার ব্যাহিত হয়ে
 উঠতে থাকে ক্রমশ। ‘সহস্রনীল’ এবং বিধ বিস্তারের দ্যোতক। আর সে কারণেই
 একটি ভুবন ভেঙেছুরে দশটি ভুবন জেগে উঠছে। ঘাছিল নিত্য ব্যক্তিগত এবং
 একান্ত তা হয়ে উঠতে চাইছে অনেকান্ত এবং আরো অনেকের।

খেলার পারে দিগন্তব্যাপী শূন্য লাটাই। খেলা কি ইহ-জীবন ! জীবনের
 পারে যা আছে তা কি মৃত্যু ? না কি মহাজীবন ! ‘শূন্য লাটাই’ কি হতাশা,
 খেলাশেষের ক্লান্তি—বিধরতামর খেদ ? নাকি দিগন্তের প্রসারতার নিজে
 মেলে ধরার নৈশেন্দ্র্য ! দীর্ঘ স্রতোর কঁকে ঝাকা মগ্ন আকাশ আমাদের সামনে
 তেমনি এক অনুচর্য উত্তর নিয়ে জেগে থাকে। □

গণশকার জীবন সরকার’এর পৃথিবী □ সাগর চক্রবর্তী

জীবন সরকার নামটির সঙ্গে আমার ভিতরে একটা অন্তরঙ্গ টানের সম্পর্ক
 সৃষ্টি হয়ে গ্যাছে কবে কখন তা আজ বলা যাবে না। মিছিলে মিটিঙে
 প্রতিবাদে কাঁখে কাঁধে মিলিয়ে পা মিলিয়ে চলতে চলতেই এরকম পোড়খাওয়া
 সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বরেন্দ্র বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই টান গহীন গভীর হয়েছে।
 আমাদের একটা পৃথিবী ছিলো। দেশই তো পৃথিবী। আমাদের একটা

দেশ ছিলো। ভালোমন্দে সুখদুঃখে মিলিয়ে একটা দেশ।—স্বদেশ। দেশ মানে তো মানুষ। মানুষই তো দেশ। বিজ্ঞাতি তব্বের বার্ষিক পরিণামে বাদের লাভ হবার হলো। সে লাভ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শ চতুর্বিধ দারিদ্র্য রাজনীতি-কলপতর, বুদ্ধের আগ্রহে বা আশ্রমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরই। কিন্তু ছিন্নমূল কথাটা আমাদের মর্মমূলে বিধে আছে। এই কারণেই মেঠো মানুষ জীবন আমাদের টানেন।

আমরা নিজেরাই নিজের টুকরোটুকরো চর্ণ-বিচর্ণ করেছি। বিক্রি হবার জন্য। বিক্রি করার জন্যই তো এ্যাতো সব উদ্যোগ আরোজন। আন্ত, গোটা মানুষ এখন ঝুঞ্জে পাওয়াই ভার। তেমন মানুষ, পুরুষ বা নারী, পেতে হলে জীবনের সঙ্গে আসতে হবে মিলতে হবে। যেতে হবে সেখানে, যেখানে থেকে একদিন সভ্যতা হাটি হাটি পা পা করে বাত্মা স্তম্ভ করেছিলো,—সেই গ্রামে নদীর কোল বেঁধে। যেখানে আকাশ, মাটি সবুজ আর জল। দোয়েল চড়াই বলবুলি শালিখ। শহর তো সেদিনের নির্মাণ। ইটকাঠ পাথর পাষণ তো শূন্য বাইরে নয়। ভিতরেও জমে গ্যাছে। প্রচুর। এবং ছোটো ছোটো কুঠুরাতে নিজেকে আটকে রাখা, বন্দী করে রাখা নাগরিক মানুষ,—নিরমতান্ত্রিক, বার্ষিক শাস্ত আশ্বপরিভার আশ্রয়িত্তে সমর্পিত। কাজেই কাদালাগা, ফাটা পায়ের মানুষ জীবন সেখানে যে জীবন, বাবু জীবন, সে তো বুদ্ধিজীবীর জীবন।—প্রসঙ্গত মনে পড়ছে একটা পরিসংখ্যানের কথা। সমস্ত দুর্নিয়োগ যতো বুদ্ধিজীবী আছেন, তাদের এক চতুর্থাংশ থাকলে ও নিখিল বিশ্বের কোনো ক্ষতিই হতো না। তর্ক করে, যুক্তি পাণ্ডা যুক্তি প্রতিস্থাপনে হরতো মামলা জেতা যায়, জীবন কে জানা যায় না। বোঝা যায় না। মতবাদের চণমা তো ক্ষীণদৃষ্টির মানুষের দরকার। তাই না? অদ্ভুত অদ্ভুত সেই সব চণমা। প্রিয়জনের মুখ দেখতে ও মতবাদের চণমা লাগে? এহলে সেই পুরোনো তর্ক। পাখির জন্য খাঁচা না কি খাঁচার জন্য পাখি? শরীরের জন্য পোষাক না পোষাকের জন্যে শরীর? জীবনের জন্য মতবাদ (জীবন দর্শন!) না কি মতবাদের জন্য জীবন?

আমি যদি পিঁড়িত হতাম, তা হলে পরজীবী স্বভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য সাহিত্য বেঁটে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত তুলে এনে জীবন সরকারের নির্মাণ রীতির নান্দনিক টীকাভাষ্য রচনা করতে পারতাম। টমাস হার্ডির মৃত্তিকা প্রাণতা, সমারসেট ম্যায়ের মানব-মানসিকতা, স্টেইন বেকের তিব্বত, গলসওয়ার্ডের নিটোল গাল্পিকতা, লরেন্স এর রোমান্টিকতা—এসব সমান্তরালে বইয়ে দিতে পারতাম। দেখাতেই পারতাম টমাস হার্ডির চরিত্রগুলোর মতোই জীবন সরকার-এর 'চালি' গল্পগ্রন্থের চরিত্রগুলো এক এক বিশেষ মৃত্তিকা ও জলবারুর অনিবার্য ফসল। মৃত্তিকার সন্তান এরা। এই মানুষগুলোকে

যাদুঘরের বস্তু হয়ে, পিরামিডের ঘ্রমি হয়ে বোঝা ধানে না। বোঝা তো দূরের কথা, ছোঁরাই ধাবে না। আর সেটা করা যাচ্ছে না বলেই বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক লেখক, সমালোচকেরা জীবন সরকারের গল্পে পণ্ডিতা (!) ঝুঁজে পান না। ভূপ্তি পান না। গভীরতার অভাব দ্যাখেন। নাশনিক বিচারে বিচারে তেমন উত্তীর্ণ নয় লেখাগুলো—। এরকম তড়িঘড়ি আরোপিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেলেন। টলস্টয়ের স্বস্তিবাচন, পুশকিনের কাব্যময়তা, গোর্কির তিক্ততা গোগল-এর পরিহাস প্রবণতা মিলে মিলে জারিত হয়ে গিয়ে যে অল্প প্রস্তুত হয় সেই পরমাত্র আশ্বাদন করবার মতো মানসিক স্থান্ধিত ও ধীরতা আজ আর আমাদের অধিগত নয় বলেই সঙ্কট দেখা দেয়। যে মন, রুচি এবং অখণ্ডতাবোধ থাকলে স্ব্ধবশ জীবনের সামাজিক স্বাদ জানা থাকলে জীবন সরকারের গল্পগুলিকে ধারণ করা যায়, ধাতুগত দৌর্বল্যেই তা এঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

মোট তেরটি গল্পক্রমে গ্রন্থিত ‘চালি’ গল্প সংকলন। পৃষ্ঠা সংখ্যা এক থেকে ঊনআশি। দশ এগারো পাতার বেশি কোনো গল্পই নেই এগ্রন্থে। পটভূমি লোকায়ত বাঙলা। তার শিকড় থেকে উন্মিষ এই চরিত্রগুলো কঁবি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে।

জীবনের গল্পগুলিতে বৌনতী তাঁর হয়ে ফেরিয়ে না ওঠাও তার অপ্রিয় হবার একটা কারণ। সহজ প্রেমের সহজ অভিব্যক্তি আমাদের সমালোচকদের আর স্নিগ্ধ করে না। যে উগ্রতা, দহন জ্বালা শ্যামলে সবুজে নীল নীলিমায় অনুপস্থিত, জীবন সেখানে রিরংসার গরল ঢালবেন কি করে?

বেঁচে থাকার লড়াইটা, জীবিকার লড়াইটা একার লড়াই—ব্যক্তির লড়াই—জীবন এমন ভাবে দ্যাখেননি। তাই ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতায় একা ঢাকি স্মদর্শন নয় তার সঙ্গে সহযোগী হয়ে কানাই-বলাইকে কাসি আর ঢোল বাদক হয়ে আসতেই হয়। ‘চালিতে লোকেন সঙ্গে নেয় মগাই, হারু, ভোলা, জগনা, হালুয়া-কে। তারা দাঁতে দাঁত চেপে ঝড়োতুফানী নদীতে লড়ে। জয়ও একার নয়। হামিদা বিবির কুয়োর পানির লড়াই ও তার একার লড়াই। আর সেই কুড়ানীর গল্পে তো সমগ্র গ্রামটাই কুড়ানী মেয়ের আত্মীয় স্বজন! জীবন সরকার জীবনেরই গল্প লেখেন। মতবাদ তাকে খেয়ে ফেলেন বলেই গল্পগুলি আসে জীবনের ভিতর থেকে। সেখানে বিশ্বাস আর ভালোবাসা হাত ধরাধরি করে চলে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া দর্শন ও মতবাদের বোঝার নিচে চাপাপড়া ধনুত কিশ্ত চৈতন্য-চেতনা নয়। শূন্য প্রেণী চেতনাই তাঁকে পরিচালিত করে। শূন্যতার অলাতচক্রে সাম্যমান মানবাত্মার আড়োগোর

বিশ্রাস্তকরণী হয়ে উঠতে পারে জীবনের গল্পগুলি। মৃতসজ্জিবনী ঐখানে।
জীবনের রসে। আরোগ্য ও ঐখানে। 'চাঙ্গি' গল্পের লড়াই ও বিজয় লাভের
ভাব, ভাবপূর্ণ ঐখানে। □

নীল অক্ষরের বিন্যস্ত রূপ : দেবাশিস প্রধানের কবিতা

ডঃ মৃদুলা কুন্ডু

কবির মানস জগৎ উন্মোচিত হয় শব্দ রত্নের মাধ্যমে। মনন থেকেই এসেছে বাক্য। মননই বাক্যের প্রতিষ্ঠা। ঐত্তরয়োপনিষদে বলা হয়েছে— 'ও' বাস্তব মেন মানসি প্রতিষ্ঠিতা, মন্যে যে বাচি প্রতিষ্ঠিতম।' ঈশ্বরের সৃজন বাসনাই নাকি আদিতে 'শব্দ' হয়ে দেখা দিয়েছিল। মরুভূমিতে অমৃতের ভিত্তিভূমি হল বাক্যরূপ। মানুষের ভাবনা-চিন্তা-উপলব্ধি-অনুভূতি বাক্যের মধ্য দিয়েই অমৃতত্ব প্রার্থনা করে। তা করতে গিয়ে 'আমি' কেও রাখতে হয় নিরাপদ দূরত্বে। 'সাংকেতিক আত্মহত্যা'র মাধ্যমে ব্যক্তি সত্তাকে বিস্তৃত করতে হয় সমগ্র বিশ্বে। তবু শব্দের সঙ্গে শব্দের বিয়ে দেওয়ার ঘটকালি করেও কবির মানস সম্পূর্ণ উন্মোচিত করা সম্ভব হয় না। তাই কবির চিরন্তন অতৃপ্তি। ভাব এবং রূপের পরিপূর্ণ মিলনও থেকে যায় অনারম্ভ।

অনারম্ভ থেকে যার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিও। সেখানেও জমে ওঠে অতৃপ্তির এই অতৃপ্তি অলঙ্কারী। প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম' সংলাপে প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্টোফানেস বলেছেন মানুষের রূপ মূলত ছিল অন্য রকম। তার ছিল চারটি হাত, চারটি পা, দুটি মূখ্য সে সামনে পিছনে যৌনিক খুশি হাটিতে পারতো। তার শরীর ছিল অপরিমিত। ফলে সে ছিল স্বরং সম্পূর্ণ। কোনো অপূর্ণতার গিছটান না থাকায় তার পরাক্রম ছিল ভীতিপ্রদ। তাই দেবসভায় বসে জিউস বিচার-বিবেচনা করে স্থির করলেন ঐ মানুষকে চুলচেরা ভাগ করে এক-কে করতে হবে দুই। অ্যাপোলোর ওপর তার পড়লো এরকম বিভাজনের পর চিকিৎসা ও সেবা করে তাদের স্বতন্ত্র রূপ দেওয়ার। তারপর সে বিভাজিত মানুষকে ডেকে জিউস বললেন যদি তারা পবিত্র ও সং ভাবে থাকে তাহলে তাদেরকে পুনরায় এক করে দেওয়া হবে। সেই থেকে চলেছে তাদের সাধনা, মিলিত হওয়ার এক হওয়ার প্রবল আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষাও অনন্ত। পরিপূর্ণ মিলন অসম্ভব।

সবটাই এই মিলনেরই সাধনা। ভাবের সঙ্গে রূপের, একের সঙ্গে আর একের। দেবাশিস প্রধানের 'শুভেচ্ছার আছো নীল পাতা' কবিতা গ্রন্থে এই

দুটি অভূতপূর্ব মধু একত্রে মিলেছে। গ্রন্থটিতে মোট ছাপান্নটি কবিতা। সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত কবিতাগুলিতে শীর্ষ্যনাম নেই। কোনো কোনো কবিতা তিন-চার পংক্তির সীমার গভীর ভাবোদ্দীপক। স্বদরবতী প্রেম ছুঁতে না পারা এবং অন্তর্গত ভাবকে শব্দগে'থেও সঠিক পরিস্ফুট করতে না পারার আকৃতি কবিতাগুলিতে ছড়ানো। সেই আকৃতির উৎসে আছে উল্লাসময় আবেগ। কিন্তু শব্দবন্ধে সেই আবেগ সংহত। উৎসর্গপথে এই উৎসর্গমির কথা কবি বলেছেন—‘সব্জ পাখির চোখে শব্দের কোমল হ’য়ে,

নীলাঞ্জনা বালিকাটি চেয়েছিল, তার নামে
কবিতা রচনা করি।’

সেজন্যই কবি নীলা পাতাঘরে হাওয়া সফর শুরু করেছেন। মধ্যাহ্নের টানেই পৃথিবীময় ছড়ানো হাওয়া, সেই হাওয়ার সমস্ত ভৌগোলিক দ্রব্য উপেক্ষা করেও চলে যোগাযোগ, শূভেচ্ছা সফর। কিন্তু মহাশূন্যে তো হাওয়া নেই! সেখানে কিভাবে ছড়ানো যাবে এই সফরের উত্তাপ?

‘দ্যাখো নীলা

বাই বাই মহাশূন্যতায় শ্রুতিন্দ্র জ্যোৎস্না উড়ে চলে।’

পৃথিবীতে পতিত জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয় মহাশূন্যে। সেই জ্যোৎস্নাতরঙ্গে মহাশূন্যেও অক্ষর থাকে মানস সংযোগ। কবি তো ‘শব্দের ঘরামী’, সেই শব্দে নির্মিত ঘরে নতুন করে কাছে পাওয়া যায় নীলাকে, নীলাঞ্জনাতে।

কাব্যের নাম ‘শুভেচ্ছায় আছে নীল পাতা’। নীল পাতা মূলত চিঠির ইঙ্গিত বহন করছে—‘নীল খামে চিঠি আসে, চিঠি যায় প্রয়োচনাময়’। চিঠির অক্ষরগুলির উদ্দেশ্য ব্যক্তি—‘নীলাঞ্জনা’, উৎসর্গপথের নায়িকা। নীল পাতা তাই কাব্য বিষয়। সেই বিষয়কে সাজিয়ে সৃষ্টি হয় শুভেচ্ছা বাতী, সেগুলিই কবিতা। কাব্যনামেই ব্যক্তিপ্রেম ও কাব্যপ্রেমের মেলবন্ধন ঘটেছে। ‘হোমার উত্তাপে পুড়ে / নীল যন্ত্রণার কথা লিখি।’

অনেকগুলি কবিতায় শব্দ সাধনার ভাব রয়েছে। অনেকগুলিতে কবিতা ভাবনার রূপায়ণ, এছাড়া রয়েছে প্রেমভাবনা এবং এই সব মিলে কবি-ব্যক্তিকে ছুঁতে চাওয়ার আন্তরিক প্রয়াস। কবির উদ্দেশ্যের পাঠ্যকর্ম শূভেচ্ছায় মোমে পুড়ে পুড়ে গলতে থাকে। কণিক প্রেমানন্দভূতির ‘শিশির’কেই নির্মিত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা—

১. অনুগত শব্দেরা এসো জুড়ে বোস ডালে

শুবে নাও রক্তরস জৌকের মগ্নতায়

শব্দে কিছূ দূঃখ থাক অথবা আনন্দ

শব্দময় রক্ততালু বেদনা গভীর

শব্দের হোমানল জ্বালিয়ে, মেধার বৃন্তুর বাজিয়ে নির্মিত হয় কবিতা।

কবিতার কাগজ ৪৪

নীল খামে চিঠি এলে অগাধ সুখ। অগুস্তি শব্দ তখন সপ্ত বাজন হয়ে ম' ম' গম্বু ছড়ায়। শব্দ হর নবায় উৎসব। যদিও কবি জানেন—‘অর্থবহ প্রেম, তোমাকে কি শব্দে বাঁধা যায়, অকরের বোবা কথামালা’র মতোই অব্যক্ত থেকে যায় সমস্ত বোধ। তবে—

‘আমরা স্বাগত জানাবো শব্দ ঘরামীকে
শব্দ আর মহানির্মাল্যের / প্রতিশ্রুতি দিয়ে...’

প্রেমের পরিণাম হচ্ছে বাঁধা হয়, ভিজে যাওয়ার কবিতাবন্ধে বৃদ্ধ হতে হয়। কবির আকণ্ঠ ক্ষুধা নিবৃত্তি অসম্ভব। সমস্ত প্রকৃতির উদ্‌মাদনা কবিতা হয়েই বাজনা বাজায় বৃকে। কবিতা সৃষ্টি সম্পর্কে ‘কিছু মর্মস্পর্শি উপলব্ধি, উজ্জ্বল স্পষ্টতা পেয়েছে। যেমন—‘তাড়ড় দৃংখ জেলে আগুন পোহাই’; ‘ভাঙাগড়া নয় পুড়ি একা একা আঁধার উৎসব’; ‘কবিতার ভাপে পুড়ি, গুড়ি গুড়ি জ্যোৎস্না মাখি গায়’; ‘শুভেচ্ছার সাক্ষ্যে বাঁধি প্রেমে প্রতিবাদে’; ‘শুভেচ্ছার নেই কোন বিধ।’ প্রেম ও কবিতা একাকার হয়ে গেছে ২৭ সংখ্যক কবিতার—

‘প্রথমকে চুমু দিই আর রাত কামুক শবরী
অন্ধরের স্বপ্নভোগ স্নানকসম্মান
আর তোকে রক্তবীজ বলি
যে’টে বেছে ছে’কে তুলি তোকে...
আমাদের কথাগুলি বেগবতী খুব
মাতাল প্রবল দৃষ্টে...বোবাবৃদ্ধ চলে নিরন্তর।’

কবিতাগুলিতে অহেতুক শব্দ প্রয়োগ নেই। রোমান্টিক ভাবকে ক্লাসিক সংহতি দানে কবি সিদ্ধহস্ত। ‘...poetry and the art have sensibility as beginning and end, but between these two entrenches, the intellect, all the resources of thought—even of the most abstract thought—and all the resources of technique may and must be used’—পল ভালেরির এই কাব্যভাবনার সঙ্গে কবিতাগুলি সাধুজ্ঞা রক্ষা করেছে। কবি সাধক-স্বলভ দ্বন্দ্বে বসে অনুভূতি-গুলি চরন করেছেন। বাক্‌ভঙ্গিতে তাই ব্যঙ্গ প্রবণতা ও গভীর কথা নির্লিপ্তভাবে বলতে চান যেমন—‘হুলের চিতার শুরুরে ছে কতোকাল’; ‘ঘরে তুমি এসেছিলে নাকি হে / এসো শেষবার ছুঁই তোমাকে’; ‘নাগরিক হাওয়ার। দুখলতা বাবুটি হে তুমি জানো প্রয়োজনা আমল সম্ভাস’; ‘পিরিওডিক্যালস বেরুচ্ছে হে / ভাবনা জ্বরে দৃষ্টাহসিক।’

নিজের তাঁর অসুখ নিয়ে ঠাট্টাও করতে পারেন কবি—

‘মুখগুণি ভেসে ওঠে ডাহুক দুপুরে
ভূটকাটা মাছের স্বভাব।’

সমস্ত চলমানতার মধ্যে ‘তুমি’ কে নিয়ে কথা বুননের স্বভাবকে গভীর বেদনা থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিক আবেগেরও প্রশমন ঘটান।

‘অবশ হচ্ছি বেদম জ্বরের

নিমোহ বীজ ভেঙে পড়ি, ছড়াই ছিটাই শিমূল স্বভাব।’ এই নিমোহ ভঙ্গিতেই তার কবিতাগুণির সিম্বি।

দু’ একটি কবিতাব্যঞ্চে সমস্ত-সমাজের প্রতি বাগ্‌ও প্রকট। ‘এ যেন চলতে থাকে / গদিতে তা দেওয়া বোঁক / ওখানে যে গেল রে / এ যে বাপ বড়ো হে জৌক।’ শেষ কবিতাটিতে সব রকম ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধিতা। সকলেরই দশা যখন সমান সমান তখন কার কাছেই বা হাত পাতা ধার ? বাহা চাহিদা, জননের চাহিদা কোনো দিক থেকেই অন্যের কাছে হাত না পাতাই প্রের। সর্ববিধ উপোসা দিন-যাপনে উপেক্ষিত জীবনে তবু কবি ছুঁয়ে গেছেন পাঠকের আতান্তিক স্বপ্ন।

ছাপাও বাধাই বেশ দ্বন্দ্বনীর। প্রণবেশ মাইতির প্রজ্জ্বল মন টানে। □

বই পাগলা বন্ধু প্রণব কান্তি ভট্টাচার্য

কোন কিছুর একটা নিয়ে মাতামাতি করার সুযোগ পেলো বাঙ্গালীকে আর পার কে ? কি নিয়ে মাতে না ? পিকনিক, ক্রিকেট, পলিটিক্স, ধর্ম, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, মিলেনিয়াম নিয়ে মাতে, এমন কি রাজভোগ-পাস্তোরো নিয়েও মাতে। অলসেরা যেমন কর্মহীনতার একঘেরেমি থেকেও আনন্দ খুঁটে নিতে জানে, বাঙ্গালীও তেমনি ‘ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম’ পর্যন্ত সর্বকিছুর থেকেই রস নিংড়োতে জানে। এ হেন বাঙ্গালী বই নিয়ে মাতেবে না, তাকি হয় ? বই মেলে মেলা বসার। মেলার ভীড় জমে।

সেদিন বই-এর কথা উঠতেই আমার এক পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। দু’ বছর আগের ঘটনা। আমার সেই ব্যবসায়ী বন্ধুটি একদিন আমার অফিসে এসে হাজির। বললো—‘তোর সঙ্গে খুব জরুরি একটা দরকার আছে।’
বললাম—‘বল, কি দরকার।’

কবিতার কাগজ ৪৬

বন্দু বললো—“তুই তো খুব বই-টাই পড়িস। তা ‘রবীন্দ্ররনবেলী’ কোথায় পাওয়া যাবে বল তো?”

আমি অবাক হই। কারণ বন্দুটির অখান্দুরাগের পরিচয় জানা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার এই পাঠান্দুরাগ আমার কাছে নতুন লাগে।

বললাম—‘লাইব্রেরীতে যা না, পেয়ে যাবি।’

বিরক্তি প্রকাশ করে সে বলে—“দূর! তাই বলছি নাকি? পুরো সেট চাই। কিনবো।’

ম্যালেয়িরা রুগীর জ্বরের মতো আমার বিস্ময়ের মাঠাও চড় চড় করে বাড়তে থাকে। কৃপণ বন্দুর এ কি ভাবসুত্র!

বললাম ‘কি ব্যাপার বল তো, তুই যে দেখছি বর্ণচোরা আম রে! ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি তুই যে এতবড় বিদ্যান্দুরাগী। সত্যি করে বলতো কি।’

আমার মুখ থেকে কথা ছাড়িয়ে নির সে বলে—‘বাজে কথা রাখ। কোথায় পাওয়া যাবে তাই বল। ঘরে যে আর টিকতে পারছি না।’

বললাম—‘রবীন্দ্র রচনাবলীর সঙ্গে তোর ঘরে টিকতে নাপারার কি সম্পর্ক হাদার?’

সে বললো—‘কি সম্পর্ক মানে! আজ তিন দিন ধরে বউ আমকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে পেড়ে ফেলে মারতেই যা শব্দ থাকি রেখেছে। চরম গৃহ অনাশ্রিত্য রে ভাই।’

অবাক আমি। বললাম—‘কি ব্যাপার খুলে বল তো দেখি। আমি তোর কেস্টো ঠিক ধরতে পারছি না।’

—‘তা পারবি কেন? পরের ঘর ভাঙলে মজা আছে না?’

—‘আরে কি ঘটেছে বলই না আগে। আমার দ্বারা কিছ্ করা সম্ভব হলে নিশ্চয় করবো।’

বন্দু বললে—‘ঐ ব্যাটা অরুণ হালদার আর ন্যাটা কারেত, ওরা নাকি তোর ঐ রবীন্দ্র-রচনাবলীর পুরো সেট দিয়ে ওদের ভ্রূঁইং রুম ডেকরেট করেছে।

তা করেছিস, বেশ করেছিস। আবার নিজের নিজের গিমিকে লোলিয়ে আমার উনাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বড় বড় লেকচার মারার কি দরকার ছিল? স্ত্রী বদ্বিধিতে ঢেকির পাড় পড়ে গেছে। আমার উনিও একেবারে ক্লেপে উঠেছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী না হলে নাকি মান-সম্মান সব জলাঞ্জলি যাবে। নতুন আলমারি বানানো কম্প্লিট। এখন বলতো ভাই—ঐ বস্তুটি কোথায় পাই। না পেলে আমি যে ঘরে ঢুকতে পারছি না।

আমি হাসবো কিনা বুকে উঠতে না পেরে বললাম—‘কম্মা কর ভাই, এ ব্যাপারে তোকে খুব একটা সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে ক’দিন আগে কাগজে যেন বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—কি সব কিস্তিতে-টিফিতে পাপরা যাচ্ছে। চারমাস ইন্টারভ্যালো একখণ্ড করে পাঁচ বছরে পনেরো খণ্ডের কম্প্লিট সেটু পাওয়া যাবে।’

বন্ধু চোখ কপালে তুলে বলে—‘হোয়াট! পাঁচ-বছর! নো-নো। আমার খুজকেই চাই, একদিন। টাকা ফেললে সিম্পাজির দুখ পর্যন্ত পাওয়া যায়—এ তো সামান্য কমোডিটি।’

হাসতে হাসতে বললাম—‘তাহলে বই দিবে জরিংরুম ডেকরেট করাটা এখন স্টেটাস সিম্বল হয়েছে দেখছি। কিন্তু বাদার—মনে রাখিস—বই আর বউ আলমারিতে সাজিয়ে রাখার জিনিশ নয়, দু’টোকেই প্রপারলি ব্যবহার করতে হয়, না হলে পোকের কাটার ভয় থাকে।’

—‘তোমার দ্বারা কিস্‌ক্স হবে না’—গজরাতে গজরাতে বন্ধুবর স্থান ত্যাগ করে। □

— — —

নতুন সহস্রাব্দের শূভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

যাচ্যুতক যে কোন ব্যৱহাৰ পৰিষেবায়

বেৱা ইঞ্জিনীয়াৰিং ওয়ৱাৰ্কস

(একাৰ্ট আধুনিক এস. এস. আই. ইউনিট)

লণ্ড, সোনাৰোট, যে কেন মেনিনেৰ কাৰু আমৰাই কৰি ।

দীৰ্ঘা বাস ষ্ট্যাণ্ড ॥ কাৰ্থি ॥ মেদিনীপুৰ-৭২১৪০১

সবাইকে জানাই নববৰ্ষেৰ আৰ্ভৱিত শূভেচ্ছা ও অভিনন্দন

‘মোৰ নাম এই বলে খাত হোক-

আমি তোমাদেৱেই লোক !’

সূৰ্য্যতপা গিৰি

আঠিলাগড়ি : কাৰ্থি : মেদিনীপুৰ

পিনকোড : ৭২১৪০১

সহস্রাব্দের প্ৰীতি ও শূভেচ্ছা জানাই—

শেনহাংশু শেখৰ ঘোড়াই

(গডঃ ৰেজিষ্টাৰ্ড)

ইলেকট্ৰিক্যাল ও মেকানিক্যাল কন্ট্ৰাষ্টৰ

কন্দৰ্পপুৰ : কাৰ্থি : মেদিনীপুৰ ৭২১৪০১

দ্রুত প্ৰকাশেৰ অপেক্ষায় কবি আবদুল হাম্মানেৰ কাব্য গ্ৰন্থ

পাখি পাহাড়ের মেয়ে

কবিতাৰ কাগজ প্ৰকাশ □ জুনপুট, মেদিনীপুৰ

আমাদের প্রতিদিনের কর্মময়তার দিনগুলিতে চাই সমস্ত শিশুর আনন্দের অধিকার...

রাষ্ট্রসংঘ প্রবর্তিত সমস্ত শিশুর নিঃস্ব অধিকার ভোগ।

উপযুক্ত পরিবেশ, শারীরিক-মানসিক সামাজিক বাতাবরণ।

আইনগত স্বযোগ সুবিধা প্রদান।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ— এই প্রপ্নে তাদের সুরক্ষা, লালন পালন, শিক্ষা ও পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ।

অল্প বয়স্ক শিশুর চাই অপার মাতৃস্নেহ।

শিশুর চাই অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের অধিকার।

সামাজিক অবহেলা, নিষ্ঠুরতা বণ্টনা থেকে শিশু ও মাকে রক্ষার দায়দায়িত্ব আমার আপনার সবার। এই কর্মক্ষেত্রে চাই সবার সহযোগিতা!

শতভুল বিকশিত হোক। রবীন্দ্রচর্চার আনন্দ ধারায়...

নারায়ণ চন্দ্র পন্ন্য

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

কাঁথি ১ ব্লক

জুনপুট রোড : কাঁথি : মেদিনীপুর ৭২১৪০১

বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন

ইংরেজী প্রধান ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়

(শিশু শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত)

ফরিদপুর : দক্ষিণ ডাউকি : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৫৬-১২০

বর্তমান সমাজের সমস্ত রকম অবক্ষয়, অশান্তি ও মূল্যবোধহীনতার মূলে আছে প্রকৃত শিক্ষার অভাব। তাই বিগত দুই দশকের বেশী সময় ধরে সমাজসেবার নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন” স্থাপন করেছে নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি সুপরিকল্পিত ও স্থানিস্থিত ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়।

আগ্রহী অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীগণকে অতি সফর প্রিপারেটরি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীগুলিতে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন।

ফরিদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন, এর একটি অনন্য উদ্যোগ।

Phone : 033-237867

Commercial / Waters Proof

- ☐ Hot Pressed ☐ Free Of Warping And Delamination
☐ Smooth Finish ☐ Perfect Bonding

Allways Usb

Pidilite Industries Production

Please step at our showroom

THE METRO PLYWOOD

88A, Chittarnjon Avenue
Calcutta-700 012

বইমেলা ২০০০-এ প্রকাশ হ'ল

‘পাঁচশে বৈশাখ’ বার্ষিক কবিতা সংকলনের সম্পাদক

নরেশচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-র ছড়ার বই

ছড়িয়ে ছড়া ☐ ছয় টাকা

প্রচ্ছদ ও কার্টুন : চন্ডী লাহিড়ী

পরিবেশকঃ দেবকান্ত স্টোর ☐ কথা ও কাহিনী ☐ রামধন

প্রশিক্ষণ প্রকাশন ☐ সি-১২ রামগড়, কলকাতা-৭০০ ০১৭

রামধন ☐ ৪২ এস পি সি ব্লক, কাজিপাড়া, বাঘামতীন,

কলকাতা-৭০০ ০৯২

দূরভাষা : ৪২৫-৮৫৭৬

With Best Compliments From :

Phone :

SRIRAM OIL MILL

1 No. Municipal Super Market (west)

Conti. Midnapur-721401

কবিতার কাগজ ৫৯

● হাতের কাছেই অভাবনীয় পুরস্কার ●

আনন্দ সংবাদ

আনন্দ সংবাদ

দুঃস্থ মেধাশী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকল্পে

একদিনের অভিনব কুপন প্রতিযোগিতা।

জামাই ষষ্ঠী বাম্পার—২০০০

পরিচালনা : কসবা এগরা যুব সংঘ

ঠিকানা : কসবা এগরা মেদিনীপুর

বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার □ বাজাজ ক্যালিবার. হিরোহুন্ডা স্পিলেণ্ডার, ইন্সামাহা, বাজাজ এম-৮০, বাজাজ সানি, TVS 50 XL সহ মোট ১৮টি মোটর সাইকেল। (মোট ২৪ ভরি সোনা ও মোট ১২০০০০ টাকার কিম্বাণ বিকাশ পত্র) সাদাকালো টি. ভি, ভ্যানরিফ্লা, সোফা কামবেড, সোনার কানের দুল, সিলিং ফ্যান, হটশট, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ৮৪টি হিরো বাই-সাইকেল সহ মোট ২৪৬৪টি পুরস্কার।

শুভ উদ্বোধন : ০১শে জ্যৈষ্ঠ, : ৬০৭, ইং ১৪ই জুন বুধবার বিকাল ৫টা।

কার্ডের মূল্য : ১৯ পরস্যা অনুদান ১৯ টাকা ৮১ পরস্যা মোট ২০ টাকা।

যদি কোন বন্ধু আমাদের এজেন্ট হতে ইচ্ছুক হন তাহলে অতি সবেগে যোগাযোগ করুন আমাদের নিজস্ব অফিস ঘরে। এজেন্ট নিতে কোন টাকা পরস্যা লাগে না। এজেন্ট বন্ধুদের জন্য থাকছে বিশেষ কমিশন ও আকর্ষণীয় পুরস্কার।

বিঃদ্রঃ—খেলার পরের দিন এজেন্ট বন্ধুদের জন্য বিনা মূল্যে কুপন প্রতিযোগিতা। সাদাকালো ১৪ ইঞ্চি, টি.ভি.-১টি, সোনার আংটি-১টি, (৪ আনা), সাইকেল-১টি, টেপরেকর্ডার-৩টি, ক্যামেরা-৬টি, প্রেসার কুকার-৫টি, মোট ১৫টি

অফিস : এগরা বাজার (দীঘা মোড়) মেদিনীপুর

বিঃদ্রঃ—খেলার দিন এজেন্ট ভাইদের জন্য থাকা-খাওয়ার স্ব-ব্যবস্থা থাকিবে। খেলার ফলাফল সমস্ত দৈনিক কাগজে প্রকাশ করা হবে। সড়করাং আর দেরি কেন, আজই আসুন এবং টিকিট সংগ্রহ করুন।

সৌরশক্তি'র অভাবনীয় উৎভাবন

TATA-BP SOLAR

স্থানীয় পরিবেশক

গুড়িয়ারা এজেন্সী (কমলা কৃষ্ণ স্টোর্স)

প্রোঃ শ্রীশত্ৰুঃ গুড়িয়ারা ।

গ্রাম + পোঃ—ধান্দালীবাড়, কাঁধি, মেদিনীপুর ।

পিন : ৭২১৪৫২

বিঃ দ্রঃ—পত্র দ্বারা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রতিনিধি আপনার বাড়িতে
পৌঁছে সংযোগ করে দিবে—অন্যত্র এক দিগন্তের ।

৪নং মঞ্জুরী গ্রাম পঞ্চায়েত

এগরা—২ পঞ্চায়েত সমিতি

বালিঘাই □ এগরা □ মেদিনীপুর

• মাটির কাজ • কালভার্ট নির্মাণ • খাল খনন • মোরাম রাস্তা তৈরী
• বনস্জল • ইন্দিরা আবাস • বাস্ধ'ক্য ভাতা প্রদান • সুন্দর শৌচাগার
তৈরী • মিনিকীট বিতরণ সহ সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ।

কানাইলাল মন্ডল

উপপ্রধান

কৃষ্ণমোহন জানা

প্রধান

With Best Compliments From

CONTRATOR ASSOCIATION

Contai Block-1 Unit

Nandan Lodge Contai : Midnapore

বিরেকানন্দ লোক শিক্ষা নিকেতন

গ্রাম—ফরিদপুর, পোঃ—দক্ষিণ ডাউকি, জেলা-মেদিনীপুর

ফোন—(০৩২২০) ৫৬১২০

বিগত দুই দশক ধরে গ্রামোন্নয়নে নিয়োজিত
সেবাসেবী প্রতিষ্ঠান

প্রকল্প সমূহ

- দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
- বিনামূল্যে চক্কু ছানি অস্ত্রোপচার শিবির
- বৃক্ষাবাস ও বৃক্ষদের দিব্যবকাশ স্থাপন কেন্দ্র
- শিশু রক্ষণাগার
- মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র
- সুসজ্জা শোচাগার নির্মাণ
- বৃক্ষরোপণ ও বিশেষ জাতীয় দিবস পালন
- জুড়ী-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিষিকান্ত জানা
সভাপতি

ব্রজগোপাল সাহু
সাধারণ সম্পাদক

With Best Compliments to the great poet Tagore—

Phone : S.T.D-03229

55256

MANILAL THAKKAR

(Merchants And Order Suppliers)

Belda • Midnapur

আন্তরিকতাই মানুষকে কাছ টানে ।
সমগাৰ্থীদের জন্য নিরন্তর জাগৃত প্রহরী...

দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

দীঘা □ মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের এই সমুদ্র সৈকত শহরকে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পর্যটন শহররূপে গড়ে তুলতে দীঘা উন্নয়ন পর্ষদ নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিমগ্ন । এরজন্য কয়েকটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে, আরো কয়েকটি রূপায়ণের অপেক্ষায় ।

রূপায়িত প্রকল্প

অমরাবতী উদ্যান ও লেক, সর্পোদ্যান নৌকাবিহার

রূপায়ণের অপেক্ষায়

সুসংহত প্রশংপ্রণালী • বিত্তীয় জলাধার প্রকল্প • রোপস্থলে প্রকল্প • সমুদ্র বিহার • প্রকল্পগুলিকে সার্থক রূপায়ণ করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং মতামত কাম্য ।

বি. সি. পাত্র

মুখ্যনির্বাহী অধিকারিক

দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

M/S OBS & ASSOCIATES

Four your Taxation & Accovnts...

RAMA PRASAD RATH

M. Com. ; I.C.W.A. : L.L.-B.

Tax Advocate, Accounts Advisor

Chamber Cum Residence : Belda, Midnapur.

Midnapur : Monday-Thursday, Holdia : Friday

Contai, Monday (all time) Near-Contin Toun Hall (West Side)

City Off. C/I Bankshall St. Cal-1 (2nd floor)

Phone : 248-0555/5405

With Best Compliments from :

M/s MENAKA ENTERPRISE

Prop : Sudip Kumar Roy

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Vill. : Maitana, P.O. : Battala,

Dist. : Midnapore

With Best Compliments from :

Pranama to our

Gaert Poet—Rabindranath

GEAMS ELECTRONICS

**A Reputed House of Electronics Casate & C-D. Please
Contact & Visite our Show-Room.**

Prop. : Swapnadip Paul.

Rathtalamore ☐ Contai ☐ Midnapore

With Best Compliments From :

244-2531

245-3712

Fax : (033) 245-0204

Welcome All Of The Tourist

NEW TRAVELS INDIA

165A/A. J. C. Bose Rod

Calcutta-700014

HOTEL BOOKING LUXURY BUS

Luxury Car Package Aad Tour Operater

HOTEL TRAVELS LODGE

Gangtok (Sikim) : Tibat Road

Phone : 03592-23858

For Your Better Service
We are always at your door step...

S.T.D. : 03220

Ph. : 50247

BHAITGARH NACHINDA S.K.U.S. LTD.

Regd. No'—Cont.3 / Dated-17.4.70

P.O.—Nachinda Bazar, Contai, Midnapore

Banking Deposit Scheme

Petrol Pump Services at Contai Bye Pass more

Subodh Chandra Patra Subhendu S. Das Abya Kumar Bhunia

Chairman

Secretary

Manager

নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান

ঋণ পরিশোধ করুন, আম'—

সামাজিক-স্বনির্ভরতার পথে হাঁটুন !

আমরা মানছি তো মেনেই নিচ্ছি

দারিদ্র্য মোচনে আমরা লোন তো পাচ্ছি ।

সরকারী সমারতা ভরতুকী আকারে,

লোনের বোঝাটাকে হালকাই করে ।

তবুও ব্যাংকের দেনা কেন থাকে বাকী,

অনাদারে তার 'পরে চাপ বাড়ে নাকি ?

সময়ের দেনা শোধ বিশ্বাস জাগায়,

না শোধার মনোভাব ঝামেলা বাড়ায় ।

ঝামেলা এড়াতে এবার ২০০০ সনে,

২৭শে এপ্রিল বেলা ১১টার স্বপ্নে—

বকেয়া সমূহ ঋণ করে দিলে শোধ,

প্রতিশ্রুতি করুন স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ ।

আগামী ২৭শে এপ্রিল, ২০০০ বেলা ১১টার এলাকার ব্যাংকে ব্যাংকে
নিবিড় ঋণ আদায় শিবিরে যোগ দিন,—বকেয়া ঋণ শোধ করুন, অহেতুক
ঝামেলা এড়িয়ে চলুন, সরকারকে সহযোগিতা করুন ।

রতন জানা

সভাপতি

কাঁধি-১ পট্টায়ত্ত সমিতি

স্রাবণী ঘর

বি ডি ও, কাঁধি-১

‘তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরস’...

রবীন্দ্র প্রণাম হোক জীবন তপন !



প্রিন্স ফুয়েল সেন্টার

ডিজেল, পেট্রল প্রভৃতির জন্যে আমরাই সর্বদা জাগ্রত প্রহরীর মতো
কাজ করে চলেছি।

দীঘা বড়ার □ দীঘা, মেদিনীপুর
আপনাদের জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ

With Best Compliments From

Hello : (03228) 50023

THE

GATEWAY GUEST HOUSE

Opp. Thermal Power, Gate No. 1, Mecheda
Midnapur, West Bengal, India

TARIFF (in Indian Rupees)

SAVE THROUGH BETHEL

FOR

BETTER RETURN OF YOUR

INVESTMENT

Daily □ Monthly

Fixed Deposit Scheme

□ Short Duration □ Maximum Benefit

□ Loan Facilities Available Here

B.H.S. CORPORATION

H/O-ROURKELA. ORISSA

REGIONAL OFFICE

Sonthesn Side of Cotai P.K. College Contat.

Midnapore-721401

Phone : 03220-56828

Cotai Branch □ 55147

রবীন্দ্রচর্চাই প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চার চাবিকাঠি

“বসন্তে ফুল গাঁথিলো আমার জন্মের মালা”

রামনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতি

বালিসাই □ মেদিনীপুর

ফোন : ৬২২৪৬

দ্বিতীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে

সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা যেমন এলাকার মানুষের সার্বিক ও ব্যক্তিগত অনেক উন্নতি হয়েছে, তেমন গড়ে উঠেছে পঞ্চায়েতের উপর মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, দূর করেছে গরীব খেটে খাওয়া মানুষের অনেকটা খাদ্যাভাব আবার বর্তমান সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে মানুষজনের স্বাস্থ্যের জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বিজ্ঞান সম্মত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজে অবসর সমাজের মানুষ জনের মনে এসেছে প্রাণবন্ত জোয়ার এবং এলাকার মানুষজন তাঁদের গ্রামোন্নয়নের নিজস্ব ও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা তুলে দেওয়ার জন্য বিগতগ্রাম সংসদ সভাগুলিতে তাঁদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক।

আগামী দিনে নেতাজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার সমস্ত শিক্ষিত সমাজ গণ সংগঠনগুলি ও প্রশাসনকে সাথে নিয়ে বিগত দিনের চেয়ে আরও বেশি বেশি করে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেবাশিস চক্রবর্তী
নির্বাহী আধিকারিক

বিমলা ঘোড়াই
সহঃ সভানেত্রী

অরুণকুমার দাস
সভাপতি

মেদিনীপুর জেলা নোনাঙ্গল মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনভবন, কাঁথি, মেদিনীপুর

নোনাঙ্গল ঘাটচাষে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং
প্রশিক্ষণের জন্য নিকটস্থ পণ্ডারোত সমিতির অফিসে
মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা মৃত্যু নিষ্পাহী
আধিকারিক, নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, কাঁথি,
মেদিনীপুর অফিসে যোগাযোগ করুন।

এম. ডি. রাও	ডা. পদ্বিন বিহারী বাস্ক	অনিন্দ্যাসুন্দর ঘোষ
আই. এ. এস	সভাপতি, মেদিনীপুর	মৃত্যুনিষ্পাহী আধিকারিক
ও	ও	নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী
সহ-সভাপতি	নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী	উন্নয়ন সংস্থা
উন্নয়ন সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	

জগতে আনন্দমগ্নে আমার নিমগ্ন...
রবীন্দ্র প্রণামই হোক সংস্কৃতি চর্চার ধারা...

দূরভাষা : ৫৫১৯৮

এস টি. ডি. ০৩২২০

শীতের মরশুমে সমস্ত প্রকার হাইব্রীড, ও. পি. সঙ্কী বীজ লাগান
এবং অধিক ফলন ফলিয়ে সমৃদ্ধ হোন।

পাকারের সেরা বীজ

অম্পদূর্বা বীজ ডাঙার

কাঁথি ১ নং মিউনিসিপ্যাল মার্কেট □ ষ্টল নং—, ১৮

With Best Compliments From :

Ph. : 03174-55236

03174-55455

Fax-91-03174-55455

A Vast Fish Culture with a certain aim to achieve Socia
Economical Status Please contact your fishery office at

DIAMOND HARBOUR Range

DISTRICT FISHERY OFFICE (MARINE)

S.K.GANGULY

D.F.O. (Marine) & Project Officer

□ BENFISH □

Diamond Harbour. 24 Parganas (South)

সাম্য মৈত্রী ঐক্য প্রগতি শান্তির পথ ধরে—আমরা চলছি, আমরা চলবো,
যুগ যুগান্ত ধরে...

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার
সার্বিক লক্ষ্য উন্নয়ন—২২ বছরের চেতনায় এ
আমাদের গভীর অনুভব।

তাই একবিংশ শতাব্দীর মূখ্যমুখি আমাদের সর্বিন্ন উচ্চারণ...

“হাতে হাতে গড়ে যাই মানব শৃঙ্খল
ধর্মের ভেদ ভাঙ্গি, মনের দেওরালে
শিক্ষা প্রযুক্তি কৃষি আর স্বাস্থ্যের শপথে
উড়িয়ে নিশান গড়ি নতুন শতক।

নন্দীগ্রাম-৩ পল্ল্যেত সমিতি

যুগলকিশোর জ্ঞানা
সহ-সভাপতি

সুভাষ কোনার
নিবাহী আধিকারিক

একাদশী বর্মণ
সভাপতি

কবিতার কাগজ ৩১

আমাদের পণ্ডায়েত

গণচেতনার অন্য নাম...

এখন গ্রামপণ্ডায়েত, পণ্ডায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পণ্ডায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বাস্থ্যশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। আমাদের এলাকাজুড়ে সমস্ত মানুষদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সদা সতর্ক প্রহরী। সত্য বুলিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পণ্ডায়েত পাঁচজননের জন্য

পাঁচজনকে নিয়েই পণ্ডায়েত...

আমাদের পণ্ডায়েত সমিতিও পাঁচজনে নেই সাকরোক্ত অজ্ঞানে!

আসুন, সবাইমিলে পড়াই কিছ' ক'রে সেখাই...!

রতন জানা সেক্স আসেকউম্বিন শ্রাবনী ধর (WBCS)
সভাপতি সহঃ সভাপতি কার্যনির্বাহী আধিকারিক
কাঁথি ১, পণ্ডায়েত সমিতি। কাঁথি, মেদিনীপুর-৭২১৪০১

নববর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই...

কবি বরীন্দ্রনাথ এবং গ্রামোন্নয়ন ভাবন—

আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।

আপনার আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন এবং

বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষ্যে

(বাগদা-গলদা-চিংড়ি চাষের জন্য)

স্থান নির্বাচন থেকে চিংড়ি তোলা পর্যন্ত প্রতিটি

ব্যাপারে আপনার পাশে আন্তরিক পরিষেবার দায়িত্বে আছে

লতিকা সী ফুডস্

চিংড়ি চাষীদের আস্থার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গের মেন ডিলার ☐ অবশি ফুডস্ লিঃ

খাদ্যাল গোবরা ☐ দীঘা ☐ মেদিনীপুর

দ্রুতায় • দীঘা = ০৩২২০-৬৬৫৬৩

কাঁথি • ০৩২২০-৫৮১২৫ [ফ্যাক্স • ০২২০-৫৫৫১১]

তমলুক • ০৮২২৮-৬৬৩৫৩

•বাগড ২০০০

সহস্রাব্দের নতুন আলোর সঁচিৎ হোক—নবস্তর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত পরিবেশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের নিরন্তর—অক্লান্ত সৈনিকের মতো কাজ করতে হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে...। আসুন, সহস্রাব্দের শ্রুত সন্ধিক্ষণে আরও আন্তরিকভাবে গড়ে তুলি প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অত্যাধুনিক টেলি যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই বৃহত্তর সেতু গড়তে চাই আপনার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

নতুন দিনের নতুন শপথে উদ্দীপ্ত হোক আমাদের অমলিন উদ্যোগ।
বেঁচে থাক আমাদের ভাষা-চেতনার উচ্চাষিত উচ্চারণ। অভিনন্দন সহ।

বীরেন্দ্রনাথ গায়েন
SDOT □ Comi

বইমেলায় বের হল...

একালের তরুণ গল্পকার

বিনোদ মন্ডল'এর

মধ্যময় পৃথিবীর ঝড়-৪০ টাকা

গল্প সংকলন

পরিবেশক—পুস্তক বিপনি / কবিতার কাগজ প্রকাশ

প্রকাশক—সহাঁদ প্রকাশন / মেদিনীপুর

সহস্রাব্দের বই মেলায় জানাই নান্দনিক শ্রুভেচ্ছা...

শিক্তদেব ফিস সাপ্লায়াস'

স্টল নং ● ২৫

শংকরপুর মৎস্য বন্দর / শংকরপুর / মেদিনীপুর

প্রোঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র নায়ক এবং শ্রীবিমল কুমার ব্রহ্ম

জীবনবোধের গল্পমালা

অসিত কর্মকারের গল্পগ্রন্থ

ঘড়ি ৩৫, ইতি তোমার ৩৫

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, বুক-মার্কেট।

আধুনিক এবং কলকাতা পুস্তক মেলা।

কবিতার কাগজ ৬০

রাজ কুমার পেপার হাউস

স্কুল, কলেজ ও অফিস স্টেশনার্সের বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

সমস্ত নামীদামী কোম্পানীর পেন'এর বিপুল সম্ভার

দাঁচা রোড : কাঁথি (পার্ক হোটেলের পাশে

বিঃ দ্রঃ—গোল্ডেন ইগল খাতার হোলসেলার এবং ডিসট্রিবিউটর ।

Registration Form Fillup চলছে

H. S. - 2001 (পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক কাউন্সিল)

ENGLISH-এ পাশের দায়িত্বে TUTION দেওয়া হয় ।

- বিষয়—ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনৈতিক ভূগোল, শিক্ষা বিজ্ঞান সমাজবিদ্যা ।
- পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পাশ করার পর যে কোন কলেজে অনার্স নিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয় ।
- H. S. 2000 Suggestions 90% কমন । বিষয়—বাংলা / ইংরেজী / ইতিহাস / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / শিক্ষা বিজ্ঞান / অর্থনৈতিক ভূগোল ।

জাশা কনসপনডেন্স কলেজ

(গভঃ রেজিঃ)

স্কুলবাজার (N. C. C. বিল্ডিং) • কাঁথি • মেদিনীপুর

• ফোন—(০৩২২০) ৫৬০৪২

শাখা কলেজ

পাটপুর্ আড়াডাঙ্গা, বাঁকুড়া, ফোন □ (০৩২৪২) ৫৭০৬১

রঘুনাথপুর—ঝাড়গ্রাম

দেবাশিস প্রধান, সম্পাদক 'কবিতার কাগজ' ঠাকুরতলা, দেশদস্তুবাড়,
জুনপুট, মেদিনীপুর ৭২০৪৫০

নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস, ১৬ মার্কা'স লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

কব্ধ'ক মর্দিত্ত প্রকাশিত ।

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কাঁথি, মেদিনীপুর

ফোন : ৫৫-০২৩

আমানত ও বিনিয়োগের মাপকাঠিতে পূর্ব ভারতে
শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শীর্ষে।

- ☐ সমগ্র মেদিনীপুর জেলা-সহ কলিকাতা মহানগরী ব্যাঙ্কের এলাকাধীন।
- ☐ গ্রাহক পরিষেবায় ও আমানত সুরক্ষায় আমরা অতুল্য প্রহরী।
- ☐ সর্বোচ্চ হারে সুদসহ রয়েছে আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প।
- ☐ আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত—এগরা ও নন্দকুমার শাখায় রয়েছে নিত্য
‘ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প’।
- ☐ পুরীতে ব্যাঙ্কের ‘হলিডে হোম’।
- ☐ কম্পিউটার পরিষেবায় ভূগলী সমবায় ব্যাঙ্ক।

কাঁথি ● রামনগর ● এগরা ● হেঁড়িয়া ● মঙ্গ
লামাডো বেলদা ● দুর্গাচক ● পাঁশকুড়া ●
মহিষাদল ● নন্দকুমার ঝড়বরিষা ● নন্দীগ্রাম ●
বড়বাজার (কলিকাতা)

১২৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সব শাখায় লকার পাওয়া যায়।

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় কর
সভাপতি

হৃদয়াংগু শেখর নূর
সম্পাদক

সেরা জিনিসটি দেখুন আসল জিনিসটি কিনুন



এখন আপনার প্রিয় শহর কুমিল্লায় ঘরকন্নার টুকটাকি এবং
নান্দনিক উপকরণের জন্য চাই ফ্রাসিল জিনিস!

ঐতিহ্য সম্পন্ন উৎপাদক গোষ্ঠী সমূহের অফুরন্ত সম্ভার! কাঁথির সম্ভ্রান্ত
মানুষদের জন্য আমরাই দরবরাহ করি....

□ লাওপালা □ ইয়েক □ বোরোসিল গ্লাস □ ভাঙেনা-
মোচড়ায়না এমন বাসনপত্র □ বোন চায়নার কাপ-প্লেট □ টি-
সেট □ ডিনার সেট □ ফুলদানি □ ক্যাকটাস পট □ ফ্ল্যাস্ক
□ হটপট □ রঙ বেরঙের কৃত্রিম ফুল। আরো অনেকানেক গৃহ
সজ্জার দেশী-বিদেশী উপকরণ!

কসমস গ্লাসওয়ার

সেওয়ান মার্কেট ৭ কাঁথি ৭ মেদিনীপুর ৭ ৭২১৪০১

গ্রাহক পরিষেবা : সুনীমল মাইতি, সুকমল মাইতি, সুকুমার মাইতি

[illegible]

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে চাই ভালো ইট
জেলাতে এসে গেল



হলো ব্রিক্স



সিমেন্টের তৈরী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ইট, গৃহ
নির্মাণের বিভিন্ন টাইলস, মোজাইক টালি, সুদৃশ্য স্টেট।
সমুদ্রোক্তলবর্তী এলাকায় এখন আর নোনা ধবার ভয় নেই।



জাননভর ঘর থাকবে অটুট এবং শান্ত।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—



বেথেল হাউসিং ইণ্ডাস্ট্রিজ

বেথেল হোমলি সেভিংস কর্পোরেশন এর একটি শিল্প উদ্যোগ
ফ্যাক্টরী (উত্তর বহলিয়া) মহিষাগোট □ মেদিনীপুর

কবিতা কাগজ

একটি পুরুষ পত্রিকা

২৬ বছর উৎসবকালীন ১৪০৭, অশ্বিন



সম্পাদক □ দেবাশিস প্রধান

সংযুক্ত সম্পাদক □ কৌশিক গিরি এস. মহীউদ্দিন

কার্যালয় □ ঠাকুরতলা দেশদণ্ডবাড়ি জুনপুট মেদিনীপুর-৭২১৪৫০

সম্পাদকমণ্ডলী : প্রণব সিংহ চৌধুরী বিধান মাঝি সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী দীপক হোতা

প্রস্তুদ : সৌরভ নাথক

উপদেষ্টা পরিষদ : ডঃ সুধীর বেরা তপোব্রত সান্যাল চিন্ময় দাশ স্বপন পট্টনায়ক

শিবনাথ হোসদা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক : এস. ব্যানার্জী, ৩৯০ রাসমনি বাগান, কলিকাতা

দূরভাষ : ০৩৩ ৪৮৩-৭৭৯০

৬টির আনন্দে মেতে উঠুন অনন্য আবেশে
ফুলের ভাসনে বরফের দেশে,
আপনার আন্তরিক সেবার অপেক্ষা

হোটেল পঞ্চক

পোর্সিং পশ্চিম সিকিম : ফোন : (০৩৫৯৫) ৫৮২২৭

Please contact with Mr. Sanjoy Khatua.

এছাড়াও প্যাকেজ ট্যুরের অভাবনীয় সুযোগ

দার্জিলিং গ্যাংটক কালিম্পং লাভা রিশপ ইয়ুমপং

In the Land of Snow & Cool, the Queen of the Hill Stations
Offers Accomodation For Middleclass Tourists

HOTEL MAYUR

48, T. N. Road. Toong Song (Mall)

Darjeeling, 734101

(Phone 0354-52786)

Calcutta Booking Office: 6, Madan Street (1st Floor)

Opp. Hindustan Building, Calcutta-72

Ph. (033) 221-9633/356-3108/440-5664

মানুষের জন্য সমবায় ☐ সমবায়ের জন্য আমরা
আপনার পাশে
আপনার জন্য
আপনার ব্যাঙ্ক

কাঁথি কার্ড ব্যাঙ্ক

কন্টাই এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

কাঁথি : মেদিনীপুর

বিষয় বিন্যাস

প্রবন্ধ

কাথির লবণ ও মলরী বিদ্রোহ ☐ প্রশান্ত গ্রামাণিক ১৭
কবিতায় গ্রাম ভাবনা, মানা বুধ ☐ ডঃ মদুলা কুণ্ড ২৩
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস, সূচনা পর্ব ☐ ইরবান বসু ৩৭
অনিল ঘড়াইর উপন্যাস, জীবন ও জীবিকা ☐ বিকাশ পতিত ৪৮
দৃষ্টিকোণ ব্যাকারসর্ব্বত্র অর্থনীতি ☐ প্রণব সিংহ চৌধুরী ১২০
অসল নারী মুক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ☐ অনিল সামন্ত ২৩৩
একাত্ত নাটক

বেগমী রঙের শাড়ি ☐ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ১০৯
অনুত-প্রেম কথা ☐ ব্রহ্মেশু মাইতি ১৪৩
ক্রোড়পত্র ☐ দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস
অগ্নিগর্ভ অর্বাণ ☐ সুপ্রাত জানা (ক) ১-১২৮
দিন যাপন ☐ সমীর কুমার রায় (খ) ১-৪৮

উৎসবের কবিতা

অরুণ মিত্র কৃষ্ণ ধর আনন্দ ঘোষ হাজরা কালীকৃষ্ণ ওই অমিতাভ ওগু ব্রত চক্রবর্তী নির্মল
হালদার অজিত বাইরী গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সুব্রত রুদ্র শান্তি রায় বিদ্রবপ্রিয় গিরি
অমরেন্দ্র গনাই পিনাকী নন্দন চৌধুরী অমিয় কুমার সেনগুপ্ত সিদ্ধার্থ সিংহ অর্পণ পদ্ম সেনগুপ্ত
চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জন খাঁড়া প্রণব মাইতি অমিতাভ দাস সন্তোষ কুমার মাজী অরুণ পাঠক
ডমালিকা পণ্ডা শ্রেষ্ঠ তাপস রায় আভা সিংহ গোবিন্দ গোস্বামী প্রবুল পাল মানস কুমার চিনি
মঞ্জুভাব মিত্র অমিত কাম্যপ অমল কর রনজিৎ দেব সাগর চক্রবর্তী সুব্রতে বাগ সুবীর
সরকার মুক্তাঞ্জয় কুণ্ড মুনাল কান্তি সিলীপ জ্ঞানা দেবাশিস মহারাণা অমলেন্দু বিশ্বাস দীপক
হোতা বিশ্বনাথ মাঝি বিমল দেব বেলালউদ্দিন সাগরিকা শর্মা রামকৃষ্ণ ঘোড়াই আশিস গিরি
সুধীন বসু নির্মল বসাক পুনপ্রোক্ত দাশগুপ্ত সিলীপ সামন্ত লক্ষ্মন কর্মকার হাবীকেশ বিশ্বাস
উত্তম চৌধুরী মহাশাহবুদ্দিন ফিরোজ বড়িক ত্রিপাঠী পরেশ সরকার বিবেক চৌধুরী ইভা
মাইতি মনোরঞ্জন রায় হরিরচরণ সরকার মণ্ডল বরুণ মণ্ডল প্রবীর কুমার সামন্ত মানিকলাল
মণ্ডল লক্ষীকান্ত ঘোষ বিশ্বজিৎ ঘোষ আরিখ ইকবাল খান মুরারী মোহন মুরারী নিলয় মিত্র
দেবাশিস ভট্টাচার্য রীনা গিরি বিদ্রব রায় দেবপ্রী পাল অনামিকা ব্যানার্জী সুমিত সাহা সৈয়দ
কওসর জামাল সাগর বিশ্বাস বীর কুমার শী দেবলীনা খাঁড়া অজয় নাগ সিলীপ মুখোপাধ্যায়
কালীপদ প্রধান মুনালকান্তি নন্দর অসীমা মহাশি ইশানচন্দ্র মিল অঞ্জন নায়ক তুহিনচন্দ্র প্রবান
শেফালী দাস মীলাঞ্জনকুমার নিরঞ্জন মাইতি আলোক সেন মনোজ নন্দী শংকর কর রবীন্দ্র
সিংহ রায় গোপাল মল্লিক (৫২—১০০)

ছড়াছড়ি

ডবানী প্রসাদ মজুমদার কার্তিক ঘোষ কালীদাস ভদ্র দেবপ্রিয়তা জ্ঞানা
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিগধর দাশগুপ্ত

ছোটগল্প

লাল কথার ভোমরা অনিল ঘড়াই ১২৯ বদলির অর্ডার স্কিটীশ শাঁতরা ১৩৭ আননা কৌশিক
গিরি ১৪৫ সরিক গৌতম রায় ১৫৫ সুন্দর কি হারায় বিকৃপদ বিশ্বাস ২৪৪ নির্ভার সিদ্ধেশ্বর
মাইতি ২৭৪ মূল কুরির বর ব্যোমকেশ জানা ২৭৪ জম-জমটি আসর সুভাষ চন্দ্র মজা ২৭১ বখরা
চিম্বয় দাশ ২১২ কাকড়া সমীর কুমার বাড়ে ২২১ চায়ে রঙের নাগ জীবন সরকার ১৫৮
ওছ কবিতা

শেফালী রায় ১৩১ বিদ্রব মাজী দেবাশিস প্রধান এস. মইউদ্দিন সুমিতেশ সরকার উৎপল প্রসাদ
মইউদ্দিন সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার
সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার সুমিতেশ সরকার
(১৩৩-১৮২)

HALDIA

The Gateway to Prosperity

Excellent port facilities, an efficient water supply system, availability of skilled manpower, well developed social infrastructure, a comprehensive transport network making the area easily accessible by road, rail and waterways have made Haldia the prime choice of leading industrial giants. An added attraction has been the surplus power situation with capacity to cater to future demands.

No wonder that leading names in the industrial firmament both of national and international repute like Hindustan Lever, Exide, Paharpur The Chatterjee Group, I.&T, Birla Metals, IBP, IFB, IOC, HPCL as well as Mitusbishi Chemical Corporation, Caltex, Praxiar have chosen Halida as the prime location for their expansion plans.

Today, Haldia is the Eastern Door to your prosperity. And Haldia Development Authority is the key to all your infrastructural needs. Come invest in the promising potential of Halida. Make your industrial dreams come true.

HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY

P.O. Durgachak, Haldia, West Bengal-721602



Phone : (03224) 74134/74334/74154

Fax (03224) 74869

CREATING SUPERIOR INFRASTRUCTURE FOR HALDIA

স্মরণ

কবি অরুণ মিত্র



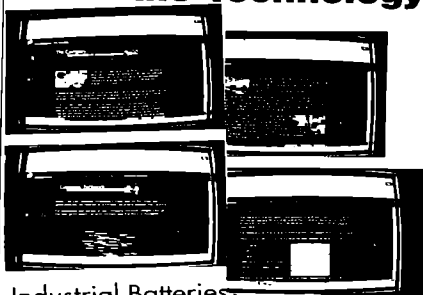
পরিণত ক্যাসেই প্রয়াত হলেন চির তরুণ কবি অরুণ মিত্র। তবুও মৃত্যু মানেই শূন্যতা, হা হা মন খারাপের বিবাদ মায়া'র ওঠা নামা। কবি অরুণ মিত্র আজ আর নেই একথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে বহু তরুণ কবিদের, কেন না তিনি ছিলেন তরুণতম কবিদেরই আত্মীয়জন, আপনজন 'কবিতার কাগজ' এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় টান, বরাবরই ছিল। তাঁর অনেক আগে দেওয়া কবিতাটি এবারের শারদীয়ার পাতায় উপস্থাপিত হল। আমরাও আজ বেদনাক্লান্ত। প্রয়াত কবির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই তাঁরই 'বেজে ওঠে' কবিতার উপস্থাপনায়...

বেজে ওঠে

অরুণ মিত্র

এই শানপাথরে আমার প্রথম পা ফেলা ওখানে খোদাই হয়ে আছে দেখা যাবে। বাস, তারপরই সব ব্যাপসা। আমি আর তার আপন নই। আমার পায়ের তলায় অন্য মাটির টান। অথচ এখানেই আমি অনবরত চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাই দুটো কচি জামরঙা পাতা কখন মাথা নাড়বে আর আমার চোখ জুড়িয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাঁ হয়। আরে তাই হয় নাকি, শানপাথরে কি চারা জন্মায় কখনো? তবু কি নাছোড় খোয়াব, আমি শক্ত খাঁজকাটা পথে চক্কর দিতে দিতে জ্বলি আর খুঁজি সেই জমি যেখানে আমার পায়ের পাতা ঠাণ্ডা প্রলেপ মাখাবে। শেষ পর্যন্ত অবিশিা খেয়াল হয় সে তো এখানে নয়। এবং মনের মধ্যে দিনরাতের ঘন্টায় বেড়ে ওঠে এই কথা : সেই ঘাসজলের মাটি যেখানেই থাকুক না কেন, সাধি নেই কোনো ভেড়িয়া দৌড় তাকে পার হয়ে যায়, কোনো কেজো দুপুর তাকে উবিয়ে দেয়। মনের মধ্যে ঘন্টা বাজতেই থাকে।

Explore the Power Touch the Technology



Industrial Batteries

INDIA MOVES ON

EXIDE



DURGACHAK □ HALDIA □ MIDNAPUR
(WEST BENGAL)



কথামুখ...

পূজো মানে প্রতিমা নয়। প্রতিমাকে
উপলক্ষ্য করে উৎসবের আনন্দধারায়
সম্মিলিত অবগাহন। আর
সুখশান্তি হোঁয়ার নতজানু প্রার্থনা।
মিষ্ট শীতল সতেজ উজ্জ্বল শরতের
অভ্যর্থনাই এই শারদোৎসব।
প্রকৃতির প্রতি যাঁদের নজর দেবার অবকাশ নেই,
তারাও এই ঋতুর আগমন সম্পর্কে উৎসুক।
তাই প্রকৃতির প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত
মানুষের অপরিণীম উদ্যোগ ও বিনয়ী উচ্চারণ...
লঘু বাতাস, কোমল রোদ্দুর, শিউলী, কাশ,
পদ্ম কিংবা কুমুদ ফুলের উজ্জ্বল আভায়
সব্বলের মন চঞ্চল।
ঢাকের বাজনায়ে ভেসে ওঠে বহু স্মৃতি।
তাই উৎসবে উন্মোচিত বেঁচে থাকার সম্মিলিত অর্থ।
সর্বস্তরের মানুষের প্রতি প্রীতি ও মোহাসের
সম্পর্ক স্থাপনেই সামাজিক কল্যাণ।
এ কথার বিশ্বস্তিই উৎসবের অঙ্গহানি।
উৎসবই সামাজিক
সকল সঙ্কীর্ণতা পরিহারের বিতাব প্রান্তর
যেমন, বিজয়ার মিলনোৎসব।
কবি অরুণ মিত্রের প্রয়াণে
আমরা আত্মীয়হীন হয়ে গেলাম।
আমাদের রক্তে তবু দূলে উঠুক
প্রজন্মের শীতল উচ্চারণ ও প্রগতি।
সবার উজ্জ্বল সুখ সমৃদ্ধি কামনা সহ...

দেবাশিস প্রধান
সম্পাদক
কবিতার কাগজ

(দেবাশিস প্রধান)





ନନ୍ଦନ - ଅନନ୍ଦ

ନନ୍ଦାଈ - ଅନାପା

ନିଆର - ନିଆର

ନାମାଈ - ନାମା

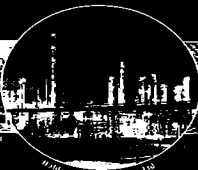


ନିଆର - ନିଆର

turnaround @ turn of the century



MCL PTA India Corp. Pvt. Ltd.



Haldia Petrochemicals Ltd.



Bhushan Industries Ltd.

'We believe the state possesses key intrinsic advantages, in terms of its size and wealth, its relative stability and its emerging investor-friendly climate'

McKinsey & Company Inc

With a stable environment, abundant electric power for new industry, a plethora of natural as well as human resources and an emerging partnership of Government, Industry and Labour propelling investments, West Bengal is confidently moving into the new millennium.

The new icons of change signifying the 'turnaround' are Haldia Petrochemicals Ltd. (Rs. 5170 crore), Mitsubishi Chemicals PTA plant (Rs. 1600 crore) and Bhushan Industries' Cold Rolling Mill - all getting ready to commence production now.

The other leading players who have contributed to this process of turnaround are Computer Associates, Cognizant Technologies, United Airlines, TCG, IBM, Sema, Praxair, L&T, Phoenix AG, Hindustan Lever, Coca Cola, Research Engineers, R S Software etc. Among the many about to set up shop are Videocoin International, South Asia Petrochemicals, Nikamal Plastics, Supreme Industries and many more.

And it is metamorphosing into the safest and one of the most investor-friendly destinations in India.



West Bengal Industrial Development Corporation

Making Things Happen

বাংলা অনুবাদে অকাদেমি পুরস্কারজয়ী উপন্যাস

অমৃতের সন্তান (ওড়িয়া)	চিংড়ি (মলয়ালম)
গোপীনাথ মহান্তি	তাকাহি শিবশঙ্কর পিল্লাই
অনুবাদ : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও	অনুবাদ : নিলীনা আব্রাহাম
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জ্যোয়ার্দার ১২০ টাকা	ও বোম্বাণা বিশ্বনাথম ৭০ টাকা
রক্তবন্যা (তামিল)	ইয়ারুইঙ্গম (অসমিয়া)
ইন্দিরা পার্শ্বসারথী	বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
অনু: সূত্রমণিয়ন কঙ্কমূর্তি ৪০ টাকা	অনুবাদ : সুকুমার বিশ্বাস ৫০ টাকা
আশ্রয় (সিন্ধি)	সাড়ে তিন হাত ভূমি (উর্দু)
হরি মোটোয়ানি	আবদুস সামাদ
অনুবাদ: আফসার আমেদ	অনুবাদ : আফসার আমেদ
ও দুর্গা খাবরানি ৫৫ টাকা	ও কালিম হাজিক ৮৫ টাকা
মরচে ধরা তরোয়াল (অসমিয়া)	নগর-মছুন (ভোগরি)
ইন্দিরা গোস্বামী	ও. পি. শর্মা 'সারথি'
অনুবাদ সঞ্জিত চক্রবর্তী ১১০ টাকা	অনুবাদ : শ্রবীর ঘোষ ২০ টাকা
ছায়ারেখা (ইংরেজি)	সর্প ও রজ্জু (ইংরেজি)
অমিতাভ ঘোষ	রাজা রাও
অনুবাদ মৌসুমী বসু ৮৫ টাকা	অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫ টাকা

স্মারকশিলা (মলয়ালম)

পুনাতিল কুজাপুমা

অনুবাদ : দেবীরানী ঘোষ ও পি. সি. বিদ্যার্থী



সাহিত্য অকাদেমি

জীবনভারা, ২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড

কলিকতা ৭০০০৫৩, দূরভাষ ৪৭৮১৮০৬

প্রাতিষ্ঠান ॥ অকাদেমি দপ্তর, যে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, উষা পাবলিশিং
ন্যাশনাল বুক এক্সপ্রেস ইত্যাদি

আমাদের লক্ষ্য কলকাতাকে আরো
সুন্দর করে গড়ে তোলা, আরো
উন্নত নাগরিক পরিষেবা

এ কাজে চাই সকলের আন্তরিক
সাহায্য ও সহযোগিতা



উপা ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসংস্থা



পূজার রোজ নামচা

সপ্তমীতে শর্ত হল দেখতে যাওয়া ঠাকুর
ইলেকট্রিকের ট্রেনে চেপে হাতটি ধরে কাকুর
ট্রেন চালাতে চাই তো ইলেকট্রিক —
ব্যাঙেল আর সাঁওতালডি যোগাবে তা ঠিক ।

অষ্টমীতে দেখতে হবে রাত্রে ট্রনির মেলা
ট্রনির আলোয় দেখতে হবে মজার মজার খেলা
ট্রনির জন্য পূজার সময় চাই তো ইলেকট্রিক —
অটেল আছে চাই কতটা যে যতটা নিক ।

নবমীতে বাবার সঙ্গে চড়কি চড়া চাই
চড়কি তো নয় নাগরদোলা সবাই জানে ভাই
নাগরদোলা চালাতে যে চাই তো ইলেকট্রিক —
খামতি কোথায় — লাইন জুড়ে বইছে চতুর্দিক ।

দশমীতে বিসর্জন সবার মন খারাপ
বিজয়া আর কোলাকুলি মুখ মিষ্টির চাপ
এই দিনে তেও নেই যে ছুটি চাই তো ইলেকট্রিক —
আমরা আছি বিবাস বিহীন দায়িতে নির্ভিক ।

TVSIB

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

আভিজাত্যের
প্রতীক

রেশম
শিল্পী



বালুচেরী • গরম • ডসর • সিঙ্ক আমদানী
• সিঙ্ক কোয়ারসী • সিঙ্ক টাঙ্গাইল
• কাথা স্টাফ • মুর্শিদাবাদ সিঙ্ক শাড়ী
• চুড়িদার • নাইটি • হাউসকোট
• সার্ট • শালোয়ার-কামিজ • কাপড়ান ও
ফ্রেসমেন্টেরিয়ালস্ • রেডিয়েন্ট শার্ট • পাঞ্জাবী
ও সিঙ্কের শার্ট ও পাঞ্জাবীর কাপড়।

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসভা লিঃ
(৩৪ বা সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)

১২/১, হোয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

* ১৪/১, হোয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০১ & ১১-এ, কলকাতার ইন্ড, কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ১৪৪/১-এ, হাটখাতী পল্লী (কলিকাতা), কলিকাতা - ৭০০ ০১৯, হোয়ার কলকাতা কলকাতা, ১৪৪, কলকাতা কলকাতা, কলিকাতা - ৭০০ ০০৭, (কলকাতা কলকাতা), * ১৪৪, কলকাতা কলকাতা - ৭০০ ০০৬ (কলকাতা কলকাতা কলকাতা কলকাতা), ১১-১৪, কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা, কলিকাতা - ৭০০ ০০৪ & ১১-১২২, কলকাতা কলকাতা কলকাতা, ১৪৪ কলকাতা (কলকাতা), (কলকাতা কলকাতা কলকাতা), কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা - ১৪ & ১৪৪ কলকাতা, কলকাতা কলকাতা কলকাতা, ১৪৪ কলকাতা (কলকাতা)

বিস্তারিত প্রচারিত কলকাতা কলকাতা

* ১৪৪ কলকাতা

বিজ্ঞাপনে ভুলবেন না পরখ করে দেখুন...

এখনও সব ধরনের আমানতের ওপর সুদ বেশী দিচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

সঞ্চয়ী
আমানতে
সুদ বার্ষিক



নগর স্থায়ী সঞ্চয় - বিদ্য বরডে
SOPAN DEPOSIT SCHEME-এ
কয়েকদশ হাজার ১০০০০ টাকা রেখে
একলাখ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত
পুঁজির স্থায়ী ব্যবস্থা

গৃহঋণ



নগর লক্ষ টাকা পর্যন্ত - বাড়ি/জমি
ভেটি/কোলা দেওয়ানদের জন্য কম
সুদে পরিচেষ্টা - বাড়ির প্রতিষ্ঠান
স্বাধীনতা অনুসারে বিভিন্ন উপর
আয়করে বাড়ি/জমির দায় - এই
- ফিলা বাবে পুঁজির স্থায়ী সুযোগ

এছাড়াও

ওয়ার্পিং মেশিন থেকে শুরু করে ক্যামেরা, ইজার, টেলিভিশন, আসবাবপত্র প্রকৃতির জন্য সহজ কণ

রয়েছে

এন.এস.সি. রিফার বিকাশ পর, এল.আই.সি পলিসি জন্য রেখে ৭৫% পর্যন্ত তহবিলের কণ প্রকর।



বিভাগীয় তহবিলে ১০% অর্থের ব্যয় করে যে কোন শ্রমিক

প্রদান করিলে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক লি:

১৯৫, হাফেলার স্ট্রীট

কলিকতা - ৭০০০১৬

ফোন: ২৫৫-২৫৫৫০১৬

শিল্পনগরী হলদিয়ায় আগামী দিনগুলিতে আমাদের উদ্যোগ

প্রাত্যহিক পৌর পরিষেবা চালু রাখার সাথে সাথে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে আগামী বছরগুলিতে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচী রূপায়ণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

☞ ট্রাক টার্মিনাস

☞ আমলাট-স্টেডিয়াম

☞ কম্যুনিটি হল

☞ গভীর নলকূপ

☞ বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ

☞ হাসপাতাল

☞ হাউসিং কমপ্লেক্স

☞ ট্যুরিজম

☞ ডাম্পিং ইয়ার্ড

☞ টাউন লাইব্রেরী

☞ যুব আবাস

☞ যাত্রী প্রতীক্ষালয়

☞ ফেরীঘাট উন্নয়ন



HALDIA
MUNICIPALITY

তমালিকা শেঠ

চেয়ারপার্সন

হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি



টাকা
ডবল
করার
সবচেয়ে
ভাল
উপায়



কিষাণ বিকাশ পট্রে

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য * কোন ঝুঁকি নেই

৬ বছরে টাকা ডবল

২½ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা

উৎসমূলে কোন আয়কর কাটা হয় না

যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে পাওয়া যায়

ডেপুটি ডিরেক্টর, 'মদল সেভিংস

কলকাতা এবং দিল্লি ও পুণে - ১৯৬৬



সরকারের আধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার



পাহাড় থেকে সাগরে

বেনফিশের

সঙ্গে

কিনস চাহি

কিনস মোল

এম

পকেডা

কিনস

কিনসার

কিনস হাটার
চাহি

কিনস চিকিৎসা

চিনি কিনস

কিনস সিলাহা



BenFish

কিনস বিকল্পের জন্য

যোগাযোগ করুন

ফোন ৪ ০০৪-৪৯০১

মত্যা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সাগর থেকে পাহাড়ে

কাঁথির লবণ ও মলঙ্গী বিদ্রোহ

প্রশান্ত প্রামাণিক

সম্প্রদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার রাজত্বকালে হিজলী রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল মোটামুটি এইরকম। এই রাজ্যের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হুগলী ও রূপনারায়ণ নদ, উত্তরে তমলুক, পাঁশকুড়া ও ডেবরা থানা এবং পশ্চিমে খড়গপুর, নারায়ণগড়ের অনেকাংশ ও কেশিরাড়ী থানা এবং জলেশ্বর ও দাঁতনের কাছে সুবর্ণরেখা নদী, দক্ষিণ দিকে সমুদ্রসীমা অবধি। ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থান মোটামুটি ২১°৩৭' ও ২২°৮' উত্তর-অক্ষাংশ এবং ৮৭°১৫' ও ৮৮°১১' পূর্ব-দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে হিজলী 'চাকলা' হলো এবং এর ২৮টি মহালকে ভেঙ্গে ৩৭টি পরগণা করা হয়। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক পরগণা হিজলী চাকলার সঙ্গে যুক্ত হলে হিজলী চাকলার মোট ৩৮টি পরগণা দাঁড়ায়। এর আগে তমলুক পরগণা হুগলী চাকলার অধীন ছিল। এই হিজলী রাজ্যে মোটামুটি চারটি জমিদারী ছিল। এগুলি হল মহিষাদল, 'মাজনামুঠা', 'জলামুঠা' ও 'জলামুঠা' (৫)। এর মধ্যে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুটি তাজখাঁর 'খাস' সম্পত্তি ছিল। বাহাদুরের মৃত্যুর পর তারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডা যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি করেছিল। জলামুঠা জমিদারীই ছিল হিজলীর অতি বিখ্যাত লবণ উৎপাদনের মূল কেন্দ্র। জলামুঠা জমিদারীর ১৩টি পরগণা ছিল এইরকম ১. জলামুঠা ২. কেওড়ামাল বিশঙ্কান ৩. দক্ষিণমাল ৪. বাহিরীমুঠা ৫. পাহাড়পুর ৬. গওমেশ ৭. নয়াচক বাজার (বারেন্দা বাজার) ৮. ভাইটগড় ৯. কালিন্দী বালিসাই ১০. বীরকুল ১১. আগ্রাফোর ১২. মীরগোদা ১৩. ভোগরায়। এর মধ্যে ভাইটগড় পরগণা বাদ দিয়ে বাকী ১২টি পরগণাই সম্রাট আকবরের সময়কার রাজস্ব বিভাজন অনুসারে সরকার মালজোঠিয়ার অন্তর্গত। ভাইটগড় ছিল সরকার জলেশ্বরের অধীন। এই পরগণাগুলি অধিকাংশই ছিল বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এবং হিজলীর রপ্তানী বাণিজ্যের অন্যতম শরিক যে লবণ তার উৎপাদন কেন্দ্র। অবশ্য তমলুক পরগণায় এবং মহিষাদল জমিদারীর তিন-চারটি পরগণাতেও যথেষ্ট লবণ উৎপন্ন হতো। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রায় ১০০ বছর ধরে ইংরেজরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে এ অঞ্চলের লবণ-ব্যবসা থেকে। একটু পরেই সে কথার আসলিছ।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চাকলা মেদিনীপুরের দেওরানী লাভ করলেও চাকলা হিজলী মীরকাশিম নিজের অধীনেই রাখেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার দেওরানী লাভ করলে চাকলা হিজলীও তাদের অধীনস্থ হয়। হিজলীর স্রষ্টিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা লবণ ব্যবসাটা পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ব্যবসা বেনিরা ইংরেজদের কাছে ভাষণ লোভনীয় ছিল প্রথম থেকেই। শূদ্ধ ওদেরই বা দোষ দিই কেন! চাকলা হিজলীর লবণ ব্যবসা মুসলমান শাসকদের কাছেও কম লোভনীয় ছিল না। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের রমরমা শুরু সেই মোঘল আমল থেকেই কিংবা বলা যায় হিজলীর জন্মলগ্ন থেকেই। তার আগে তাম্রলিপ্তের আশপাশ অঞ্চলকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'নিমকিন-মহাল' হিসাবে। হিজলী, ভুলুকা, মেদিনীপুর ও জলেশ্বর অঞ্চলের লবণ ব্যবসা জমিদাররাই চালাত, নবাবরা বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করতেন। এখানকার লবণ কেনার জন্য দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসতো কাম্বার, পাজাব, গুজরাট এমনকি সুদূর মুলতান থেকেও। এই অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারী, লবণ-ব্যবসায়ী সকলেই প্রচুর অর্থ আয় করতো এই লবণ বাণিজ্য থেকে।

ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ মার ফরাসীরাও হিজলীর লবণ ব্যবসার রমরমা কথা বলেছে তাদের নানা বিবরণীতে। সুতরাং এই লোভনীয় ব্যবসার উপর ইংরেজদের নজর পড়ছিল বহুদিন আগেই। ভাগ্যচক্রে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবসার পুরোপুরিটাই তাদের কব্জায় এলো। তাদের চেষ্টা চললো কীভাবে এই ব্যবসার সব মুনাফাই নিজেদের ঘরে তোলা যায়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল লবণ ব্যবসার কোম্পানীর এক চেটিয়া অধিকার প্রবর্তন করেন। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের একেবারে হটিয়ে দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেই লবণ ব্যবসা পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেয়। নিমকিন মহালের ইজারাদারদের তারা জোর করে দাদন নিতে এবং সমস্ত উৎপন্ন লবণ তাদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য করে। কোম্পানী এইসব লবণ মোটা অঙ্কের লাভ রেখে বাহিরাগত ক্রেতাদের বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা লুটতো। উৎপাদনকারী কিংবা ইজারাদারকে বাধ্য করা হতো একটা নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানীর কাছে লবণ বিক্রী করতে। কম দামে কেনা এই লবণ বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করার একচেটিয়া অধিকার কোম্পানী নিজের হাতেই রাখে। কোম্পানী ছাড়া আর কেউই বাইরের কিংবা ভারতের অন্যান্য স্থানের ব্যবসায়ীদের কাছে লবণ বিক্রী করতে পারতো না। লবণের এই একচেটিয়া কারবারে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেমস গ্রান্ট [Mr J. Grant] হিজলীর লবণ উৎপাদন এবং তার থেকে রাজস্ব আদায়ের

যে বিবরণ দেন, তা এই অঞ্চলের লবণ উৎপাদনের সম্যক চিত্র তুলে ধরেছে।
 গ্র্যান্ট সাহেব তখন বাংলার 'মুখ্য সেরিস্তাদার' [Chief Sarishtadar]।
 তাঁর মতে, এই অঞ্চল 'is of great importance as an accessible
 frontier, rich in its produce of grain, but still more valuable
 as productive of more than one third of the necessary
 Quantity of salt manufactured and consumed annually within
 the whole British dominions dependent on Fort William.'
 শাহজাহানের রাজত্বকালে হিজলী বাংলা সুবার সঙ্গে ছিল এবং শাহজাহান
 নির্মকিন মহাল সৃষ্টি করেন রাজস্ব আদায়ের সুবিধা ও বৃদ্ধির জন্য।
 আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮টি মহাল নিয়ে গঠিত
 হিজলীর রাজস্ব ছিল ৩,৪১,০৮৪ টাকা এর মধ্যে ৪১,৫৬৫ টাকাই আসত লবণ
 ব্যবসায়ের বাণিজ্য শুল্ক হিসাবে। এর ১৫ বছর পরে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জাফর
 খাঁ বা মুনশিদকুলি খাঁর রাজস্ব বিভাগের পর চাকলা হিজলীর রাজস্ব দাঁড়ায়
 ৫,৭৭,৯৪২ টাকা। অবশ্য লবণ বাণিজ্য-শুল্ক একই থাকে, অর্থাৎ ৪১,৫৬৫
 টাকা।

এই সময় হিজলী অঞ্চলে দু'ধরনের জমি থাকতো। এক শ্রেণীর জমি
 যে গুলোতে চাষবাদ হত, এদের নাম ছিল 'মধুর'। অপর শ্রেণী হল
 'নির্মকিন' জমি যেখানে লবণ উৎপন্ন হতো। মধুর জমিগুলি উঁচু উঁচু বাধ
 [Embankment] দিয়ে বেঁধা থাকতো যার ফলে সমুদ্রের বা নদীর লোনা-
 জল ওগুঁলি প্রাণিত করতে পারতো না এবং বিভিন্ন ফসলের চাষাবাস সম্ভব
 হত। এখনও এইসব অঞ্চলের চাষযোগ্য জমি উঁচু বাধ বা Embankment
 দিয়ে ঘেরা। বাধগুলি তৈরী করা হতো সমুদ্র বা নদীর সমান্তরালে এবং
 এগুলি নদী বা সমুদ্রের লোনাজলের অনুপ্রবেশ রোধ করত। এখনও একই
 নিয়মে বাধগুলি তৈরী বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাঁধের ভিতরের দিকে
 জমিগুলিকে বলা হত 'মধুর' আর বাঁধ ও নদী বা সমুদ্রের মাঝবানের জমি
 ব্যবহৃত হতো লবণ উৎপাদনের জন্য। এই জমিগুলিই অভিহিত হতো
 'নির্মকিন' নামে। সেকালে Embankment-কে বলা হত 'বাহির-বন্দী'।
 নির্মকিন জমিগুলিকে সমুদ্র বা নদীর লোনাজল এসে প্রাণিত করতো এবং
 তার ফলে লবণ উৎপাদন সম্ভব হত। এই নির্মকিন জমিগুলিতেই তৈরী হতো
 লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র বা 'খালাড়ী'। মোটামুটিভাবে, এক একটা খালাড়ী
 গড়পড়তা ২৩০ মণের মত লবণ উৎপাদন করত। এই লবণ উৎপাদনের কাজ
 যারা করতো তাদের বলা হত 'মলকী'। নির্মকিন জমিগুলিতে সমুদ্র বা
 নদীর লোনাজল বিশেষ পদ্ধতিতে পরিষ্করণ করে পরিষ্কার লবণ সম্পূর্ণ জল
 সংগ্রহ করা হত। এই লবণাজল জলের বাষ্পীভবন করলে পাওয়া যেত লবণ।

জল ফাঁটিয়ে বাষ্প করার জন্য যে কাঠ বা জ্বালানী লাগতো তা সংগ্রহ করা হতো নিকটবর্তী জঙ্গল থেকেই। 'জালপাই' হলো সেইসব জারগা যেখান থেকে জ্বালানী পাওয়া যেত। এ অঞ্চলের গ্রামের নামে তাই জালপাই নামের ছড়াছড়ি।

এইভাবে লবণ উৎপাদন চলতো নভেম্বর মাস থেকে জুন মাস অবধি। বছরের বাকী সময়টা মলঙ্গীরা নিজেদের 'মধুর' জমিতে চাষাবাস করতো। এই সব মধুর জমি প্রায়শঃই নিষ্কর হতো অথবা নামমাত্র খাজনার মলঙ্গীদের বিতরণ করা হতো। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী লবণ দপ্তর [Salt Department] খুলে জমিদারের লবণ উৎপাদনের অধিকার কেড়ে নেয়। গ্র্যাণ্ট সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই সময় হিজলী চাকলার চার হাজার খালাড়ী ছিল। প্রত্যেক খালাড়ী থেকে নবাব খাজনা পেত এগার টাকা করে। এইভাবে ৪০০০ খালাড়ী থেকে নবাবের রাজস্ব আদায় হত ৪০,৫৬৫ টাকা। এই সময় মলঙ্গীরা প্রতি একশো মণ লবণ উৎপাদনের জন্য পেত ২২ টাকা। অথচ হুগলী কুঠিতে এই সময় লবণ বিক্রি হতো একশ' মণ ৬০ টাকা। এই একশ' মণ পিছন ৩৮ টাকার লাভ বিভিন্ন ধরনের লোকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যেত। আড়তদার, ব্যবসায়ী, রাজস্ব কর্মচারী, দালাল, বহনকারী প্রভৃতিরা এই লভ্যাংশের ভাগাদার ছিল। মূল উৎপাদনকারীর ভাগ্যে জুটতো লবণের মোট মূল্যের একতৃতীয়াংশ মাত্র। গ্র্যাণ্টসাহেব বলছেন, এই সময় হিজলী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হতো।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 'লবণ দপ্তর' [Salt Department] স্থাপন করে লবণ বাণিজ্য পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নেয় এবং কোম্পানী লবণ ব্যবসা একচেটিয়াভাবে চালাতে থাকে। জমিদারদের লবণ উৎপাদনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণ স্বরূপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে জমিদারদের কিছু নির্দিষ্ট ভাতা 'মালিকানা' এবং আরও কিছুটা ভাতা 'মুশাহারা' হিসাবে দেওয়া হত। এ ছাড়া খালাড়ী থেকে জমিদাররা যে রাজস্ব আদায় করত তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাদের অনুদান দেওয়ার বন্দোবস্তও কোম্পানী করে এবং লবণের একচেটিয়া কারবার কোম্পানী জোর করে নিজের হাতে তুলে নেয়। ইংরেজদের এই একচেটিয়া বাণিজ্য চলতে থাকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি, যখন লিভারপুল-লবণ [Liverpool Salt] কলকাতা ছেয়ে দেয় এবং তা দামে অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় এই অঞ্চলের লবণ ব্যবসা অসম্ভব জনক হয়ে পড়ে। ফলে দেশী লবণ উৎপাদন খুব কমে আসে এবং প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবু দেখা যাচ্ছে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিমণ দেশী লবণে ইংরেজ সরকার বাণিজ্য শুল্ক নিজে ০ টাকা ৪ আনা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লবণের ২০ / কবিতার কাগজ

একচেটিয়া কারবার-সংক্রান্ত সমস্ত আইন তুলে নেওয়ার শৃঙ্খ আদার সাপেক্ষে লবণের উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবগত মালিকানায় চলে আসে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে লিভারপুল লবণের উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত কম হওয়ার এবং তৎকালীন ইংরেজ সরকারের গভীর আনুকূল্যে ভারতবর্ষে ওই লবণ অত্যন্ত সস্তা দরে বিক্রী হতে থাকে। অপর দিকে অত্যধিক শৃঙ্খ আয়োগ করে পুরানো পদ্ধতিতে তৈরী দেশী লবণের বাজার দর অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনভাবেই দেশী লবণের উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল, তার উপর অত্যধিক শৃঙ্খ চাপানোর ফলে দেশী লবণের বিক্রয় মূল্য লিভারপুল লবণের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেল। লোকে সস্তার লিভারপুল লবণ কিনতে থাকলো। দেশী লবণের উৎপাদন অলাভজনক ব্যবসা হিসাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। ফলে হিজলী অঞ্চলে অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের যুগ শুরু হলো। কারণ, হিজলী-কাঁথি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি মোটামুটি দেড়শ বছরের কিছু বেশি সময়, লবণ-বাণিজ্যেই তাদের অর্থনীতিকে কোনও রকমে টিকিয়ে রেখেছিল। লিভারপুলের লবণ এসে সেই শেষ ভিত্তিটুকুও উপড়ে দিলে গেল।

আগেই বলা হয়েছে বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে যেসব জমি জোয়ারের সময় লোনাজলে ডুবে যেত সেই সব জমির মাটি থেকে পরিষ্করণ [Filtration] করে লবণ জল পাওয়া যেত। তাকে কাঠের আগুনে ফুটালে তার জলীয় ভাগ বাষ্প হয়ে যেত এবং পাতে লবণ জমতো। মলঙ্গী নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের দ্বারা এই পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুত করতো। এই নাম আজও চালু আছে কাঁথির আধুনিক লবণ কারখানাগুলিতে। এদের জীবিকা প্রধানতঃ লবণের উপরই নির্ভরশীল ছিল। বর্ষাকালে এই পদ্ধতিতে লবণ তৈরী করা যেত না। তখন এদের মধ্যে যাদের মধুর জমি ছিল তারা চাষাবাস করতো। তবে মলঙ্গীরা ছিল মূলতঃ দরিদ্র শ্রমজীবী। জমিদারের সঙ্গে এদের যে চুক্তি হত সেই অনুসারে বর্ষার সময় এরা জ্বালানী কাঠের জন্য কিছু জমি পেতে পারত।

লবণাক্ত মাটি ও জলের মধ্যে বহুদূর ধরে কাজ করা অত্যন্ত শ্রম সাধ্য ছিল। এদের নবাবী আমলে মজুরী ছিল একশ' মণ লবণ পিছ্ মাত্র ২২ টাকা। ইংরেজরা লবণের একচেটিয়া কারবার হাতে নেওয়ার পরও এদের মজুরী বাড়েনি। আবার মলঙ্গীর কাজ ছেড়ে পালানোও এদের পক্ষে মর্শকিন ছিল। কোম্পানী ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্যে এদের থুঁজে থুঁজে বার করতো এবং আবার কাজে লাগিয়ে দিত। নেহাতই যদি কোনও মলঙ্গী বা কিছু মলঙ্গীকে থুঁজে না পাওয়া যেত তবে তার বা তাদের জারগায়

নতুন মলঙ্গী নিয়োগ করা হত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই জোর করে এই কাজে লাগানো হত। মধ্যে মধ্যে মলঙ্গীরা দলবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটের আকারে স্বল্প মজুরী ও অন্যান্য উৎপাদনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাত। কাঁথির ইতিহাসে সন্দেহঃ মলঙ্গীরাই সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ এপ্রিল মাসে উৎপাদন সহিতে না পেয়ে বহু মলঙ্গী দলবদ্ধভাবে কাজ ছেড়ে ২৪ পরগণার মুড়াগাছা অঞ্চলে পাঁচিয়ে যায়। কোনও প্রতিকার না পেয়ে এদের বিক্ষোভ ক্রমে একটি আন্দোলনের রূপ নেয়। মলঙ্গীরা এই সময় 'সফট কমিটি' নামে একটি কমিটিও গঠন করে। রাম দী'ডা, ভগবান মাইতি, হারু ম'ডল, হারু পাঠ, জয়দেব সাহা, বৈষ্ণব ভূইয়া এদের নেতৃত্ব দেন (৬)। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল কাঁথি মহকুমার বীরকুল দীঘা এলাকার ও মীরগোদা অঞ্চলের সমস্ত মলঙ্গী একসঙ্গে সমবেত হয়ে শোভা-যাত্রা করে কাঁথি আসে। বীরকুলের মলঙ্গীদের নেতা বলাই কুন্ডু এদের পক্ষে একটি আবেদনপত্র কাঁথির সল্ট এজেন্টের হাতে দেন। মলঙ্গীদের মজুরী বৃদ্ধি, তাদের উৎপাদিত লবণের মূল্য উপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো, বেগার ও ভেট দেওয়ার প্রথা রহিত করা প্রভৃতি দাবী তোলা হয় ওই আবেদন পত্রে। এইসব উৎপাদনের কোনও প্রতিকার হল না। আন্দোলন চলতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু কোম্পানীর শোষণ ও শাসন দুই-ই সমানভাবে বলবৎ থাকে। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা দমে যায় নি।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরমানন্দ সরকার নামে একব্যক্তি মলঙ্গীদের দলবদ্ধ করে নতুন উদ্যমে আন্দোলন শুরুর করেন এবং মলঙ্গীদের প্রতি কোম্পানীর অত্যাচারের প্রতিবিধানে সচেষ্ট হন। ব্যাপক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মলঙ্গীরা দলবদ্ধভাবে কাঁথি এসে সল্ট এজেন্টের কাছারী ঘেরাও করে এবং এই কাছারী বাড়ী হলো কাঁথির 'নিমককুঠি' যার কথা আগের পর্বে বলা হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্টের পাইক বরকন্দাজরা নারক পরমানন্দ সরকারকে গ্রেপ্তার করে এবং চারিদিকে গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এজেন্ট সাহেব মলঙ্গীদের দাবীগুলি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে এই বিদ্রোহ শান্ত হয়। প্রায় ২০০ বছর আগে দরিদ্র প্রমজীবি মলঙ্গীদের এই বিদ্রোহ 'মলঙ্গী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাঁথিবাসীর সেই প্রথম বিদ্রোহ। □

কবিতায় গ্রাম-ভাবনা : নানামুখ

ডঃ মৃদুলা কুন্ডু

গ্রাম, গ্রাম্য, গ্রামীন, গা, গে'রো এইসব শব্দ উচ্চারণে একই সঙ্গে অনেক অন্তর্ভুক্তি ভিড় জমায় মনে। উপেক্ষা-অবজ্ঞা-রোমান্টিকতা-রহস্যময়তা-সহজতা-শ্যামলতা-পঙ্খিলতা মিলে-মিশে একাকার। গ্রাম সম্পর্কে কবিতাও তাই বহু বিচিত্র। প্রকৃতি ও গ্রাম্যতা যদি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাধা হয় তো বলা যেতেই পারে সৃষ্টির আদি-র সঙ্গে অবিভক্ত হয়ে আছে গ্রাম। সৃষ্টির আদিমতা ও নিবিড়তার সঙ্গে তাই তার নাড়ির যোগ ছিল হয় না সহজে। গ্রামের মানুষ যতদূরেই যাক বা যেতে বাধা হোক গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো ছেদ ঘটে না। অন্যদিকে গ্রামের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তারাও পরোক্ষ বা সুদূর পরোক্ষে গ্রাম জীবনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পারে না।

এই গ্রামগুলির কতখানি বদল ঘটেছে তার অবয়বে বা তার অন্তর্গত স্বরূপে? নীহার রঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—'আরতনে বা আকৃতি-প্রকৃতিতে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের যত পার্থক্যই থাকুক, ঐতিহাসিক কালে অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চম শতক হইতে একেবারে আদি পর্বের শেষ পর্যন্ত সমগ্রভাবে বাঙালার গ্রামের চেহারা ও প্রকৃতি একই থাকিয়া গিয়াছে। বস্তুত, মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সে চেহারা ও প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে' (আদি পর্ব, দে'জ, ১৮০২, পৃঃ-৩০৬-৩০৭)। আমরা সকলেই জানি অষ্টাদশ শতকের শেষে ভূমি-ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তনের ফলেই নাগরিক-স্পৃহা বাধ্যত বা অনিবার্যত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার ব্যাপকতা আরো প্রকট হয়। দীর্ঘ এক শতাব্দী কাল ধরে গ্রামীন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে তৈরি হল সম্পর্কের টানা-পোড়েন। গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে এতদিনকার জাতিভেদ প্রথার মাথার বাড়ি মেরে মানুষ কৌলীণ্য পেলে অর্থ ও শিক্ষাবলে। সৃষ্টি হল নাগরিক উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চাকুরী জীবনরায় এই সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড। এছাড়া গ্রামের জমি-মজুর সম্প্রদায় নাগরিক শিল্প-কারখানার শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হল। গ্রামের চেয়ে শহর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য শহরবাসীর সংখ্যাধিক ঘটাতে থাকলো দ্রুত। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—'প্রথম প্রথম শিফহতেরা চাকুরীস্থলে থাকিতেন, স্ত্রী পরিবারসহ অন্যান্য সকলে গ্রামে বাস করিতেন, দুর্গাপূজা বা অন্য উৎসব

উপলক্ষে তাঁহারা গ্রামে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে অনেকটা পাম্‌চাত্ত্য প্রভাবে শ্রমীর মর্যাদা ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি হওয়ার চাকুরীজীবীরা সম্প্রদায় শহরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গ্রামের সহিত সম্পর্ক কমিতে লাগিল এবং একান্ত্রবর্তী পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। এই দুইটি গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে এবং বিশ শতকের প্রথম হইতে ইহা বাংলার সামাজিক জীবনে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে (আধুনিক যুগ, জেনারেল, আগস্ট ১৯৮১, পৃ-২৫৯-৬০)। শূন্য শিক্ষিত মানুষই নয়, তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষেরাও কুলগত বৃত্তি লোপ পাওয়ার ও কুটির শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার শহরবাসী হলো। গ্রামজীবনও রূপান্তরিত হল অনিবার্যভাবেই। সময় আমাদের জানাচ্ছে এখনও শহর-মুখানতাই প্রোতময়।

গ্রামে জন্মগ্রহণ করে, গ্রামের জল-কাদা-মাটি মনকে সতেজ-সবুজ করে তোলে। তারপর উচ্চ-শিক্ষা তারওপর জীবিকার খাতিরে শহর থেকে গ্রামে ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৈত জীবনে অভ্যাস হতে হয় বাধ্যত। মনোলোকে হানা দেয় গ্রাম। অন্য দিকে শহরের অভ্যাস-সুবিধা-চাকচিক্য মনকে ক্রমশ গ্রামীণতা থেকে দূরেও রেখে দেয়। কেননা গ্রাম শূন্য রোম্যান্টিকতা, রহস্যময়তা, সহজতা নয়, সেখানকার পথ ঘাট রেগ-জ্বালা সেই দূরত্বকে আর কমাতে পারে না সহজে। যদিও এখন ঘরে ঘরে টি. ভি., ইলেক্ট্রিক আলো, দ্রুতগতি গ্রামকে সমৃদ্ধ করেছে। মোটরবাইক, বাস, লরি গ্রামের নির্জনতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রতিনিয়ত। তবু প্রকৃতিগতভাবেই গ্রাম ও শহর ভিন্ন। তবে দু'টি প্রেক্ষাতেই রয়েছে হাহাকার, রয়েছে বিষমতা, রয়েছে বিরহ বেদনা। তারও চেয়ে গভীরে প্রবেশ করলে ছোঁয়া যাবে তার গহনতা। শহরে যে রয়েছে তার আছে গ্রাম ছেড়ে থাকার বস্তুগা ও কাতরতা। আর গ্রামে যারা রয়েছে তারা ঘরের মানুষ দূরে রেখে যুগপৎ গর্বিত ও বেদনাত। দুই ভিন্ন প্রেক্ষার মানুষদুর্দল নিজেদের মতো করে আনন্দে মগ্ন হয়।

গ্রাম বললেই চোখের সামনে পরপর ছবি ফুটে ওঠে শ্যামল-প্রকৃতি, সজল-বিল-খাল-দাঁঘি, খাটো কাপড়ের মানুষ, গোরু-ছাগলের পাল, পাখির ডাক, সকাল-বিকাল লাল-সূর্য দেখা, আর মধ্যে হলোই অন্ধকার। শহর বললেই ঝলমলে আলো, বড় বড় প্যাকারাবা, সিনেমা হল, হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আর...। যদিও মোটা দাগের এই মিল-অমিল দিয়ে গ্রাম-শহরকে সীমান্বিত করা যায় না। দুইয়ের মধ্যে বন্ধনও কম নয়। ১২৬০, জানুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকর'-র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—'নগরের শোভা বৃদ্ধিকরণ মূলক নিয়ম দ্বারা প্রজামন্ডলি কোথায় সুখানুভব করিবক, আমাদিগের ভাগ্যদোষে তাহার বিপরীত হইয়াছে। ধূল্যার নিমিত্ত রাজপথে

গমনাগমন করা যার না, নরদমার প'চা গাশে বিবিধ প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, এদিকে টেক্সের দারে প্রতিদিবস দুঃখি লোকদিগের হাড়ি, কলসি, ক্যাটা, কুলা পৰ্ব'ভ বিক্ৰম হইয়া বাইতেছে' (বিনয় ঘোষ সম্পাদিত— 'সাময়িকপত্র বাংলার সমাজচিত্র, বেক্সল পাবলিশার্স. প্রা-লি. ১৯৬২, পৃ- ১৯৫)। ১৮০৭ এ পৌ'ছেও এই চিত্র কতটাই বা পাণ্টেছে? তবু বর্ত'মানে যদি কেউ শ্বেচ্ছায় গ্রামজীবনের পেশা অবলম্বন করে, তবে তাকে 'বোকা' আখ্যা দিতে এক পলকে সময়ও নেয় না কোনো মান্দুষ।

গ্রাম-শহরের বৈতত্য নিয়েই বাংলার কবিবৃন্দ ভেতরে-বাইরে অবিরাম ষণ্ডেরত। কবিতায় যে গ্রামচিত্র পাই তার স্বরূপগত ভিন্নতাও অনুভবগম্য।

১. শহরে বসে গ্রাম মান্দুষের স্মৃতিময় জীবনচিত্র
২. গ্রামে বসে গ্রাম-মান্দুষের প্রত্যক্ষ জীবনানুভব
৩. শহরে বসে শহুরে মান্দুষের বিভিন্ন ফাঁকে দেখা গ্রাম.

প্রথম দু'টির মধ্যেও রয়েছে বহু-মাত্রিকতা—

- ক. স্মৃতিমেদুরতা-নশ্টাঙ্গজিয়া
- খ. গ্রামের প্রতি উদ্যাস'লিতা দেখে ফোড় ও ব'ণা
- গ. শহরে বসবাসের বাধ্যতার প্রতি সূত'র রোষ
- ঘ. দেশ বিভাগ-জনিত গ্রাম-বিচ্ছিন্নতার ষণ্ডণা
- ঙ. গ্রামের সামগ্রিক জীবনচিত্র
- চ. গ্রামে প্রত্যাবর্ত'নের আকুলতা

বিশ শতকের গোড়াতেই দেশ ষখন সংকটাকুল তখন এক কাক কবিবে পাওয়া গেল, যারা দেশকে, বাংলা ভূমিকে, গ্রামকে আঁকড়ে ধাকতে চেয়েছেন পরম মমতার ও প্রস্থার। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কন্সনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্বগ্রীপসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পরিমল কুমার ঘোষ প্রমুখ। এর পরে পরেই পাছি পল্লীকবি জসমউদ্দীনকে, বাংলার কবি জীবনানন্দকে। আপাতভাবে একটানা এত জনের নাম করলেও এ'দের কবিতার মধ্যে পার্থ'ক্য তো আছেই। সেই বৈচিত্র্য ও ভিন্নতাতেই পল্লীগ্রাম বিকশিত হয় পুরোমাগার। সত্যেন্দ্রনাথ যে বাংলা ও বাঙালীর জগৎগান করেছিলেন 'বসুন্ধরনী' ও 'আমরা' দু'টি বিখ্যাত কবিতায়, সেই বাংলা ও বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিকে প্রতিষ্ঠা দিতে আভির্ভাব্যেই অগ্রণী হলেন এইসব কবিরা। এ'দের কবিতা ও কাব্যের নামগুলিতেই ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামের শৃঙ্খতা ও নষ্টতা।

কন্সনানিধান পল্লী প্রকৃতির প্রেমে বিভোর। তাঁর দৃষ্টি মূখ্য কবির আকুলদৃষ্টি। স্বতীন্দ্রমোহন বাগচী গ্রামকে ভালোবেসেই গ্রামকে আরো

সুন্দর করে তোলেন। তার 'ঐ যে গা-টি' কবিতা-একসময় পাঠকের মধুখে মধু খেঁচিয়েছে—

‘ঐ যে গাটি বাছে দেখা ‘আইরি’-ফেব্রুয়ারি আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কোমলোড়ে,
পূর্বের দিকে আম-কাঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে বাহার তলে রাখাল-বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বপ্ন-পূরী,
ঐখানেতে ফুল আমার গেছে ছুরি!...’

গ্রাম-জননীর শিশু সন্তান কুমুদরজন মল্লিক যথার্থই পল্লীর-নিষ্ঠ প্রেমিক। এই কবি শূন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে নগরমুখী হন। পরবর্তী জীবনে গ্রামেই জীবিকা নির্বাহ করেন। আরো আরো আরো উন্নতির কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি। গ্রামকেই ভালোবেসে। গ্রামের বাইরে শ্বাসকষ্ট হত তার। প্রয়োজনে কলকাতা গেলেও নাকি দু’চারদিন পরই গ্রামে ফিরে শ্বান্তি পেতেন। যে ক’বছর শহরে পড়াশুনা করেছেন সেই সময়কালটি তার কাছে ছিল রামের চোন্দ বছর বনবাসের চেয়েও বেশি কষ্টের তার ‘একটি গ্রাম’, ‘পল্লী’, ‘গ্রামের টান’, ‘আমার বাড়ি’ ‘মাজুমদার’ প্রভৃতি কবিতায় গ্রাম বাংলার কোমল-মধুর চিত্র এই শান্তি ছেড়ে নগরবাসী হতে তার প্রবল অনিচ্ছা।—

‘তোমারে যে আমি ভালবাসিরাছি কাব্য পড়িয়া নহে
নহে কো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।

হয়েছি তোমার সুখ দুঃখ ভাগী

নয় তো নেহাত অভাবের লাগি,

আমার ভক্তি এ অনুরক্তি, বুকের রক্তে বহে।...

আমি নদ’মা মম’রতটে বাঁধিতে চাহি না ঘর

উচ্চ প্রাসাদ অলিঙ্গ হেরি ভীত মোর মধুকর।’ (‘পল্লী’)

গ্রামের অল্প অভাব-অনটন-অসুবিধার মধ্যেও গ্রামকে ভালোবেসে যাওয়ার মধ্যে প্রেমের গভীরতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তার ‘চরে অনেক সহজ শহরে বসে নটালজিক রোমান্টিকতা। তবে প্রথমটিতে যে ভীতি ও শান্তি, দ্বিতীয়টিতে তার বদলে নৈরাশ্য-সংশয়-বিস্তারের সমাহার।

এতক্ষণ পল্লী এবং গ্রাম সমার্থক ধরেই আলোচনা এগোলেও দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পল্লী গ্রাম শব্দটিও ব্যবহার করি আমরা। আসলে পল্লী বলতে বোঝার ক্ষুদ্রগ্রাম বা গ্রামাঞ্চ বা গ্রামাংশ। পাড়া-গাঁ বললে যেমন পাড়া এবং গ্রাম দুইকেই বোঝায়, অর্থাৎ গ্রামের অংশ পাড়া অনেকটা সেই-রকম। পরবর্তী দুই কবি জীবনানন্দ এবং জসীমউদ্দীন-এর কবিতাই এই

ভেদ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। বিংশ শতকের তিনের দশকেই কবিতার গ্রাম আবহা-
হতে থাকে। নাগরিক যন্ত্রণা, যুদ্ধোত্তর ক্রান্তিকাল, আরো একটা যুদ্ধ
শূরুর মন্দ্র নিহিত দামামাধ্বনি, করলাকুঠি, পাশ্চাত্য-মুখীনতা, বাগবৈদম্বা,
কবিতার নির্মাণকাৰ্যে পল্লীগামের সহজতাকে ক্রমশ স্থান করে দেয়। সেই
ইঙ্গিত কালিদাস রায় তাঁর কবিতার অত্যন্ত অসহায়তার সঙ্গে জানিয়ে গেছেন—

‘ধনপতি সাধুর পারের উন্মত্ত দাপট

ভেঙে দিল খুল্লনা মা’র চণ্ডীপূজার ঘট।

ধানদুব্বীর আশ্বিষ গেল, মায়ের হাতের ফোটা.

স্বপ্নমলের প্যাপড়ি ঝরে রইল শূধু বোটা।

যুগের হাওরা বনলে গেল, নির্ভিয়ে নিল ঝড়

বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।

কবির ঘত পুঁজি পাটো বিদায় নিল সবি

তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।’ (‘কবির-বিদায়’)

তবে এর মধ্যে বসেই কবিতা লেখেন জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দীন।
জসীমউদ্দীনের কাব্যের সহজতা ও গভীরতার উদ্দীপন প্রকট। কারণ তিনি
গ্রামের অংশ পল্লী নিয়ে সেখানকার লোকজীবন নিয়ে ভাবিত। সেখানকার
যন্ত্রণা-শোষণ-এবং সংগ্রামও রূপ পায় তার কাব্যে। অন্যদিকে জীবনানন্দের
কবিতায় গ্রাম-বাংলাকে ঘিরে সহজতা রহস্যময়তা-রোমান্টিকতা মিলেমিশে
একাবার। সেই গ্রাম-বাংলার সংকট উপলব্ধি করেই ‘রূপসী বাংলা’র নাম
প্রথমে রেখেছিলেন—‘বাংলার হস্ত নীলিমা’। কিন্তু প্রকারান্তরে সংকট বা
হাসের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠল মৃদু প্রেম। তাই নাম বদল। এই কাব্য
প্রকাশে কবির অনিচ্ছা আমাদের ভাবার,—সত্যি কি কবিতাগুণি সম্পর্কে
অসম্পূর্ণতার বোধ? নাকি বাংলার রূপে মৃদু একান্ত-নিজস্ব প্রেম প্রকাশিত
না করার ইচ্ছে? তুলনার জসীমউদ্দীন নিজের কথা নয় যেন পল্লী-গ্রামের
মানুষের মতোই খসান, তাদের কথা, ভাবান তাদের দিয়েই। কিছুটা যেন
চারপা বা কথকের ভূমিকা তার ‘রাখালী’, ‘ধানক্ষেত’, ‘নকসী কাঁধার মাঠ’
পড়লে সব বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে জসীমউদ্দীন পল্লী কবি অভিধাকে সার্থক করেন
আর জীবনানন্দ ‘রূপসীবাংলা’র কবি হয়ে ওঠেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কবিদের কবিতার গ্রাম-চিত্র, গ্রামজীবনই এই
প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। এই অবস্থানে পৌঁছানোর আগে মধ্যবর্তী সময়ে
বাংলা কবিতায় গ্রাম ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কবির হৃদয় মণ্ডিত
করে। আলোচনার সুবিধার জন্যই মধ্যবর্তী সময়ের সেইসব উচ্চাবততা
পাশে রেখে শেষ দশকের কথুরতা বোকার চেষ্টা করবো। যদিও জানি তাতেও
অনেক ভ্রান্তি, অনেক ত্রুটি, অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। কারণ কিছু

পত্রিকা, এবং কিছু কাব্যগ্রন্থকে ঘিরেই এই লেখা এগোবে। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই এর পূর্ণি।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'স্বাভিন্দ্র' (ফেব্রু ১৯৯৭) পত্রিকাটি উল্টেই মন্ডির ইরম-এর কয়েকটি কবিতা পাই, তারমধ্যে দু'টি দীর্ঘ কবিতা 'নেশা', 'বারমাসী'। পড়েই মনে হয় গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমাতে চাইছেন এই কবি। একদিকে শহরের প্রতি নেশা, সেই নেশা'কেও কবি বল্লিত করেন গ্রামীণ সমগ্র সৎকার প্রবাদ এবং এলোপাথাড়ি জীবনের সারল্যে। পরিবাসা, পরিদ্বান, মাজার, কাড়-ফুক, কুহক, এসবের আবর্তন থেকে কেন্দ্রাতিগ শহরে আনল্যকি নাম্বার ও শহরে নেশার স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়ে আরো বেশি নেশার 'ভৌদ' হয়ে যান ঘরে ফেরার স্বপ্নে। অন্যদিকে বিবিরাম ছুটে চলা—

'...নগরে বরুকের জল, ছুটেছি কেমন তোড়ে, যতোই
আনুক জন—যেতে হয় উজানের জলে। এমন
আগুন বার চোখে মুখে পড়ে, সে কি আর ডর ভর
বুঝে?' (নেশা')

তবু ছোঁা শেষের অবসরে, বা রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে ফিরে বারোমাসের গ্রাম ভিড় জমার চারপাশে। সব ফেলে, ছেড়ে-ছাড়ো মায়ের কাছে গ্রামের মাঝে ফেরার প্রতিজ্ঞাভিত্তে প্রতিটি মাস চলে যায়। শহরে বসে মনে হয়—
'কেমনে ফিরিব আমি আটকে রাখে বোধের সতীন / বেভুলে দিলেছি ধরা ধুতুরা—নেশার / কুলে আছি বোলা রোদে ধান্দার জালে, তার মাঝে হাসফাস যেনো এক উজাইর ফসল' ('বারমাসী')। রোদ-বৃষ্টিতে শেরালের বিয়ে, ধান-গম্ধ মাথা ভোরের আজান, ভাল-পিঠে, নারকেল ভাজার গম্ধ ভরা নবায়ের মাস কবিকে আকুল করে তোলে কিন্তু নিরুপার কাতরোক্তি আহড়ে পড়ে—

...আটকে আছি আমি এক নগরে বাউল,
নিরেছি দু'তারা হাতে কমানান পোকাদের মাঝে। সেই
সব পোকাদের গজিয়েছে পাখা ভুলে গেছে ব্যর্থদের কাল,
ভুলে গেছে কোবার লুকিয়ে আছে আমাদের মূল ;
শুধুই লাফালাফি ধার করে বেনোজলে ভেসে আসা
চকচকে ভুল।...('বারমাসী')।

এই বিপন্নতার মাঝে কবি আরো বিস্মিত হন যখন দেখেন ভুল গম্ধ বেহুশ হয়ে থাকতে থাকতে কুরাশা-ভেজা ভোরের লোভ আর জাগে না মনে। 'বাজে' হয়ে বাওয়ার চড়াও অসহায়তার মুখে পড়া ছাড়া কিছু করার থাকে না তখন প্রতিটি মাস শেষ হয়ে বার গ্রামে ফেরার প্রত্যাশায়। শহুরে

নেশাকে গ্রামে ফেরার নেশার বশ করতে থাকেন তখন অসহায়ভাবে। গ্রামে ফিরতে না পারা এবং ফেরার অত্যধিক আশার বৈতত্যের দীর্ঘ কবিতাটি শেষ হয়—

...‘ক’ করে শেষ হলে ষার ফিরে আসে বিরহ
হিসাব। এতো বেশী ভাসমান কেনো মনে হয়, মনে হয়
ভিনবাসী রাত্তি পদ্রুপ, হারিয়েছি বিষভেজ কুহকী মারায়।
শুধু শুধু আশা দেই নিজেই করি মাফ
শান্তনা দিয়ে। তবু বলি এই লেখা যতোটুকু হোক,
আসবো ফিরে মাগো পাক-সাঁফ হয়ে। যেমন
চলিয়েছিলে তেমন পাবে আরো ওবে কেটে থাক কিছটা
সময়। এমন ওলট-পালট কেনো হয়ে যাই, দোয়া
করো এই রোদে যেমনো ভালো রই।’ (‘বারমাসী’)

জীবিকা, প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজন, আশা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার শহর জীবন বেছে
নেওয়া। কিন্তু কেন এই অনিবার্য অনিচ্ছাবরণ তাও স্পষ্ট এবং স্বজ্ঞ
ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয় কবিতায়। সেইসব কবিতায় অসহায়তা ও বাস্তবতা
মুখোমুখী বলেই নেশা-ঘোর, আবিষ্টতা কম

‘উড়তে উড়তে দুলতে দুলতে
স্টান এসে ছাড়িয়ে গেলাম
ছাড়িয়ে গেলাম মফঃস্বলে
একটা একটা শক্তপোক্ত ভাতের মধ্যে
একটা একটা বিরঙিকর ঝাঁকর হয়ে
মিশে রইলাম সারাজীবন
খুব কমিয়েও সারাজীবন মিশে রইলাম
এখন আমি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেলাম’

(ভ্রমর মৃধা, “সেই ছেলেটা” ‘হাওয়াবাড়ি’ ১৯৯৩)

অথবা, ‘আমার গ্রামদেশে দীর্ঘদিন খরার সংবাদ
আমাকে তাতিলে তোলে

এত কান্না জমে আছে বুকের ভিতরে—

ভাই, আমার দ’হাতে তোর হাত দু’টো রাখ।...

কাল স্বপ্নে সারাক্ষণ জননী, তোমাকে খুঁজছি।’

(নিখিলেশ রায়, “স্বপ্নের জগতে,” ‘কণের মাদুলি’ ১৯৯৭)

গ্রাম জীবনের দারিদ্র, অপ্রাপ্তি, গ্রাম-জীবনের পূর্ণতা, নাগরিক-ঘটনা,
গ্রামে প্রত্যাবর্তনের টান হৃদয়-পারস্পরিকতা ও অসংলগ্নতার কবিতায়

এই সেই শহর কোলকাতা

কান পেতে শোন—

এখানে পাবে স্মরণে কসন্তের বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ।

মৃত্যু এখানে প্রতিবেশী,...

(শ্যামল প্রামাণিক, 'কোলকাতা', 'কখনো আকাশ কখনো মাটি' ১৪০১)

বা, কসন্তের শহর কিংবা এ কলকাতা অবিকল বর্মি

কাভুরে শিশুর মতো ছবির বাজার বসে ঘেন ঘুম পার

কাঁচাঘুম গাঢ়ঘুম ঘুমের কুমারী মূখ টিপের মতন

সবুজ ফসল আর দুধ জরা গাই খায় পুকুরের মাছ...

নিতাই জানা, 'ঘুম', দরগারোড পত্রিকা, ১৯৯৫) ।

রণজিৎ সিংহ তাঁর 'ভাঙতে চাই তোমাকে, কলকাতা' কবিতায় নিদারুণভাবে তুলে ধরেছেন নগরের রূপ ও স্বরূপ । এই নগর কৃত্রিম সমস্ত কিছু শিখরে মানুষের অহংকার কেড়ে নেয় । যে গর্ব ফিরিয়ে দেওয়া মেকী সভ্যতার সাধ্যাতীত । আকাশজোড়া কাকের কা-কা ধ্বনি নগরের শূণ্যতা ও হাহাকারকে সঞ্চারিত করে দেয় জীবন ধাপনে ।

'তুমি উজাড় করে আন লক্ষ লক্ষ গ্রাম । সমস্ত দেশ

হুমড়ি খেয়ে পড়ে তোমার রাস্তায় । তোমার আবর্জনা থেকে

খুঁটে নেয় বাঁচা । তোমার ধুলোকাদা থেকে চেটে নেয় বাঁচা ।

অবিশ্বাস্য বাঁচা । বাঁচার ধূমে লাগে তোমার রাস্তায়

রাস্তায় । দেখো, মানবশিশু কেমন সদর্পে ঢাকা

গড়াতে গড়াতে ছুটে চলেছে নদীর আকাশে'

(কাব্য : 'একান্ত বাস্তব', ১৯৯৪) ।

তিনি কলকাতার আদি গ্রাম, জল-জল নদীময় রূপ ও তার স্বল্পসংস্কৃতির মাঝখানে ফিরতে চান ।

গ্রাম-শহরের নামজন্মা প্রচেষ্টার যাদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয় তাঁদের কাছে অসহায়তার ফাঁক ফোকর গলে ব্যঙ্গ উঁকি দিয়ে সাক্ষাৎ করে যায় । কবিতার সেই কষাঘাত নেমে আসে প্রবলভাবে । নিজেকেই ব্যঙ্গ করে শোধ না নিয়ে এ পৃথিবীর স্বপ্ন শোধ হবে না যেন । কিছুটা ভূপ্ত ও পাওয়া যায় নিজেকে উন্মোচনের আলোর । বস্তুগত ভেতরের এই আনন্দই পরম পাওয়া ।

'এবারে ফসল ভালো, মাঠে মাঠে দুর্ভেদ্য সবুজ

গড়ে তোলা শেষ, রষা শেষ, দিঘিপুকুরের

জরায়োবনের প্রতি বন্ধুকে পড়া প্রেমিক গাছেরা

ওরাও আমাকে দেখছে বারান্দার বেতের চেঁচারে

কে ওই অসুস্থ

নদীবাংলার পাশে নির্নির্মেয় বসে আছে
যেন ওরও একদিন এর সাথে সম্পর্ক ছিল'

(প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, "নদীবাংলার কবিতা", 'উন্মেষ গোষ্ঠী' ১৯৯৬)

গ্রামের সম্পদে পরিপূর্ণ মানুষকেই এ কবি অনুসরণ যোগ্য মনে করেন। এ কাব্যের "পলাতক" কবিতার তাই রমানাথ নামের মানুষটিকে বোঝার প্রয়াস, যে বড়কত্তার দেওয়া উপহার ট্রানজিস্টার সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নিজের দেশের ঢাকের শব্দের গর্বে।

অন্যবৃষ্টিতে শহরে বসেও মেঘ ও বৃষ্টির প্রার্থনার গ্রামকেই সমৃদ্ধ দেখার আকাংক্ষা। বৃষ্টি হলে শাকভুলুনি বৃড়ি শাকপাতা খুঁজে পাবে। নদীর ঘাটে খুড়োরা আসর জমিয়ে গল্প করবে, বলদজুড়ে চাষী মাঠে যাবে, অভাবী মানুষগুলি গল্প করবে মৃদুখোমুখি বসে। অন্নপূর্ণা মাকে আবাহন করবে তো গ্রামের মানুষগুলিই। কিন্তু বহুদিন গ্রাম ছেড়ে থাকা মানুষের দূরত্ব অথবা শহরসম্পৃক্ত মানুষের সম্পর্কেও গ্রাম মানুষদের দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা স্বাভাবিক। 'হাউ বিউটিফুল' গ্রামবিলাসী মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ থাকলেও আভ্যন্তরিকতা সেখানে অসম্ভব। এই বাস্তবতাকেই পিনাকী ঠাকুর তাঁর 'পটে লিখা' কবিতায় উন্মোচিত করেছেন—

'এ-ই গ্রাম। হে ভারত। বহু আমার। ওই তো চাকের দোকান।
গল্প চিড়ের খাজা একটা টাই করবে?...আহা থাক।
নতুন মানুষকে এরা হাজার কোচেন করে। রাগ করতে নেই।

ফেরার লোকাল? সেই বিকেল পাঁচটা দশে। জানো, জানো আমি
সাতবছর (নারিক ছর) বরস অবধি এই গ্রামেই থাকতাম।
রিটারার কপ্পে ঠিক ফিরে আসবো।—দেখা যাবে!—ফিরবোই।
বেথানে

এখনও মরাই দেওয়া। মা-মা ঘ্রাণ। ভীট ফুল ফোটার পরেই
গন্ধে নেমে আসে প্যাঁচা...ধ'রে নাও, শাদা লক্ষ্মীপ্যাঁচা...
(টিউবওয়েলের জলে আসে'নিক, থাক থাক, কাগজও পড়ো না?)

তোমার ক্রিটিক ডাখ পান করছে গোপাল ঘোষের আঁকা গ্রাম।
(কাব্য: 'আমরা রইলাম', ১৯০৪)

ভেতরে বাইরে গ্রাম কতটুকুই বা পাগেটেছে? সেইসব গ্রাম ছাড়তে যারা
বাধ্য হয়েছিলেন দেশ ভাগের পরিণামে, তাঁদের বশ্তনার তীব্রতা অননুমোদন।
তাই স্বপ্নময় হলে ওঠে গ্রাম-দেশ, সেই স্বপ্নময় জন্মভূমি ছবির মতো
কবিতার উঠে আসে—

‘তোমাদের ধোবাউড়া এখনও আগের মত গ্রাম

সেই যে একটি চারা রোপেছিলে মাঠে,—

সোনালি ধানের গ্রাম, সোনালি আশের—

তোমাদের ধোবাউড়া

বাঁশঝাড়ের ভেতের ভরে সম্ভার ঘুমিয়ে পড়ে—

তোমাদের বাড়ি, তোমার পিতার, পিতামহ, প্রপিতামহের বাড়ি
যাখে সুরজন?’

(তসলিমা নাসরিন, “বাড়ি বাবে সুরজন”

‘বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ডেলা’ ১৯৯০)

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার ব্যর্থ গ্রামের পথ রুদ্ধ করে রাখে। গ্রামের বিরুদ্ধে অভাবনীয় অভিযোগ তাই আছড়ে পড়ে। গ্রামগুলি তার সন্তানদের অনেক কিছু দিতে না পারার জন্যই মা-কে ছেড়ে যেতে হয়। অথচ ছেড়ে থাকার দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগও পাওয়া যায় না। গ্রামও মন্থ ফিরিয়ে নেয় শহুরে গণ্ডভরা মানবগুলির বিপরীতে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। শৃঙ্খলেশার ধোরে নয়, পরিস্থিতির চাপে পড়েই গ্রামভূমি ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু একবার বেরিয়ে গেলেই ফিটমানী গ্রাম অনাওয়ার ভার সম্পর্ক পাতাল। কবিকে বন্ধ দরজার মাথা কুটে ঘরে ঢোকার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাতে হয়। চিরচেনা ঘর-দুয়ার দূরে সরে যায়। তবুও দরজা না খুললে নিজের অসহায়তার কারণগুলি খাড়া ঘরে আবদ্ধ কপাটে।—

‘গিরেছিলাম গোলামির বাজারে। গিরেছিলাম? নাকি
তোমরাই, ওগো পিতৃপুরুষ, ওগো গুরুমশাই, তোমরাই
ঠেলে দিয়েছিলে, বেজার লোভটোভ দেখিয়ে ভাজিয়ে-ভাজিয়ে
পাঠিয়েছিলে।...তারপর লড়ে গিরেছি।...বাজারের
বিস্ময় করেছি কয়ারস্তু।...’

...আজ ভিখারির দশার এসেছি। দরজার দাঁড়িয়েছি। আমাকে
ফিরিও না। আমার দিকে তাকাও, দেখো, দিকু নই,
আমি ঘরেরই ছেলে।’

(রঞ্জিত সিংহ, “আমি ঘরেরই ছেলে”, ‘একান্ত ব্যাচান’ ১৯৯৪)।

ধানের ক্ষেত, জলের শব্দ, পাখির ডাক, মানুষের মন এতসবের টানেই
গ্রামে প্রত্যাবর্তন। মেঠোপথে কেউ লাঙল খামিরে কুশল জিজ্ঞাসা করে, কেউ
রোগগ্রস্ত চোঁহারার সুবিধে-অসুবিধের কথা শুনতে চায়। মানুষের অন্তর কথা
কললে শহর দূরে সরে দাঁড়ায়—

‘ধূলোপথ কমে আসে, উৎসুক কৌতূহলী চোখ
দুই ধারে শহরের অকজা ও মলিনতাগুলি
মুছে যেতে থাকে
প্রণাম তোমাকে গ্রাম দেশ’

(নিখিলেশ রায়, “গ্রামদেশ”, ‘কর্ণের মাদুর্লি’ ১৯৯৭)।

শুধু বড় ঘর নয় সীমাহীন আকাশের জনাই গ্রামে ফেরার টান। এত
অসম্ভাব্যতা, এত গ্রানি, এত দারিদ্র সবেও গ্রামজীবনের অন্তর্গত ঐশ্বর্যেরই
সম্মুখি এই টানকে আরো তীব্র ও নিবিড় করে তোলে। শুধু নিজে ফেরা
নয়, পরবর্তী প্রজন্মকেও এই স্বচ্ছ সুন্দর জীবনে পৌঁছে দেওয়ার তৃপ্তিই পরম
আকাশকার ধন মনে হয়।

‘স্বতটা রোদের মধ্যে ছেলেবেলা কাটিয়েছি
সম্ভবত ততটাই রোদ এসে আমার ছেলেকে নিয়ে যাবে...
...দুর্বোধ্য পাখির ডাকে আমার ছেলের চোখে ঘুম নেই
তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বগলে চাটাই নিয়ে বর্ণপরিচর
মানে এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার শেষ হলে—
বিকলে মাঠের দিকে ছুড়ে যাবে তারবেগে
মাঠ থেকে ঘরে ফিরবে মাঠের অসম্ভাব্যতা নিয়ে
এতখানি স্বাভাবিকভাবে তাকে ফিরে পেলে
আমার স্ত্রীর সাথে সেরে নেব অস্পষ্টত্ব সাংসারিক কথা
তারপর একদিন বানপ্রস্থে যাব।’

(তন্ময় মৃধা, “হাবি”, ‘হাওয়ার্ডি’, ১৯৯৬)।

অথবা,

‘গ্রামভলার কসে লোকটা ঘরবাড়ির চারপাশ দেখাছিল
বর্ষার জল পেয়ে ক্রমেন লকলকিয়ে উঠেছে শশা গাছটা
বুনো প্রজাপতি লতাপাতার উড়ে উড়ে বসছে...
...লোকটা ফাঁড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছে
যে সন্তান আসছে তার নাম রাখবে ফাঁড়ি
মা ও মারির বৃকে উড়ে বেড়াবে এমনি ভাবে।’

(‘ফাঁড়ি’, সুরত রাহা, দরগারোড, ১৯৯৫)।

গ্রাম ছেড়ে যে সমস্ত মানুষ সত্যি সত্যিই দিকু হয়ে পড়েছে তারা ‘ঘরেও
নহে পারেও নহে’ তার চেয়েও কঠিন সত্য হল তারা মাঝখানেও নেই
ঠিকমতো। যে গ্রামে ফেরার আকুলতা সেই গ্রামও আর নেই আগের মতো।
তাই যেখানে ফিরতে চাওয়া সেই গ্রামের তল্লাস করতে হবে আগে। সেই
হাঙ্গিরে বাওয়া গ্রাম এখনকার গ্রামবাসীরাও চাইবে কেন? উন্নয়ন সেখানেও

হাত না বাড়িয়ে পারেনি। তাই যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সেখানে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। আর এই অসম্ভাবনাকে ঘিরেই এত টানাপোড়েন কবিতার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কার্তিক ঘোষের সঙ্গে গলা মেলাতে কোনো অস্বীকৃতিতে তাই আর থাকে না কোথাও—

...‘এখন আমার শহরে বাস, ঠাণ্ডা আঁপিস—
জীবন থেকে মাঠ-নদী ফুল সবই হাঁপিস !
নাম ছাপা হয় বিজ্ঞাপনে, মস্ত হরফ—
বাড়িতে ফোন, রঙিন টিভি, ক্রিজের বরফ !

এই ছেলেটা, ভেলভেলেটা—শোন না এবার,
তোর কাঁ মনে ইচ্ছে আছে এসব নেবার ?
নে তবে তুই বাকসো বাড়ি, সখের বালাই—
আমি বরং মায়ের কাছে গ্রামেই পালাই।

(‘আমি বরং’, সংবাদ প্রতিদিন, রবিবারের প্রতিদিন, ৩০ জুলাই, ২০০০
এই টানা-পোড়েনকে টুক করে গিলে ফেলে জীবনের প্রবহমানতার এঁগিয়ে
না গিয়ে কি উপায় আছে ? □

‘কবিতার কাগজ’ আপনার আন্তরিক সাহায্যের প্রত্যাশী।

ভালো গদ্য-পদ্য দিয়ে
আপনার প্রিয় এই পুরুষ পত্রিকাকে
বাঁচান। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও
দেখতে দেখতে তার বয়স হ’ল ছাব্বিশ বছর !
১০০০ টাকা দিয়ে আজীবন গ্রাহক হোন।

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস : সূচনাপর্ব

ইরব'ন বসুরায়

খগেন সেন সম্পাদিত রমেশাল পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' সম্পর্কে আলোচনা স্মৃতিগ্রা দেবী ছন্দনায়ে লেখা, বাচ্চাদের জন্য মৌচাকে লেখা 'আলো হাতে'—এইসব হাত মক্শোর লেখা পেরিয়ে এসে মহাশ্বেতা লিখলেন 'ঝাঁসির রাণী'। এটি উপন্যাস নয়, লক্ষ্মীবাঈ-র জীবনী লেখাই ছিল রচয়িতার উদ্দেশ্য, তাই মহাশ্বেতার উপন্যাসের আলোচনার এই লেখাটির প্রসঙ্গ না-আনাই হয়ত সংগত। তবে এখান থেকে তাঁর সাহিত্যিক প্রবণতার একটি ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। কোনো লেখকের জীবনে পর্বান্তর স্বাভাবিক, কিন্তু পর্বান্তর মানেই সম্পূর্ণ ভিন্নপথে যাত্রা কিনা, তার বিচার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনে রাখতে হয় পর্বান্তর হঠাৎ হয় না, তার প্রস্তুতি থেকে যায় আগে থেকেই। 'হাজার চুরাশির মা' বিষয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির স্বাভাবিক্য এবং দৃষ্টান্তসাহসে, লেখকের দায়িত্ববোধের ঐকান্তিক্যে স্মরণীয়, কিন্তু সেখানে যে ধরনের আবেগ কাজ করে, তা খুব নতুন কিছু নয়। 'অরণ্যের অধিকার' বরং নতুন এক পর্বের শুরুর। অনতি-অতীত ইতিহাস থেকে আদিবাসী জনজীবনের সংগ্রামের যে-ইতিকথা আর যে নায়ককে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মহাশ্বেতা, তারই প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতায় একদিকে রচিত হয় 'অপারেশন বলাই টুই', অন্যদিকে 'মাস্টার সাব', চোটি মুনডা থেকে টেরোডাকটিল...ইত্যাদি। একে যদি পালাবদল বলা যায়, তাহলে দেখা যাবে 'তার প্রস্তুতি ছিল আগেই—বন্দ্যযুগী গার্গ্য বা 'অধারমানিক'-এ। আবার বজ্র ছিল হয়ত আরো আগে। কী লিখেছেন মহাশ্বেতা আগে—সেই বিচারের ক্ষেত্রে উপন্যাস না হলেও 'ঝাঁসির রাণী' গুরুত্বপূর্ণ।

'ঝাঁসির রাণী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬তে, তার আগে ধারাবাহিকভাবে লেখাটি বেরিয়েছিল সাময়িকপত্রে, কাজ শুরুর আগে উপাদান সংগ্রহ হয়েছিল ১৯৫২-১৯৫৪তে। 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর শতবার্ষিকীর প্রাক-লগ্ন এ-রচনার একটা উপলক্ষ্য হয়ত, কিন্তু মহাশ্বেতা মনে করিয়ে দিয়েছেন ছেলেবেলাতেই দিদিমার মধ্যে শোনা 'ঝাঁসির রাণী'-র গল্প এক রূপকথার মতো ছড়িয়েছিল। সেই শৈশবমুহুর্তির রূপকথা থেকে এই গ্রন্থ অনেকটাই দূরে, কিন্তু বোঝা যায় প্রথমদিকের বড়ো মাপের এই রচনাতেই মহাশ্বেতা চেয়েছিলেন এমন-এক নায়িকাকে,

যিনি জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর যার ইতিহাস লড়াই-এর ইতিহাস। অনেক পরে যখন তিনি নায়ক করে তুলবেন বিরসা মৃণ্ডাকে বা জগদীশ মাণ্ডারকে, তখন তিনি সাধারণ মানুষের লড়াইকে আর তার নামককে যে মর্যাদা দিতে চান, তারই একটা দূর আভাস যেন থেকে যায় ‘ঋসির রাণী’তে। ইতিহাস-রচনা নয়, লক্ষ্মীবাই-র জীবনী লেখাই এখানে উদ্দেশ্য, তাই ব্যক্তিই এই রচনার মূখ্য, কিন্তু লক্ষ্মীবাই-র জীবনীতো কোনোমতেই ইতিহাসবিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনাবলীর পৃথানুপৃথক যেমন এখানে ব্যবহৃত, তেমনি নানাঙ্গনের স্মৃতিকথা থেকে আহরিত তথ্য দিয়ে লক্ষ্মীবাই-র মানবিক রূপটি গড়ে তোলার চেষ্টাও হয়েছে—পরবর্তীকালে এই ভাবে ইতিহাসের তথ্য আর মানবিক প্রতিমা মিলে যাবে ‘অরণ্যের অধিকার’-এ, বিরসার চরিত্রে। আবার ‘ঋসির রাণী’-র শুরুর্তে নরীস তথ্যের বদলে পাওয়া যায় বৃন্দেলখন্ডের অতিদরিদ্র কিষাণ আর দিনমজুরদের কথা, কাঠকুটো আর শুকনো পাতা খুঁটালিরে যারা মাঘের শীত তাড়ায়, তাদের লৌকিক বিশ্বাসে ‘ঋসির রাণী’ আত্মা বেঁচে আছেন। এইভাবে উপকথা জড়িয়ে এ-রচনা শুরুর হয়, উপন্যাসের ধরণেই যেন।

‘ঋসির রাণী’-র অল্প কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয় ‘নটী’। সেই একই সময় এ-রচনার ধরা পড়ে, তবে ‘নটী’ ইতিহাস নয়, উপন্যাস। এ-রচনাতেও লক্ষ্মীবাই আছেন—কিন্তু এ হলো মোতি আর খুদাবক্সের কাহিনী। ১৮৩৭-এ গোয়াল্লিরে তানসেনের উরুসের আনন্দমুখর পরিবেশে এ-কাহিনীর শুরুর, এক বিবাদাচ্ছন্ন ঘটনার। মোতির মা রোশন, এক প্রেমের জন্য রজাঙ্গ-হরে যাওয়া নারী, তার মৃত্যু হয় শুরুর্তেই, মোতির বয়স তখন দু-বছর। উপন্যাস শেষ হয় ঋসির রজাঙ্গ প্রাপ্তিরে। মোতিকে তার মায়ের মতোই নটী হতে হয়। ঋসির রাজ দরবারের নত’কা। খুদাবক্সের পুত্রপুত্র ছিল পাঠান বোম্বা, তারপর কিষাণ। তার বাবা আনোরার ফৌজ থেকে পালিত্রোহিত বলে শর্ত-পত্রের নামনেই তাকে গুলি করে মারে ব্রিটিশ অফিসার। খুদাবক্সের স্মৃতিতে থেকে যায় সেই মৃত্যু আর বাপের ‘বদলা নেওয়ার’ নির্দেশ। ঋসিতে দেখা হলো দুজনের—রাজদরবারের নত’কা আর সৈনিক খুদাবক্সের। এই দুটি চরিত্রের প্রেম হয়ে উঠতে পারত বামদলি এক গল্পের উপাদান—কিন্তু এখানে কিছুটা পুরনো ছকই কাজ করে—রাজনত’কার সঙ্গে সৈনিকের ভালো-বাসার রাজার হুকুমটি, আবার খুদাবক্সের শত্রুভানুধ্যায়ী ঘোড়ার ভংকঠা, খুদাবক্সকে বঁচানোর জন্য মোতির কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, মোতির আত্মত্যাগ, খুদাবক্সের ভুল-বোঝা—এসবই প্রেমের কাহিনীতে বহু-ব্যবহৃত। তবে ‘নটী’ অন্যরকম হয়ে ওঠে, তার কারণ এর পরিবেশ এবং মহাশ্বেতার সমাজ ও ইতিহাসবোধ; অক্ষাই সে-বোধ পরবর্তীকালের মতো

অত তাঁর নর। মোতির মা এক সামন্ত-নবাবের সামরিক বিলাসের শিল্প, তার প্রেম কোনো মাথকতা পায় নি। সেই সামন্ত পরিবেশ থেকে মোতি বেরোতে পারে নি। অন্যদিকে খুদাবক্সকে জ্ঞানতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চেহারা। এই দুটি পটভূমি এই প্রেমকাহিনীকে স্বতন্ত্র করে তোলে। খুদাবক্স যখন মোতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন সেই বিচ্ছেদকে সে অনেক-বড়ো পটভূমিতে দেখতে পায়। গোটা উত্তরভারত জুড়ে তখন বিদ্রোহের রণধ্বনি, চাপাটি আর রক্তক্ষয় পেঁছে যাচ্ছে লড়াই-এর সংকেত। সেই লড়াই-লড়াই-এ শেষপর্বে ঝাঁপিতে ফিরে আসে খুদাবক্স, মোতির সঙ্গে তার পুনর্মিলন হয় খুবই স্বপ্নদ্রাবী—কাসির উপর তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রিটিশ ফৌজ। সেই-এ মোতি এসে দাঁড়ায় খুদাবক্সের পাশে, ব্যক্তির প্রেম মিলে বার দেশের প্রতি ভালোবাসার। খুদাবক্সের মৃত্যুর পর লড়াই-এর দাবি তুলে নেয় মোতি, শেষ পর্বন্ত তারও মৃত্যু ঘটে—এখানে বাড়তি আবেগ হরত খানিকটা ডাবালুতার দিকেও সরে যায়। কিন্তু ব্যক্তিগতদের টানা পোড়েন ছাড়িয়ে একটা বড়ো আদর্শের সঙ্গে তা যুক্ত হয়ে যেতে পারে বলেই, সেই বাড়তি আবেগ উপন্যাসকে গুরুত্ব দেয়। আর এই কারণেই উপন্যাসের নাম ‘নটী’ হওয়া সত্ত্বেও, নাচ মোতির পরিচয়কেই তুলে ধরে শুধু—এই শিল্পে মোতির ব্যক্তিগত আশ্রয়ও ততো নয়, কেননা সে সামন্তনা খুজছে গানে—ফলে এ উপন্যাসে শিল্প কোনো সমস্যাও নয়, সমাধানও নয়।

এর কিছুদিন পরে রচিত ‘মধুরে মধুর’ উপন্যাসে কিন্তু নৃত্য শিল্পীদেরই পাই আমরা। এর প্রেক্ষাপট আধুনিক সময়—এ উপন্যাস শিল্পের সমস্যা ঘিরেই আর্ষিত। ফলে এই রচনার পরিধি একটু গুটিয়ে আসে। ‘মধুরে মধুর’ উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই স্লাম্যান, তবু তারা জীবনের একটিমাত্র অংশকেই ছুঁতে চায়। এই উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শগত, সে আদর্শ শিল্পের। এই আদর্শের জন্য শিল্পের জন্য চরিত্রগুলি ছুটে বেড়িয়েছে। এ-উপন্যাসে প্রেম আছে, একটি পুরুষকে ঘিরে দুটি নারীর হ্রস্ববাসনা আর্ষিত হয়েছিল, যদিও সেই দুটি ভালোবাসার মধ্যে কোনো সংঘাত নেই; এখানে অনেক বড়ো জারগা পেয়েছে শিল্পের প্রতি ভালোবাসা। সাধন, রাধা ও বৃন্দা, এই চরিত্রগুলি এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও ভিন্ন। চট্টগ্রাম সাধনের জন্মভূমি, রাধা বাঙালি হলেও চিরদিন বাইরে প্রতিপালিত, মধ্যভারতের এক দেশীয় রাজ্যের কুমারবাহাদুরের কন্যা বৃন্দা আশৈশব রুরোপে কাটিয়েছে। সাধন তার পাঠের কারুকারি বাবা ও মারের ঘর ছেড়ে বারবার পালিয়েছে রাধা বাবাকে খুব কাছে না পেলেও মা-বাবার স্নেহ পেয়েছে প্রচুর, আর বৃন্দা বাবার স্নেহ পায় নি। মাকে গ্রন্থা করতে পারে নি। এই বিপরীত পরিবেশ ও সামাজিক

স্তর থেকে আসা মানুষগুলির মানসিকতাও আলাদা হওয়ারই কথা—তবু তারা একজায়গায় মিলতে পারে, অন্য নানাবিধ সমস্যা থাকলেও এই বৈপরীত্যগুলো তাদের মধ্যে কোনো সংকট তৈরি করে না ; এই ব্যাপারটিকে একটু অস্বাভাবিক মনে হতে পারে । এখানে মহাশ্বেতা একটিই স্বীকৃতি তৈরি করেন, এরা সকলেই ভালোবাসে শিল্পকে ; সে-ভালোবাসা শিল্পকে ছাড়িয়ে শিল্পীকেও ছুঁয়েছে—কিন্তু এ-উপন্যাসে তার গুরুত্ব কম । সাধন ছোটোবেলা থেকেই ঘুরে বেড়িয়েছে, ভরার নৌকার সঙ্গে, বেদেরের সঙ্গে সনাতন দাশের আখড়ার, কণ্ঠমণির আশ্রমে, রাজপুত্রনার বাজারাদের সঙ্গে—সব জায়গার অভিজ্ঞতা তাকে করে তুলেছে এক খাঁটি শিল্পী—নাচকেই সে করে তুলেছে জীবনের একমাত্র সার্থকতা । বৃন্দাও নৃত্যশিল্পী কিন্তু এই ‘জুবে-গাওয়া’টা তার মধ্যে ছিল না এটা সে শিখেছে সাধনকে দেখেই । বাইরের নানা ধাক্কা ছিল ঠিকই তবুও বৃন্দার শেষ পর্যন্ত দূরে সরে যাওয়ার একটা কারণ বোধহয় এই যে সাধনের মতো বৃন্দা শিল্পের মধ্যে ওরকম জুবে যেতে পারে নি । অন্যদিকে একবার সরে গিয়েও রাখা যে আবার সাধনকে নিয়ে নতুন করে নাচের সাধনা করতে পারে তার কারণ সেও শিল্পকে এমনি মযাদা দিতে পেরেছে । সে সাধনকে ভালোবাসে তবু প্রয়োজন হলে সাধনকে বাদ দিয়েই গ্রুপ খোলার কথা ভাবতে পারে । ‘মধুরে মধুর’ শিল্পের জন্য এই জীবন উৎসর্গ করার কাহিনী । তবু দু-একটা সংশয় থেকে যায় : উপন্যাসের নিবেদন অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছিল এই পণ্ডিতগুণি “মাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি । এখনো মাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় । মহৎ সত্য বা স্বাতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা”—তার মহাশ্বেতা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন “অভূতবোধই সকল শিল্পীর প্রেরণার উৎস । যে-সব সাংস্কৃতিক কর্মী বাধাবন্ধ ঠেলে শিল্প দৃষ্টির চোখটা করছেন, তাদের সেই মহান পিপাসাই এই উপন্যাসের উপজীব্য :” শিল্পের জন্য এই পিপাসা আর অভূত সত্যও মনে হয় এখানে যেন শিল্প ছাড়িয়ে উঠতে চাইছে জীবনকে । যে-বিশুদ্ধতা আর চড়াও সিঁধিতে শিল্পকে নিয়ে যেতে চেয়েছে সাধন তার অসুস্থতা বা মৃত্যু নিয়ে আপ্যস্ত নেই—কিন্তু এ যেন এক একমুখী দৌড় আর সে দৌড়ে বারোবারে ফুলে যাওয়া হয় জীবনের আর-সব বৈচিত্র্য ও বহুস্তর-সম্মিলিত বিন্যাসকে বশ্বকে, সংকটকে । এমনকী যে সাধারণ উপাদানগুলি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন, তার অভাব যেন ছাড়া ফেলতে না পারে তাই এখানে অর্থ কোনো সমস্যা নয় বৃন্দা বা রাখা দুজনেই প্রচুর অর্থের মালিক । অর্থী শিল্প এখানে শুধু শিল্পীর মানসিক সাধনা, জীবনের অন্যবিধ বশ্বগুলি তাকে ছোঁয় না । হরত সে-কারণেই এই উপন্যাসেও সাধনকে মরতে হয়, সেই ভাবালুতার অন্য প্রগ চাপা পড়ে যায় ।

এর কিছুকাল পরে প্রায় একইসময়ে লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রেমতারা’, ‘এতটুকু আশা’ ও ‘তিমির লগন’। ‘মধুরে মধুর’ যেমন নৃত্যশিল্পীদের জীবনকথা, সেই বৈচিত্র্য কিছুটা থেকে যায় ‘প্রেমতারা’ ও ‘এতটুকু আশা’তে। ‘প্রেমতারা’-র ‘নারক-নারিকা’ সার্কাসের শিল্পী। পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়ে প্রেমতারাকে তার বাবা সার্কাসে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর জর পেতে পেতে আর নানাজনকে বয়সের দাম চুকিয়ে দিতে দিতে নানা সার্কাস ঘুরে প্রেমতারা পৌঁছয় গ্রেট জুবিলি সার্কাসে—এখানে সে তারের উপর নাচে, দড়ির দোলায় ঝাঁপ দেয়, বাঘের মূখে মাথা গুঁজে দেয়। আর বাঘ সিংহের স্বয়ং করার জন্য চাকরের কাজে বহাল হয়েছিল মনোহর। মালিক তাকে খেলোয়াড় হতে দিতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তাকে খেলোয়াড় করতে হয়। আর কনট্রাক্ট সই করতে গিয়ে মনোহর জানল এখানে জীবনের কোনো দামই নেই। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মোনাকাত, কিন্তু তার দায়িত্ব তার নিজেরই। এ-উপন্যাসে শিল্পের সমস্যা আছে, সে সমস্যা কিন্তু জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। শিল্প এখানে সাধনা, নেশা, জীবনের সাধকতা আবার জীবিকার উপায়ও। এরই মাঝে প্রেম, ভালোবাসার উচ্চারণ। নানা জটিলতার সেই ভালোবাসা আত্মতা ও বিক্ষত। সার্কাসের মেয়ে তো চিরদিনই মালিকের ভোগ্য—কাজেই প্রেমতারাকে জোর করেই ভোগ করে মালিক। মনোহর, প্রেমতারা, মালিক গোপী, এর সঙ্গে মনোহরের ট্রেনিং দেওয়া বাঘ বাদশা—মানুষ আর পশুর নানা আকর্ষণে-বিকর্ষণে সার্কাসের এরিনার পিছনের জনং আলোড়িত হতে থাকে। কিন্তু বাঘের আক্রমণে মনোহর পত্ন হয়ে যায়, চাকরি বজায় রাখার জন্য তখন নিরুপায় হয়ে তাকে মালিকের সব কিছু মানতে হয়। গোপীর জাস্তব মালিকি দাবি, প্রেমতারার নিরুপায় আত্মসমর্পণ, মনোহরের করুণা কুড়ানোর মতো মেনে-নেওয়া—সম্পর্কগুণ্ডোর মধ্যে ছায়া পড়ে তাই। স্কোভ, হতাশা পরিণত হয় পরস্পরের প্রতি আক্রমণে—ভালোবাসার মধ্যে এসে যায় অপমান আর বশুণা। এই উপন্যাসের চরিত্র-গুণি মধ্যশ্রেণীভুক্ত ভদ্রগোক নয়, তাই তাদের প্রবৃত্তি এবং তার প্রকাশে কোনো পালিশ নেই। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে করতে তারা জেনে যায় জীবনের রুঢ় লড়াইকে, শোভন ও মার্জিত ভঙ্গি আরম্ভ করার সময় তাদের থাকে না। ‘প্রেমতারা’ উপন্যাসে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ-গুণির জীবন ও তার আশা-আকাংক্ষার টানই বড়ো ব্যাপার। প্রেমতারা ও মনোহর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাদের ভালোবাসার মান-অভিমানের সূক্ষ্মতার থেকে বেশি তাঁর প্যাশনই। আর এদের জীবন ব্যক্তিগত হলেও, তা এক যৌথ জীবনের অংশ। সেই ক্রিয়াট সৌকর্য্যবন থেকে সরে থাকা যায় না। এদের জীবনের স্বার্থ হলো—একদিকে সার্কাসের এরিনার তাঁর আকর্ষণ,

অন্যদিকে ঘরগেরস্থালির আকাংক্ষা। সার্কাস ছাড়ার কথা তারা ভাবতে পারে না, যখন ছাড়তে হয়, তখনো কিন্তু তারা বাঁচার চেষ্টাই করে, যেমন সার্কাস থেকে বিভাঙিত লালুবাবু আত্মহত্যা করে না, বরং মদ ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে দোকান চালায়। প্রেমতারার শরীর ভাঙে, খেলা পড়ে যায়, শেষ পর্যন্ত ধোবাবস্তির অশ্বকারে বাসা বাঁধে সে; মদ, জুরার আড্ডা থেকে জীবিতার ব্যবস্থা করে—পূরনো জীবন ছেড়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে। এ-উপন্যাসে প্রেম আছে, কিন্তু তা কোনো বাস্তবীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি নয়, তা বাঁচার অবলম্বন।

পাশাপাশি ‘এতটুকু আশা’ উপন্যাসের চরিত্রগুলিও মেহনতি মানুষ—কিন্তু তারা বয়ে বেড়ায় নিম্নমধ্যবিত্তের স্বপ্ন, তাদের মধ্যে কাজ করে মধ্য-শ্রেণীগত চেতনা। তাই মোটর মেকানিক বলাই হতে চার ট্যান্ডিমালিক, এক সময় স্বর্ধীরের মধ্যে এসে যায় কারখানার মালিকখুলভ মনোভাব। এইখানে একটা বন্দ্ব তৈরি হয়, শ্রমিক-অবস্থানের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীগত চেতনার। কিন্তু এই বন্দ্বটা তেমন গুরুত্ব পায় না, নিছক ঘটনা হয়েই থাকে—বরং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই বেশি প্রাধান্য পায়। নারীপুরুষের সম্পর্ক ব্যাপারে ভুল ধারণার জেরে বিতর্কবার বিয়ে করেও স্বধীর তার কিত্তির শ্রী বিজলীকে ভালোবাসতে চার না, শুধু টাকাপয়সা দিয়ে কতব্য করে যায়, আর বলাই কতগুলো পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণার স্বধীরের প্রথম শ্রী শান্তিলতার সঙ্গে তুলনা করে বিজলীকে অসম্মান করে। বস্তুত এই সমস্যা একেবারেই ব্যক্তিক স্তরের—এর সমাধান ব্যক্তিক স্তরেই—তা নিয়ে কোনো উপন্যাসের বড়ো সত্য তৈরি করা যায় না; নিম্নশ্রেণীগত অবস্থান আর মধ্যশ্রেণীগত চেতনার বন্দ্ব কোনো সমাধানে পৌঁছয় না, কেননা তা খুব একটা সমস্যাই তৈরি করে না। তাই ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে একবিব্দুতে এনে মিলিয়ে দিয়ে সমাধান খুঁজতে হয়, ঘটনা সাজাতে হয়, আবেগ তৈরি করতে হয়—দুর্ঘটনা তৈরি করতে হয়, আর বিপর্যয়ের মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে হয়। এই দিকে জোর পড়ে বলেই চরিত্রগুলির বস্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটি উপেক্ষিত থেকে যায়, বদলে এ-উপন্যাস পরস্পর সন্নিহিত দুটি পরিবারের অভ্যন্তরীণ গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

তবু এখানে বস্তির বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু ‘তিমির লগন’-এ এসে মহাশ্বেতা যেন এক তৈরি-করা ছকেই ঢুক পড়েন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই অত্যন্ত বিস্তবান, ক্লাব, পার্টি ইত্যাদিতে তাদের জীবন ভরা। ‘তিমির লগন’-এ এই জীবন সম্পর্কে মৃদু আপত্তি যেন জানান মহাশ্বেতা। কিন্তু এর মূল বক্তব্য ‘প্রেম, প্রভারণা, প্রতিশোধ’। বিস্তবান পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও বাসবী পার্টি ইত্যাদিতে স্বচ্ছন্দ নয়, তার মতো আত্মমগ্ন মেয়ে পার্টিতে

এসে নিশীথকে দেখেই ভুলল। নিশীথের বাইরের চেহারা অত্যন্ত মনোমুগ্ধ-
কর—কাজেই অনেককেই তা মোহগ্রস্ত করে। বাসবী নিশীথের মায়ার মূগ্ধ
হয়, নিশীথ তাকে এবং আরো-অনেককে ঠকায়—এ-সবই চেনা ছক, এবং তা
বেশ চোড়স্বরেই বাঁধা। কিন্তু উপন্যাসে এরপর প্রায় রহস্য কাহিনীর আদল
এসে যায়, এবং তার জন্য ঘটনা সাজিয়ে নিতে হয় সম্ভাব্যতার যুক্তিকে প্রায়
লঙ্ঘন করে। নিশীথ অর্থ ছাড়া আর কিছুই চেনে না, টাকার জন্য সে সব
কিছুই করতে পারে—তবু এ-চরিত্রটি একেবারেই ঐশ্বর্যাত্মক। বাসবীর
অনুমিত মৃত্যুর পর ষড় দীর্ঘকাল সে পরিকল্পিত ভাবে অপেক্ষা করেছে
বাসবীর ছোটো বোন মালবীকে বিয়ে করে সম্পত্তি দখলের জন্য এবং তার জন্য
অভিনয় করে গেছে, সেখানে যুক্তি বেশ নড়ে যায়। বাসবীর মৃত্যু যে সত্য
নয়, তা অবশ্য পাঠক প্রথমেই জেনে যান, কিন্তু রহস্যটিকে জোর দেওয়ার জন্য
সমাজরাল পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয় বাসবীকে, চূড়ান্ত মূহুর্তে আত্মপ্রকাশের
জন্য। অন্যদিকে দেখা যায় এক মর্ষিড মানসিকতার প্রকাশ। বাসবীর বোন
মালবী প্রতিমূহুর্তে নিশীথকে দেখে, আর নিশীথ তার স্বভাববিস্ময় ভঙ্গিতে
মালবীকেও মূগ্ধ করে, এর মধ্যে নিশীথের শরতানির সংকোচহীন প্রকাশ,
কিন্তু মালবী যে নিজেকে বাসবী করে তুলতে চায়, বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ সরে
এসে একটা যান্নিরে-তোলা পরিচরকেই মেনে নিতে চায় তা মর্ষিডটি ছাড়া
ভার কিছু নয়। এবং এই মোহ একেবারে ক্রাইম্যান্সে না পৌঁছে কাটে না।
এটা ঠিক, বাসবী-মালবীদের পরিবার যে ধরনের গণ্ডঘেরা জীবনে অভ্যস্ত—
সেখানে বাইরের জগৎ থেকে আসা নিশীথ তার রূপ ও বাক্‌চাতুৰ্য নিয়ে
বাসবীকে ভোলাতে পারে বা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত পরিবেশে মালবী বানানো
জগতেই মজতে পারে—কিন্তু যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা সেভাবে নেই—
মালবীর বন্ধু রজত যে মালবীকে বোঝাতে চায়, তা খুব জোরদার নয়। বস্তুত
মালবীর বাসবী হলে-ওঠার চেষ্টা যে এক মানসিক অসুস্থতার পরিণতি হতে
পারে দু'টি, হয় চূড়ান্ত বিকার অথবা যুক্তির চিকিৎসা, কিন্তু এখানে তার জন্য
অপেক্ষা না করে ঘটনার ধাক্কার উপর নির্ভর করা হয়েছে। বাসবী ফিরে
এসে বিয়ের দিন নিশীথকে গুলি করে মারে, তারপর বিচারের সময় সব সত্য
উদ্‌ঘাটিত হয়, এই বিন্যাসে নাট্যকেপনার দিকেই ঝোঁক পড়েছে—বস্তুত
'তিমির লগন' উপন্যাসে মলে চরিত্রগুলির মধ্যেই নাট্যকেপনা বেশি, ফলে
উপন্যাসের সমস্যাগুলিকে মলে হয় বাড়িয়ে-তোলা, ফেনিয়ে-তোলা। ফলে
বাসবীর ট্রাজেডি আবেগ বিহীন, কিন্তু ঘনীভূত নয়। আর শেষপর্যন্ত তো
'সুখী পরিণতি' এনে দেওয়া, যা ঘটে গেল, তার কোনো ছারাই আর থাকে
না, এমন কী মালবীও সেদিনই রজতকে বিয়ে করতে বসে যায়। সব মিলিয়েই
উপন্যাস এক অর্থাত্মক আবহ তৈরি করে। 'নটী', 'মধুরে মধুর', 'প্রেমভারা'

বা 'এতটুকু আশা'র নানাবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও, পরিবেশ ও জটিলতার নানা মাত্রা পাওয়া গিয়েছিল—এখানে তা অনুপস্থিত। এই একমাত্রিকতাই উপন্যাসের বিরাট গুটি।

'তিমির লগন'—এ যে ধনী, অভিজাত, বিলাসী সমাজকে দেখা গিয়েছিল, 'তারার অঁধার' উপন্যাসেও তারা উঁকি দিয়ে যায়—তবে এই উপন্যাস তাদের নিরে নয়। এখানেও একটা ভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। প্রতিভার বিশাখলার সংকট এই রচনার মূল বিষয়। বিজয় দাশ হয়ত প্রতিভাবান ছিল, কিন্তু সেই প্রতিভার বিকাশের জন্য যে শৃঙ্খলা আর বিশেষ শিকার প্রয়োজন তা তার ছিল না। ফলে সে কোথাও পৌঁছার না, কোনো সৃজনী প্রকাশ ঘটতে পারে না এই প্রতিভার। বরং সে কেবলই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তার পরিবেশ ও চেনা জগৎ থেকে, নিজের স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে। নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণায় সে নিজেকে নিরে যায় ভুল জায়গায়। তার পরিবার যে তার সম্পর্কে বিরাট কিছু ভেবে নিয়ে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখায়, তার পিছনে কাজ করে দু'ধরনের মনস্তত্ত্ব—অতিসাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বিজয়ের মতো স্বতন্ত্র ছেলেকে তার পরিবার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলেই অতিরিক্ত সমীহ করে—আবার তাকে অবলম্বন করে নিজেদের হীনতা থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্নও দেখে। অবশ্য এও ঠিক—প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে নিজের প্রতিভার অহংকারে অশ্ব, অকর্মণ্য বড়ো ভাই সম্পর্কে দ্রুত মিশ্রিত সক্ষম নিয়ে আত্মত্যাগের যে মন্বীনা দেখা যেত, তা এখন অসম্ভব। তবে বিজয়দের মতো চরিত্র খুব অচেনা নয়। নিজেকে প্রবল প্রতিভাবান ভাবা আর সজ্ঞা সব গতানুগতিক পথ সম্পর্কে অগ্রস্খা দেখানোকে অসংগত মনে না হলেও, একথা ঠিক যে প্রতিভাকেও নিজের ঘোগাতা প্রমাণ করতে হয়। কোনো-কিছুই না শিখে, সববিষয়েই নিজেকে নিশ্চিন্ত দেওয়ার অধিকারী করে তোলা যায় না, আর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ানো প্রতিভার সাজে না, তা অব্যোধ্যতারই নামান্তর। ঘোগাতা প্রমাণ করতে না-পারলে প্রতিভার ঘোষণা হয়ে দাঁড়ায় ফাঁপা আড়ম্বর। এই ফাঁপা আড়ম্বর সহানুভূতিসম্পন্ন সমালোচনার কাটতে পারে, বিজয় দাশ তা পারেনি। বরং এই আড়ম্বর আরো ফুলে উঠেছে অশ্ব ভাবকদের স্মৃতিতে আর শিল্পবিলাসী ধনীদের খেলায়। বিজয় নিজের কমতায় অশ্ব, তার 'নাসি' 'নাস কমপ্লেক্স' তাকে কেবলই সরিয়ে দেয় বাস্তবতা থেকে। 'তারার অঁধার' সেই ট্রাজেডিরই রূপায়ণ। মানতেই হয় এ-ট্রাজেডি একান্তই ব্যক্তির ট্রাজেডি, ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন থেকেই এর জন্ম—নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হতাশা, দারিদ্র্য আর মানির পরিবেশের চাপ থেকে পালানোর একটা প্রয়াস হয়ত

ধাকে, কিন্তু সেই চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা না করে, নিঃশব্দে আলাদা ভেবে নিরে সরিষে রাখা আত্মরতি মাঠ, সেই আত্মরতি বাস্তবতাকে ভুলে এক বানির-তোলা ঙগংকে বাস্তব করে তুলতে চায়। ফলে বাস্তব জগৎও তাকে প্রত্যাখ্যান করে। স্ত্রাবকরাও একসময়ে হতাশ হয়ে পড়ে—বিলাসী ধনীরা খেলা ফুরোলে ভাঙা খেলনার মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর ব্যস্তির এই সংকট স্বাভাবিকভাবেই তাকে টেনে নিয়ে যায় মানসিক অসুস্থতার দিকে, তখন নিঃশব্দে ছায়ার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়। ‘ভারার আঁধার’ হয়ত এখানেই শেষ হতে পারত—কিন্তু মহাম্বেতা উপন্যাসকে আরেকটু ভাবালুতার দিকে টেনে নেন—তাই বিজয় দাশকে আত্মহত্যা করতে হয়। বোঝা যায় ব্যক্তিগত সংকটকে একটা পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মহাম্বেতা একটু বৈশিষ্ট্য এগোন—সম্ভবত বিজয় দাশের প্রতি পাঠককে আরো সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলার তাগিদে—যদিও এতটা প্রয়োজন ছিল না, এখানে এসে যায় অতিনাটকীয়তা।

‘বারোস্কাপের বাস’ এর বেশকিছুদিন পরে রচিত। উচ্চবিস্ত পরিবারের নিন্দ্র মহিলা শেলী মাসির স্মৃতিচারণার সূত্রে এই উপন্যাস এগিয়েছে। একটি দিনের পরিধিতে, পুরনো ছবি দেখার মধ্যে দিয়ে শেলীমাসি আর তার চারপাশের মানুষজন, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুদের জীবন পাঠকের কাছে উঠে এসেছে—নিভাসই এক পারিবারিক গাঁড়ির মধ্যে এই উপন্যাস বাঁধা। টুকরো টুকরো ঘটনা এসেছে পিছন-ফিরে দেখার সুবাদে, কিন্তু ঘটনা নয়, পুরনো অ্যালবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে যে-খরনের অনুভব কাজ করে, এখানে সেই অনুভবই মূল। ‘বারোস্কাপের বাস’ এক হারানো জীবন আর জগতের জন্য স্মৃতিকাতরতা, কিন্তু সেই সঙ্গে তা মনে করিয়ে দেয় স্মৃতিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা বড়ো দৃষ্টির। উপন্যাসের শেষে তাই শেলীমাসি চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে দেন বারোস্কাপের বাসটিকে, স্মৃতিকে পিছনে ফেলে ভারমুক্ত হতে চান। এই উপন্যাস এক নারীর অতীত ও বর্তমানের সহাবস্থানের ব্যক্তিগত কাহিনী, কিন্তু এক বিষয়তার সোঁতে তা আচ্ছন্ন। অসুবিধে হলো এই যে অতিকথনের ভারে এ-রচনা এলিয়ে পড়ে, পাঠককে একটু হ্রাস করে তোলে।

‘বারোস্কাপের বাস’ যখন প্রকাশিত হয় তখন মহাম্বেতা শুরু করেছিলেন দু’টি লেখা—‘কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গুলির জীবন ও মৃত্যু’ এবং ‘অধারমানিক’। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, স্মৃতিমেধরতার সংকট—এইসবের পাশে ব্যক্তি-মানুষের সামাজিক অবস্থান, ও সমাজ ব্যক্তির সম্পর্ক—এই উপন্যাসগুলিতে মহাম্বেতা এবার মূখ ফেরালেন সেই দিকেই। অনেকটাই সরে এলেন তিনি।

‘নটী’র চরিত্রগুলির প্রেম এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছিল—সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের ঝগড়া সেখানে ছিল, কিন্তু তা ততটা গভীরতা পায় নি। এবারে বদলে গেল অনেককিছুই। ‘বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাং’ এক কবি, সেও চেয়েছিল কবির দ্বিতীয় ভূবন তৈরি করতে, কিন্তু সে ‘মধুরে মধুর’-এর সাধন নয়, ‘তারার ভাষার’-এর বিজয় দাশ নয়; মহাম্বেতা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন “হরত আমি এমন এক যুদ্ধের কথা লিখতে চেয়েছি যে তার জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে নিজের জন্য একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করেছে চেয়েছিল, ... চেয়েছিল নতুন জন্ম নিতে এবং সমসাময়িক সমাজ তার প্রত্যেকটি চেষ্টাকেই পরাভূত করেছিল...”। আর ‘আধারমানিক’-এ জানিয়েছিলেন “মানুষ অত্যন্ত মারাবী জীব, ‘নিজের নিজের’ বলতে মানুষ অজ্ঞান। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস এবং সংসারের এমনি নিয়ম যে, মানুষের সেই নিজস্ব অহংকার অথবা পরিভীতিটুকু সবসময়ই কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় বলে হাহাকার পড়ে আবার হরত অগোচরে দাঁড় করিয়ে দেয় এক বৃহত্তর পটভূমিতে, অন্যত্র কর্মকাণ্ড—মানুষকে যেখানে তার ভূমিকাটি খুঁজে নিতে হয়।” সেই নিজস্ব ভূমিকার অনুসন্ধানে এরপর মহাম্বেতার যাত্রা। কিন্তু সে অন্য পর্ব।

শুরুর দিকে এই লেখাগুলি বা ‘যমুনা-কে তাঁর’ ‘রূপরাধা’, ‘লারলী অসমানের আরনা’, ‘বিপন্ন আরনা’, ‘সন্ধ্যার কুলাশা’ বা ‘অমৃত নগর’ লেখাগুলির দিকে তাকালে যা মনে হয়, মহাম্বেতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজের পথ। এই পর্বে তাঁর রচনাভঙ্গি প্রবলভাবে বিবরণময়ী চরিত্র উদ্‌ঘাটনের বদলে চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার দিকে অগ্রহ বেশি, ঘটনার উপর নির্ভরতা খুবই, বহুসময়েই দুর্ঘটনা বা মৃত্যু দিয়ে সমস্যার সমাধান ও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস, ভাষার আবেগ ও তারল্য রয়েছে, অনেকটা ছাঁড়িয়ে গল্প বলার চেষ্টার পুনরাবৃত্তি এসে যায়, গঠন শিথিল হয়ে পড়ে। এছাড়া শিল্পকে নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা, কখনো শিল্পের সমস্যা তা কখনো-বা শুধুই একটা উপকরণ, যেমন ‘নটী’তে আসে গজল আর ভজন, ‘মধুরে মধুর’-এ বৈষ্ণব পদাবলি, ‘বারোশ্কাপের বাক্স’-তে রবীন্দ্র-সংগীত। কিন্তু বাইরের উপকরণ বাহুল্য এই উপন্যাসগুলিকে তেমন কোনো মাত্রা দিতে পারে নি। তবে এই উপন্যাসগুলির দিকে তাকালে পাঠকের মনে হতে পারে, এই পর্বেও মহাম্বেতা নারীর স্বতন্ত্র ও গৌরবান্বিত ভূমিকা রচনার সচেতন। ‘নটী’-র মোতি বা ‘মধুরে মধুর’-এ বৃন্দা ও রাধার স্বাভাবিকতা, বলিষ্ঠতা তো চোখে পড়েই, প্রেমভরা ও নারী হিশেবে স্বতন্ত্র, এমনকী ‘তিমিরলগন’-এর বাসবীও শুধু যে নিশীথকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে, তাই নয়, শেষ পর্বও সে নিজের জীবন নিয়েই গড়ে নিতে চেয়েছে।

‘বায়োসকোপের ব্যঙ্গ’ তো একটি নারীরই কাহিনী। এই স্বাভাবিক হস্ত
একটু উচ্চকিত, আর ততটা গভীর নয়, কিন্তু তা পাঠকের নজরে পড়েই।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন মহাশ্বেতা। সেই দীর্ঘযাত্রার এই শূন্য
দিকটিতে একবার দেখে নেওয়া মহাশ্বেতাকে সম্পূর্ণভাবে চেনার জন্যই
জরুরি। এটুকু না জানলে চেনা যাবে না আজকের মহাশ্বেতাকে। বোঝা
যাবে না নিজের সঙ্গেও কতটা বোঝাপড়া আর লড়াই করে এগোতে হয়েছে
তাকে, তারপর তিনি পেঁছতে পেরেছেন ‘টেরোড্যাকটিল পেরগসহার ও
পিপথ্য’-র। □

উৎসব আনন্দ “কবিতার কাগজ” এ

প্রকাশিত গল্প নাটক উপন্যাস

এবং প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে

আপনার পাঠ-অভিজ্ঞতা, মতামত

সমালোচনা—আমাদের দপ্তরে

লিখে পাঠান। আমরা যত্ন করে তা ছাপবো

পরবর্তী সংখ্যায়।

আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই

আপনার সান্দ্রাণ পত্রাঘাত...

অনিল ঘড়াই'র উপন্যাস : জীবন ও জীবিকা

বিকাশ পণ্ডিত

জীবন বয়ে চলে জীবনের মত কখনো তা নয়ল-সাদা, কখনো বাঁকা-জটিল। উপন্যাসে সেই জীবনের কথা থাকে। কারণ উপন্যাস বাস্তবতার স্পষ্ট চিত্র। সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ভালমন্দ সমস্ত নাড়ী নকশের হৃদিশ মেলে উপন্যাসে। র্যালফ ফক্স উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—'The epic of the struggle of the individual against society.' তাই উপন্যাস থাকবে জীবন আর জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জীবিকা। তবে জীবন কথার মানে সবার কাছে সমান নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষের কাছে জীবন মানে ছেঁড়া-ফাটা জীবনটাকে রিপু করে বেঁচে থাকা।

জীবন জীবিকার মাটিতে শিকড় বিঁধিয়ে বেঁচে থাকার রস সংগ্রহ করে। জীবিকা ভালো কিংবা মন্দ দুইই হতে পারে। অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাসে বিহার পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যমানুষের জীবন রয়েছে। এ জীবন ছিঃম্হা, তাদের বৃকের ডেতরে বিরামহীন দুঃখের চাষাবাদ। তাদের দেহে নীল বস্ত্রের আঁকিবুঁকি।

আমাদের স্বপ্ন আর বাস্তবে, আশা আর প্রাপ্তিতে অসামঞ্জস্য বিস্তার। তবুও জীবন গড়ার। বাঁচার পিপাসা জীবনকে পৌঁছে দেয় জীবিকার ক্লোতলায়।

'বন্ধুত্ব' উপন্যাসে ছাড়িয়ে আছে শিকড়হীন কিছু মানুষের হতাশা, দায়িত্ব, প্রেম, সংগ্রামের স্বঘর্ষণ ছবি। উপন্যাসটির পটভূমি বিহারের ছোট্ট এক শহর। শহর না বলাও ভালো। এখানে বিষফোড়ার মত মাথা তুলেছে পাহাড়, খননসে পাথরে জমিতে দারু হাড়িরার প্রাণ। এখানকার মানুষ হাঁপায়, কাঁদে, ঘর বাঁধবার চেষ্টা করে, ভালোবাসা পুষে রাখে মনের ভাঁড়ারে। শূন্য পেটের দাবি মেটাতে এরা ছোটে। রক্ত মাটির মত এখানকার বেশীর-ভাগ মানুষের দরদের গাঙে নিম্নমত্যার চড়া। তবুও হাসান মাষ্টার পাশ্পা পরে অব্যর্থ ওষুধ বিলোয়। শূন্য বেঁচে থাকার জন্য গলিত কুষ্ঠ দেহ নিয়ে বনা রেলব্রীজের কাছে চাল নামায়। পদলিগের খিঁচি খেয়েও জানায় "বাঁচতে তো হবে?"

শূন্য পূর্ণা নারী হলেও এক বহুশলা, শূন্য ঘর্ষিত হয় চাপ চাপ অশ্বকারে। চন্দনার মামা বেঁচে থাকতে বিধবা বোনকে কৌল্যার বস্তিতে রেখে টাকা কামায়। ডাণ্ডী চন্দনাকেও রাতের ঘ্রেনে টাকার বিনিময়ে হাতে হাতে বদল করে। জীবন ও জীবিকা রক্ষার কি বিচিত্র পথ!

বটুর কাছে জীবন দুর্লভ। স্বর্গের পারিজাত। পুন্নিশের খিস্তি খেউড় হুজুম করেও শব্দ, পুন্নিবাবিরি চাল নামায়। স্বপ্নহীনতার পাথরে ধাক্কা খেয়ে এখানকার মানবগুলো হাড়িয়া খেয়ে জীবন কাটায়। জীবনগুলো আশায়, ভালোবাসায় বেড়ে উঠে চায় কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। স্রিৎসার চাবুকে চাপকে কাউকে ঘোলায় ফাঁসীতে, কাউকে ঝি-এ পরিণত করে। মেয়ের উপার্জনে বেঁচে থাকা বনা মেয়ের শব্দেই থেকে পড়ে যাওয়া কুটো পরসা কাকের মত খুঁটে খুঁটে তোলে। জীবন টিকিয়ে রাখার অপূর্ব জীবিকা বটে! এখানকার আদিবাসী মেয়েরা পরিভ্রান্ত ক্রান্ত দেহ নিয়েও জ্যোৎস্নার মতো হাসে।

রিফিউজির দুঃখ ও ছিন্নমূলতার চিন্তা অভয়বাবুর মাঝে দানা বাঁধে। বটু কিংবা মাখনবাবুর প্রেমের শিকড় সীতার ভালোবাসার মাটি থেকে রস নিতে চায়। কিন্তু সীতা হারায়। বটুর জীবনও হারিয়ে যায় হাড়িয়া চুল্লীর ঠেকে জ্বলে। বহমান জীবনে থিতু হওয়ার আশায় মানবগুলো জীবিকার নোঙর ফেললেও অশ্বকার জগৎ তাদের টেনেছে। জীবনের প্রয়োজনে যে কোন জীবিকাই তাদের কাছে সূর্যের মত।

“মুকুলের গন্ধ” উপন্যাসে অন্ত্যজপ্রণীর কামনা বাসনা, রক্তের গাঙে মিশে থাকা সংস্কারের ইতিবৃত্ত। সংসার, নেশা, সংস্কার, বৌনতা, ভালোবাসার বৃক্ষে মানবগুলোর জীবন ঘোরে। জগেন জমাদার শুরুর ভালোবাসে, শরীর ছিবড়ানো শরীর চটকায়, বিধবা যশোদা তাকে টানে, হাসপাতালের মাল সে পাচার করে। কিশোর ফুলের স্বপ্ন আশা, ভালোবাসা, ফুলের গোপন রক্ত-ক্ষরণ প্রকাশিত অজর্নের মধ্যে। প্রচলিত জীবনের প্রতি তার অসন্তোষ। তাই সে বেছে নেয় শব্দ চরানোর কাজ। আম্মাকালী সোয়ামীকে ঘরে ধরে রাখতে শরীর খুলে দেয়। মেয়েমানুষ সব দেয়, শব্দ সোয়ামী আর সোহাগ দেয় না। এ দুটো দিলে মেয়েমানুষ আর তো মেয়েমানুষ থাকে না, কেশনগরের পুতুল হয়ে যায়। তাই জীবন টিকাতে তার বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন।

এ পৃথিবীতে ভালোভাবে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে দেয় না। তাই বিধবা যশোদার শরীর ঘিরে এত ভীড়, এত লোভী চোখের আনাগোনা। সে যেন একমালি পুকুর, গেঁড়ি তুলতে কারো বাধা নেই। তবুও জীবিকা অর্জনে গিয়ে সে বাঁশের ঝাড়ে পড়ে থাকে, সব নিঙড়ে। কাননের কাছে শরীর, জীবন সৌন্দর্য, মান সম্মান, দায়বদ্ধতা খোলামকুচি। সে ঘরে খায় কিন্তু পানের কবে ঠোঁট ভিজিয়ে ফল ফুল দেয় কারখানাবাবুকে। জীবনটা তার কাছে খেলা। ট্রিলার রক্ত মাটির বুকে গজিয়ে ওঠা লাভগলতা। তার জীবন জ্যোৎস্নার মত উরল; স্বর্ণের মত চঞ্চল। অজর্নকে সে ভালবাসে। তবুও

হাজারো ব্যক্তির বোঝা প্রতিধ্বনিত সে। টিয়ার ভালোবাসা, ফণিণী প্রতিবাদ, অব্যক্ত অভিমান ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম, তাকে ভিন্নতর মাত্রাদান করেছে। তার সংগ্রাম যখন অন্যথাতে জীবন কাটার তখন টিয়া আঁকড়ে থাকে স্নাতনী আদর্শ। বাসমতী সংস্কারে ভরা সমাজে আধারিত ডাইনী। তবুও তার শরীরে মূলক ধরে, গন্ধ বিলোর। তারও জীবন ঘোরে সংস্কার আর ভালোবাসার যাদুতে।

‘বিপর্যিত যুদ্ধের মহড়া’ উপন্যাসের জীবনও মাটি ঘেঁষা : তবে তা পশ্চিমবাংলার এখানকার জীবন দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, স্নেহের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় কাঁথিতে, কলিকাতায়।

ভাগ্যধর এক জামবাটি পাতার জন্য সকাল থেকে চাতকের মত ঘনে থাকে। হলধর সারাদিন ঘুরে চাম ছিঁড়ে নুন মেয়ে টান টান করে শুকোয়। পুরু-ম্লাড়িতে চামড়া শুকাতো গিলে ভাই জটোরস সাথে কুরুক্ষেত্র বাধায়। সামান্য কারণে ভাই-এর সাথে ভাই-এর যুদ্ধ গ্রাম্যজীবনকে চিনিয়ে দেয়।

সোহাগী ব্রজদুলালের বউ হলোও নিজেকে সঁপে দেয় নীলকণ্ঠের কাছে। মেয়েরা কখনো সমুদ্র, কখনো পানা ডোবা, কখনো ফুলের মালা, কখনো শূধু নীলাকাশ। সোহাগী ব্রজদুলালের কাছে পানা ডোবা অথচ নীলকণ্ঠের নীলাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদ-নারী সুযোগ পেলেই খেলা করে পুরুষ আকাশে। সোহাগী নীলকণ্ঠের সাথে সাথে আদিম খেলা খেলতে খেলতে বদলে যায় ব্রজের কাছে। দেহের পাগলা বুনো প্রোত মুছে সোহাগী হয়ে ওঠে স্বামীবিচ্ছেদে কাতরা স্বামী সোহাগীণী স্ত্রী। অপূর্ব অভিনয় পটিনসী এক নারীর জীবন মহতের প্রকাশিত হয়।

অর্জুন বড়োর জীবন পলিমাটির মত সব সহ্য করে। ব্যাঙার বউ গুঁগলি তুলে জীবন কাটার। কুমকুম স্বামীর চুলে বিলি দিতে দিতে সোহাগী পায়রার মত একটা ছেলে কোলে জীবন খন্য করতে চায়। কাকবন্দী গাঁ ছেড়ে ভাগ্যধর যায় কলিকাতায়। পীতাম্বর কাকমারা অন্য গাঁয়ে পা বাড়ায় বেঁচে থাকার জন্য। পুঁলিশ নামক ভদ্র জীবের অভয় উচ্চারণ চিনিয়ে দেয় পুঁলিশ জীবনকে।

এ উপন্যাসের জীবন মাটি ঘেঁষা, তবে সংগ্রামী। সংগ্রামে সংগ্রামে রক্তাক্ত মানবগুলোর জীবিকা অর্জনের প্রয়াসও বিচিত্র বড় বহুদুখী।

“কলের পুতুল” এ গোল পৃথিবীর মানবগুলো কলের পুতুলের মত চলে। দয়াল ভাঙার অপবাদ পান, জীবন দেন লোকের ভালো করতে গিয়ে। এখানে উঠতি ছেলেদের জীবন বড় চমৎকার ফুটেছে। “ক্রোধে রক্ত চশমা পরে। ফিল্টার সিগারেট খায়। কালী পূজো করে। পাটি করে। মিছিলে যায়।

আবার চাকরীর খাতার নাম লেখায়। বিলাতি মদ খায়। সিনেমার নায়কদের অনুকরণে কোমর দুলিয়ে নাচে সন্তোষী মায়ের মন্দির সামনে।”

দোলনের জীবন আর পাঁচটা মেয়ের মত। যদিও দয়াল ডাক্তারের কাছে সে ছেলের মত। কিন্তু মেরে মেরেই রয়ে যায়। সে স্কুল ছাড়ে, হাড়ি ঠেলে, ভালোবাসাতে গেথে। শেষ পর্যন্ত রাইচরণের কুতূহল দয়াল ডাক্তার কলঙ্কের কালি মেখে আর দোলন পাণবিকতার শিকার হয়ে অশ্বকারে কাঠাল দড়িতে ঝুলে হারিয়ে যেতে চায়। রাইচরণের জীবন বড় চেনা। টাকার লোভে এদের জীবনের ভাষা, গতি সব পাণ্টায়।

শম্ভু রকবাজ, লম্পট, বড়লোকের বখাটে ছেলে। তার জীবন শূন্য উপভোগের। সে খেঁদির শরীরে স্বপ্ন বীজ বুনে তাকে সন্তান সম্ভবা করে তোলে। কিন্তু খেঁদির দারিদ্র্য নিতে বললে শম্ভু ডাংগুটির মত ল্যাফার। বাবুগুঁড়া, রামকানার জীবন দারু, চুল্লু, হাড়িয়া, মহুয়া, কানিট্ট লিকারে গড়ায়। তারাও দোলনের ক্রীজে শরীরে যৌনতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করে। গজানন এক অবলার মনে স্বপ্নের রঙ ধরিয়ে তার সঞ্চিত টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। “টাকা পেলে কত সহজে ওরা মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দেয়!” তাই এখানকার জীবন এবং জীবিকা পরিচিত, খুব চেনা।

অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাসের জীবন সাধারণ মানুষের। এখানে উচ্চাবেশের দেখা কম মেলে। এরা আশীষিত। সংস্কারে, অভাবে অশ্বকারে এদের জীবন ঘোরে। আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ জীবনগুলোকে কালো অক্ষরের মধ্যেও রক্তমাংসের করে তুলেছে। হাড়িয়া, দারু, চুল্লুর ঠেকে এদের বেশীর ভাগ জীবন কাটে। অভাবী মানুষগুলো অভাবের তাড়নার পশু হয়ে যায় কখনো কখনো। তাই নারীর সত্যি কাদে বাঁশের ঝাড়ে, ট্রেনের কামরায়, রেলরাস্তার ধারে, কাটা কোঁপে। মানুষগুলোর জীবন সোজা পথে চলতে গিয়ে কেমন বড়রেখার হারিয়ে যায়। কলের পুতুলের মত জীবনবৃত্তে ঘোরে। বিপরীত যুদ্ধের মহড়ায় নামে জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তবুও ভালোবাসার মকুল ধরে মানুষগুলোর মনে। তবে মকুল ফুল ফল হওয়ার আগেই করে গেছে হেঁশরের পাতার মত।

অনিলের উপন্যাসে বিচিত্র জীবিকার সমাবেশ ঘটেছে। কেউ দোকান করে, কেউ শূকোর পোষে, কেউবা রেল ওয়াগন থেকে চাল নামায়। কেউ হাড়িয়া, চুল্লু বিক্রি করে, কেউ বা হাতে হাতে বদলার ট্রেনের কমপার্টমেন্টে, কেউবা বোন, ভাগ্নী, মেয়ের উপার্জনে দিন কাটায়। কেউবা সংভাবে বাঁচতে চেষ্টাও তুকে পড়তে বাধ্য হয় জীবিকার অসংবস্ত্রে।

উপন্যাসগুলির জীবন মাটির গন্ধ মাখা। সমগ্র জীবনের শিকড় প্রাণিত ভারতের আবহমান কালের প্রচলিত সংকীর্ণ ভ্রমসমাজ আখ্যায়িত অসংবস্ত্রে। □

আবার কোন্ ধুলোর

অরণ্য মিত

সম্বল কিছুই আর নেই,
মুঠো খুলে দেখি
খুঁদকুঁড়ো মেখে রেখাগুলো রহস্যময়
তাদের আঁকেবীকে খুব লুকোচুরি চলছে।
সামনে মস্ত বড় মোড়,
পা বাড়াব আবার কোন্ ধুলোর ?
এতদিন ভো বাহারের ছবি ছিল
স্মৃতিপরায়ণতা ছিল
এবং দর্ভিক্ষের কোলে শূন্যে
খাদ্যগুণের বিচার ছিল,
সে-আমোদও ফতুর !
হাতের রেখার সঙ্গে ছক কাটে ঋতুচক্র
ফুলফুল আর ফসলের গোলকধাধা,
এবং আড়াল থেকে কেউ
জোর গলার হুকুম হুঁড়ে দেয় :
অম্ব ভিক্ষার লাঠি নাও, হাঁটো।

সময়ের পাজিরে ব্যথা

কৃষ্ণ ধর

সময়ের পাজিরে বাজে সময়েরই নিজস্ব ব্যথা
অহরহ একটু কাৎ হলেই টনটন করে ওঠে
অথচ তার হাতের মুঠোর শোকাতুর। প্রহর ছিল না
ছিল গোধূলির রক্তিম বিদায় ভালবাসার উজ্জ্বল, ভরপুর
কী করে যে এই ব্যথা নিজেই জানে না স্মৃতিহীন
দিনরাত্রি এতদিন পর পরিণত কোটালের ওঠ হুঁরে
সমুদ্র বেলায় যেন তাকে ব্যঙ্গ করে
বসন্তের পাখি চৈত্রে লাল ঝড় ধূলি ধুসরিত স্মৃতি ব্যাকুলতা
কাকে ডাকে ? জনর অথবা শরীর ? চরুতর গতিতে তারা
ছায়াছবির মতন চলে যায়, পিছনে দেখে না।

সময়ের পাজিরে শূন্য শাণিত আঘাত বেদনার অনূর্জ্বিত
 সে এখন এই অনড়তা নিষ্কণ্ড প্রহর ভেঙে কী ভাবে যে যাবে
 এই শবের পাহাড় ভেঙে, অশ্বকার নদ পারে মাড়িয়ে
 অমলতা ভোরের উজ্জানে
 নবজন্মের নরুরে পৃথিবীর কাছে
 ঋণ শোধ দিতে

বাধা ব্যাধে সময়ের পাজিরে পাজিরে
 অহরহ, অথচ তার হাতের মূঠোর শোকাভূর প্রহর ছিল না
 ছিল গোথলির রক্তিম বিদায়...

ভাঙন

আনন্দ ঘোষ হাজরা।

এই পৃথিবীতে এসে অনেক ভেঙেছি কতবার
 ভেঙেছি অনেক মানে অপমানে স্বপ্নে ও স্মৃতিতে
 ভেঙেছি অনন্ত বেদনায় ।

সেই সব ভগ্ন অংশগুলি কোন অতীতের বাক্যে
 অন্য কোনো পথেরখা ধরে আজ কোথার হারালো ।
 কিংবা কোনো প্রতিকূল বাতাসে ঝঞ্ঝার উড়ে উড়ে
 কোনো দ্বির বৃক্ষশাখা পেয়েছে কোথাও ?

আমার সহস্র সত্তা লক্ষ বেদনার মূর্তিগুলি
 কোনো এক উজ্জ্বল মহিলার ভালোবাসা পাবে ব'লে
 আজো ব্যাধাতুর এক অশ্বকার প্রদেশের দ্বারে
 অধোমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

আরো বহুবার ভেঙে পৃথিবী মণ্ডল থেকে
 অন্য কোনো পৃথিবী রেখায়

চলে যেতে পারি যদি, শব্দমালা, তাহলে অনেক
 শব্দকাণ্ড ঘটে যাবে বলে মনে হয় অকস্মাৎ !
 শব্দমালা, যদি তুমি কাছে থাকো

অন্য এক শব্লে পৃথিবীতে

আরো বহুবার ভেঙে জাগরুক হতে পারি
 স্বপ্নে ও স্মৃতিতে, বেদনায় ।

মেয়ে

কালীকৃষ্ণ গৃহ

আমি তো সরলভাবে বৃক্ষে নিতে চাই পৃথিবীকে ।
কিন্তু এক শাস্ত ঋতুমতী মেয়ে আমাকে সন্দেহ ক'রে
দেখেছে নিজের ছায়া, স্বপ্ন, স্রাব, বাস্তবতা ।
শহরতলির গান ঘিরে থাকে সেই মেয়েটিকে ।

আমি দেখি ক্লান্তির ভিতরে পাতা উড়ে আসে অশ্বখের আমের জামের...

স্বপ্নের

অমিতাভ গুপ্ত

যে বিপ্লবের স্বপ্নরেখায়

কপিল কালো ঘোড়ার রেকাব

অম্বারোহী, আছে তো ঠিক জেগে

হয়তো যে-কালবৈশাখীর মেঘে

মিলিয়ে নিজের সব উষ্মগের

কৃষ্ণকে রাধিকার মতো উন্মাদসে বিদ্যুতে

মাধবী মঞ্জরীর দিকে আছে এ'প্রাবন তেমন পারে হুঁতে

২

দ্ব'লের তবু অসংখ্যের

মতো শত সহস্র সম্ভের

কাছে মরুভূমির তীর পা'ছুর আভার

সম্ম থেকে সম্মান্তরে তবু ষড়্‌গ-ষড়্‌গাস্তর যার

৩

এতদূর থেকে তবু প্রশ্নের অতীত

অতীতের মতো ভবিষ্যৎ

কথা বলে । হয়তো গুঞ্জন ক'রে ওঠে

নিষ্কিন্তু ভীরের মতো, শত লক্ষ কোটি কোটি

বিলোহী নদীর

৫৪ / কবিতার কানন্দ

রোগা ডটপেন, তোমাকে

ব্রত চক্ৰবৰ্তী

রোগা ডটপেন দিয়ে যারা ভালবাসার কথা লেখে,
তারা সম্বাই কি খুব ভালবাসা পায় ?

ভালবাসা কখন শূন্য হয় আর কখন শেষ হয়,
সাদা বা রুলটানা কাগজ কি এ বিষয়ে কিছু জানে ?
কবে একজনকে আরেকজনের মনে করিয়ে দিতে হবে না
ভালবাসার কথা !

মাসের পর মাস বছরের পর বছর খাড়া হেঁট করে
ভালবাসার কথা লিখে চলেছ ।

রোগা ডটপেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে ?

দায়

নির্মল হালদার

নক্ষত্র শূন্য নক্ষত্র অজস্র নক্ষত্রের ভার
কি করে সহিছো তুমি ? আমাকে দিলে আমি বইতে রাজী

আমার কাঁধে কিছু নেই কোনো দায়িত্ব নেই
আমাকে দাও হে অকাশ, তোমার বোঝা
কিছুটা লাঘব করি ।

১
বালক বয়সের মেঘ

অজিত বাইরী

বালক বয়সের মেঘ, তুমি ঝুঁকে আছো জ্ঞানলায় ।

আমার অভিমান উড়ে যার তোমার দিকে

এখনো, কোনো কোনো দিন

দুঃখী বালকের মত ভাবি হয় বৃক,

যখন কলম খুলে বসি শাদা পাতায়

যখন নৈশশব্দের দিকে উড়ে যার

ঝাঁক ঝাঁক বিষণ্ণ জোনাকি

যখন বৃকের ভেতর থেকে উঠে ওঠে নদী

আর নিম্বাসে কাঁপায় বাঁশপাতা

যখন হাওয়া ওঠে গভীর জঙ্গলে
আর হতাশার মত ঝরে হলুদ পতালি ।
বালক বয়েসের মেঘ, তুমি ঝুঁকে আছো
জানলার ।

আমি শব্দের ফেরিওয়ালো, শব্দ
ফেরি ক'রে কেড়াই ;
যেমন খাঁচাবন্দী পাখির ঝাঁক নিয়ে
পাখিওয়ালো
গহন দুপুরে রোদ্দুরে হারিয়ে যায় দূর জনপদে ।
পুরনো দুঃখগুলি রেখে যায় থাকি পোশাকের পোস্টম্যান ;
বকের পাখায় লুকোনো আলো পড়ে
পৃথিবীর মাঠে ;
কলম খুঁজে বসি সাদা পাতায় ।
বালক বয়েসের মেঘ, ঝুঁকে আছো
জানলার ।

বুদবুদ

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা এতটা মধুর হতে পারে
তোমাকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না
হাতের কাছে সারাজীবনের মোহ
তাকে একটু আড়ালে রাখলে
কেউ কোন দোষ দেবে না

কিছুই চাইনি তবু বারবার মনে হয়
স্নিগ্ধতা তোমার শরীরে এখনো জড়িয়ে
তাকে এত সহজে মরলা হতে দেব না
দশ বছর আগে যে বিহ্বলতা

এতটা অস্থির করেছিল
সেই সম্পর্গেতা এতদিনে জলছবি হয়ে আছে
শব্দ একবার সহজ প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল
যেখানে ভালবাসা নেই ছিল অবক্ষরের বুদবুদ...

৫৬ / কবিতার কাগজ

এই বাঁচা

সুস্বত রূপ

১

মেঘের রঙের মতো আকাশে বেড়াতে বেড়াতে
ওলটায় পালটায় শব্দ ।
শব্দরূপ খুঁলে দিচ্ছে অদ্ভুত সব আচরণ ।

২

শব্দের পৃথিবীতে কেউ কারো নয় ?
আলাদা জীবন সব শব্দের ।

৩

শব্দের গন্ধ সহ্য করতে করতে
উন্মাদ হ'য়ে যাও ।
হারিয়ে যাওয়া, না-দেখার জন্যে এই বাঁচা ।

পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে

শান্তি রায়

পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে জাগাবো হৃদয় আনবো বিশাল্যকরণী
পরমায়ূর মূল্যবান শিকড়—আমাদের মূখের দিকে তাকিয়ে
থাকবে ভবিষ্য প্রজন্ম, তামাম দুনিয়ার মরমী ভূগোল
...অজস্রতা ও ইলোরায় খাজুরাহে যেমন ধরা পড়ে
মণিময় শিল্পের পাখি ও সবুজ দ্রাঘিমা !

তাই পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে জাগাবো হৃদয়...

দুঃখের সংগ্রহ

অমরেন্দ্র গণাই

দুঃখের সংগ্রহ তবু বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন
দুঃখের কাছে তাই আমাদের ঋণ
যত কিছুর ভালবাসা...
বলার পাতায় রাখি পান ও বাতাসা
দুঃখের সংগ্রহ দেয় জীবনের সাজ
দুঃখের বাগানে ফোটে চাঁপা গন্ধরাজ
পথে পথে কৃষ্ণচূড়া লাল
দুঃখের পোষাক পরে গান গায়, কালের রাখাল

নৈকট্যে বহু

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

সহজ নৈকট্যে বহু নদী
জলের বিকল্প নেই জেনো ।
শ্যামকান্তি তীরভূমি গৃহস্থের আত্মদা মেখেছে,
ছায়া চরে গাভীন মশুর,
নবীন ধানের ঠোটে ধরা পড়ে ভোরের শরীর—
এসবের একই অর্থ : আকাঙ্ক্ষার জল ।
বহুতা স্থাপত্য রাখো নাব্য সভ্যতার,
পটরেখা অঁকা হয় রমণীর স্নানে,
চতুর বাণরী বাজে তমাল পুদিনে
এসবের অর্থ জানে জল শুধু স্রোতের আগ্রয়ে ।
ঘাসফুলে দুঃখ গল্পময়
হা-হা মস্তণার দাহ চৈত্রের বাতাসে ।
প্রবল কৃষ্ণার মত রাত নামে বিপন্ন নিশীথে...
এ সময় নদী চায়
কণ্ঠনালী দৃষ্টিভূমি এবং আত্মর দেহকোষ
এখনই সহজ হও...
বিপুল নৈকট্যে এসো নদী—
জলের প্রকৃত অর্থ বহে আলো জলে ।
৫৮ / কবিতার কাগজ

জল-বিবাহ

অমিরকুমার সেনগুপ্ত

জল-বিবাহের দিনে জোড়োন আতপ চাল, কনুই-ঠেকান বৃকে তোর
তথাপি উচ্ছ্বাস, নদী বয়ে যাচ্ছে দুর্নিবার মধ্যরাতে হানা দিলো ভোর
তোর দরজার। আহা দুর্বা ঘাস কই, কই আমপাতা, কীতা হলুদের
কোথার লাবণ্য? থাকে হাতে সুতো বেঁধে দিবি দুঃখাগ্নি সেই পুরুষের
কঁধে নেই পাথর, তা আতর না রক্ত কিছ্র এমাবৎ অনুমানহা।
শ্রান্তুল কেটে যে তুই রক্ত দিবি, রক্ত নিবি, উভয়ের আজীবন স্বপ্ন
এ ভাবেই শোধ হয়। কোথার পুরুষ যার হাত-মুঠো সিঁদুর; কোথার,
আকাশের চাঁদ, সেই রাতজাগা পাখি কই; নদী বর কানায়-কানায়,
বৃকের সমস্ত ফুল-নিবেদন ব্যর্থ হলে মাটিতে আগুনজ্বাত ছাই
তোর মূখে তবু গান; এসো হে উদ্ভিদসেব, প্রণয়ের মালাটি পরাই।

চারাগুলো কখন

সিন্ধার্থ সিংহ

একটু ঝোড়ো হাওয়াতেও কখনও সখনও উড়ে যেত ছাউনি
ঘর ধুলোর ধুলোময় হয়ে উঠতো
ক্যালেন্ডার অনবরত আছাড় খেতো দেয়ালে
বালতির জলে ভাসতো সর
বৃষ্টিতে ভিজে একসা হতো সব
বাচ্চাদের নিয়ে ডক্তাপোশের তলার মাথা গুলুতো রীতি
জলের তোড়ে ভেসে যেত দু-একটা সদ্য পোতা চারা
আমি ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতাম
ভাবতাম, রাহুলটা যদি বড় হতো!

শুধু রাহুল নয়, ওরা সব কটা ভাই-বোনই এখন বড় হয়ে গেছে
এত বড় যে এ ঘরে আর ধরেনি
যে যার মতো দূরে গিরে, গেড়েছে শিকড়।

এখনও ঝোড়ো হাওয়া ছুটোছুটি করে, ঝাপটা মারে জুফান
আমরা দুই হুড়োবুড়ি খাটে 'দ' হয়ে বসে থাকি আশঙ্কায়,
ছাউনি তেমনই থাকে, উড়ে যায় না কোনও ঝড়ুটোও

জিটের সীমানা জুড়ে রাহুলরা বুঝি বৃক পেতে হয়েছে প্রহরী!
দাওয়ার বোরসে দেখি, চারাগুলো কখন গাছ হয়ে গেছে।

অভিজ্ঞ

অণব পণ্ডা

প্রাথমিক রাস্তিকণা, লালানীঠা পতঙ্গশরীর ;
শব্দ এক ক্ষুদ্র চোখ জেগে থাকে চাপা নিঃশ্বাসে
অদরে জোনাক জ্বলে, ফসফরাস সবুজ আগুনে
টেনে নিতে ক্ষিপ্ততার তুমি আজ উঠে যাও ছড়াস্ত ছড়ার দিকে
রোমশ পাহাড় বেয়ে । আর, হু হু বাতাসের লোভে
টেনে আনো পাথরের ঘাম । অবশেষে পেশীতন্ত্র
ঘিরে ফেলে দীর্ঘতর শাড়ি, বাতাসে ফেরাও চোখ
স্বাপদসংকুল এই প্রাথমিক রাস্তিকণা গাড় প্রক্রিয়ার
জেগে ওঠে লালানীঠা জ্বলে শরীর
গিলে নেয় ফাঁস আঁটা অনভিজ্ঞ শ্বাস

বাঘ, বেড়াল ও মাছ ভাজার গল্প

(চরিত্র হারানো কোন এক বাঘকে)

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গল থেকে একটা বাঘ কিভাবে এসে গিয়েছিল
বেড়ালের পালে, আর সেই থেকেই শূর হরেছিল
চরিত্রের অধঃপতন...

কল্পে কটা বেড়ালের সঙ্গে একদিন সিঁদ কাটল
এক শাসালো গৃহস্থের

লুকিয়ে তারিণে তারিণে খেল ভাজা মাছ
সঙ্গে কাটার অবশেষ টুকুও...

জাত হারানো বাঘ ধরা পড়ে গেল গৃহস্থের হাতে

-কিল, চড়, লাথি তো জুটলই

শেষ হল কান ধরে ওঠবোস এবং পশ্চাদদেশে লাথিতে ।

আশ্চর্য, বাঘটার লজ্জা তো হলই না

বরং আরো মেতে উঠল মাছ ছুরির মজাতে...

বাঘের এই অধঃপতনে গৃহস্থের খুব মারা হল
মমতার সঙ্গে বাঘটাকে জঙ্গলে ছেড়ে এলেন
যদি বাঘ ফিরে পায় তার হারানো চরিত্র ।

কয়েকদিন পরেই বাঘটা আবার ধরা পড়ল গৃহস্থের রান্নাঘরে
ভাজা মাছ এবং কয়েকজন বেড়ালবংশসম্মত ।
এবার শুধু কান ধরে ওঠবোসে হল না
কুশ্ব গৃহস্থামী কেটে দিলেন বাঘের সুদীর্ঘ রাজকর্কর লেজ
উপড়ে দিলেন বাঘের সুন্দর সৌক
চেহারার কেমন এসে গেল চোর চোর ভাব ।

ভাজা মাছের গন্ধে বাঘ শেষ পর্যন্ত বেড়াল হয়ে গেল !

বিশল্যকরণী

মনোরঞ্জন খাঁড়া

যে কথা ফরাটে পাতার হলুদ খেয়েছে মাঘমাসে
যে আশা মরে ভুত হয়ে ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরে উত্তর ফাল্গুনে
যে খেয়ার লীগির দাগে আঠারোর হোবন বোঁহিসেবী গন্ধ ছড়ায়
যে আকাশ তারিরে তারিরে রাতে কোন লাভন্যবতীর
ঋতুস্নান দেখে হাই ভাসে তুমি তার কতটুকু জ্ঞান ?

তখন জৈষ্ঠ মাসে বিকেলে ভ্যাপসা গরমের কাল
তার আঁচলে জর্দা পানের চুন
পাকা আতার কোলা ভ্রাসনে বসানো পদরুখ
তারপর একে একে সব খেয়ে ফেলে অবশেষে নারীকেও খায় ।

যে বর্ষার ভিতর পারত পক্ষেই কোন কাব্যমিথুন কিম্বা
মৃত মাছির কামা সুবাস লুকিয়ে নেই
যে ছবি শতগুণে মৃত হাসিকেই প্রদাহযোগ্য করে সাজায়
তুমি তার কতটুকু জানো ?

বাঁকা পথের দু'পাশে কতো যে থোলাই ! চোরকাটা ঋণের সৌকর্য
অক্ষর অমলিন অস্পষ্ট লেগেট থাকে
ভিখারি জীবন নিয়ে কিভাবে দেখবে তুমি
মহাজীবনের খাদ-খোদিলে শূন্যে থাকা বিশল্যকরণী ?

কবিতার কাসজ

শেষদিনে, মুরারিমোহন

প্রণব মাইতি

কতকাল কতদিন অপেক্ষার কাটাযো হে মুরারিমোহন
আমরা কাদতে জানি, আমরা দিতেও জানি,
আমাদের চারপাশে গভীর হাঁমুখ খাদ
আর আর ডাক দ্যার-তাকালেই বড় ভয়-জীবনহরণ !

বাঁচতে তো ভারী সাধ-শীতরাতে-কে দ্যার হাতছানি
আগুনের দেশে যাবো পুড়ে ছাই হবো...
আমরা বাঁচতে চাই-স্বপ্নসাধ ছোঁবো
অপেক্ষার দিন শেষে, কে যে দেবে অক্ষর পারানি,

জীবনে বাচার ইচ্ছে ক্রমশই নিভুনিভু দীপেরমতোন
কেন তবু আশা দিয়ে বাঁচাও আমরা
আমি ঠিক দিনশেষে শেষের পাতার
লিখে রাখি শেষ কথা-কোথায় হে অরুণেরতন ?

ওপারের বাঁশী আমি কত কাল পরে আজ শুনোঁছি গ্রীহারি
দুঃস্বপ্নের লোনা জলে আঁকি আঁপনা
আর কোন দিন প্রভু ভুলে আঁকবনা,
শেষ কথা শেষ গান, শেষ দিনে শূনে যেন মরি ।

শান্তি বিশ্বক

অমিতাভ দাস

১-

জীবনব্যাপন উড়োনচণ্ডী
না গেরস্থ না সন্ধ্যোদী
সরস সিন্ধু ছন্দবেশী
কখন নদী জঙ্গমে
কখন দেখি পর্বতে বা
ঠিক সমুদ্র সঙ্গমে
ভাসলে খড়ির গণ্ডী

-৬২ / কবিতার কাগজ

ব্যাকরণের ব্যঙ্গ্য ছিঁড়ে
 তাক লাগানো ছন্দ
 মোলবাদীর পাঁচিল ভেঙ্গে
 লাগিয়ে দিলে স্বন্দ
 খঁজছেন কেউ ছন্দে বিভোর
 হারানো বাজুবন্দ

তীক্ষ্ণ আলোর শিখা জ্বলে ওঠে
 সন্তোষকুমার মাজী

অস্ফোটা রেখা না মনে, ভীষণতা মুছে ফেলো ঢোখে
 সৌম্যতা ফিরিয়ে আনো, শত্রুহীন হয়ে যাক এ জগত
 সঙ্গত শরীরজুড়ে আনো শৃঙ্খল আবাহন
 প্রানায়ামে শৃঙ্খল করো মন, ধন-মান মুছে যাক
 অহংকার মুছে গিয়ে অলংকার হোক

বাসবাস তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুলুক তীর তান
 সুবাসনা বেয়েই উঠুক সেই ঝড় অনড় প্রজ্ঞার
 সর্বনাশী বেয়ে তরঙ্গের অভিঘাত করুক বিবশ
 ইড়া পিঙ্গলার স্রোতে ভেসে যাই শরীর অবশ

তীক্ষ্ণ আলোর শিখা জ্বলে ওঠে মন ও মননে ।

চিঠি সংক্রান্ত । ৭

অরুণ পাঠক

বহু প্রতি প্রশ্নের পাশ দিয়ে তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেখছি
 অথচ মস্তিকাময় শস্যের মতো কখনও অর্থহীন হয়নি
 ওঁ মন্থ : অনেকগুলো ব্যর্থ শাসনীর পরও
 ও আমার কুনকে ভরা ধান, অ...আ...ক...থ...
 আমি বিদ্রূপবিহীন সে শাসনে জজ্ঞরিত মহাকালে
 মাথা রেখে আবার তোমাকে নাম ধরে ডাকবার
 সাহস পেরেছি ।

কবিতার কাগজ / ৩৩

পাঁচ বৃক্ষের রুমণায় সন্ত্রাস এক, পাঁচ মূখে একই চুম্ব
জঙ্গলের গভীরে টেনে পথ হারিয়ে দিতে পারে
অব্ধ তোমার চোখে যে দেশ সবুজ আর যে ভাষা সজীব
সেখানেই ফুলের জড়তা—কলমের বেআরু দংশন
থেকে যায় ।

এ' বর্ণপরিচর ভৌমিকদা জানে না । জানানো কতগুলো
কানমলা নারীকে চেনার, দেশকে স্বদেশ করে তোলে ।...

তোমাকে চাইব যখন

তমালিকা পুষ্পা শেঠ

তোমাকে চাইব যখন অনাবিল আদিগন্ত

তখন হিমালয় এসে যদি

বলে, থামো—তফাৎ যাও

তবে তা অগ্রাহ্য হবে

তোমাকে ডাকব যখন

তখন ব্রহ্মপুত্র যদি তোলে

নিষেধের তর্জনী

তবে তখনই ঝাঁপাব জলে

পথ দেখাবে অশানি

তোমার সঙ্গে বি.বা.দা. বাগ

ট্রাফিক ওয়ান ওয়ে-নো এন্ট্রি

নো রাইট টার্ন

রেড রোডে ব্যারিকেড

সব অবরোধ হবে চুরমার

হবে অনশন-আইন অমান্য দূর্বীর

যদি ডাকো ব্যারেকের জলের মত

যন্ত্র-নির্লিপ্ত হবে আবেগ

ফুলের বৃক্ষেরও রাজনীতিকরণ চাও যদি

তর্জনী হবে জেনো আঘাতের নদী

তোমাকে চাইব যখন

পাথরের বুকফাটা

অনন্ত জ্বালা ঝোঁকে

অনাবিল-আদিগন্ত

জল-প্রপাতের মত তুমি তখনই ঝাঁপাবে বৃক্ষে

৬৪ / কবিতার কাগজ

প্রত্নপোখরাণ, আমরা প্রেমবলি

তাপস রায়

আমাদের পাড়ারও রাত জাগার ধূম, উৎসব
পরবর্তী ভোরে কতখানি দৃশ্যের জোরে, খুলে যাবে
আমাদের মৃদুশবাক্
কলকল নিজেদের তীব্র জাগানো ...

আমাদের একমাত্র পৃথিবীও ফুটবলের মত
মানুষের দিকে অপজক চেয়ে থাকে, লাথিখুঁথায়
জিপিপাঠ জানেনা মানুষ, পৃথিবীর পদ্রনো অক্ষর-বর্ণমালা
স্মৃতিহীন মানুষ চেনেনা, দেখি প্রত্যাহের ভিড়ে
পোখরাণ জন্ম নেন প্রেমিক শরীরে

নিবেদন

গোবিন্দ গোস্বামী

বনজ্যোৎস্নায় চিরুণি তল্লাশি চালিয়ে
শিশির ভেজা কিছূ নক্ষত্রের ফুল
তোমার কাছেই জমা রাখলাম

অনেক শব্দই ভালোবাসার জন্য খরচ হয়ে গেছে
অনেক বিবর্ণ পাতা কুরে কুরে খেয়ে গেছে বিষন্ন সময়
অশ্বকরে অস্পষ্ট অক্ষরে এখনো বেঁচে আছে কিস্কিছূ ছবি
ভোরের দেয়ালে আঁকা স্মৃতিমগ্ন শব্দের স্পন্দন

হিরন্ময় সকালের অঙ্গীকারে
এখন তোমার কাছে
সূর্যস্নাত সময়ের নগ্ন নিবেদন
আলোর বর্ণমালা দিয়ে আকাশের আঙিনায়
লিখে রাখো অস্ত্রহীন ভালোবাসার সিন্ধু পদাবলি

গ্রীষ্মের আকাশ

প্রফুল্ল পাণ্ডা

বাগাড়ম্বরে ছেঁয়ে আছে বাস্তব আকাশ
এ আকাশ আমাদের কে বলেছে কে জানে
অশ্রু লুকিয়ে হাঁটিতে হচ্ছে মকরজ্যোতি রেখা ধরে
শ্মশানচিতার উদার হাতছানি এসব না মনে রেখে
বেজে চলে কবিগানের ঢোল শিশির পতনে ।
দু একবার হয়ত হিস্‌হিস করে উঠবে শীতাতর্ক খরিস,
শস্যফলনের কথা মনে রেখে আর উগ্রত অধঃপতন
এড়িয়ে মিশে যেতে পারে স্বপ্ন সারি সারি ।
ঘুরতেই হবে দক্ষিণ থেকে একদিন আলোর তীব্রতা,
একদিন আঙুল তুলে বলে বসবে কেউ
বিশাখা নক্ষত্রের সাথে দেখা হয়নি সত্যি সত্যি কারুর,
আজন্ম বিধবস্ত এই বুদ্ধের ভেতর মেঘ ডাকবে যখন
তখনই দরোজা জানালা বন্ধ করে
নিষ্ঠে নামতে থাকবে একটার পর একটা পেঁচানো সিঁড়ি, ।
অগাধ কাশা চেপে বলে দিতে হবে গ্রীষ্মের আকাশ
সেও নাকি বিসদৃশ হাঁটার অভ্যাস ছিল এতদিন ।

অটহাসি

আভা সিংহ

প্রমিদের 'প্র'

কৃষকের 'ক'

সব গুলে থেয়ে নিরে

মানুষের 'ম'

—টাকে বজায় রাখতে

অটহাসি হা হা...

৬৬ / কবিতার কাগজ

শব্দজ্ঞান

হ্রস্বীকেশ বিশ্বাস

কররেখা নেই নেই তো নেই
কী আর হবে, যা হবার তা হবে
কররেখা নেই ব'লে ক্রুদ্ধ তরুণ কবি যদি
কাচকাটা হীরা দিয়ে শব্দ শব্দজ্ঞান নেখে
কী দোষ তাতে ? আর কী বা যায় আসে,
কী আসে যার কে কী বোঝে বা না বোঝে
কবিতায় কী দোষ তাতে কবিতায় কুহকে যদি
সপ'গ'ধা কুহকিনী নারী না-ই আর আসে
সপ্তম আশ্চর্যের মতো অযোনিজ শব্দ সম্ভাবের
সহবাসে সহবাসে কবি
প্রকৃত সমৃদ্ধ শব্দজ্ঞান দেখে

স্মৃতির প'দ্বি

মানসকুমার চিনি

জ্বলছে মূখের ছবি, আর
প্রতিদিন রাস্তায় হেঁটে যাওয়া
এতোটা গোপন চোখ
ছ'ড়ে দিলে পথে
সেই থেকে তুমুল মন
সারা ঘর জুড়ে
চিঠি নিয়ে খেলা করে ।

আমি তাকে খুঁজি
সে আমাকে চাঁদের আলোয়
ছ'রে দিলো ।
প্রতিটি প্রেমের হাতে শব্দ ধারাপাত
ভুল মন্ত্রার দোষে
সঠিক পাঠ চোখ মাপে ।

একডালিয়া এভারগ্রীণে দূর্গাদর্শন

মঞ্জুভাষ মিত্র

সপ্তমীর রাতে একডালিয়া এভারগ্রীণে দূর্গাদর্শন
মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল আকাশমুখী আবেগের জরজর
ভাবলে অবাক লাগে সতের বছর বরষে
উত্তর কলকাতা থেকে এখানে ঠাকুর দেখতে এসেছিলাম
আজ আবার ঠাকুর দেখতে এলাম ; মাঝে কত বছরের ব্যবধান
আর উচ্চাকাংখার অক্ষুণ্ণ-আঘাতে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করবার গম্ভীর
মাত্র আট মিনিট মোটের-দ্রুত আমার অবস্থান
জলের দেখে জলদেবীর জন্যে এ মূহুর্তে

হাজার পংক্তি রচনা করছি

সময়ের নীল খামে করে

সে গান তোমাকে দিলাম, ও গো প্রিয়, ওগো প্রিয়া

শুধু তোমার জন্য

অমল স্কর

তোমার জন্য

শিশির-ভেজা গোলাপ । শিউলি সকাল ।

তোমার জন্য

অস্তরাগ । মনমাতাল । ফুরিয়ে যাওয়া বিকাল ।

তোমার জন্য

ঝোড়ো হাওয়া ! শ্রাবণ মৃদুর । নিজনি দূপদূর ।

তোমার জন্য

বন পলাশ । ঝরা বকুল । বৃষ্টিপড়া, টাপুর টুপূর ।

তোমার জন্য

আশাবরী । সুরলহরী । ছন্দ গান । উছল প্রাণ

তোমার জন্য

জীবনবোধ । বেঁচে থাকা । মরাগাঙে ভরা বাণ ।

তোমার জন্য

বেজার সুখ । পাতা বৃক । মেলামেশা । খোলামেলা ।

শুধু তোমার জন্য

কবিতা লেখা । জীবনানন্দ আকাদেমি বাংলা ।

আপেল বাগান

অমিত কাশ্যপ

আপেল বাগান আজ ভরে আছে মাংসগন্ধ মেখে
নীতে কেটে ছিল হাত ইভ আর দানব
আদম ভাবে নি কিছুই
ইভ ছিল পাতার দেওয়ালে ।

বারুদ ভিজে ছিল নীল ডানায়
সুখ ছিল আলাপচারিতার রত
বড় দেরি করলে হে, বড় দেরি
জন্মান্নিস্রব্ধের বীজে তিনি বিষ মিশিয়ে দিলেন ।

৪

মুখ লুকবো কোথায়

রঞ্জিত দেব

আমার আর মন ধারাপের কি থাকতে পারে
যেভাবে তুমি আমার হাসি জানন্দকে কথায় মূড়িয়ে
নির্জন রাস্তায় ছুটে গিয়ে দাঁড়ালে ।

যেভাবে সরিয়ে রাখলে অতীত ও বর্তমান নবীন প্রসঙ্গ,
নরিয়ে রাখলে কিছু বিশ্বাস আর সমর্পণ
শিশুর কান্নার মতো উদ্যত অগ্রভূতে এখন নোনা স্বপ্ন ভিজে ।

আত্মার আর বলার কি থাকতে পারে—
জ্যোৎস্না দিয়ে ভাত মেখে অভূক্ত তুমি আধারে দাঁড়ালে
পিষে মারলে জরগার সোনালি দিন, শেষ সম্বলটুকু
হাওয়ার উড়িয়ে দিয়ে বললে, পূর্ণমণ্ডিক ভব—
নিরন্তর আনাগোনা শিস দেয় ঝর্ণার কলরোল ।

আমার কিছু বলার নেই, আগেও কি ছিল কিছু
অবাস্তব খুনসুটি, লুকোচুরি, আবোল তাবোল কিংবা অন্য কিছু
হরতো গোপনে ছিল কিছু শব্দ, কবিতার খাতা, বিনম্র সংলাপ
যেই যেই নেচে ওঠে বিশ্বাস ও সমর্পণ—প্রকৃতি দিবালোক জ্বলে ।

৫

হে জীবন, জীবন হে

সাগর চক্রবর্তী

চমৎকার রৌদ্রে আজ রক্তের উৎসব
আকাশ ধরেছে কণ্ঠে শতকের ধর্মীর গরল
এখন বৃষ্টি হলে অনাগত শিশুরা সবাই
প্রতিবন্দী হবে ।

এবং ছিন্নমস্তা রাজনীতি, নাকি আত্মতুষ্ক !
এই পথে গিয়েছিলো আগন্তুক ইরানীয় কিম্মা ককেশীয়
শস্যহীন আর্ষদের রথ ।

অজস্র নতুন নদী খেয়ে ফেললো পুরোনো নদীকে ;
নদীর ভিতর থেকে এ'কে বে'কে যে সব রাস্তা এসেছিলো
সেগুলো হারিয়ে গেলো পাষাণে কংক্রিটে সৌধে-প্রীজে !
তাই আর নদীতে যাবার রাস্তা নেই !

স্নান নেই, অবগাহনের

স্নিগ্ধ শান্তি নেই ।

হে জীবন, জীবন হে,

চমৎকার রৌদ্রে ছুটছে অস্বমেধের তেজি ঘোড়া...

সামনে কুরুক্ষেত্র অথবা বিবাদসিংহ-বিস্তীর্ণ কারবালা !

ক্রেদজ' কুসুম

সুধাংশু বাগ

বৃষ্টি এসে ছললো তাকে, ধরে দিলো তৃষ্ণাত' মলিন
মস্ত শরীরী সোরভ । যেন ভেঙ্গে পরাগকেশর
কুসুমরূপসী নারী খুলে দ্যায় পেলব রঙীন
পার্পাড়ির অহংকার । আর, তার আকাংক্ষার স্বর

নিষিক্ত নিবিড়ে কাদে । অকথিত উচ্চারণে তার
বৃষ্টি এসে গান গায়, ফটে ওঠে ব্যথার ব্যজনা
বিরহী বাগানে, হাল, উড়ে যায় হোলুদ সংসার,
ধ'সে পড়ে দেবালয়, করে যায় অতৃপ্ত অর্চনা

৭০ / কবিভার কাগজ

অমৃতের আশ্বাদনে । তবু বিষ, অহর্নিশ গ্রাস
করে বৌবনের আলো । স্নেহ করে, বৃষ্টির বেদনা
ফোটে কদমের ডালে । এখন সে নিজ'নে নিবাসি,
সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভিজে ভিজে ভেজার ভাবনা...

সৃষ্টি থাকে অকল্পিত, স্পর্শ ছাড়া নিজ'নে নিকরু,
বৃষ্টি এসে ছুঁয়ে যায়, ফুটে ওঠে 'ত্রেদজ' কুসুম'...

তারাবাতি শহরের রূপকথা

সুবীর সরকার

উল্টোপাল্টা অনেক কিছই ঘটে যাচ্ছে আজকাল । কোনরকম
প্রস্তুতি ছাড়াই বাইরে বেরোতে হয় । সোজা চালাতে
হবে জেনেও আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলে যার আমার
মসৃণ সাইকেল । 'এখানে রিক্সা দাঁড়াবে না'—এইরকম
বিজ্ঞাপিতর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি রিক্সাচালক ।
'রাত বেশী হলে নিরাপদে ফেরা যাবে না'—এই সতর্কবাণী
উপেক্ষা করে গ্রীষ্মতি শিখা সামস্ত গান ধরেন । অটোহাসিতে
ফেটে পড়ে গোটা হলধর । বর্ষাপ রচনা করে পরিত্যক্ত
দেশলাই বাস্তব । আমি আসনপিড়ি হয়ে বসে পড়ি, কিন্তু
আমার মনঃসংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় । কারণ, হই হই
করতে করতে এগিয়ে আসছে সোনামুখি সুই হাতে দিদিমারা ।

কুংসা ছড়াও

মুনাল কান্তি

মৃত্যুর নাম লিখে-উঁড়িয়ে দেব,
জীবনের স্বাধীন পতাকা
সুবোধ বালক—
আঁচলের আড়াল থেকে বল
'নষ্ট চারিত্র' এদেরই বলে ।

ভবিষ্য

মৃত্যুঞ্জয় কুন্ড

যারা চোখ দিয়ে আগুন করতে

তার এখন বৃষ্টি করার ।

আফশোস আর চাপা হা হুতাহের

ওপর, সময় বদলে করে মাটি ফেলে ।

মুক ও বধির ছায়াগুলো

একদিন ধূসর হতে হতে

মিলিয়ে যাবে ।

জ্বালাধরানো রোদ এসে

চৌচির করবে মাটি ।

ফটস থেকে বেরিয়ে আসবে লতাগুচ্ছ ।

তখন আবার জ্বাল রোদকে

হাটিলে দিতে ছায়ালোক থেকে উঠে আসবে

আলোর হাত ।

শব্দ করে ট্যাঙিয়ে দেবে

নিঃসঙ্গ সাম্রাজ্য, দেখে নিও ।

আমি এবং তুমি

দিনীপ জানা

তুমি ভাবো আর না ভাবো

যাও আর না যাও, আমি—

সময় আগুনে পা ছুঁবিলে বসে আছি ।

কারণ পা বড় অবাধ্য ।

তুমি প্রস্তুত থাকো আর না থাকো

শরীর রোদে পড়ে

প্রণয় সূত্রে মেতে উঠি

কারণ প্রকৃতি বড় আদিম

জ্যোৎস্নার হলুদ জল বড় নিঃপাপ

পর্বত কটি দেশ বড় শান্ত

কাশ উর্মি বড় মোহময়

জীবন ব্যাকরণ আজ কার্ণিকত

তুমি মানো আর না মানো ।

সার্বাঙ্গসার

দেবাশিস মহারাণা

তার কাছে নতজানু হই, সে-ই জানে কতের গভীর
অঞ্চ পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা

দুঃখে ঢাকতে পারেনি কোনদিন

কালির দোয়াতে ফুরোতে থাকা কীর্তমান জীবন
ধরে রাখে সাদা কাগজ

শুধু নতজানু হ'তে পারি
আমাকে সে ফেরাতে শেখেনি

ব্রাতি গভীরতা পেল, প্রতিবেশী জুবে যার
ঘুমের ভেতর...

সে আমার চোখের মণিতে রাখে চোখ
পাঠ করে কতদাগ

হারিকেন বাতি জানে, কিভাবে প্রেম ঢেলে ঢেলে
জীবন আলো ছড়ায় চারিদিক

শাদা পাতা তোমাকে

অললেন্দু বিশ্বাস

(উৎসর্গ : চিত্রকর সংযুক্তাকৈ)

১৬

আন্টি বেরোবেন আজ । পথে পথে মূর্ছা বাবে কুছুড়া ফুল !
ফুলদল কী বলবে তবে । বৃষ্টিমোছা আকাশের মত তবু মৃৎ—
ভুলল যে কুড়িফোটা চোখ ! ঠোঁটের বিভঙ্গে যে খয়েরি তিল
অহংকারে কীকাল রোদ্দুর । এ'সব বসাই তবে নীল নিকেতনে !
আন্টি বেরোবেন আজ । সে কথা জানে কী পথরেখা গাছ
কোথায় গিয়েছে গতিপথ সে কথা জানে না, আন্টির দৃ'চোখ ।
কেননা দৃ'চোখে তার গে'থে আছে শুধু বসন্তের গান ।
ছন্দে থাকছে, ক'কে দেখছে কুচলুগ শোভিত রজন লালে ছত্রখান ।
জড়ো করি ছত্রলাল । চলো আন্টি, ক্যানভাসে রাখি শাদাপাতা
মূর্ছা বাঙরা ফুলদাল ইজ্জলে চড়ালে, বাণের কাগজ পাতা...

১৭.

প্রণয় প্রত্যাশ থেকে এ'মুহূর্তে' সরে গেলে শাদা পাতা
অক্ষরের নীলচোখ ঝ'রে পড়বে আচমকা বজ্রের মতন ;
ভালো হবে বলো, ভালো হবে—এ'অধম প্রেমিকের নাশ !

নীল আশ্রা থেকে মিড় করাতো সবুজ ঘাসের শীষে
হলুদ পাখির রাঙা ঠোঁটে যে নতুন অশ্রু'কণা ঝলকাত
তাকে আমি খুব ভোরে তুলে এনে চুপি চুপি রাখতাম
তোমার পাতায় । শাদা এ'প্রান্তর জুড়ে জেগে থাকা হ্রুশাধর্নি
তাকে তুমি কোন ফাঁকে এড়াবে বাতাস । শূ'ধু ডানা মন্ত হলে
রোদ্দুরের বীজ মূখে ছড়াবো তোমার নয় বিভাব !

দীপক হোতা

বিপন্নতা বিষয়ক

১.

কঠিন কঠিনতর অসুখ ঘাটির । এ সময়ে তোমরা কি মূ'খ
ঢেকে আছো ? এগিরে চলো, মূ'খ ভয় ছ'ড়ে ফেলো আজ,
তোমরা তৈরী থাকো, মূ'খ্য আর আগেও আর একবার পরখ করো
স্বদেশের মানচিত্র বদলাতে পারো কি না, তা না হ'লে ছে'ড়ো পাতা ।
চোখে চোখে বাধিরে দাও তুমুল অগ্ন'পাত, বিপন্ন ইতিহাস !

২.

রাত্রির নিজ'নতা ছি'ড়ে, এই যে শব্দরাশি ছিড়িয়ে যাচ্ছে
পোড়া মাসে আর বারুদের গন্ধে বাতাস হচ্ছে ক্রমে ভারী ;
কেন ছে'ড়ো সংহতির আলোর শৃ'ঙ্খল, তবুও কাঁপে
ক্রমাগত রাত্রির বুক । শ্মশান চিতার আলোর
রক্তমূ'খী উবু হ'লে বসে আছো মা ; এ কেমন অস্থি'কলস !

তবু ভাল আছি

তোমরা জানতে চাইলে তাই প্রত্যাশেরে উড়িয়ে দিলেম স্বর ।
ভাল আছি, তবু আমি ভাল থাকতে চাই বলেই একথা বলি ।
চারপাশের এত মনখারাপের দূঃসহ ভাবনা আমাকে
ঘিরে ধরে দিন রাত । আমার নিজস্ব বোধ কুয়ে খায় ।
তবু আমি ভাল থাকতে চাই বলেই তুমি বা তোমরা জিজ্ঞেস
করলেই প্রত্যাশেরে উড়িয়ে দিই স্বর—আমি ভাল আছি, তুমি ?

একজন পরিত্যক্তের কাছে বিশ্বনাথ মাথি

একজন পরাজিতের কাছে
কি-ই বা পাবে তুমি
কি-ই বা পেতে পারো রোজ
তার কাছে কি এমন আরোগ্য আছে
পেতে পারো ছেড়ে যাওয়া বাসভূমি
তার না পাওয়ার বেদনার নিম্নে নাও খোঁজ ।

পরাজয় যে জানে সে জানে
তুমি শূন্য পারো জেনে নিতে
সে জানে না তার জীবনের মানে
তুমি তাকে ফিরিয়ে এই পৃথিবীতে ।

পরাজিত মানুষের দোষ লাগে
উদ্বোধনে কে'পে ওঠে বৃক
সম্মেলনে ব্রাত্য সে আগেভাগে
সবাই তাকে ভাবে উজ্জ্বল ।

সুখকর বেলালউদ্দিন

রাতির কপালে চুম্ব দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম
অশ্রুকার বিছানায় । কানে ভেসে আসছে
নিশ্চুতির হা হা কান্নার ধনি ! এমনই রাতের
গায়ে কালো রঙের পেঁচ গিলে খাচ্ছে
অনারবিল কি'-কি'-র ডেউ । এরই ভেতরে
বেড়ে উঠছে সময়, দাঁড়ের পোড় খাওয়া হাওয়া
এভাবেই তোমার সঙ্গে আমার চার্লচিস্ত্রময়
প্রেম, যুবক হোচ্ছে, দ্যাখো কেমন বিষাদের
রক্তিম আলোর আমি অবগাহনের সুখ নিচ্ছি...

নৌকো

বিমল দেব

চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছি

ঢেউ গুনতে গুনতে চলতে শিখলাম

রাত নেই, দিন নেই

শুধু একটি নৌকো ছুটে যাচ্ছে কোথাও...

পুনর্বাস

আশিস গিরি

মাঝ রাত্রে নদীর স্পর্শে কেন সুখ !

ওবাড়ির নবজাতক কাদে,

কোন বিপন্ন শূন্যতা তার বুকে !

ছিঃ এ মাতৃষ পরাজয়

মাটি বা মানুষ যাইহোক !

পরম্পরা ঢলে গ্যাছে, কুমায়ুন

ভাঙছে বরাবর, হাঁসুলির চরজুড়ে

যে গ্রাম্যতা ছিল, অনুর্বর ভাবও

ভাষার ফসল ।

ছ'য়ে গ্যাছে ফাটামাঠ নালীর ভেতর ।

প্রজন্মের তালিকা খুঁজে ছবিও মরে যায় ।

জানালার সে আকাশ ছিল, টগবগে

মিলে মিশে কাশবন তুলো ।

তা এখন অর্থহীন গচ্ছিত সম্পদ ।

খিল পায়ের মৃদাঘাস, কবর বা শহীদবোধ

ঢাকা পড়ে রাষ্ট্রীয় বালির ওপর,

ফরমাস তো অনেকটাই...

এখনও কী বাকি আছে লেখা

যুগ্ম-দগ্ধ প্রেমের সনেট ?

শব্দগুচ্ছ গোলাপ না হোক,

কথা হোক প্রকল্পিত পুনর্বাস

টাটটান সুদীর্ঘ বছর ।

৭৬ | কবিতার কাগজ

বৃষ্টি

সাগরিকা শম ।

অনেক অনেক দিনের খর্রা

শুদ্ধ শূন্যে আর উত্তম হাওয়া

আমার বাগানে আর শ্যামলতা নেই

দিন কি এমনিই কাটেবে

এই আকুলতা ব্যাকুলতার মধ্যে ?...

অকস্মাৎ যেন অনুভব করি —

আমার আকাশে একটু মেঘের আনাগোনা ।

আমি উবেলিত

আমার আকাশ ভরে গেল মেঘে মেঘে

নামলো বৃষ্টি অর বৃষ্টি

অবিব্রাম বৃষ্টি ।

উজ্জ্বলিত আমি ।

মনের বাগানের শীর্ণ ডালগুলিতে,

এল সতেজতা—এল লাবণ্য ।

ছোট কুড়িদের কোমল কম্পন—

ফুটল অপরাধিতা, গন্ধগাজ, গোলাপ

আর আমি নিজেও হরে গেলাম

অজপ্ন বৃষ্টি ফুল ।

বাঁচার শত্ৰু

রানকৃষ্ণ খোড়াই

সমাজের চোখে কালো চামা

ঘাতকের ঘারে আঁটা

কলর বসদ বলির জীবকে

দেখে হাসে কালো পাঠা ।

বেকার বোঝার কাঁধ টেনটেনে

খুন রাহাজানি ধর্ষন,

কালো রাত কবে আলো দেবে বলো—

গর্বিত স্মরা বর্ষন...
বৃকের চাতালে বিভীষিকা জ্বলে
পেটের গভীরে গর্ত
বিষ ঢেলে দিলে এসো হাসি আজ
সোহাগে বাঁচার শর্ত...

তাদের শূভ হোক

নির্মল বসাক

তাদের শূভহোক—

এক পা রাম্রাধরে যার, আর পা বসের গাড়ীতে
রাত দশটার আগে নাম্রায় না বাড়ীতে
তারা স্বাধীন হোক, আর্থ-সামাজিক ও যৌনাচারে ।

স্বামীর বজ্রাতি আর চলবে না, চলবে না...

অন্তে যদি তেল মাখিতো যে 'এক্সট্রা' দেবে তার,
স্বাধীন হোক তবে যৌনাচার...
যেখানে ইচ্ছা বিলোম্বো রোম, কার বাপের কী ?
বশ হোক বিয়েতে ডাউরি...

আমার নিজের পারেই হাটবো —তাতে হুমকানির কী আছে ?
দীঘা-সৈকতে ঘোড়া চাপি বা বিকিনি বিছাই সী-বিচ এ
সমুদ্রকে দেবো, পাহাড় কে দেবো, দেবো জঙ্গলকে—
যে দেবে বাধা আমারে, খামারে চড়ে বেড়াতে
গরু, মোষ, গাধা, মেঘ বা ছাগল...
চৌন্দপুরদুর্গ তার হোক না পাগল —
এসব স্বাধীন ইচ্ছার ক্রমবৃদ্ধি হোক...

যেখানে ইচ্ছে সেখানে রাখবো আমার নিজের এনুটি পা ;
এক পা ঘরে আর এক পা বসের গাড়ীতে চড়বে, করবে রাম্রা
তাহলে প্রশ্নাই. যারপরনাই সুবিধে তোমার অর্থকরি ;
যদি তাতেও মন না মাতে, 'আই এ্যাম সরি...'

তাদের শূভ হোক, তাদের প্রেম হোক, তাদেরও যে'...

৭৮ / কবিতার কাগজ

বিপন্ন

সুধীন বসু

বোধে, এমন বিপন্ন সময়
শব্দ কিনা সাক্ষী থেকে যাওয়া !
সময়ের শরীরে নিভুল হাত রেখে
হ্রস্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ, অনুভব...
সমকালীন স্বত কথা
সর্বকালের বিম্ব ও যন্ত্রণার শরিক হয়ে যায়,

চরিত্রকে শব্দ শব্দ ভাঙ্গনের...
শিকড় উপরে যাচ্ছে একটু একটু করে—
ঝড়ের অপেক্ষায়...
মাটির সাথে শিথিল আপস বন্ধন
এভাবে চলতে চলতে একদিন
সবটাই হয়তো বা উপড়ে ফেলে দেবে
পতনের শব্দ থেকে নীরবে ।

কত শব্দ আজোও রয়ে গেল
গভীর আঁধারে নতুন শতাব্দীর অপেক্ষায়—
সব কিনা একসাথে প্রতিধ্বনি হলে
নিভু নিভু প্রদীপ সব আরো হবে
আকাশ ঘাদের ছাদ আজো, তাদের
প্রকৃত অ-সুখ সেয়ে যাবে ।

রমণী অনুশাসনের রাত

পদ্ম্যাম্বলাক দাশগুপ্ত

ভূবে যার নৌকো যাত্রার শ্রুতি, শ্বেত মহত্তের
রমণী অনুশাসনের রাত,

বিম্বস্ত

ধ্বংসের রাত...

অভ্যস্তরে

গাঢ় শব্দভাষা ।

শব্দ ভঙ্গিমার চেনা যায় না ।

জবাব

দিলীপ সামন্ত

উচ্ছ্বস্ট এ'টোকাটা মূখে তুলিনি
বিশেষ বাণী ছড়িয়ে দিই শব্দ
যদিও এরকম বিশেষে
কখনো রক্তাশ্রু আমি
রক্তে ভাসে শব্দ্যার বালিশ
তবু অন্তস্ত নই
কেন না প্রতিশোধ স্পৃহায় ছুঁড়ে মারি তিল
বিশ্বাস ও বোধে গড়ে তুলি ইমারত
স্বাধীনতা চেতনায় বে'ধে দিই ক্ষত
শ্রেণী শোণিতের স্রোত বে'ধে দিতে
আরুণি শব্দ্যার ঘুম আসে
ছুঁড়ে ফেলি কোপ্তা কালিয়া, কাবাব
অজ্ঞাত নয়,
রক্তে শানাইছি প্রতিবাদ

সপ্তম

লক্ষ্মণ কর্মকার

তুমি বললে মাটি
মাটিই কিনেছিঁ সত পারি
তুমি বললে জল
ভূতলে এনেছিঁ জলধারা
তুমি বললে ফুল
বাগান করেছিঁ পরিপাটি
তুমি বললে প্রাণ
প্রাণ কই ? এ যে স্বপ্নের সাহারা

৮০ / কবিতার কাগজ

প্রেমিক কথা

মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ

অক্ষরে অক্ষরে নিশাচর প্রেমিক

বধূরা জানে মধুমর আভা

রাজপথে ফেরিঅলা চাঁদ ভালোবাসে

জোছনা বিকি করে না গলিতে গলিতে

নোটবুক থেকে খুঁজে নেওয়া স্রোত

ঘিণে যায় প্রিয়তম মূখে

বিজ্ঞাপিত সমুদ্র নয়

উত্তম চৌধুরী

এসব কোনও বিজ্ঞাপিত সমুদ্র নয়

দৃশ্যাবলীর চোখে বাবে ক্ষুধার্ত চোখ

বরণ এখন সমিহিত আমার স্বপ্ন

ভূগর্ভস্থ জমাটবন্ধ কালো হীরে

বেড়ে উঠেছে সময় এবং স্রোত ধরে

মাটির ওমে প্রতিপাল্য খনিজ দেহ

অতীত ছুঁয়ে নেমে আসছে ভাবনাগুলো

রোদের ভেতর শূন্যে নিচ্ছে সদা শরীর

রক্ত জমির গোথে ভাসে নিজস্ব রং

অভিজ্ঞ গাছ ম্ললে কেউ ফোভ রাখেনি

এসব কোনও বিজ্ঞাপিত সমুদ্র নয়

বরণ এখন স্বপ্ন হাওয়া দেয়াল জুড়ে

বরণ এখন প্রতিষ্ঠিত দিনের আঁড়

রেখে যাচ্ছে রোদের সীমার শব্দগুলো ।

দিনলিপি

কৃত্তিক ত্রিপাঠী

পুরান সম্পর্কের স্পর্শ হে
বাড়ি ফিরছি সম্ভবেলা
বদলে যাওয়া উঠোন
আমার যতোখানি সম্ভব
হাতেরা উন্মুখ আছে আগুন চিনবে
আগুন, আগুন
ঘরে আছে আগুনহীন উদ্ভাপ
পথশূণ্য গতকাল বাড়ি ফিরেছি
গতকাল ছিলো বৃন্দশেষে হাজারো বছরপার
সব কাজ শেষ করে ফিরে আসা পাখির মতো
ঝালের দরোজার কাছে নিভৃত ক্ষমা

ক্ষমার সঙ্গে দুঃখ সম্পর্ক
দুঃখের পাশে অগাধজল অগাধ ঢেউ
পৌছোবে না কোনদিন তুমি সেখানে
এক অসম্ভব সম্পর্ক দিনের মতো ঢেঁটা রাখতে পারো

সে যাই হোক, দুঃখ এই কারণে
বদলে গেছে সবারিছা, অনেককিছু

সমস্ত উন্মোচিত পথে কথাহীন
কথামূল্য নাকি বলাকওয়া বারণ, হে—
আমার পুরান বালিকা, মাঠ, সব পাকা ফলস
নিপ্রাণ মৃত মানুষের মতো আশ্রিত শস্যসব
খানাডোবা, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো, মৃদাখানা
পার হচ্ছে শস্যেরা, পার হচ্ছেন মৃত মানুষ
পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে নিচ্ছে গতিজাডা

আজ এই সম্ভা হলো বাড়িমুখো
মেসপ্রহরী দেয়নি তোমায় ছুটি
এই গ্রাম, এই পুরান অনর্ভূতি জল হরে
বাম্প হরে শাদ হরে কথা হরে জমে উঠছে

৮২ / কবিতার কাগজ

হাজারো মন খারাপ

সেই সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড, তোমার নিম্পুহ
ফিরে যাওয়া, টানা ছ'ঘণ্টার বসিন্দুদে,
আরেক বাসস্ট্যান্ড, গৌধরা রিকশা, বাড়ির পাশে
বেদম হোটেল, ভূমি মনে করছো না তো !

সুন্দর এক ব্যাকুল দেবীকথা ধরে গেলো মাথা
জন্ম কথাতে ঢেউ

গতকাল তোমার জন্মদিন ছিলো, অথচ

স্বার্থমগ্ন অসুখ দেবেছি স্বভূমিতে

দুখানা সাপ, দুখানা মগ্ন হাস, দুখানা

জোটবাধা রাস্তার কুকুর চোখবোজা

বন্ধ চোখে লজ্জা হয় না বন্ধি ? হয়তো না ।

✓ হলেও কী আর করার আছে ? ঐ নিরমই তো
চলে আসছে এতোকাল,

নে যাই হোক, এতোকালের গর্ভস্থ শিশু

মাথা উঁচু হলো আজ, ভালো কথা

আলো হয়ে আছে রাস্তা, গলিপথ, সামান্য

চালেরও দোকান

সমস্ত মানুসজন উন্মোচন তীর গেঁথে আছে

আলোর বৃকে

একান্ত অনুভূতির গন্ধে আমার মন খারাপেরা

অন্ধকার খুঁজছিলো

✧ অন্ধকার-অন্ধকার

নিরহংকার অন্ধকার এক পরিচিত সিঁড়ি

জারিত হোক সিঁড়ি

ভূমি ছিলে না তাই রক্ষে

কথা, সে তো আত্মপরিচয় নিয়ে জমে উঠেছে অগাধ

প্রশমন, সেও তো সময় নিশ্চারণ ।

তা হোক কিশোর এক জলঘাট

অনেক দিনের পর বিভাজন অক্ষয় মায়ের পাশে

স্বপ্ন আলো আমার আদরে মরা মা

সামনে পেছনে অন্ধকার

জারিত হোক জন্মসিঁড়ি

কৈশোর থেকে শৈশব, শৈশব থেকে প্রশমন আনন্দ
প্রশমন আনন্দ মানে কুঁড়েঘর, তার মধ্যে বাসা
ফিরে পাচ্ছি প্রণয় সেই অশ্বকার ।
জ্বরিত হোক অশ্বময় জন্মসিঁড়ি
অনাথ আলো বিচ্ছুরণ !

ভাবো একবার ভাবো

পরেশ সরকার

হাততালি পেতে পেতে লোকটা এমনি উদ্ভাস
স্বপ্নের মধ্যেও খোঁজে করতালির স্মৃতির আওয়াজ
তবে কি বোধের কাছে দায়বদ্ধ মানুষের ঋণ
করবে না স্বীকার সে শস্তার প্রশংসায় বানাবে ঘরবাড়ি---

অপবাদ অবহেলা নিতে নিতে সে লোক নাকাল
নিজেকে কোন কাজের নয় ভেবে হয়েছে হতাশ
তারজন্যে করুণার প্রয়োজনবোধ কেউ তো করেনি কখনও
ঠুটো জগন্নাথের মত আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে
মজানদীর খাদের বালিসিঁড়ি করেছে হৃদয়---

তুমি তো কাজের মধ্যে ছুবে থাকে হে বিবেক বৈরাগ্য সময়
তুমি তো হৃদয়কথা বুঝে নেবার চেষ্টাও করেনি কখনও
আর কি তা বলে মন নেই তে কাঠের মতো ভেসে ছুবে যাবে
অশ্বকারের বুকের ভেতর বিবাদে ছুভেই জন্ম নাকি তার
ভেবে দেখো কে আপন কে তোমার পর কে ছুঁয়েছে ও হাত---

সংকেত

বিবেক চৌধুরী

পথ অনন্তের দিকে হাঁটে অনন্ত বাদাম ভাঙে, কামদেব ভোরের
ভাষায় খঁজে পাই নিজস্ব ভাষার জগৎ । হে নারী-প্রকৃতি-নদী জল
তোমাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাই, এতটাই মোহ মৃৎ সংকেত.
ভাষায় প্রচ্ছন্ন তোমাদের স্বভাব । সংকেতের ভাষাভাব
বুঝে যদিও এক পা এক পা করে এগোই—ততটাই
ভারসাম্য হারিয়ে যুক্তি ও তর্কের পাদানিতে টলে যায়
বৈতর্ক্য আলো মেঘ খুঁশি ।

৬৪ / কবিতার কাগজ .

চাঁদে ঘর বাধে

ইভা মাইতি

ওরা কারা ? ওরা কোন সুগন্ধ সম্প্রদায়,

নাকি গন্ধহীন ?

তামারই রক্তজাত যারা, রক্ত উদাসীন ।

ওর মুখে ঢেয়ে দেখো অন্তরে সোজা গোজামিল ।

সুবর্ণ শৈশব ছেঁড়া, বাকি বয়স দপ্তর বোকা ।

হে বিশ্ব প্রকৃতি ওর মুখে দাও ভাষা

ঢেলে দাও এক বৃক হানি কি তামাসা !

শেকড়ে বাকড়ে দাও আত্মত্যাগ-পরিশুদ্ধ শক্তি প্রবনতা,

ওরাই পারে সূর্যের অহঙ্কার ছিঁড়ে

বৃশ্চের অলঙ্কার পরাতে

দুঃস্বপ্নমুখে এক মূঠো অন্ন গুঁজে ।

ওরা যে চাঁদে ঘর বাধে ।

স্মৃতির কোঠায়

মনোরঞ্জন রায়

খেয়াল-ভরসে যেন ছোট এক টেউ

আকাশে বাতাসে আমি পলকা হাওয়া

কচি পাতা হয়ে আজও গ্যাছে গ্যাছে দাঁলি

আমাকে কখনও তুমি যেও নাকো ভুলি ।

হাতাল স্বপ্নের সাথে মিশে করি খেলা

মৃদু আলো ভরে দেয় ভালবাসা হয়ে

সমুদ্রের বৃক বলে, যাবে নাকো ভোলা

শীতের সন্ধ্যা আসে ভরা পাত্র নিয়ে ।

মনের শিররে আজও কে দাঁড়ায় জেগে

মৃত্যুর মূখ ভাসে গোধূলির আগে

আকাশে বাতাসে মিশে স্মৃতির কোঠায়

দোলা দেবো চিরদিন বেলা অবেলার ।

ঋতুচক্র

হরিচরণ সরকার মন্ডল

পাগল করা খর রোদ ভিজিয়ে দেয় শরীর
তখন বৃষ্টির কথা মনে হয় বৃষতী বিধবার
যত মেঘ বিবাদ নিয়ে ক্ষরে ক্ষরে হারিয়ে যায়
ঘরে বন্দী দিন ঋতুচক্রে রঙের আগুন
এ বেলা ভীষণ একলা হয়ে যাই।

কবিরা আগুনের রঙে নগ্ন ছবি আঁকলেও
আগুনের যাদুকরী তন্ত্রাশ পার না
তখন ভস্মের কথা মনে হয় কুমারী কুস্তির
মত ব্রত নিমগ্নতা নিয়ে পুড়ে পুড়ে ছাই
ঘরে অম্বাবর্চিদিন ঋতুচক্রে রতিবাস
এরাতে ভীষণ একলা হয়ে যাই।

গৃহ বৃন্দ থামেনি খরোরোদে গা গরম করে নিই
নারীকে ছোঁব না নদীতে নামবো না মিথুন সাতারে
আনন্দের পাল্লায়ে সিঁধ হচ্ছে শরীরের নুনজল
এ সিন্ধুকণে ভীষণ একলা হয়ে যাই।

গ্রামটা বৃন্দক্ষেত্র

বরুণ মন্ডল

গ্রামটা গ্রাম নেই আর
গ্রামটা বৃন্দক্ষেত্র
আতঙ্কে রাতি কাটাই
সকালে গুণছি লাশ

এখনো পলাশ ফোটে
যাতাসে কাঁপছে ধূল
গ্রাম আর গ্রাম নেই
পুলিশে দিচ্ছে টেল

তুমি কি একলা বাবে
আমি চলো সঙ্গে বাই
গ্রামে মেঘের ছায়া
ডাকলে আসে না কেউ

গ্রামটা গ্রাম নেই আর
গ্রামটা বদ্বন্দ্বিত
ভয়েও সে তো মরতে হবে
এসো না সাহস দেখাই

ঐতিহাসিক

প্রবীর কুমার সামন্ত

প্রলম্ব করেছো বলে চিন্তার পাহাড়ে খনস নামে
কেন এই হীনমন্য ব্রতধর্ম? নিরোজিত হলে ?
শান্তিযোগ্য অপরাধ ভানা মেলে ছৌ মেয়েছে বাজ
লোকায়ত জীবনের ভিক্সিম্লে অগ্নি জেরলে দিলে ।

যে যার বিশ্বাসে বাঁচে—আদিগন্ত খোঁচানো কি ভালো ?
সহ্যের সীমানা পার, স্পর্ধা আজ কতো দূরে হাটে—
এই কি কল্যাণধর্মী-প্রান্তদর্শী নেমেছো খেলার—
নিভৃত কবর খুঁড়ে গভীর শেকড়ে মাটি কাটে ।

নীতিভ্রষ্ট ধিক্ ধিক্ ! রোষবাহি কদ্বন্দ্ব ব্যাপকতা
চক্রান্তের পথে পাড়ি চিহ্ন পড়ে গোপন বিকরে
বিষবৃক্ষ উৎপাটন লঘুগদর করে না তো ক্ষমা
কতো মৃত্যু দম্ব ঘর ভস্মস্তম্ব হাহাকার করে ।

পৃথিবীতে প্রতিবাদ মানবতা কোথায় দাঁড়ায় ?
শুদ্ধ কেশপদর নয়, কি যে ভীতি বাঁচার তাগিদে—
ছিঁড়ে দিলে তাজাফুল পদপিষ্ট মাটিতে মটোর,
জীবন হয় না কেন পরস্পর বোঝে সাদাসিঁদে ।

নিসর্গ

মানিকলাল মন্ডল

গ্রামের ভেতর গ্রাম

অসংখ্য গাছগাছালির ভেতর পাখির সুর

দুপুর, গভীর রাত

একটা বাদুড় ওড়ে ঝটপট্

শব্দ কিংবা না-শব্দের মতো রহস্য মেলে চামচিক

ত্মেন ক্ষমতা নেই যে তুমি

জোছনার ভেতর উড়ে গিয়ে বাঁশগাছের ডাল থেকে শব্দ এনে

আমার কানে গুঞ্জে দাও

শীত পড়লে কী দারুণ লাগে বলতো রোদ

গাছ থেকে যে পাতাটা এইমাত্র

খসে পড়ল

তার কাছ ঘেঁষে বাঁস

ধীরে ধীরে দেখি ওর চোখে জল কিনা !

অভিমানহীন

স্বপন পট্টনায়ক

জলের বুকে কোন দাগ থাকে না

ভ্রমিক নাব্যতীর একদিন গৃহাশ্রয় শেষ হয়

শোকে স্বপ্ররাসী প্রোতে

জল খেলা করে জলের সাথে

অখণ্ড জলের বুকে তার কোন চিহ্ন থাকে না

শুধু কথা-না-রাখার ইতিকথার উপর

জমে যায় অসংখ্য শামুক

পতঙ্গ পরাগহীন, বিবর্ণ পাতার ফাঁকে

ফুল টেনে নেয় রোদ থেকে মধু

প্রথমদুখী স্মৃতির স্মৃতি সহবাস

বাবার পাখির কঁাকে চুরি যায় শীতলত্ব

অভিমান, পরিতাপ খাতব নোঙর
সবারই অন্তত একটি কুল থাকে
যা নিসেন্স রংয়ের মত
যা ক্রমশঃ স্তিমমান পটশন্য হয়
জলের বৃক কখনো শূন্য থাকে না
জলের বৃকে কোন দাগ থাকে না
জল অভিমানহীন

কালো রুমাল সোমনাথ প্রধান

কখনো কখনো কালো রুমাল
ছুঁয়ে দিয়ে যাও বৃকে,
এলোমেলো করে দাও
বহুদিনের বাঁধা সুরগুলো
কালো রুমালের গিঁটেই ভাস্কর হয় পৃথিবী !
আর আমার স্বপ্নময় রোদ্দরের একটি করে পালক
প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ে অজস্র দৃশ্যটনার ।
তীর ধনুকের বিচ্ছেদ বিষ
বার বার ছিন্ন ভিন্ন করে বৃক,
একটি কালো রুমাল সমস্তোতা করার জন্য
বৃকের উপর ঘনিয়ে আসে ।
প্রশংসার জড় পদার্থদের মতো
আমরা নীরবতা ভাঙতে পারি না ।

সুপার সাইক্লোন বিরথচন্দ্র মন্ডল

রূপোলি দিশিরে একান্ত ছারার
নিবিড় প্রতীকার ছিল কাকডাকা ভোর
লেখু পাতার গম্ভে ক্লাতিবোধ দূরে থাকে,
বৃষ্টিতে নদী জল ফুঁসে খড়-চালা ছুঁতে চায় ।
বে-পরোয়া জীবনে তবু গম্প কথ্য
মাটির দেওয়াল জুড়ে ছেয়ে যার স্বপ্নময় স্মৃতি,
এ ভাবেই বসে যার মহানদী

নক্ষত্রা জেগে থাকে শীতহাওয়া মেখে

আজ মোহমর রাত-কথা নেই,
ষষ্ঠ জন্মাংসবে মেতে ওঠা দুটি হাত
মায়ের কোল নিয়ে মোহনার মিশেছে,
শিশিরে শূন্যতা নেই,

অমের কাড়া-কাড়ি ছিন্নাস্তরের মতো ।

সাইক্লোন সুপার আখ্যায় নিয়ে গ্যাছে সব
পড়ে আছে প্রত্নতাত্ত্বিকের বিবর্ণ ছবি ।

ব্যক্তিগত পঙ্ক্তি

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

১. সিন্ধা অপরূপা নারী দেখলে

আমার ভালবাসতে ইচ্ছা করে ।

আমি এক কাঙাল

রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া কিছুর না

প্রবন্ধ মানুষের ভাষায়

এই ভাষা ও অক্ষর আমাকে শেখায়

ভালবাসা মানুষেই জানে

মানুষের ভেতর আমি কাঙাল মানুষ

২. বলা ? না, তারও অপেক্ষা রাখি না, ছড়িয়ে বাই

পথের ধূলোর, চরণ ধূলোর ।

বলার শতধারারও ছড়িয়ে ধার না, যতই চাবুক

নাচাও যতই পা নাচাও সিংহাসনে !

৩. সারা ভুবন ঘুরে ঘুরে শান্তির জন্য অজলিবন্ধ

ভোর কাছে দাঁড়িয়েছি, মৃত্যু ।

ওয়েবসাইট

বিশ্বজিৎ ঘোষ

এতকাল ঠিক কি কি কথা বলেছি তোমার ?

বেশ কিছু হতাশা লিখেছি গত মরশুমের

সে সব তোমার ভালো লাগেনি ।

কম্পিউটারের সাহায্যে বসে এমন অনেক বকুনি

দূরদেশ থেকে বয়ে আনছে নীল ওয়েবসাইট ।

খবরের কাগজে আজও দেখিছি
 আট ও ছ'বছরের ফুটফুটে মূখে বি ষ ডেলে
 মা আশ্বঘাতী
 গত সনে বর্গা জমিতে ফসল ফলেনি
 এ সনেও চাষ মন্দা,—
 ধারদেনা বিপদলতা পেলে
 প্রান্তিক চাষীর ঘরে খাবার জোটে না
 কতদিন ভুলাবে বলো মা
 কচিমুখে শব্দ জল দেলে ?
 আমি তো আপন মনে
 বীজধানও সৈন্দ্য করে খাই
 এই বৃষ্টির আগে শেষ হবে সমস্ত রসদ
 তারপর একটা আশ্বিনে ঝড়— ।
 ওয়েবসাইট খুলে তখন দেখো
 কোন এক নতুন উপত্যাকার আমার হেঁটে চলা ।
 সে পথ পেয়ে গেলে
 নতুন ভাবনার
 নীলকণ্ঠ পাখীটাকে
 আমার শিশুকে দিলে আকাশে ওড়াবো !

কোথায় রাখব এত নীল

আরিফ ইকবাল খান

এত নীল কোথায় রাখব ?
 নব'গ্রহ নীল কালশিটে ,
 যেন সেই আদিম দাস শরীর !
 সমুদ্রের মত নীল—
 অফুরন্ত নীল
 কোথায় রাখব এত নীল ?
 নীলবাড়ি আজ মৃতদের স্থান ।
 অঞ্জলি ভরা নীল হাতে

আমি চললাম
 উৎস থেকে দূরে
 উৎসের সম্মুখে
 ভোমাদের শাভেচ্ছা পরগুণি
 থাক কিছদিন
 পথে যদি দেখা পাই
 স্ক্রুটিস অথবা নীলকণ্ঠে
 ধরিলে দেব হেমলকের পাত,
 আর আমি বিগ্রাম নেব
 মৃত্যু কোলে শীতল উৎসারে ।

সংসারী

মদুরারী মোহন সামন্ত

সে আমাকে দেখে না দেখার ভান করে চলে গেল
 এক ঝলক রক্ত মূখ, মাকড়সার পা, ডেকে আর
 অসুখ বাড়াবো না । কটা তার বেড়ার মতো সাবধানে
 যতটা নিরাপদ রাখা যায় । কোনদিনও তাকে
 ভৎসনা করিনি, সাক্ষাতে ঝগড়া হয়নি, সংসারের রাগ ।
 কাজের মেয়ে আছে, বাজারের ব্যাগ তখনও উঠেনি
 অমনিবাস তিন দিনের ছুটি নিয়ে তিনমাস বেপান্তা !
 চায়ের কাপ শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছি । মেচিস্টো কোথায়
 ও মেয়ে দেখনা-কে শোনে কার কথা, নির্বাক রান্না ঘরে গেছে ।
 ওষুধের ব্যাগ নিয়েছি । চ্যাটার্জী বাড়ীর বড় নাতি
 বছর পনের আর বাচবে না বুঝি । বসন্ত গুটিকা শরীরে
 ব্যাঙাচির মতো খেলছে । আমার আগে তিন জন
 ওলাক্ আউট দিয়ে গেছে, ফিরতে দেরি হবে ।
 রোগী খেঁটে সঙ্গীতে মন বসে না । খেঁদো গলার
 ঘরেই ভালো লাগে একা । রোগী লিপি নিয়ে
 মেটিরিয়া চট্‌কালে পর শক্তিশালী মনে হয় ।
 সে আমাকে দেখে না দেখার ভান করে চলে গেল
 আমি গোসাপের মতো মূখ তুলে তাকাই নির্বিকার

ঘর মন মানদুখ

নিলয় মিত্র

তাকে স্পষ্ট ফিরিয়ে দিয়ে
ঘরে ঢুকলে, দরজাটা বন্ধ করে এলাম ।
বেশ ভেতের পুড়ে এসেছিল সে
চোখে থেকে বাবার মিনতি
মুখে করুন বিজ্ঞাপ্তি, না হয় একটু বসি ।
তাকে চলে যেতে হল
ঘরের মোহাণ, দেয়ালের হাসি মুখ
ছড়ানো ছিটানো রাশ রাশ বই
বাসী রজনীগন্ধা কি ভীষণ লজ্জনার মতো ।
তুমি তাকে বললে না বসো
দু' হাত ধরে ইচ্ছে জানালে না, একটু থাকুন,
শূন্য সাদা বিছের মতো তার দিকে চেয়ে
স্পষ্ট বলে দিলে
এবার তাহলে আসুন...

অনিবার্য অক্ষরবৃত্ত

দেবাশিস ভট্টাচার্য

তোমার সামনে অক্ষরগুলো
দাঁড়িয়ে থাকে সারিবদ্ধে
তুমি বলো এটা ভালো, ওটা ভালো নয়
আর ভালোয় না-ভালোয়
কবিতার জন্ম মৃত্যুও...

হঠাৎ কখন কোন্ খেলালে
আমিও দাঁড়িয়ে গিরে পংক্তিমালায়
দাঁড়িয়েই থাকি ঠায়
কথার মোচড় টপকে
চলে যায় যে যার স্বভাবে

তুমি জানতেও পারোনা
ওদেরই মতো আরও একজন
কবিতার মৃত্যুমুখ দূরে ওঠে অনিবার্যতায় ।

অবাধ্য প্রত্যাশা

রীনা গিরি

জানি তুমি চলে যাবে
আমার উঠোন খালি করে
হয়তো একদিন ভুলে যাবে
আমার উপস্থিতি নীল ঘূমে
গম্পহীন পেলব অঁধার

জানি না কী ভূঁঞা ফোটে চোখে
অবাধ্য প্রত্যাশা ঠোঁটে নাচে
বুক চাপা কিছুর কথা
স্মৃতিতে ঘোরেফেরে
অযাচিত রোজকার ভিড়ে

উচ্চাঙ্গ সংগীত

বিপ্লব রায়

ভাবি গুম হ'লে থাকবো এবার
চতুর্দিক কি—দীর্ঘশ্বাস...
এক থেকে দুই । দুই থেকে আরো—
আরো উচ্চাঙ্গ...

চেনা অচেনা মুখগুদলি
এক উচ্চাঙ্গ সংগীতে বাঁধা !

উঠানে দাঁড়িয়ে ভিখারির মুখে
শব্দমালা । দাও আমার একটু ফ্যান দাও...
হায়রে দৈব—হায়রে আল্লা । বিকৃত
অঙ্করে কি এই শব্দ ? কি এই বাক্য—
“জনগন মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা... ”

পরিবর্তন

মোহম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ

প্রেমিকার সাথে কথা কাটা-কাটি হলে
গতিমুখ পরিবর্তিত হয় স্রোতের
ভালোবাসা পথ হারালে
নবস্তরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে
আমরা সকলে যদি পাথর হয়ে যাই
তবে পর্বতশৃঙ্গ ভরে যাবে ব্যারিকেডে ।

মৌনমুখর

দেবপ্রী দাস

নীল শূন্য হৃদয় আমার
নিজেই বৃষ্টিনা ওকে...
ঝড়ুর মত পরিবর্তন করে দিক্
কচি পাতার ঢাকা মন মেঘ গতি
আগমনে অনেক বাধা—সেতু ।
ত্রিলন-আনন্দ ভেঙ্গে যায়
যা ভালোবাসা দিয়েও ফিরে পাওয়া যাবে না ।
তবুও বোঝাতে পারি না
অশান্ত দুরন্ত না পাওয়ার বেদনা মেঘ
মৌনমন কনকলতাকে
লতানোই ওর স্বভাব সংকেত
কার সাধ্য মানাবে ওকে ?

আগুনের কোন স্নেহ নেই

মানিকলাল মণ্ডল

সম্ভবতঃ নাচ-গান ভুলে গিয়ে আলো
আগুন হয়েছে
তাই আগুনের কাছে কোন স্নেহ নেই
যে শিশুটি মায়ের কোলে চাঁদ দেখছে
তার কাছ থেকে কোনদিন চাঁদ ছাড়াবো না বলে
কবিতা লিখতে যাই

একটা চুমু খেয়ে শব্দগুলোকে বুকে টেনে নিই

খিস্তি খেউড়গুলো ভুলে যায় ক্রোধ

গা থেকে মূকুল খুলে নিও না ফাগুন

তোমাকে গল্প শোনাযো ।

তোমাকে দিতে চাই

অনামিকা ব্যানার্জী*

তোমাকে দিতে চাই আমার পৃথিবী

যে পৃথিবী একটু একটু করে গড়েতোলা

যে পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, মোহ সবকিছু আছে...

নিজেকে উজাড় করে সাজানো পৃথিবী

তোমাকে দিতে চাই সেই কবিতাগুলো

যেগুলির প্রতিটি লাইন তোমাকে মনে করে লেখা

যে কবিতাতে তোমার সঙ্গে জড়ানো আমার সবকিছু

তোমাকে দিতে চাই আমার সমস্ত ভাবনা

যে ভাবনার অবকাশে আমি শুধু তোমাকেই ভেবেছি

তোমাকে দিতে চাই মেঘলা দিনের অঝোর ধারা

যে বৃষ্টি তোমার সম্পূর্ণ দেহকে ভিজিয়ে দিবে যার

তোমাকে দিতে চাই সেই সুবাস্নাত দিন

নতুন আঙ্গিকে নীল আকাশের বুকে পেঁজা মেঘগুলো

নিজেকে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিতে চাই তোমার সাথে

আমার সব স্বপ্ন-আশা-আকাংক্ষা তোমাকে দিতে চাই

আমার শরীরের প্রতি অনু-পরমানু তোমারই জন্যে

শুধু তুমি একবার চেয়ে দেখো

আমি কি না দিতে পারি তোমার জন্যে

তুমি শুধু একবার আমাকে ডেকে বলো

আমি তোমাকে চাই

আমি পেয়ে যাব আমার সমস্ত পৃথিবীকে

তুমি চাইলে কিনা দিতে পারি আমি

একটি প্রেমের কবিতা

সৈয়দ কওসর জামাল

এতটা রহস্যময় ভেবেছি তোমাকে

যেকোন মূহুর্তে তুমি রাতের আকাশ হতে পারো

আর আমি

তোমার দূরের এক ধূসর গোখলিমান

আলোর ভরিলে দিতে চাইছি পৃথিবীকে।

ভেবেছি যতটা ঠিক, আসলে তো কিছুই ছিলনা

আকাশ ছিল না কোন মাথার ওপরে

ছিল টুকরো এক মেঘ, আর তার ছায়া

নেমেছিল চোখের ওপরে

হাওয়া এসে দাঁড়াতেই স্বচ্ছ তলদেশ উঠে এলো।

সান্ত্বনার মতো ওই যে তারাটি

অশ্রুকার বিদিশার নিশার ফুটেছে

তার কোন রহস্যের রেখামাত্র নেই

প্রেমিক কবির তার উজ্জ্বলতাটুকু নিয়ে গেছে

কতোকাল আগে।

রহস্যের কিছু নেই—তবু তার ভূতগুস্ত ছায়া

কখনো হঠাৎ

তোমার মুখের ভাজে সময়ের রেখাচিহ্ন আঁকে।

ব্যাকরণ

সাগর বিশ্বাস

ক'জোকে ক'জো কিংবা

অশ্রুকে অশ্রু বলতে নেই

জানি, কিন্তু কালোকে

সাদা বলতে শিখিনি কখনও

অনুরূপে সাদাকেও কালো।

আমার এ অধিগত ব্যাকরণ

প্রয়োগ করোঁছি যতবার

ততবারই কাটাভার
খিরেছে আমাকে, বিক্ষত
করেছে দেহ-মন ।
বলেছে সকলে —
এখন রঙের রাজ্য
সংখ্যাভাবে বেড়েছে অনেক
কালো আর তত কালো নেই
সাদাও থাকেনা আর
শব্দ শব্দ বেশে ।

আমি বলি : দেশে
ওবে সেই ব্যাকরণখানি
ইতিমধ্যে পোড়াল কি
কোনও কুরেবার ?

আল্লনার মৃৎ

বীরকুমার শী

আল্লনার মৃৎ দেখি
সে মৃৎ কার ।
আল্লনা ভাগা ভেবে পাণ্টে নিই তা
তবু একই মৃৎ—সে মৃৎ কার ।
চোখে-মুখে জল দিই
মৃৎখোশটা মৃৎ দিতে চাই
তবু সেই মৃৎ—সে মৃৎ কার ।

সাইক্লোন

দেবলীনা খাড়া

প্রতিটি শিরার আমার কন্ট
অস্থি খুঁজে দেখলেও পাবে নিতান্তই
দুর্ভাগ্যে ব্যথিত কথার ইতিহাস ।
কঠিন শিলা খুঁড়ে এ বুকোও পেতে পারো
দুর্ঘটো অকুণ্ঠিত জ্বালা বিকলের ম্বল্ল ।
তুমি বলে দাও—একি সাইক্লোন, না অন্য কিছদ ?

ভাঙা পিঁড়ির নিকে তাকালে পাবে আজও

প্রথম পুজোর গন্ধ...

তবুও এই শব্দকন্যা শরীরে একটা পিন ফুটিয়ে দেখে

কতো কষ্ট। তুমি কি পাওনি এখনো ?

এ ঝড় নয়, নয় কোন সাইক্লোন...

বাস্তব যদি তুমি বদ্বকতে

এই রাতির সুপার সাইক্লোন

তোমার স্বপ্ন বলতে কখনোই ডাকতাম না !

জানালা খুলে রাখি

অজয় নাগ

তারপর তুমি

একে একে খুলে দিলে অবরুদ্ধ জানালাগুলি

এলো হাওয়া

এলো আলো

জীবন তখন দ্যুতিময় ।

জলজ হাওয়ার ছিল প্রাণ-সঞ্জীবনী মন্ত্র

আলোর ছিল উত্তরণের কলা কৌশল,

জীবন তখনই হলো হিরণ্য দ্যুতিতে ভাস্বর ।

স্বপ্নলোকের পথে যাওয়া শব্দ...

তখন কণ্ঠে বীণার সুর-স্বকার ।

আকাশের ডাকে, মন স্বপ্ন-মজিল,

স্বপ্নময় চৈতালী তিস্তিল রাত ।

হাতছানি দেয় কৈশোর আকাশ

ফাগুয়ার রাঙা সোনালী প্রাস্তর

পথ-সুদূর তেপান্তরের পথে পাড়ি,

পথের দুধারে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, শব্দসারী...

জানালাগুলি খুলে রাখি প্রতিদিন

ওপারে নবতর জগতের হাতছানি...

ঠিকানা

দিলীপ মুনোপাধ্যায়

রাস্তাঘাট থৈ থৈ জল বৃষ্টি কর কর
হাওয়া বৃষ্টি তুমুল লড়াই
এখনই কেটে পড়।

কোথার দাঁড়াই? গাছের নীচে মাটির সোঁদা গন্ধ
আকাশ জাগে ধুমোর পাড়া
ঠিকানা সব বন্ধ।

পথেই থাকি পথে রাধি পথেই রাত্রি পার
তুমুল জ্বরে বৃষ্টি এসে
জ্বালো সংসার।

চেউ / ৯১

কালীপদ প্রধান

আমি নদী দেখিনি কোনদিন
নদীর স্রোত দেখেছি
তুমি কি দেখেছ
ভেসে ভেসে নির্ণিশেষ হতে
দেখো আর মিলিয়ে নিও

আমি নদী দেখিনি কখনো তবু
টেউ-এর ভেসে যাওয়া
আমার জীবনের সঙ্গে একাকার
মিলে-মিশে পূর্ণজন্ম স্বপ্নের দেশ
ভেসে যাওয়া টেউর সংসার
আমার বড়ই আপন বড় চেনা

অভিবাস্তি অথবা আশ্রয়ন

মৃণালকান্তি নন্দকর

কখনো কি করা পাতার কান্না শুনেনো?
নীলবে নিঃশব্দে বনন বৃন্তহৃত হয়...

১০০ / কবি বতার কাগ

পাখিরা হরতো বা কাঁদে, কীট পতঙ্গও ।
মারের যুদ্ধের কান্না আরও তাঁর স্পর্শকাতর,
যেহেতু বেদনা নীল অব্যক্ত অথচ আত্মনিঃস্বরণ ।

আমরা সভ্যতা গড়ি, এবং গর্ব করি নিজস্ব জুগোলে
সমস্ত সহানুভূতির সর্বকিছুরে হারিয়ে
এখন হরে উঠেছি বোবা ফসিল ।

সবাই এক যান্ত্রিক চক্কর লক্ষ্যহীন অভীশার,
তাই নির্বিবাদে হত্যা করি চার পাশের
বৃক্ষ, জল, নিম্নতর জাতব প্রজাতিগুলো
স্বার্থে অথবা অর্থহীন আত্ম তৃপ্তিতে ।

তবুও থাকি না, নিজস্ব অনভূতিগুলোকে
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতে করতে
মারি ভাই-ভাইকে অথবা নিকটতম প্রতিবেশীকে ।

তবুও—

আজও আমরা নিজেদের সভ্য বলি
গড়ি এক যান্ত্রিক সভ্যতা !

ষষ্ঠীয় জীবন

অসীমা মহান্ধি

সুবর্ণরেখার জলে গা ধুয়ে মেয়েটি যখন মেয়ে হোল
তখনও ভোর হয়নি
চুরি করে চাঁদ দেখেছিল তার শিশুর অপাবৃত রূপ
লক্ষ্য পায়নি মেয়ে, ভয়ও না শিহরণও জাগেনি
চাঁদ, তার বন্ধু ছিল পাশে ।

মেঘদূত পড়েছিল মেয়ে একবার, দু'বার বহুবার,
ছোট্ট করে লিখল 'তুমি আমার ষষ্ঠীয় জীবন'
চেয়ে রইল অক্ষরের দিকে...
'পোড়ার মুখী' বলে নিজেকে গালি দিল—হাসলও
এবং দুমড়ে মূচড়ে পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে দিল হাওরায় ।

শরীর ভারী হয়েছে, চোখের কোনে সময়ের দাগ,
 সুন্দরীর দুর্নাম গেছে এখন ।
 বন্দুরা মিলে আবার সেই সুবর্ণরেখার চড়াইভাতি—
 নদীর জলে নিজের মূখ দেখে হাসল মেয়ে
 কিন্তু ডালের ছায়ায় টলটল করছে এ কার মূখ ?
 ঘাড় তুলে দেখল আকাশের বুকে সে হাসছে, হাসছেই
 বন্দুরা কখন চলে গেছে, তাকে নেরনি...সেও যারনি
 মূখ তুলে চেয়েই আছে, মূখ লাল হোল
 সে জ্বলছে,—পড়ছে, গলে গলে পড়ছে তার অস্তিত্ব
 একাকার হয়ে যাচ্ছে তার মেয়েবেলা—
 ফিস্ ফিস্ করে বলল মেয়ে 'ভূমিই আমার দ্বিতীয় জীবন' !

একদিন না একধিন

ঈশানচন্দ্র মিশ্র

সমুদ্রের ঝিনুকগুলো
 মন্দলাগে নাকো দেখতে
 কারো সাজঘরে বিরাজ করে
 কারো গলায় সাজসজ্জায় বা হাতে
 খুশি হয় সে ।

অতলাস্ত সমুদ্রতল
 নির্বিকার নির্বিবল জীবন
 ভাবেনি সে এত সমাদর তার
 স্বতন্ত্রকার সান্নিধ্যে ডাও নিশি যাপন
 রক্তে বারুদ মেশে ;
 ক্লস সীমারেখাহীন
 যৌবন অনন্ত কালের মিতা
 শূন্য তারিরে তারিরে স্থখের আঘাণ
 নাচঘরে মদালসা ঠুংরির প্রেম বিলাসিতা
 ভরস্ত শরীরী চাঁদ ।
 ছিঁল সাগরজলে
 জ্বোলুস ছিল শরীরে ঝিকিঝিকি
 সাধ হ'ল স্বাদ নিতে লোলুপ যৌবন
 রংচটা খাল ওঠা আর বাকী আছে কী
 বাপধন, একদিন নিতে হয় বাধ ।

দু'টুকরো

অঞ্জন নায়ক

অপলক অশ্বকার
বিষমতা ভেসে
ক্যানভাসের সহাস্য রেখার ধরা দাও
শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।
আমার চারুধারে নবর থাবা
মাকখানে সুতো
ছেঁড়া ইতিহাস বুকে নিয়ে
বেঁচে থাকার স্বপ্ন এখন
রক্তের ফির্নাকি
এটাই আশ্রয় কবিতা।

ঝান্ন না ব'লেই

তুহিনশত্রু প্রধান

হাতের মৃষ্ঠোর সব কিছুর কি ধরা ধার ?
রঙের প্রতি কোবে আকাঙ্ক্ষার বিনীত আরোহিন
কিশলয় বুকে পরিণত হ'লে

ফুল চাই
ফল চাই
ছায়া চাই
পাখির সংসার
আসবাবগন্ত

একবার শিরার শিরার বয়ে চলে বিষ
হাতের মৃষ্ঠোর এত কিছুর কি ধরা ধার ?

গুচ্ছভাবনা

শেফালী দাস

জীবনের অলিগলি পার হয়ে
আজ ভীষণ ভালবাসছি উত্তরণ,
ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ দিনগুলো
হারিয়ে গেছে গভীর অশ্বকারে---

অমাবস্যার রাতে নিশ্চন্দ্রদীপ ঘরে
 ক্ষুধার কাতর শিশুরা—
 সব মিলিয়ে ধূসর গেরস্থালী
 রাত ভোর বৃষ্টির স'গত্যস্যাভানি
 উগ্রে আসা ভিক্ষে কান্না,
 গদ্যে মরে ছুঁপিপেঁজের চোরাগলিতে ।
 আজ শুনসান্ ঘুঘু ডাকা দুপুঁরে
 সব ভাবনা জড়িয়ে যাচ্ছে ভাবনার গাছের পাতায় ।

টিকোন মজলিস্

নিরঞ্জন মাইতি

সাময়িক ঘটনাবলী, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য—বিছাণ্ডির সৃষ্টি করে কে প্রকৃত দারী? পরস্পর দোষারোপ প্রবল চাপ সৃষ্টি—একালের বিধি । অনেক ঘটনার কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যায় । কালেভদ্রে প্রকাশ পায় । যেটুকু প্রকাশ পায়—তা অসম্পূর্ণ । কিন্তু সত্য কোন কালে অসত্যের সঙ্গে থাকে না । বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশমুখী হয় । সেই পট-ভূমিতে একটি বাংলা প্রবাদ বাক্যে ইতিবৃত্ত অনুসন্धानে প্রয়াসী ।

বহু আগের ঘটনা । কোন এক ব্যক্তিকে 'উধো মুখোজ্জ' বলে দবাই ডাকতো । পোষাকী নাম ছিল—উৎসাহ মুখোপাধ্যায় । নামের আড়ালে 'কম জোর' লক্ষ্য করা । 'বাবা' হওয়ার সম্ভাবনা নাই । কালবৈশাখীর ঝড় মনে উঠলো । রেহাই পেতে নানা পন্থা নিতে চাইলো । কারণ পিঁড়ের অধিকারী কেউ ছিল না তার । সেকালে সমাজে 'নিরোগ প্রথা' চালু ছিল । সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো । কিন্তু কোন সে মহাজন তার প্রস্তাবে রাজি হবে? অনেক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি দূর পাড়ার 'বুধো পিঁড়িত' প্রস্তাবে রাজি হয় । চিরপরিচিত বুধো পিঁড়িতকে দূর প্রান্তের লোকেরা বজ্রেশ্বর পিঁড়িত বলে সম্মান জানানতো । উপবৃত্ত শিকিত ব্রাহ্মণই—এই প্রথার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো । পিঁড়ের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা স্বত্বের দেখতে না চেয়ে 'বাবা' হয়ে কসলো । উধো গিমির 'বাজা নাম' ঘুচলো । পুত্রের নাম রাখা হল—দেবকী নন্দন । নাম বাছাই করতে অনেক ঝড়কুটো পড়তে হয়েছে । ঘটনা প্রবাহ কেবল তিন জনের জানাজানিতে আবদ্ধ রইল ।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে ঘুরে আসে । দেবকীনন্দ বড় হতে থাকে । জ্ঞাত পিতা উধোর চিন্তার অবসান ঘটে । নিশ্চিত মৃত্যুতে আর কোন বাধা নাই । পুত্র কৈশোরে পা রাখলো । কিন্তু কালচক্রে—জ্ঞাত ও

অজ্ঞাত পিতা—দুইজনই পরলোক গত হ'ল। লোক সমাজে জ্ঞাত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল। দেবকানন্দন—পিণ্ডস্বাস্থ্য তৃপ্ত করতে পিণ্ড প্রদান প্রক্রিয়া শুরুর করলো। গর্ভধারিণী মাতা কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে একটু চিন্তিত হ'ল। বিধা জড়িত কণ্ঠে 'বৃধো পিণ্ডতের' নামে পিণ্ড প্রদানের ইঙ্গিত পুত্রকে দিল। পুত্রের তাৎপৰ্য জানার ইচ্ছা থাকলেও অবকাশ ছিল না। দেবকানন্দন বৃধো পিণ্ডতের নামে পিণ্ডদান করে বসলো। 'বীজ' প্রদানকারী পিণ্ডের অধিকারী হয়—একথা সবলোকে কর। এম্বুলে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পিতা—কে পিণ্ডের অধিকারী হয়েছিল—বিচারের তার ধর্মশাস্ত্রের উপর রইল। পাঠক দেখলো—উধোর ঘাড়ে বৃধোর পিণ্ড প্রদান।

বিশেষতকের শেষ পানে, পৃথিবী নামক গ্রহটি একবিংশ শতাব্দী ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বিরাট এখান আর নাই—একটা ঘরের এ-ধার ও-ধার। দুইয়ের গ্রহ-গুলি এখন পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী হতে যাচ্ছে। কিন্তু একাল-সেকালের অস্বাচীন সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এ কালের দেবকানন্দন পিতৃ পিণ্ড প্রদান কালে অজ্ঞাত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করে। সমাজে সেকালের সংস্কৃতির নবতম সংস্করণে হাজির হয়। সব কালের দেৱা বলে দাবী ওঠে; কেউ বাধা দিলে ধোপে টিকে না। অঘোষিত কাগিল যুদ্ধে পাকিস্থানী হানাদারদের অবস্থার পেঁছায়। অধিকাংশ হানাদার জীবন বিপন্ন করে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পূর্ণ করে। অবশিষ্ট বেগতিক দেখে আত্মগোপন করে।

সফল

নীলাজান কুমার

উৎসব ভোমার পথে। না হয়
থেকে গেলাম অনন্ত নির্বাসনে!

কিম্বর্ত্তা নিয়ে এ বাচার ভগ্নী নেই;
অস্তঃস্থল স্বাধীন।

মহীরুহের স্বপ্ন দেখাই অবোধ বৃক্ষবীজে।

টুকরো থেকে এক
অলোক সেন

ক.

খড়গপুর ছাড়তে না ছাড়তেই
আকাশ মেঘলা, আর
বালেশ্বরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি
একেবারে কোল ছুঁয়ে যায়...
(কি করছিল মেঘ বৃষ্টিরা !)

আজকে ভরা প্রাণ
এখন রাতের শব্দ,
—বিশ্ব এখন গুটিয়ে যাচ্ছে...

খ.

রেল কামরার ছোট কপে
হালকা নিয়ন আলো,
আমি তখন নির্ণিমেষ
তুমি বিষয়ে বাকহারা

আকাশ এখন তারায় ভরা
আলোর ভরা অচেনা সব তারা
বিশেষ এখন নবীন বরণ ।

জল গড়াচ্ছে রাস্তায়
মনোজ্ঞ নন্দী

কলকাতা পুরসভা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে একটু আগেই
দেখলুম—পুলিশের শাদা ড্যান ফুটপাথ থেকে তুলে নিল
একজন ভিবিবির নিঃপ্রাণ শরীর ।

এক মৃৎ দাড়ি-গোফ, হাত-পা শব্দ কাঠ—
সুরেন ব্যানার্জী রোড জুড়ে তখন সবে মাত্র সম্ভা নামছে

১০৬ / কবিতার কাগজ

আর ঠিক উল্টো ফুটপাতে, রিগালের সামনে তখন
গাড়ি-বারান্দার নীচে রোগা লম্বা মেয়েটি জুড়ি
করে হাসল। খুবই বিসদৃশ লাগল তার কপালের
ত্রিশূলচিহ্নিত লাল টিপটি।

আর আশ্চর্য তখনই অজ্ঞান বৃষ্টিধারায়
ধুয়ে যাচ্ছে দেখলুম প্রাত্যহিক চূষণের দাগ,
ধূষণের চিহ্নগুলি তার সমস্ত শরীরে...
আর তখনও জরের শিখর ঝুঁজছে দেখলুম
কিছু খোজা, ভিখিরি, বেশ্যা ও দালাল।

অদূরে ৩৫৬-খারা বলবৎ করার দাবিতে সভা করছে
ভূগমূল কংগ্রেস। রাষ্ট্রীয় সংস্থা কেসরকারীকরণের
বিরুদ্ধে মিছিল যাচ্ছে গোটা
লেনিন সরণিজুড়ে বাম সংগঠনগুলির।

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে মলিন সন্ধ্যার সব ফুটপাত।
জল গড়াচ্ছে রাস্তার...

একটি দিনের খসড়া

শংকর কর

এমনই রৈখিক জীবন। মাথার উপর কামদেবের
লম্বা প্রজ্জারা মাটিকে মাখাচ্ছে সেই প্রচ্ছদ ছেঁড়া
চাঁদের স্নিগ্ধ আলো কি রকম স্বপ্রিল। জ্যোৎস্নার
কোলে মৃৎ গুঁজে দু'কুড়ি মেঘ মনের ভার্টা
বলে নিয়ে আসছে। স্মিতহাস্য বাতাসও। স্বপ্নে
রূপালি আলোর বৃষ্টিস্নান নির্ণিমেষ নিবাক দেখি।
আচমকা বিদ্যুৎপূর্ণভাবনারা ধর খরিয়ে কাপে।
এক ঝাক সত্যি বৃষ্টির কাদায় আমি ভিজে, চোখের
কোণে দু'ফোটা জল। জ্যোৎস্না রমণীর হাত ধরতে
পারিনি বলে ভোর আসছে ধীরে একান্ত সমীহে।
একটি দিনের কাছে ঝলমলে রাতি নিভাস্ত
অবশ, মন খারাপের সময় ফিরিয়ে দিল, অনেককেই
দেয়, সবার জন্য নয়, রাত ভোর আগমনের মৃৎ।

বনালীর শাখায় শাখায়

রবীন্দ্র সিংহ রায়

বৃষ্টির আঁচলে অতিথি রোদের নগ্নহাসি

মেঘমালার স্বপ্ননাড়ি ঠিকানা

আমি খুঁজেছি মোহমী মৃৎ

অজান্তে ভেঙেছে কখন দেহের তরঙ্গ উল্লাস

মর্তিমর্তীর শব্দরূপ

প্রবল পিঙ্গল বর্ণে যেন তাই

আগামীর প্রশান্ত রূপরেখা

সেই মৃৎ, সেই চোখ ভাবায় লাজুক অহঙ্কার

গোল স্তিমিত প্রহর...

ঘনীভূত স্তম্ভতা, উৎফুল্ল আলো

গুপ্তকথা বলে যায় বনালীর শাখায় শাখায় ।

ভেঙে গেছে সাজানো কৌশল

নিমগ্ন রাত্রির গহনে লেন-দেন দৌহের নিবিড় সম্পর্ক

চুপিসারে আশ্রয়ন জ্যোৎস্না রঙ...

নীল উত্তাপ বিন্যাসে এক পঙ্ক্তির ওপর

আমাদের শ্বেতাঙ্গ পরত কেঁপে যায়

হিসেবের পলাশ আর হিসেব মানেনা

বৃকের নদীজল—নীল সঙ্গম

ক্ষীণ হর নল্ল সুরের নিকণ মায়া

সবুজ পাতার শাস্বত বর্ণরহস্য স্নিগ্ধ সবুজ

আমরা ছুঁয়ে আছি

ভেঙে গেছে সাজানো কৌশল !

বেগনি রঙের শাড়ি

নাটক □ মধুসূদন মুনোপাধ্যায়

মুনোপাত

'বেহুলা মানে কী? মানে কী? বেহুলা মানে মাটি?
মাটি মানে খাল, বিল, নদী, নালা, গাঙ চিল?
বেহুলা মানে কী কলেজে ষাওয়ার আগে মা
গুঁছিয়ে দিচ্ছেন মেয়েকে তার বাস ও ঘর?
কোথায় তোমার বাস, কোথায় তোমার মাটি, জিন্সের
কোন পকেটে তুমি পুরে রেখেছ বাংলা ভাষা,
তোমার কোন স্তন পথের পাঁচালি?'

(সমস্ত ইংরেজীর ছাটীকে / সুবোধ সরকার)

কিছুদিন আগেই আমরা একুশে ফেব্রুয়ারী পেরিয়ে এসেছি। এ'বছর প্রথম এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কালার টেলিভিশন ও দৈনিক সংবাদপত্রের দোলাতে এ'বছরটি সমগ্রমতোই আমাদের ব্রেকফাস্টের টেবিলে মর্তমান কালার পাশেই হাজির ছিল। বিশেষ ক্রোড়পত্রের প্রথম পাতায় ছোপ ছোপ রক্তের দূর্দান্ত অলংকরণে সালাম, বরকত, জব্বার—১৯৫১ সালে ঢাকাতে যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দি়েছিলেন। বাংলা বর্ণমালার উচ্ছ্বাসিত হরফে সেদিন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল তাদের কথা। স্বভাবতই সেদিনের জন্য বাতিল হয়েছিল মাধুরী দীক্ষিত কিংবা ফ্যাশান-দুনিয়া। শূদ্ধমাত্র পিছিয়ে না পড়ার ভাবনা থেকে কিংবা পরে কাউকে কঁধ ঝাকিয়ে জ্ঞান দেওয়ার জন্য সেসব নিবন্ধ আমরা কেউ কেউ খুব মন দিয়ে পড়েছি।

আবার আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ সকালে বাজার, দুপুরে অফিস এবং রাজনীতি, সন্ধ্যায় ইংলিশ মিডিয়াম সন্তানের হোমটাস্ক কিংবা হাতের মটোর ছত্রিশটা চ্যানেলের অডুইডি রাতে ছর-সাত খাটের গদিতে শারীরিক বিছানা—এসব পরিপাটি গৃহসজ্জার ভিতরেই দেখে নিয়োছি ‘খাসখবর’—বাংলাদেশের শহীদবেদিতে মাল্যদান।

আমাদের এইরকম মূঢ়মূঢ়ে তেলেডাজা জীবন থেকে যদি কেউ নিজের মূদ্রাদোষে একা হয়ে যায়, রক্তকরবীর কিশোর কিংবা সালামের কাছে বারবার ছুটতে হয় একটুখানি শূন্যশীল জীবনের পরিচর্যা, ব্যবহৃত শরীরকে বেগনি রঙের শাড়ির উদ্ভাস দেওয়ার অঙ্গুত তাগিদে—তখন তার সেই কতযন্ত্রণার মূখোমুখি দাঁড়াতে পারবে কি আমরা?

একটা ব্যক্তিগত, পরাবাস্তব সাক্ষ্য পেরিয়ে সে অনারাসেই খুঁজে পায় তার একটা নিজস্ব জানালা, যেখানে ঋণীর জলের মতো কিশোরী ঘুঙুর রেভেনিউ স্ট্যাম্পের উপর সেই যারা আমাদের স্বাক্ষর হাতের দিকে তাকিয়ে মূচকি হাসে, কাছে ডাকে তখন কি কোনো দারই অনুভব করবে না আমরা? নূন্যতম অপরাধবোধও কি আমাদের পিঠে বন্ধুর মতো হাত রেখে একটুখানি সতর্ক করে দেবে না আমাদের? তাহলে, পরবর্তী জন্মের কাছে কোন আশ্বাস রেখে যাব আমরা? কোন বীজ অঙ্কুরিত হবে তাদের পাললিক জমিতে?

(বলাকা মঞ্চে ০১-৫-২০০০ নাটকটি প্রযোজিত হয়)

একক অভিনয় : দেবপ্রী আইচ

মঞ্চ : বিনোদ মাস্তা

আলো : কৌশিক ঘোষ

প্ররোগ : উৎপল সৌনচার (প্রথম অভিনয়)

প্রযোজনা : অফিসার্স ক্লিয়েন্স ট্রাব। কে. টি. পি. পি

(অভিনয়ের পূর্বে নাট্যকারের অনুমতি প্রয়োজন)

প্রথম দৃশ্য

(টেপে গান চলছে)

‘ওঠো ওঠো রে বিফলে প্রভাত বয়ে যায় যে...’

গান চলতে চলতে মাঝপথে থেমে যায় । লোডশেডিং ।

সুলতা : ষাঃ এই সকাল বেলাতেই পাওয়ার চলে গেল । এই (স্বামীকে)
নাক ডাকছে দেখো । ওঠো ওঠো । আপনারা নিশ্চরই অনেকে ব্লুম
থেকে উঠে পড়েছেন । শুনতে পাচ্ছেন পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা কি
হুসন পড়ছে :

সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বুঁটি বাদল গেছে ছুঁতে
রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে...

ষাঃ, থেমে গেল । মনে হয় এর মা ওকে কিছুর একটা করতে ডাকল ।
আপনাদের মনে পড়ছে, তারপর কি আছে ? আমার কিন্তু বরবারি মনে
পড়ছে ।

ছুটির দিনে কেমন স্নরে
পুজার সানাই বাজার দূরে
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে

রামাঘরের চালে ।

(স্বামীকে) হ্যাঁ হ্যাঁ চাপিয়েছি । দয়া করে উঠে মুখ ধুয়ে নিন ।

আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ কি পরের স্তবকগুলো মনে মনে বিভ্রিবিড়
করছেন ? আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি :

শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের পরে
ছোট্ট মেয়ে রোন্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি
চেয়ে চেয়ে চুক করে রই
তেপান্তরের পার বৃষ্টি ওই
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি ।

জানেন, আমি না আমার বাবাকে একবার বলেছিলাম বেগনি রঙের একটা
শাড়ি কিনে দিতে ।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, কি হবে বেগনি রঙের শাড়ি নিয়ে ?

আমি বলেছিলাম, কেন, রোম্পুরে দেব ।

রোম্পুরে দিবি ! বলেই বাবা তো হোঃ হোঃ হেসে উঠে বলল, তার মানে শাড়িটা পরবি না খালি রোম্পুরে দিবি ?

আমি তখন বলতে চেয়েছিলাম : একটা ছোট্ট মেয়ে বেগনি রঙের শাড়ি রোম্পুরে না দিলে দূর থেকে সবাই বুঝবে কি করে যে এখানেই রাজ্যের বাড়ি ।

ঠিক ও'রকম গুঁছিয়ে বলতে পারি নি, বলেছিলাম : রাজ্যের বাড়িতে একটা ছোট্ট মেয়ে বেগনি রঙের শাড়ি রোম্পুরে দেয়, পড়োনি আমার বই—এ ?

বাবা আবার হেসে উঠে বলল, 'ওঃ আচ্ছা আচ্ছা তোর মন্থস্থ হয়ে গেছে !' আমারও মন্থস্থ আছে, বলেই বাবা শূন্য করল :

থাকত যদি মেয়ে ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া
তর্কনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে কষে
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শূন্যিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে—

কিন্তু মামণি, বেগনি রঙের শাড়ি না'হয় জোঁগাড় হলো কিন্তু পক্ষিরাজের ঘোড়া কোন বাজারে পাওয়া যাবে ?'

আমি বললাম : বাজারে কেন পাওয়া যাবে ? দাঁড়াও তোমাকে এনে দিচ্ছি, বলেই বইয়ের বাঁশ থেকে তর্কুনি মোম প্যাণ্টেল বার করে স্কাইং পেপারে বড় করে এঁকে দিলাম । চিনতে যাতে একদম ভুল না হয়, বড় বড় করে ঠিক বানানে লিখে দিলাম : পক্ষিরাজ ঘোড়া । বাবা খুব খুশি হয়েছিল ।

(স্বামীকে)

হ্যাঁ চা হয়ে গেছে ! ঐই ঐই কি দম্‌টুঁমি হচ্ছে । চা-টা ছাঁকতে দাও একদুনি মা এসে পড়বে কিন্তু ।

আচ্ছা তোমরা পাওয়ার প্ল্যাণ্টে কি ঘোড়ার ডিমের কাজটা করো-বলো তো ? সকাল থেকেই লোডশেডিং...

(ঠিক এ'সময় পাওয়ার আসে)

টেপ বেজে ওঠে,

মেল আঁখি জাগো জাগো

থেকো নারে অচেতন...

(টেপের নবটা কমিয়ে দিয়ে)

ওকে বাবা, ঘোড়ার ডিম কপাটা উইজো করে নিচ্ছি, হোল তো ?

এই শোন. তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ।

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারী জানো তো । এই বছর প্রথম এই দিনটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেল ।

না, কিছু হবে না । শিল্পাঙ্গন ক্লাব থেকে বিপিনদারা এসেছিল, আমাকে কবিতা পড়তে বলছে । মিতুলের কাছ থেকে জেনেছে, আমি এ'সব ভালোবাসি । বাব ?

বিকাশকে কথা দিয়েছ, ঠিক আছে, অন্য একদিন বাব ওদের বাড়ি, বিবাহ-বার্ষিকী ? তাহলে কালকে তুমি যাও, পরে আরেকদিন নাহর দুজনে মিলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে ।

এটাকে তুমি আদিত্যোত্তা বলছ ?

একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটা তোমার কাছে এতটাই ফালতু ?

জানি, তোমার প্রোমোশনের পরীক্ষার এনিমে কোন প্রশ্ন থাকবে না । তুমি কুইজের মাস্টারও নও যে তোমাকে জানতে হবে সালাম-বরকত-জুবর এই নামগুলো কোন বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ? এছাড়া আমি তোমার আইনত স্ত্রী, এবং তোমার সন্তান আমার গর্ভে, অতএব আমার অভিকেন্দ্র নিয়েও তোমার বিশদুমাত্র দৃষ্টিপাত নেই ; আমার ভালো লাগা-খারাপ লাগা তোমার কাছে নিছকই গৃহপালিত প্রতিক্রিয়া এটা অভিমানের কথা নয় স্বর্গীর ; এইসব বিশেষ দিনে আমাদের কি সামান্যটুকু লজ্জা হতে নেই ?

(টেলিফোন বাজে)

—হ্যালো,

হ'্যা বলছি । আপনি কে বলছেন ?

ও আচ্ছা, বিপিনদা. হ'্যা বলুন কি বলছেন ?

প্রতিনাটক ? কালকেই—সের্বিক ।

এত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব ?

না না আমি আগে অল্পস্বল্প করতাম, হ'্যা একটা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাইবলে—পরিচিত নাটক ? কালকেই বলেছি—কি নাটক বলুন তো ?

ওঃ রক্তকরবা ? পদ্মোদা ?

আচ্ছা, আচ্ছা মাঝখানের কিছুটা ধারগা । আ-আমি ভেবে দেখছি, তাছাড়া কাল আমি দ্রুতে পার কিনা বুঝতে পারছি না । না, না শরীর খারাপ নয় । অন্য কারণ । না, না চোটা জো করছি । আপনি একবার সন্ধের দিকে ফোন করুন, হ'্যা । রাব্বি ।

(শ্বশুড়ির প্রবেশ)

মা, আপনার পুজো হচ্ছে গেছে, দাঁড়ান চা-টা গরম করে দি। বিপিনদা ফোন করেছিল। কাল ঐ একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে ওরা একটা অনুষ্ঠান করবে, ওরা একটা শ্রুতিনাটকে আমাকে নিতে চাইছে, কবিতাও পড়তে বলেছে। কেন মা? কী অসুবিধা হবে বলুন? আমি তো কাজকর্ম সব সামলেই যাব। না, মা আমার একটা কবিতা পড়ে কিংবা নাটক করে দেশ এমনকি ছুঁ উদ্ধার হয়ে যাবে না, উদ্ধার করতে যাচ্ছি না, একুশে ফেব্রুয়ারীকে যারা আদিখোতা বলার মতো স্মার্টনেসে পেঁছার নি, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটু শ্রদ্ধা জানাতে চাই।

(শ্বামীকে)

শোন দীপক, বিকাশের বিবাহবার্ষিকীতে আমি যাব না—আশা করি, তুমি আমাকে জোর করবে না। এটা যা-ইচ্ছে-তাই নয়, তুমি তো বন্ধুতেই চাইছো না।

(শ্বামী চলে যাচ্ছে)

কি টিফিন করে যাবে না? এত রাগ হয়ে গেল? বেশ বাবা, ওসব পরে ভাবা যাবে—টিফিন করে যাও,

(হাত ধরে, শ্বামী হাত ছাড়িয়ে নিরে চলে যার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পাশের ঘরে মিডুলকে ঘুম থেকে তুলে)

মিডুল, ভোর কী বলার দরকার ছিল যে আমি কবিতা ভালোবাসি!

হ্যাঁ ভালোবাসি—কিন্তু তুই এখন আমাকে বলে দে তো...

আমি এখন কবিতার কাছে যাব না আমার শ্বামীর কাছে যাব? একুশে ফেব্রুয়ারীর অগ্রপাতের কাছে যাব নাকি বিবাহবার্ষিকীর ফুলের বোকের কাছে কাছে গিয়ে ক্লারেড রাইস-চির্লিচকেনের ঢেঁকুর নিরে ফিরে আসব?

আমি কি নন্দিনীর কাছে যাব যে নন্দিনী খুব সহজেই বলতে পারে, :

‘একসময় কোঁকে উঠে ওর কণা ফলার মতো দুটি আমার মনের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, ‘আমি তোমাকে জানতে চাই।’

আমার কেমন গ্যা লিউরে উঠল। বললুম, ‘জানবার কী আছে? আমি কি তোমার পুঁথি?

সে বললে, পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।’ তারপর কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, ‘রজনীর কথা আমাকে বলো। তাকে কিরকম ভালোবাস।

আমি বললুম ‘জলের ভিতরকার হাল আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে। পালে লাগে বাতাসের গান আর হালে লাগে জেউরের নাচ—’

এইসব কণ্ঠস্বর বুকসেলফের ভিতর ঘনির মতো শুইরে রেখে আমি কি
১৯৪ / কবিতার কাপড়

বন্দনার ন্যাকা ন্যাকা গলার 'এই জানিস তো ও না আমাকে এবার
ভ্যালে-টাইনস ডে তে একটা হাঁয়ের নেকলেস দিয়েছে, কেউ একজন বলবে,
তুমি কী দিলে ? হেসে ঢলে পড়তে পড়তে আরেকজন বলবে, 'ও দিয়েছে
ভ্যালে-টাইন স্পেশাল KISS

(কে-আই-এস-এস.)

(হাসি)

বল, এসব শুনব ? আমি এখন কোথায় যাব ?

কোথায় যাওয়ার কথা আমাদের ?

আমাদের কী কোন প্রতিশ্রুতি ছিল ?

নাকি,

'প্রাসাদের আলোর ঝলসানি

পড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়

এবং শরীরের ভিতর বাসা গড়ে

লক্ষ নিবোধি পতঙ্গের ।'

তাহলে সমস্ত সত্তার নিয়ে আমাদের কি কেবল পাটি'শেষে টুথপিকই হবে এক-
মাত্র শেষ পরিচালণ ? রত্নকাত পুরুষের নাক ডাকার আওয়াজটাই কি হবে
আমাদের চরম গফলতা ?

(ভেঙে পড়ে, গেয়ে ওঠে, 'ওগো দুখ জাগানিরা তোমার গন শোনাব...)

—এইসব গান কাকে শোনাযো কে আমার দুখ জাগানিরা হবে এখন
মিতুল ?

—আমার সেই কিশোর ? হ্যাঁ কালকেও এগোছিল স্বপ্নে ।

এসেই কি বলল জানিস :

'বাজারদরের চত্রে বেশি কালো টাকা ঘূষ দিয়ে

জীবনকে পাওয়া যাবে জেবে

যেন কোনো জীবনের উৎস-অশ্বেষণে তারা সকলে চলেছে ।

পরপরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ;

আমি বললাম : জীবনানন্দকে তো আমরা যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছি, উনি কি
এখনও আমাদের নামে কমপ্লেন করছেন ?

ও বললো, তোমরা তো হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে ফেলেছো, তোমাদের আর
কি ভাবনা, হাইহোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন কিছু পড়ে শোনাকেন—তোমরা
একটু ধৈর্য ধরে বসো, তারপর শুরু হবে শেরারমাকে'টে কোথায় লগ্নী করা যার
তাই নিয়ে কিছু ভাবনাছিন্তা । এখন মগে আসছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আমরা সবাই চুপ । একটা ছেলে মগে ঢুকে বলল : রবীন্দ্রনাথ জ্যামে পড়ে
গেছেন । আমাকে মোবাইলে এইমাত্র জানালেন তিনি আজ সহজপাঠের চন্দ্র
বিস্ময় ব্যবহার পড়াকেন বলে ঠিক করেছিলেন, আমাকে পড়তে বলে দিলেন ।

আমি এই স্নানের জেনারেল সেক্রেটারী, আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে হাজির করতে না পারার জন্য, পরে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব, বলেই পড়তে শুরু করল,

‘বাগগাছে বাদর । যত ঝাকা দেয় ভাল তত কাঁপে

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে অচিড় দেয় ।

বাগগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাদর গেল চাঁপাগাছে ।

কী জ্ঞানি কখন ঝাপ দিয়ে নীচে পড়ে ।’

শেষ হতেই চটপট হাততালি ।

আমার দূর সম্পর্কের এক অবিবাহিত দিদি, যার বাবার পরস্যা নাই বিয়ে দেওয়ার, তবু চোটা করছে, দিদিও রোজ মুখে সাবান ঘসছে, টিণ্ডি দেখে দেখে জ্বীম কিনছে, হাসি হাসি মুখ করে শট্টিওতে গুণীন ফোটো তুলিয়েছে, সে দেখি মগে ঢুকে বলে উঠল : বহুবিন্যাসহ ব্যুটির সম্ভাবনা আছে ।

একটা লোক আমার পিঠে হাত রেখে পানের ছোপ পড়া দাঁত নিয়ে হাসতে হাসতে বলল,

‘আজ মাংস-টাংস হলে বেশ হয় না ?

কত করে কেঁজি চলছে এখানে মাংসের ?

হঠাৎ দেখি একজন নেতা মগে উঠে বলছে,

‘বন্ধুগণ, আমরা এখন বিশেষ দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে...’

বলেই দেখি আর কিছু বলতে পারছে না । কিশোর মূচকি হেসে বলল, ওর জিবে ফেবিকল দিয়ে রেবেছিলাম, আজ যখন ও দুপুরে আরাম করে ভাতঘরু দিচ্ছিল ।

তোমার দাদা, মানে আমার পরম পূজ্যপাদ স্বামী যে তার চালা ছিল জ্ঞানতাম না, আমাকে এসে খুব বকল তারপর কিশোরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, কিছু একটা ব্যবস্থা করো ।

কিশোর হাসতে হাসতে গিয়ে নেতাকে উল্টোদিকে কদলিয়ে দিয়ে বলল— কিছুক্ষণ থাকুক, সব ঠিক হয়ে যাবে ।

তোমার মা তাই দেখে হে“ই হে“ই করে উঠল, ভদ্রলোকের ছেলেকে এইভাবে হেনস্থা ?

ঠিক সেইসময় তৃপ্তি মিত্র গয়ে উঠল,

‘পোষ তোদের ডাক দিয়েছে আররে চলে আর আ...’

তখন দেখি তোর বিপিনদা আমাকে বলছে, একুশে ফেব্রুয়ারী আসবেন তো ?

এখন তুমি আমার বল, আমার কি করা উচিত ? আমি একুশে ফেব্রুয়ারীতে যাবো, না বিকাশের বিবাহবাধি কীতে,

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুমনা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ সুমনাই তো ।

এই সুমনা—

কেমন আছিস ? কতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হোল—চিনতে পারছিছিস তো ?

—তুই একটু মোটা হয়ে গেছিস—তারপর কেমন আছিস বল । এটা কে ?

তোর ছেলে—কি মিষ্টি দেখতে রে— (একটু আদর করে)

কোথায় থাকিস ? বাম্বা এইটুকু বলসেই ভর্তি করে দিইছিছিস । ইংলিশ

মিডিয়াম নিশ্চয়ই—এখন কি স্কুলে থাকিস না ফিরিছিস ? ফিরিছিস তাহলে

চল একটু বস। ঘাক কাম্পিন কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বললে পারি না ।

সুমনা, তোর মনে পড়ে তুই, আমি একবার নাটক করতে কোথায় একটা গিরে-

হিলাম—কল শো ছিল, ফেরার সময় আমাদের ঘাটীডোরটা গেল খারাপ হয়ে ।

তুই খুব চিন্তায় পড়ে গেলি, বাড়িতে বকবে, তোকে আর নাটক করতে Allow

করবে না, আমি অতো কাউকে পরোয়া করতাম না, ভয় ভয় আমার একটু

কমই ছিল, বাইহোক গাছের তলার বসে সবাই ভাবছি কি করব কি করব সেই

সময় সবল একটা গান ধরল,

হাল খুলিয়া দে

ও তোর নাও ডাসাইয়া দে...

দিন ছিল পূর্ণিমা । চাঁদ আমাদের সবাইকে খুব আদর করে আলো

মাখিয়ে দিচ্ছিল, আমরা সবাই অন্যরকম হয়ে থাকিলাম ।

তোর মৃৎটাকে দেখে মনে হচ্ছিল একগুচ্ছ আমের মঞ্জরী । ঝড়ে পড়ে ঝাঙকার

ভয় নিয়েও সোল খাওয়ার কথা ভাবিছিস ।

উৎপলদা খুবই দৃষ্টিস্তা করছিল—খুবই স্বাভাবিক, director মানুষ,

দৃষ্টিস্তাতে ওর খাদ্য তালিকার অন্যতম ব্যঞ্জন । নাটকের শেষে টিফিন সেটুকু

দিইয়েছিল সেটুকুই যা খেয়েছিলাম, নাটকটা মনে আছে ?

সেই ত্রেখটের 'দাগ'

নাৎস' বাহিনীর একা বোম্বা আমার প্রেমিক, শেষে আমারই পিঠে একটা

উল্ক এ'কে দিইয়েছিল কিংবা দিতে চেয়েছিল সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা এক

মুহূর্তে উখাও হয়ে গিয়ে আমার খুব ভয় করতে শুরু করল তখন তুই আমার

মাসি অত হাসিখুশী, তুইও পাথর হয়ে গেলি,

অথচ দেখ, নাটকের শেষে গাড়ি খারাপ হওয়ার আগের মুহূর্ত পৰ্বত আমরা

হেঁ হেঁ করে গান করছিলাম, আমাদের মনে ঐ উল্ক নিয়ে বিস্ময়মাত্র আশংকা

ছিল না, ভয়ও ছিল না । পরবর্তী শো-আগে পৰ্বত আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত

শাকব, এমনকী আমরা এখন এতটাই গড়গড় হয়ে গেছি যে সেই দৃশ্যটুকুর

আগে পৰ্বত আমরা তাই নিয়ে ভাববও না ।

কিন্তু এখন, নাটক ছেড়ে দেওয়ার পর, আমার এই বিবাহিত জীবনে কি মনে হয় জানিস আমার পিঠে সত্যিই উল্কির চিহ্নটা আছে। হয়তো অস্পষ্ট, কিংবা অকের গভীরে। এই চিহ্নিতকরণ মেনে নিলে, কাপড়চোপড় যথাসম্ভব ঢেকেছুকে গল্পগাটেরনা পরে সবার সঙ্গে সামাজিকতা বজায় রাখছি। হেঁদে হেঁদে কথা বলছি, কিন্তু খুব রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাবার ভয়ও লাগে—
তোরও কি এরকম হয় স্ত্রীনা ?

ঠিকই বলেছিস—উপায় নেই, ভালো খেতে পরতে পারছি, দার্জিলিং-পুন্ড্রী বেড়াতে যেতে পারছি, পুকুরে লেটেটে ডিঙাইনের লাড়ি পাচ্ছি, ইংলিশ মিডিয়ামের টাই খুলিয়ে আমার পুত্র আমাকে টা টা করছে, বিউটি পালারে বাওয়ার কথা ভাবছি, যদিও এখনও যাই নি—তাইতো ?

স্ত্রীনা, এই যে তোর সঙ্গে এত কথা বললাম, সব থেকে আশ্চর্যের কি বলতো—তুই আদতেই আমার সামনে নেই। আমি দেখলাম তুই ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিস, দু-তিনবার ডাকলামও, তুই সাড়া দিলি না, হয়তো তুই শুনতেও পাস নি, কিংবা অন্য কোন নামে এতটাই পরিচিত হয়ে গেছিস যে স্ত্রীনা নামটা তোর অনভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তোকে আর আমি বিরক্ত করিনি। কিন্তু কাকেই বা বলবো বল আমার এই সব কথা ? আমার পিঠটা তাকে দেখিয়ে বলব—

মাসি, মাসি দেখনা আমার পিঠেও উল্কিটা এঁকে দিলে গেছে কি না...

(কাদতে কাদতে হেসে ওঠে)

আনার ডারলাগ এখন আমার ডারলাগও হতে পারে অনায়াসেই। তবুও এঁটুকুই, আমি এখন বিনোদদার করা মন্ডের উপর দাঁড়িয়ে নেই, কৌশিকদার আলো পড়ছে না আমার উপর, উৎপলদার খেটেখুটে বানানো মোজার্ট বেটোফনের সিমফনি আমাকে আগলে নেই ;

কিছু না থাকলেও, আমি এখনও পারি সবারিকছুকে আমার সামনে আনতে।

তোকে যেমন এনোঁছি, বিনোদদা-কৌশিকদা-উৎপলদা সবাই আছে,

এবং আপনারা আছেন না।

কি আছেন তো ?

এনোঁছি তো আপনাদের ?

কিন্তু মাসি আমি এখন কি করব ?

দু মাস প্রেগন্যান্সির দোহাই দিয়ে ওরা আমাকে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে যেতে দেয়নি। অথচ বিবাহবাধিকারিতে নিয়ে গেল জোর করে।

সেখানে সবাই হ্যালো-বাই করল, হা-হা হি-হি করল, আর আমি সফট স্মিলকসে ছুঁকু দিতে দিতে দেখতে পাচ্ছিলাম—বন্যার জলের মতো বেপরোয়া সালাম

কামার হাতে ফুল দিতে আসছে তার সারা শরীর থেকে অবিরল রক্ত বরষে
তার উদাস গলার হাসতে হাসতে বলছে,

‘সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল ঝুঁড়ে আনি
তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোরা জনো
ফুল ঝুঁজে আনতে পারলে বেঁচে বাই—

তারপর আরো গলা তুলে বলল,

‘একদিন তোরা জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী

এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি—(কান্ডিতে কান্ডিতে)

নালাম, তোরা যা, আমি নন্দিনী নই, নন্দিনীর পাট্টুকু মৃৎস্থ করেছিলাম
শুদ্ধ, নাটকে একটা মেয়ে দরকার পড়েছিল বলে আমার ডাক পড়েছিল, আমি
আসলে প’চিশ অন’স্ব’ স্লিম স্ত্রী গৃহকর্মে নিপুণা শিক্ষিতা সঙ্গীতজ্ঞা
পাচ ফুট দু ইঞ্চি সুলভা রায় । আমার ঠোঁটে এখন লিপস্টিক, শরীরে গাসা,
চোখে দৃষ্টান্তি হাঙ্গামার্স স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী আমি এখন
প্রস্তুত !

ওরা এবার শুরু করবে । দু’চার পেগ পেটে পড়লেই ওরা বাঁদর নাচে । এইসব
celebration তোরা কোনদিন করতে শিখেছিস ? প্লীজ, তোরা এখন যা,
আমাকে কিয়ত করিস না, আমি একটুখানি সিপ’ দিত্তে ওদের সঙ্গে নাচবো—
না, দাঁপক তুমি আমাকে বারণ কোর না, আমি একটু নাচবই, কিছু হবে না,
আমি আশে আশেই নাচব, তোমার ছেলে পেটের ভিতর থেকেই নাচ শিখতে
চাইছে, ওকে কাম অন... (নাচ : ইংরেজী পপ মিউজিক)

সুলভা পড়ে বার এবং ঠিক সেই সময়ে শব্দ মিত্রের ক্যাসেট বেজে ওঠে ।

‘মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে

আমি সব দেবতারে ছেড়ে

আমার প্রাণের কাছে চলে আসি

যদি আমি এই ফুরিয়ে ;

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কর ;’

কে কে লাগানো এই ক্যাসেট ? (ক্যাসেট জোরে বাজতে থাকে)

প্লীজ বন্ধ করো, প্লীজ... (খুব জোরে চীৎকার করে ওঠে)

কিশোর, তুই আমাকে ভালোবাসিস ? আমাকে আঘাত করে তুই বেশ মজা
পাস বল ? তুই কেন এসেছিস এখানে ? এসেছিসই যদি আমি তোরা কোন
বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছি যে আমাকে ধুমড়ে মূচড়ে তোকে প্রতিশোধ নিতে
হবে ?

দাঁপক আমার খুব গা বমি বমি করছে। না, না ধরার দরকার নেই। ঠিক আজি। আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো প্রীজ।
তোমরা কিছ্ মনে করো না ভাই—বিকাশ তোমাদের এই আনন্দ অনুষ্ঠানে
একটু বিঘ্ন ঘটালাম, খুবই দুঃখিত—
'রুকাবট কে লিয়ে খেদ হেই...' (হাসতে হাসতে)
পরে আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(ফোন বাজে)

হ্যালো, হ্যাঁ বলছি।

হ্যাঁ সেদিন আমার শরীরটা ভালো ছিল না বলে যেতে পারি নি। কিছ্ মনে
করবেন না। না বিপিনদা আমি আর কোন অনুষ্ঠান করব না। না এমনিই,
হ্যাঁ রক্তকরবাঁ একবার ঠিক হয়েছিল করব, পার্ট! হ্যাঁ পার্টও অনেকেরই
নুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। না, না আমাকে বাদ দিন।
বললাম তো আর সম্ভব নয়—আচ্ছা আমারও তো একটা ইচ্ছে—অনিচ্ছের
ব্যাপার আছে নাকি!

প্রীজ আপনি আমাকে বিরক্ত কোরবেন না। (ফোন নামিয়ে রাখে)

(আবার বাজে)

হ্যালো, হ্যাঁ বলছি।

মিডুল, তুই কি বিপিনদার সঙ্গেই আছিস? তুই তো সবই জানিস—তাহলে
এসব নিয়ে আর জলঘোলা করছিস কেন?

বিয়ে হওয়ার পর তুইও যখন ঐ বিপিনদার লাগেজ হয়ে যাবি লাগেজের গারে
বিপিনদা তার নামের স্টিকারের আদ্যক্ষর সে'টে দেবে, তখন দেখবো কত
স্বাধীন মতামত তুই দিতে পারিস।

আমাদের বে'চে থাকাকাটাই ইন্ডার্ভিত্তিক। তোর দাদা বিশেষ কিছ্ ইন্ড্রিতে
আমাকে মেনে নিয়েছে। আমি হয়তো বিশেষ কিছ্ ইন্ড্রিতে তোর দাদাকে
মেনে নিয়েছি।

সেইসব ইন্ড্রা আমাদের স্কেয়ারারফট মোজাইক স্কোরে আরাম এনে দেওয়ার জন্য
কবিরাজ মশায়ের মতো বলে দিয়েছে—

'ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না'

একটু অন্যরকম হাসতেই বলে,

'ঐ হাসিটিতো ভালো ঠেকে না। ঐ যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে,
ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ।' (হাসতে হাসতে)

স্বতন্ত্রাং আই এম সারিয়া । তোর বিপিনদাকে বলে দিস তন্য কাউকে দেখুক ।

বেগুনী রঙের শাড়ি কিনেছিস ?

বেগুনী রঙ ? কেন হঠাৎ ?

কি, রোদ্দুরে দিবি ? (হাসতে হাসতে)

হঠাৎ থেমে

কিন্তু আমি যে আর পক্ষীরাজ ঘোড়া আঁকতে পারি না মিতুল ।

(কলিং বেল বাজে)

এই কেউ একজন এসেছে । পরে কথা বলব, রাখছি এখন হ্যাঁ !

(দাঁপকের প্রবেশ)

ওঃ তুমি । এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ? শরীর খারাপ নাকি ?

বাবা, কত ফল এনেছো—আমি কি একা এত খেতে পারি নাকি ?

(একটা খাম দেয় হাতে)

বাবা, খামের ভিতর কি আছে গো ?

নাম ?

নাম ঠিক করে ফেলেছো । দেখি দেখি ।

(খামটা ছিঁড়ে)

মেয়ে হলে মেঘনা, ছেলে হলে সায়ক ।

বা : ভালো নাম ।

আমিও দুটো নাম ঠিক করে ফেলেছি ।

কি নাম !

ছেলে হলে সালাম !

চমকে উঠলে যে ! সালাম মুসলমানদের নাম ! নামের গারে কি মুসলমান হিন্দু লেখা থাকে নাকি ! এই নাম তো আর এমনি এমনি আসে নি—একটা বিবাহবাণীকী রাতে বমির গল্প থেকে এর উদ্ভব, ছেলে যদি সব শুনেন নিজের ব্যাভিল করে, করবে—কিন্তু আমি ওকে ঐ নামেই ডাকব । সালাম ।

চীৎকার করো না । তাছাড়া ছেলে যে হবে তার তো কোন মানে নেই, মেয়েও হতে পারে । মেয়ে হলে নাম রাখাষ নন্দিনী !

তার মায়ের বিয়ের আগের থেকে রিহাসাল রুম থেকে যে নন্দিনী ল'ণ অবস্থাতেই নড়ে চড়ে, কথা বলে, গান গায় ।

এটা কিন্তু খাটি হিন্দু নাম, নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি থাকবে না ।

সালাম নামটা রাখা কোনো মতেই যাবে না বলছো । দেখো একটা সামান্য নাম তোমার সামাজিকতাকে কেমন তুড়ি মেয়ে ভরমার করে দিচ্ছে, আচ্ছা এসময় যদি কবি শব্দ ঘোষ বলে ওঠেন :

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো ? / চতুরতা ক্লান্ত লাগে খুব ?
 মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধুপ জ্বেরলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে / বসে
 থাকি ? / মনে হয় পিশাচ পোষাক খুলে পরে নিই / মানব শরীর একবার ?
 প্রাবৃত সময় ঘরে বসে আনে জলীয়তা, তার / ভেসে ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশরন
 লাগে / যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো । চতুরতা ষাও / কী বা আসে ষার ।
 লোকে বলবে মর্থ বড়ো / লোকে বলবে সামাজিক নয়—
 এই প্রথর সূর্যকিরণ সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে ?

না গো, আমারও নেই—

তাই আমি একা একা, না একা নয়, স্তম্ভনাকে ডেকে, বিনোদ দা, কৌশিক দা,
 উৎপলদার, হনুপ্রেরণা মৃগনাভির মতো আমাকে নিয়ে চলেছে আগামী একুশে
 ফেব্রুয়ারীর দিকে—হয়তো গোপনে, নীরবে ; জ্যোৎস্না আলোর উদ্ভাসে
 একুশে ফেব্রুয়ারীকে গিয়ে আমি বলবো—

‘জানো আমি আমার ছেলের নাম রেখেছি সালাম ।’

সালাম—সালাম করে ডাকতেই রাজহাঁসের মতো শূন্যতা ছড়িয়ে ও ছুটে
 আসবে আমি ওকে কোলে তুলে নিতেই ও ফিক্ করে হেসে বলবেই—

শীতের বেলার দুই পহরে

দূরে কাদের ছাদের পরে

ছোট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়

বেগনী রঙের শাড়ি...

আমি শুনতে পারছি. পিছন থেকে আপনাদের ভিতর থেকে কে যেন বিড়বিড়
 করছেন,

থাকত যদি মেবে ওড়া

পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া

তকুনি যে যেতাম তারে

লাগাম দিয়ে ছুটে...

(এ সময় আবার ফোন বাজে)

আচ্ছা এই ফোনটা কি বিপিনদার ফোন ?



যুগ-যুগ-জিও বইমেলা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

বই মানে পুস্তক, বই মানে গ্রন্থ
যতো ধরি, যতো পড়ি ততো চার মন তো !
বই মানে 'বুক' আর বই পুঁথি—কেতাবও
বই লিখে দিকে-দিকে মেলে খ্যাতি-খেতাবও ।

বই হয় গদ্যের, পদ্যের ও কবিতার
বই হয় ছোটদেরও, আগাগোড়া ছবি তার !
বই হয় ধর্মের, কর্মের ও নাটকের
দাম শূনে ঘাম ছোটো ক্রেতা আর পাঠকের ।

বই হয় প্রবন্ধ—নিবন্ধ—ফিচারের
বই আশা-ভাষা-ঠাসা-জ্ঞান-বোধ-বিচারের !
বই হয় উল-বোনা, আতপনা-উল্কির
বই সুখে-দুখে ভরা ; গড়া ফুল ও ফুলকির ।

বই হয় লেখা-শেখা, আঁকা-নাচ-গানেরও
ডাক্তারি-কবিরাজ, জাদু-অভিষানেরও !
বই হয় রাশিরাশি খুঁশি-হাসি-গল্পের
সাধ থাকে বেশি-বেশি, সাধ্য যে অল্পের ।

কেউ ভোবে বিষয়েতে, ভাজি পড়ে ললাটেই
কেউ মাতে মদ্রণে, পুস্ত্যানি-মলাটেই !
কেউ দ্যাখে কাগজের, কোরাঁলিটি-টাইপও
ঝুড়ো খোঁজে 'পি. টি. এস্', 'সি. টি. এস্' ভাইপো ।

কেউ বই কেনে, কেউ খায় চানা-ফুটকাও
ভেলপুঁরি, ঝালমুড়ি, চা বা কফি কুছ খাও ।
মোগলাই-ফিশকাই, পাবে চিলি-চিকেনও
পকেটেতে মালকড়ি বেশি ক'রে ঠিক এনো ।

কোপ্তা-কাবাব-চপ, কাটলেট ও ওমলেট
য়েজালা ও বিরিয়ানি খেয়ে ফিরি হোম্ লেট।
ব্রোজই ঘাই, খাই-দাই, বইমেলা প্রিয় তাই
বইমেলা, বইমেলা, বৃগ-বৃগ জিও ভাই !

কদল ও পাখির হুড়া

কার্তিক ঘোষ

ময়ূর

গাছের মাথার
মেঘ করেছে
মেঘ যেন এক পাহাড়...
এই না দেখেই
একটা ময়ূর
পাখম মেলে তাহার।
বনের ধারে নাচছে ময়ূর
আর দেখে বা বাহার।

টিয়া

টিলাক টিলাক
ডাকছে কে রে
ঠোঁট টুক টুক লাল...
একটা তো নয়
একশো টিয়ার
কাক দেখেছি কাল।
আর রে টিয়া
টুপদর কাছে
লক্ষা খাবি ঝাল ?

দোয়েল

উলুকে কুলুকে
বনের ধারে
ভোর হয়েছে যেই না...
একটা দোয়েল

ঝুমটা জেঙে
শিস দিয়েছে সেই না ।
ছটফটে কী
দোরেল পাখি
এই আছে তো এই না ।

পদ্ম

পাব আকাশে
লাল টুক টুক
সূর্য উঠেছে...
দিবির জলে
ওই তো কেরন
পদ্ম ফুটেছে ।
ফুলের রানি
পাপড়ি মেলে
ভোমরা ছুটেছে ।

চাঁপা

সবুজ সবুজ
পাতার ফাঁকে
সোনার বরণ ফুল...
ওই তো চাঁপা
ছড়ার সুবাস
দুলছে দোদুল দুল ?
চাঁপার বনে
দখিন হাওয়া
খুশিতে মশগুল ।

গাদা

হিম পড়েছে
গাদার বনে
ফুল ফুটেছে হলদে..
আর রে পাখি
হলদ পাখি

টুইচ টুইচ দোলদে ।
হলদে গাঁদার
বাগান জুড়ে
আল না—এনে দোলদে ॥

ভূতের ছড়া
কালিদাস ভদ্র

শ্যামা ওড়া গাছে ল্যাংড়া ভূত
পা দু'লিয়ে নাচে
ক্যাওড়া ঝোপে চ্যাংড়া ভূত
ভরেই কাঁপে গাছে ।

কাণ্ড দেখে মামদো ভূতের
হেঁচকি ওবে খুব
তালপুকুরের ঠাণ্ডা জলে
দৌড়ে বিল ডুব ।

তালপুকুরের তাল গাছে এক
পেছনী ছিল বনে
মামদো ভূতের কাণ্ড দেখে
ঢিল ছুঁড়ে দেয় কষে ।

ঢিলের চোটে মামদো ভূতের
ভাঙলো মাথার খুঁলি
খুঁলির থেকে বেরিয়ে এল
আজব যে রঙ তুলি ।

অহো বৃষ্টি

দেবস্মিতা জ্ঞানা

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপূর
কাপূর সুপূর চালে !
বৃষ্টি পড়ে কমকমিরে
কালো দাঁঘির জলে

বৃষ্টি বলে ধামবো না আর
আমার স্বভাব এমন—
বখন তখন ইচ্ছে হলেই
করবো জোরে কামন !

গরম কালে বৃষ্টি কে চায়
পাবে কি এক ফোঁটা ?
ভাপসা গরম চলেছে শব্দ
করেছে ঘামের ফোঁটা !

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়া

এক

ওই দূর, দূর গা
পূজো হ'াতে দু'গা
শহরের ফুলে-ফলে
রসকষ দূর যা ।

দুই

আজ এটা, কাল সেটা
অকাতরে দাঁড়ি
জনগণ তবু কন—
ছিটেফোঁটা নিচ্ছি ।

তিন

সম্ভ্যাস বিয়ে যদি
বিচ্ছেদ সকালে !
তবেই তো বলা যাবে—
প্রেম কিছু দ্যাখালে ।

চার

কোলকাতা এখন তো
মেগাসিটি তব্বী,
একবার ছুঁয়েছো কী
পুড়োপুড়ি ধন্য ।

পাঁচ

ভারতের ঘরে-ঘরে
ভরা ধান-গান—
পোখড়ানে পরমাণু
আরো ফেলে যান ।

বারম্বাসা

দিগম্বর দাশগুপ্ত

বোশেখ মাসে—বৈশাখিনী পর পুরুষের সঙ্গে
পালিয়ে গেল রাত দু'পরে ওপারে পব'বঙ্গে ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে—ষষ্ঠিচরণ বিষ্ট ঘোষের শালা
বোম ফাটিয়ে বিক'প্রসার করল দু'কান কালা ।
আষাঢ় মাসে—চাষার ছেলের সঙ্গে হল বিয়ে
ভালোবেসে বামুন মেয়ের মন্দিরেতে গিরে ।
শ্রাবণ মাসে—পতিত পাবন বর্ষা বাদল রাতে
গ্রামের পথে প্রাণ হারান গোখরো সাপের ঘাতে ।
ভাদ্র মাসে—ভবতারণ ভুল্ললোকের ছেলে
পড়ল ধরা পকেট কেটে, চালান হল জেলে ।
আশ্বিনেতে—অশ্বিনী ভড় পুজোর গেল পুরী
ফিরল যখন, নেখল ঘরের বা' কিছু সব চুরি
কার্তিকৈতে—কৈলোর ক'র্তি' করল পাড়ার কেষ্টা
পড়াতে এক ছাত্রী, তাকে……বায় না বলা শেষটা ।
অশ্বিনেতে—ষাত্রী বোঝাই বাস পড়ল গতে
মরল হ'জন, চালক উধাও, পারল না কেউ ধরতে ।
পোষ মাসেতে—ঘোষ-বোসেতে লড়াই হল অ্যাইসা
হামলা হল, মামলা হল, হিন্দ ফিলিম্ যেইসা ।
মাঘ মাসেতে—মেঘনাদ্ সার ছোট্ট মেয়ে খুকুর
বাচ্চা হল হানপাতালে, কামড় খেল কুকুর ।
ফালগুণেতে—সমর নিল গলায় দড়ি লট্কে
সেই শোকেতে পাগল হল পাশের বাড়ির ফট্কে ।
চৈত্র মাসে—মৈত্র মশাই তীথে' গেল কাশী
ফিরল যখন গেরুয়া বসন হয়েছে সম্যাসী ।

১২৬ ' কবিবার কাগজ'

রূপকথার ভোমরা

অনিল ঘড়াই

নদীটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে বাঁধের গা ছুঁয়ে। ছোট নদী—যেন মনে হয় সাদা কাপড় সোড়ার কেচে শুকোতো দিয়ে গেছে কোন গ্রামের বউ, খেলায় নেই তাই দিনের পর দিন রোদে শুকোর সাদা কাপড়। হাওয়া দিলেই ডেউ ওঠে, সেই ডেউ নাচতে নাচতে চলে যায় ধানী মাঠ পেরিয়ে বহু দূর।

সুজয়ের মন খারাপ, সে-ও চলে যেতে চায় নদীর মতো।

তারক তাকে বলেছিল, বাপো, বড় হওয়া মূখের কথা নয়। যদি ঘাসের কথা ধরি—তাহলে ভাবতো ঘাসের কয়স কত? একটা দুস্বাধাস পবুজ হতে কত সময় নেয় জানো?

তারকের প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না এ গায়ের। সে বড় আজব মানুষ, তাই তার দ্বারা সংসার করা হল না। তিন চেলের জন্ম দিয়ে তারক খেলার ছলে সীতাকে বলল, আমার সময় হয়েছে, তুমি থাকো। সংসারের সব শেকড় আমি উপড়ে দিলাম।

সাতা কাদে, ছেলে তিনটেকে নিয়ে আমার দিন চলবে কি ভাবে?

তারক হাসতে হাসতে বলেছিল, তিনজনকে তিন দিকে ভাসিয়ে দাও। ওদের গায়ে আমার রক্ত। ওরা ঠিক দানা খুঁটে খাবে প্রাণের জন্য।

—আমার কী হবে? আমি কোথায় যাবো?

ব্যাকুল সীতার হাত ধরে তারক বলেছিল, আকাশের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তা বলে কি আকাশ মরে গেছে? মনের জোর হারিও না, তাহলে দেখবে আলো এসে পড়েছে আঁধার পথে। পথ তুমি ঠিক খুঁজে নেবে।

সুজয়, অজয় আর বিজয় পেটের দায়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে বহুদূর। তারা তারকের জন্য কাদে না, শুধু সীতার দুঃখে কাদে।

সুজয় এখন বাবুর বাড়ির মাস মাইনে করা চাকর, তবু তার চোখ রাজার মতো, মন শরৎকালীন আকাশ। এই পনের বছর বয়সেই সে হয়ে গেছে বাউল-সাধক। সে গায় ‘আমি ভবে এসে রসবশে খেজুর খেলায়। মশিদরে তে গিয়ে দেখলাম ঠাকুর নেই সেথায়...’ এখন আমি যাব কোথায়?

পতিতবাবু গান শোনেন আর হাসেন। বাহবা দিয়ে বলেন, খাসা গলা। এমন গলা না হলে গান শুনে কোনো মজা পাই না। একবার যার মন মজেছে সে আর অন্য খেলার বাবে না।

সুজয়ও বারান। সে আকাশ দেখে, পাখি দেখে। পাখিদের গান শোনে। নদীর জলের সাথে তার কত ভাব। জল যেন তার মা। আদর করে, সোহাগ দেয়। মধুমাখা স্বরে বলে, ব্যাটা আমার, আমাকে ছঁরে থাক। তোম জীবনের ছক বদলে যাবে।

সে বছর গাঁ জুড়ে ভীষণ আকাল। চাল নেই। ধান নেই। সুখ নেই, হাসি নেই মানুষের মনে।

সীতা বলল, বাপ আমার, এবার তোরা খঁটে খা। আমার আর শরীর চলছেনা। আমি শহরের দিকে পালাই। এখানে থাকলে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। সে বছরই পতিতবাবুর পেছন-পেছন সুজয় এল তার ঘরে। নারাদিন খাটলে ভরপেট ভাত পাবে। মাসান্তে মাত্র বিগ টাকা মাইনে। এভাবেই চলছিল সুজয়ের ছোট জীবন। মাঝে মধ্যে মনে পড়ত গ্রামের কথা। ব্যাধা উঠে আসত শরীর জুড়ে। সেদিন কাজের ছুটি। খাওয়া দাওয়ার মন নেই। মাটা তাকে ভীষণ জ্বালাত। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে আসত সীতা। খনখন গলার বলত, এ পৃথিবীটা বড়ো কঠিন জায়গা। নারা জীবনের চোখের জলেও পৃথিবীর মাটি নরম হবে না। নরকে আমি হারিয়ে গেলাম।

পতিতবাবুর বড় ছেলের নাম কুণাল। সে পাররা উড়াত। হাততালি দিত শুন্যে। সুজয়ের বরসী কুণাল একদিন তাকে বলল, সাদা পাররাটা ডিগবাজী খায়, কালোটা পারে না। কেন পারে না জানিস?

সুজয় উল্টো দিকে ঘাড় কাৎ করল।

কুণাল তার ঘাড় সোজা করে দিয়ে বলল, এই আকাশটা সবার জন্য নয়। বারা ডিগবাজী খায়, তারাই একদিন জিতে বার।

সাদা পাররাটার সাথে প্রেম হল সুজয়ের।

পাররাকে দানা খাওয়ানোতে গিয়ে সে নিজেই মূঠো মূঠো খেয়ে নিত পাখির খাদ্য। কেন খেত?

তার রাধা ভাত ছিল তবু খেত।

সে কি রাফস?

না, তাও নয়।

তাহলে সে কী?

সে গাছ না মানুষ? সে মাটি না বালি? সে জল না ঘোলা রস?

মোষের পিঠে বসে বাঁশ বাজাত সুজয়। বাঁশির সুর ভেসে যেত আশ-খেতে। নদী ফুলে উঠত সুরের টানে। গাছে বসে কোকিল 'কুহু-কুহু' করে ডাকত। দিন এই ভাবেই গড়িয়ে রাত ডেকে আনল।

একদিন পদ্মর সাথে দেখা হল তার ফুলের বাগানে। পদ্ম ফুল পরী

নয় তবু সে ফুলের বাগান ভালবাসত । তার ঠোঁটে লেগে থাকত পরাগরেনু ।
সে বলত, এই রেনু না হলে ফুল থেকে ফল হয় না ।

অবাক হয়ে শুনত সূর্য ।

পশু বলত, মৌমাছি দেখেছো ?

ঘাড় নাড়ত সূর্য ।

—ভোমরা দেখেছ ? হাসত পশু, তুমি' হলে সেই কালো ভোমরা ।
আমাকে ছোঁও তো দেখি !

পশু ছুটে পালাত ঘাস মাড়িয়ে, তার বুকে ঢেউ উঠত চারা খান-গাছের ।
কখনও নুইয়ে যেত সে । হাত নাড়িয়ে ডাকত—ছোটো...ছোটো— ।

ছুটেতে ছুটেতে পশু একদিন ফুল হয়ে গেল ।

সূর্য হয়ে গেল ভয় ।

পতিতবাবু জানতে পেরে কাঁচা কণি দিবে পেটালেন ।

—অসভা ছেলে কোথাকার !

সূর্য বলল, পায়রা-পাখি সবাই অসভা । ঘাস অসভা । ঝল অসভা ।

পতিতবাবুর কণি ভেঙে গেল । মনে মনে বললেন, পায়ল কোথাকার !

পশু গোয়াল ঘরে সময়ের তেল দিবে ডলে দিল সূর্যের পিঠে । মূখের
খুঁতু লাগিয়ে দিল পিঠের ফোলা চামড়ায় । একসময় হাত বাড়িয়ে গাছ হয়ে
গেল ওরা ।

লতা হয়ে গেল পশু । খঁড়ি হয়ে গেল সূর্য ।

জীবন বয়ে গেল সেই সরু নদীর মতন ।

নদীর গম্ব বলত সূর্য ।

পশু শুনত ।

শুনতে শুনতে একদিন সে নদী হয়ে গেল । ছারা হয়ে গেল সূর্য ।

পায়রা ওড়ানোর মাঠে আবার দেখা হোত ওদের ।

পশুর কাছে গোবরের ঝুড়ি । সূর্যের হাতে পাঁচনবাড়ি । গোয় চরছে
মাঠে ওরা গোয়লাছুঁট খেলত ।

হাসতে হাসতে ফড়িং হয়ে যেত পশু । সূর্য হয়ে যেত চোরকাটা ।

ফড়িং বসত চোরকাটায় ।

একদিন কুণালের পায়রা উড়ে গেল দূর গায়ে । বাবুরও ভীষণ মন
খারাপ ।

সূর্য আগ বাড়িয়ে বলল, আমি পারব পায়রা খঁজে আনতে ।

—পারবি ? যদি পারিস তোকে এক বাটি মূড়ি বেশি খেতে দেব ।

সূর্য বলল, পায়রা খঁজে আনব কিন্তু মূড়ি চাই না ।

—কী চাস তুই ?

—আমাকে এক জোড়া পায়রা দিতে হবে।

—কি করবি পায়রা দিয়ে ?

সুজয় ভাবল, ঘরবাঁধা খেলা খেলব। পায়রা ঘর বাঁধে। ডিম দেয়।
বাচ্চা ফোটার। বাচ্চাদের ওড়া শেখায়। কীভাবে খেতে হয় তাও শেখায়।
শিকারী চিলের হাত থেকে কীভাবে নিজেদের বাঁচাতে হয়—এনিদ্যাও তাদের
জানা। পায়রা যা জানে অনেকেই তা জানে না।

পতিতবাবু হাসল, দেব, দেব। ঠিক আছে যা।

ফাকা মাঠে সুজয় আগে, পশু তার পেছনে।

ধান মাঠ পার হয়, উঁচু আল।

পশু হাঁপায়। তেঁস্তার গলা শব্দকার। বড় কণ্ঠ।

সুজয় বলল, হাঁ করো। আমি শিশির ধরে আনছি।

পশু লাল মুখ দেখিয়ে হাঁ-করে। তার মূখের ভেতর বিব্ব ব্রহ্মাত
সুজয় ঢেলে দিল ফোটা ফোটা শিশির বিসদু।

তবু ঠোঁটে জিভ বুলালো পশু। দূ-চোখে তেঁস্তা। এ যেন শূন্যে
মাঠের জল পিপাসা।

সুজয় বলল, আরো চাই ?

পশু শিশুর মত বলল, হ্যাঁ।

—তাহলে জিভ বের কর। চোখ বন্ধ কর। দূ-হাত বাড়িয়ে ধরো
আমার কোমর। ভাবো তুমি ফুল। আমি বৃষ্টির ধারা। ভাবো তুমি
মাটি, আমি জোয়ার আসা খাল। ভাবো...

সুজয়ের লাল জিভ পশুর মূখের মধ্যে খেলা করে যায়। উদগত রনে
ভিজে যায় পুরো মূখ গহ্বর। বুজে আসে পশুর চোখ। শিথিল হয় স্নায়ু
জগত। এলানো হাত-পা। পশু কি ঘরে গেল ?

এক সময় বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল পশু। চোখে-মুখে তৃপ্তির ছায়া। এ
ছায়া তো আকাশও দিতে পারে না।

রেল লাইন পেরলেই আবার শব্দ হয় ধান মাঠ। ডিজেল-ইঞ্জিন টেনে
নিরে যায় লোহার বাঁচা! পশু দেখে। সুজয়ও দেখে। ধান মাঠে শব্দ
লেগেছে সাপের। অস্ফুট মুরার খেলা করছে সাপ দূটো।

পশু মূঠো করে ধরে সুজয়ের হাত। অস্ফুটে বলে, তোমাকে ছাড়া
বাঁচব না। সুজয় বলল, এখন মরাও বাবে না।

পশু শূধোল, জীবন তাহলে কি ?

সুজয় মাথা চুলকে বলল, জীবন তুমি আর আমি। এই নিঃশ্বাস হল
জীবন। এই শাশ্বলাগা সাপ হল জীবন।

—তাহলে পায়রা ?

—পাররা হল সুখ আর দুঃখ। চলো আমরা সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়াই।

পাররার দেখা পেয়ে গেল ওরা।

দানা ছড়াতেই উড়ে এল চেনা পাররা।

পক্ষ্মর হাতের মৃঠায় পাররা ডাকল,—বকম-বকম।

শ্রুণি হল সূজর।

পক্ষ্ম বলল, বাবার কথা খুব মনে পড়ে। তার যুকে কাশ রোগ ছিল। বাবু তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল। বাবার বদলে মা কাজে এল। রাতে ঘর যেত না। বাবুর পা দাঁড়িয়ে দিতে হোত। ফলে—আমার আর একটা জাই হলো। বাবা তাকে দেখতে পারত না। মাকে চুলের মৃঠি ধরে মারত। একদিন মা-ও গলার ফাঁস নিল। সের্দিম গারে পুদলিশ আসল। আমি এখন ছোট। পুদলিশ মাকার দড়ি দিয়ে বাবাকে থানার ধরে নিয়ে গেল। বাবু বলল, তুই আর কোথায় বাবি—আমার ঘরে কাজে লেগে যা। সেই থেকে পেটভাতায় আছি। আমি গোয়াল কাড়ি, ঘসি দিই। বাবু ডাকলে ভরে কাছে যাই না।

—খবরদার বাবি না। সূজরের চোয়ালের হাড় জেগে উঠল।

—আমার কথা আর কি বলব! মায়ের দুঃখ আর ঘটল না। বাবা সাধু হয়ে চলে গেল ভিন-দেশে। বহর না ঘুরতেই সে আবার বিয়ে করে বসল। মা সেই দুঃখে শহরে গিয়ে নিজেকে আরো সস্তা করে তুলল। গায়ের লোকে বনে—আমার মা নাকি বেবুণো?

আমরা সব বেবুণ্যের ছেলে!

হাতের চেটোর চোখের জল মূছে নিল সূজর। দৃঢ়চেতা গলার বলল, আমরা অমন হবো না। আমরা পাররার মতো বাঁচব। তুমি খাটবে—আমি মাটি হেনে ঘর তুলব। তুমি রাধবে, আমি তোমার সম্মুখে বসে খাবো। আমি যেমে গেলে তুমি ভালপাবার বাতাস দেবে। ভোটের দিনে দু-জনে এক রিকসোর বসে ভোট দিতে খাবো। আমাদের যে সন্তান হবে তারা আমাদের মতো মূর্খ হবে না। তারা শুলে যাবে, পড়বে। আমি তুমি হা-করে শুনব।

পাররা ফেরত পেরেছে কুণাল। তবু সে কথা মত ককশিস দিল না। বাবু তাকে কিনে দিয়েছে মোটর সাইকেল। কুণাল নিগারেট খায়। খরাপ বন্ধুদের সাথে মেলে। সিনেমা দেখে। মেয়েদের শিস দেয়। পাটি অফিসে দূ-বেলা যায়।

পক্ষ্ম রোজ রাতে তার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়।

একদিন কুণাল ভাত না খেয়ে পশ্মকে কাঁচা খেল। বাবা দিগেও হেরে গেল সে। তার চোখের কোলে কাঁপ। ঠোঁট শকনো। হাসি নেই মূখে।

সুজর বলল, পশ্ম, তোমার ক'ই হয়েছে?

পশ্ম বলল, পোকায় কেটেছে। আমি পারলাম না গো!

জমরের বদলে পোকা—মাথার আগুন জ্বললে উঠল সুজরের। সে ফেলেপ উঠল—তোমার হাতে অস্ত্র ছিল না?

—বা ছিল সব ভোঁতা।

—ওদের খঁচিরে মারো।

—হাত কাঁপে। ওরা যে অন্নদাতা। আশ্রয়দাতা।

—তা বলে রক্ষক ডাক্ক হবে?

পশ্মর চোখ জলে ভরে উঠল। আবার ডুবে গেল জলে। এই বৃষ্টি বন্যা এল? এই বৃষ্টি ঝড় উঠল! এই বৃষ্টি প্রকৃতির তান্ডবে ছারখার হয়ে গেল দেশ-দুনিয়া।

—কুণালকে আমি শান্তি দেব। ও ফুল দেখেছে, বিষ ভোমরা দেখেনি।

—ও কাজ ভুল করেও করো না। ওদের দো-নলা বন্ধুক আছে।

—থাকুক। আমার আকাশে বজ্র আছে। ঝড়-বৃষ্টি-উল্কা আছে।

—পেটভাতার কাজ চলে গেলে খাবো কি, থাকব কোথায়?

—গাছতলা কারোর বাপের নয়। সুজর হাতের মূঠি পাকিয়ে দোতলা বাড়িটার দিকে তাকাল। ফুট ফুটে রোদে হলুদ বাড়িটা হাসছে। দেওয়াল বেয়ে গাড়িয়ে নামছে রক্ত। বাতাস বয়ে আনছে পশ্ম'র মায়ের কাপ্তান। পশ্মর বাবার গলা থেকে কাশির দমকে উঠে আসছে রক্ত।

—পশ্ম, আমাকে ছুঁয়ে দেখো। পশ্ম হাত বাড়ায়।

—তুমি আগুনের টিপি। আমি পুড়ে বাব।

—পশ্ম' আমার এই শরীর দেখে তোমার কি মনে হয়?

—তুমি ইস্পাতের ফলা।

—পশ্ম, আজ তোমার কি খেতে মন চায়?

—তুমি বা খাওরাবে।

—আমি তোমাকে পাল্লরার মাংস খাওয়াব।

আঁতকে উঠল পশ্ম।

—কুণাল জানতে পারলে তোমাকে খুন করে ফেলবে। পাল্লরা ওর বড় সখের জিনিস।

তুমিও আমার কম সখের সিজিন নও। ও তোমাকে ছুঁয়েছে। নষ্ট করেছে। ওর সব কিছু আমি নষ্ট করে দেব। উত্তেজিত সুজর কিছুতেই কথা শুনল না। সে ঝড় হয়ে গেল। কাটা গাছের মত শরীর নিয়ে

ছুটে গেল হৃদয় বাড়ির দিকে। বেন সুজ্ঞন নর, ছুটে গেল আগুনের গোলা।
বজ্র-বিদ্যুৎ ভেঙে পড়ল আকাশ থেকে। যে হাতে বাঁশ ছিল সেই হাতে
অনারাসে তুলে নিল প্রকাণ্ড শাবল।

কুণাল বেরিয়ে এল গোবার ঘর থেকে। চোখে-মুখে দুঃশ্চিন্তা। স্বপ্ন
পান্টাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে জীবনের মানচিত্র। সামনে উঠে আসছে মেহনতী
মানুষ। পণ্ডায়ত গ্রাম-সভা সবই ওদের দখলে। খাস জমির জন্য লড়াই
করে বৃকে গর্দিল বিধে শহীদ হচ্ছে খেত মজুর। সুজ্ঞন কোনো সুযোগ না
দিয়ে কাপিরে পড়ল কুণালের উপর। মূখে থুতু ছিটিয়ে বলল, পশ্মকে
নোংরা করেছিস তুই? সে আমার ভালবাসা। সে আমার মাটি। আমার
ফুল-ফল-অন্ন-জল। তোকে আমি ছাড়ব না।

—মারবি নাকি? কুণালের গলার রগ ফুলে উঠল।

—না, তোকে আমি মারব না। ক্ষমি করে দেব। তোর এক পোখ
উপড়ে নেব। একটা করে হাত-পা ভেঙে দেব। তোকে লুণা করে ছাড়ব।
সাজানো ঘরে জমে উঠল বৃজবৃন্দ।

সুজ্ঞন হারল না। সে কুণালকে কামি করে ফিরে এল বাইরে।

পশ্ম দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্য। অচিল দিয়ে সে মূর্ছিতের দিল সুজ্ঞনের
শরীরে ঘাম। চোখ মেলে বলল, এবার কোথায় যাবে?

—এতবড় পৃথিবীতে যাওয়ার কি জায়গার অভাব? তুমি পারো দূটো
নিরেছ তো? আমরা খাস জমিতে ঘর বাঁধব। মাটি কেটে পুকুর বানাব।
মাটির ঘরের সামনে ফুলের বাগান সাজাব। রাত্রে দাওয়ার বসে চাঁদ দেখব
দুঃজন্য।

—বাঁশ বাজাবে না?

সুজ্ঞন হাসল, বাজাবে। পতিতবাহুর লোক এলে আমি তাকে উঁচত
শিঙা দেব।

এবার ভ্রম পেল পশ্ম। নেড়ে উঠল চোখের পাতা। বলল, এমন কোনো
কি জায়গা আছে যেখানে বাবুর ছায়া নেই?

সুজ্ঞন বলল, আছে। তোমার বৃকের ভেতরে যে ভালবাসার খনি আছে
সেখানে কোনো বাবুরই ছায়া নেই।

শকুন সরে গেছে আকাশে। নদী ডরে গেছে জলে।

ধোড় আসা ধান গাছ হয়ে গেছে পশ্মর মতন।

নদী ডাকে—আয়, আয়। আমি তোকে জুকার জল দেব।

মাটি বলে—আমাকে ভুলিস না বোটা। আমার বৃকে গড়ে তোল তুই
স্বপ্নের ঘর-দুয়ার।

বাতাস বলে, আমি আছি, থাকব তোমার পাশে। আমাকে মনে রেখো।

গাছ বলে—ছায়া দেব তোমায় । সব ছায়া যখন শেষ হয়ে যাবে আমার ছায়ায় এসো । আমি তোমাকে স্বপ্নের দেগে নিয়ে যাব । আমি তোমার দূ-চোখে স্বপ্ন এঁকে দেব ।

একে একে অরণ্য আসে । অরণ্য বলল, পৃথিবী সুখের, তোমাদের পোষা পায়রা দুটো এখানে উড়িয়ে দাও । ও সুখ পেড়ে আনবে তোমাদের জন্য ।

ঘাস-জল-হাওয়া বলে, আসো । ভয় পেও না ।

কাটা গাছ বলল, আমাকে দেখো, আমি কীভাবে বেঁচে আছি । আমাকে সবাই ভয় পায় । আমি কারোর সাথে লড়াই করি না । কেউ আমাকে আঘাত করলে আমি তাকে ছেড়ে কথা বলি না । নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় আমি অনড়, অবিচল ।

রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে পশু ।

কাশ রোগ ভাল হয়ে গেছে তার বাবার । কৃষ্ণাঙ্ক ফুটেছে দিকে-দিকে । ভ্রমের গুঞ্জন ভেসে আসছে কানে ।

সুজয়ও স্বপ্ন দেখে । ধান মাঠে ঝরে ঝরে পড়ে সোনা । এত সুখের মধ্যে তার মা পরেছে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি । এলো চুল উড়ছে বাতাসে । চির দুঃখী মা তার হয়ে গেছে কোজাগরী পুণিমার জীবন্ত লক্ষ্মী ।

...স্বপ্ন । চারিদিকে শব্দ স্বপ্ন । শব্দ আশা, শব্দ ভালবাসা ।

ঘুম ভেঙে গেছে সুজয়ের ।

ছোট নদী তাকে বলে, তোমার বাবা এই পথ দিয়ে গেছে ।

সুজয় মুখ ঘুরিয়ে নেয় ।

একটা মাছরাঙা পাখি উড়ে এসে বসে ডালে । ঝুপ করে শিকারের আশায় ডুব দেয় জলে । তার গা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে জল । তৈলাক্ত পাখনায় জলের কোন দাগ থাকে না ।

সুজয় ভাবল—স্বপ্নের জগতের সঙ্গে তার এই জীবনের কোনো অমিল নেই ।

পশু ফুটে আছে সংসারের ডোবার ।

পশু ভেসে উঠছে তার মনে ।

হৃদয়ে ছাড়িয়ে পড়ছে পশু সুবাস । রক্তে ডুবসাতার দেয় মাছরাঙা ।

ক্রমশ স্বপ্নিনল আলো এসে পড়ল পৃথিবীতে । ক্রমশ সুখের আলোর ভরে উঠল পৃথিবী ।

সেই প্রথম সুজয় স্বপ্ন দেখা ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে ফিরে এল । □

বদলির অর্ডার

ক্ষিতীশ সাঁতরা

খাম খুলতেই ভূ-কম্প, পড়ার শব্দেতে অশ্রুৎপাত, সমাপনে মহাপ্রলয়।
মাথার মধ্যে শব্দ হ'ল ঘর্নিপাক। ঠার বসে ডাক পাড়লেন—শুনছ ?

—বলো।

—তাড়াতাড়ি এসো।

—হাতে কাজ।

—কাজের নিকুচি করেছে, এদিকে এসো আগে। সম্ভবানশ হয়ে গেছে।

—সম্ভবানশ ? কি সম্ভবানশ ? হাঁপাতে হাঁপাতে দারোগাগির্দারী চারু-
বালার প্রবেশ,

—বল, কি হয়েছে ?

—আর কি হয়েছে ! বদলির অর্ডার।

—বদলির অর্ডার ! —বড়শিতে লাগা দম খাওয়া মাছের মত কেলোতে
কেলাতে বললেন চারুবালাদেবী—কিন্তু কেন এমন হল ? তুমি যে বললে—

—আরে বলেছিলাম তো। এখানকার পার্টির নেতা এই গত পরশুও
তো বলে গেল, আপনার কোন ভয় নেই—ঠেকানো গেছে। কমপক্ষে আরো
বছর দুই এখানেই থাকছেন।

—তাহলে এমন হল কেন ?

—আরে সেটাই তো আমরা প্রথমে—বিরক্ত হলেন সদাশিববাবু।
টে'টি গেড়িয়া খানার ও-সি। এক ধাঝা মাথার চুল ছিঁড়ে টে'বিলে একটা বুঁবি
মারলেন—কেউ না কেউ পিছু লেগেছে, না হলে এমন হয়। মনে হচ্ছে ঐ
শালা এম-এল-এর কান্ড। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। বক্ত যে'চো।
এ'টুলির মত পাছায় সে'টে আছে আমার। এই নিয়ে চার বার হয়ে গেল—
চারুদেবী অশ্রুকারে হাতড়ালেন খানিকল। কিছুই পেলেন না। অগত্যা
পতিদেবতার ওপরই নির্ভর করলেন—ব্যাপারটা পার্টির ঐ নেতাকে একবার
বলনা গিরে—

—আরে বলে কি হবে। প্রথমবারে ছেলের পড়াশুনো, দ্বিতীয়বারে তোমার
চিকিৎসা, তৃতীয়বারে নিজের অসুখ—এবারে আর কি বলা যাবে ? তাও
মেরেটা যদি বড় হ'ত। বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে একটা খুঁটি মারা যেত।

কিন্তু এখন তো আর হাতের মাথার কিছুই নেই—ঠেকাটা দেব কিসে ? যা দেখা যাচ্ছে, তাল্পি গোটাতেই হবে । নিরুপায় ।

চারুবালা দেবীর তক্তনগজ্ঞন বড়বাবুর চোরে অনেক বেশী । বড়বাবুতো বড়বাবু, অন্যান্য বাবুরাও তত্ক্ষণ, কখন যে কি প্রকার কামাট আসে । আর কনটেবলরা তো ভরে জুজু । তারা বলে—চারুবালা দেবী কপাল দোষে বড় বাবুর স্ত্রী । ভাগ্য ভাল হলে নিষ্যিৎ বড়বাবুই চারুবালা দেবীর স্ত্রী হয়ে যেতেন । বাঘের মত হেন স্ত্রীলোকটি বেড়ালের মতন মিউমিউ করতে লাগলেন—তবু তুমি একবার ঐ নেতার সঙ্গে দেখা কর ।

সদাশিববাবু এমনিতে বেসামাল হয়ে পড়ছিলেন । গিল্লীর আনতাবাড়ি কথায় খেঁকিয়ে উঠলেন—কি খালি নেতা নেতা করছ । বললাম তো হবে না । কোন নেতার বাপের সাখ্যি নেই এ অর্ডারকে ভারোলেট করে । ও গোছগাছ করে ফেল, বাসা ছাড়তেই হবে ।

শাস্ত্রে বলে, ডুবে যাবার সময় কুটোগাছটা পেলেও ধরে ফেল, বাঁচলেও বেঁচে যেতে পার, শেষ বারের মত বড়বাবু একবার পার্টি অফিসে ঢুকলেন, গভীর রাতে ।

লোকজন নেই । একেবারে ফাঁকা । সবাই খেয়েদেয়ে শূন্যে পড়েছে । সদাশিববাবু একজন কনটেবলকে দিয়ে নেতাকে ঠেলে তুললেন—আপনি তো বললেন, এখন বদলি হবে না, ঠেকিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু একি কান্ড হ'ল বলুন তো ? বলে—বদলির অর্ডারটা দেখালেন ।

এমনিতে ঘুমের তরাস ছিল, চোখের পাতা ঝড়িয়ে এসেছিল তার ওপর ঠেলে তোলা । কাগজখানা বার করেক দেখে খালি মস্তব্য করলেন, এশালা মাইনসার কান্ড । ঠেকানো যাবে না দাদা । —সেটাই তো সমস্যা । এক দুমাস পরে হলে তবু দেখা যেত, এখন তো দেখছি ! —দেখার কিছুই নেই তৈরী হয়ে পড়ুন ।

ঘর ফিরতেই গিল্লী ছেঁকে ধরলেন—কিছু হল । গুম মেরে গেলেন সদাশিববাবু । মুখে কিছু না বলে শূন্য মাথা নেড়ে না, না করলেন । গিল্লী পথ না পেয়ে বললেন—কবে যেতে হচ্ছে ? সদাশিববাবুর গলার বিরক্তির সূর । কবে অমর । মাঝে তিন দিন । আগামীকালই নতুন বড়-বাবু এসে পড়বেন চার্জ বুকে নিতে ।

উপায় যখন নেই তখন মূর্খটি বন্ধ করে চারুদেবী জিনিষপত্র গোছাতে শুরু করে দিলেন । আর ওদিকে সত্যি সত্যিই পরের দিন নতুন অফিসার বাস থেকে নেমে সোজা টেঁঠিগেড়িয়া থানায় হাজির—নমস্কার !

সদাশিববাবুর রাতে ঘুম আসেনি ক্রমে । রাত জেগে চোখ দুটি ফোলা । ঘেন কেঁদে কেটে সারা হয়েছেন । মুখ দিয়ে কোন কথা এল না ।

ভীষণ অন্যমনস্ক। মৌনভাবেই প্রতি নমস্কারটি জানালেন। তার পরেই স্বাধীনতা বসে পড়লেন হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিতে।

সারাদিনই প্রায় লেগে গেল সব দিক বুঝিয়ে উঠতে। হিসেব থেকে শুরুর করে এখানকার মানুষজন, কে কেমন। তাছাড়া চোর ডাকাতরা এখন কোন কোন গ্রাম দাঁপিগে বেড়াচ্ছে। পার্টির নেতাদের কাছ থেকে কোন কোন ভাষাতকে ধরপাকড় করতে মানা আছে। সেই সঙ্গে কোন পার্টির কোন অঙ্গে কেমন প্রভাব—বার কেমন দৌরাখ্য, বিশেষ করে এম-এল-এ সম্বন্ধ বলতে গিয়ে দাঁত কিড়কিড় করে উঠলেন কয়েকবার। রাগের চোটে ‘শালা’ শব্দটি বার দশেক মত প্রয়োগ করলেন। শেষে বললেন, লোক হিসেবে মোস্ট থার্ড ক্লাস। বহু পিছু লাগা স্বভাব। আপনিও সাবধানে থাকবেন। কখন যে আপনাকে কোন প্যাঁচ ফেলে দেবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

নতুন বড়বাবু ঠার বসে মগ্ন হয়ে সব শুনলেন। বড়ো লোকের ভিত্তিভাবে শাস্ত্র শোনার মতন।

মাঝে মাঝে বিষয়গুলো সম্বন্ধে উপদেশও নিতে লাগলেন—হাঁদ কখনো কোন বিপদে পড়ি তাহলে কাকে ধরা হবে?

সোজা পার্টি অফিসে চলে যাবেন। ওখানকার লোকগুলো মোটামুটি মন্দ নয়। কথা শোনে। তবে মাঝে মধ্যে ওদের কথাও আপনাকে শুনতে হবে। ওপরওলাকে কন্ট্রোল করতে হলেও ওরা করে দেবে। তবে সব ক্ষেত্রেই পার্টির পাওনা গড়ার ব্যবস্থা রাখবেন, তাহলেই হ’ল।

সব বুদ্ধিগে নিয়ে নতুন বড়বাবু ফিরে গেলেন। আর সদাশিববাবু বুঝিয়েটুকুরে দিয়ে নিজের মালপত্র গোছাতে গিন্নীর হাতে হাত মেলালেন।

ঠিক পরের দিন সকাল বেলায় নতুন বড়বাবুর লরি গা গা করে থানার ঢুকে পড়ল। মালে ভর্তি। খাট থেকে শুরুর করে চা ফোটানোর কেবলি পর্যন্ত। একটা দেশী কুকুর ছিল, সেটাও নিয়ে এসেছেন। সে ব্যাটা থানার ভেতর গাড়ী ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে কে’উ কে’উ শব্দে ডেকে উঠল বার কর।

এদিকে সদাশিববাবুর মালপত্র বোঝাই হচ্ছিল লরীতে। আলনা-চোরায় লেপ-বালিশ। টেপ-টিভি মার কয়েক জোড়া জুতো পর্যন্ত। সব তুলেটুলে দিয়ে শেষে গিন্নীকে বললেন—তুমি উঠে পড়, আমি আসছি।

গিন্নীসহ ছেলেমেয়েরা লরীর সামনেটার গিগে বসে পড়ল। সদাশিববাবু কয়েক পা এগিয়ে যেতেই উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এলেন নতুন বড়বাবুসহ অন্যান্য বাবুদার। কনস্টেবলরাও প্রায় সকলে এগিয়ে এল বড়বাবুকে বিদায় জানাতে।

বিদায়পর্ব কখনো স্থগিত হয়না। পাক্সা দুটো বছর এখানে ছিলেন। সকলের সঙ্গে এমনভেই একটা আলাপ পরিচয় তথা টান বসে গিয়েছিল।

নিজের সংসার গড়ার মতনই গেড়ে ফেলেছিলেন। এমন করে হুটমুট ছেড়ে যেতে হবে সেটা ভাবেননি এবং আশাও করেননি। কিন্তু উপায় তো নেই। এরকম নিরম। আসা আর বাওয়া।

তবু নতুন বড়বাবুর মনে হল, সদাশিববাবুর যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। জল্লোকের চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ করে। শূন্য এখন নয়, এরকম দৃশ্য বৈদ্যন হিসেবে দেখার সময়ও লক্ষ্যে পড়েছে। গলা ভারী হয়ে গেছে। মাঝে কথা বলতে গিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হয়েছে গলার। ব্যাপারটা যেন একটু গোলমেলে ঠেকছিল। তখন ভেবেছিলেন হয়ত দুঃখ হচ্ছে সম্বাইকে ছেড়ে যেতে, অথবা টানটা সহ্য করাটা ছিল না তাই। তা বলে এমন করে কান্না? তাও চোখের জল কেলো? একবার যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন বলে মনে হল। খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। একবার ইচ্ছে করলেন জিজ্ঞাসা করেন ব্যাপারটা, কিন্তু পারলেন না। একটু যেন বাধা বাধা ঠেকল।

একটু পরেই দেখা গেল, আরো এক বিষম কাণ্ড। পার্টির দু'একজন নেতা দেখা করতে এসেছিলেন। তাদের মূখোমুখি হতেই একদম ভাউভাউ করে কেঁদে ফেললেন। আবার এও দেখলেন, নেতাদের চোখে জল। ব্যাপার ন্যাপার দেখে নতুন বড়বাবু অধিক কৌতুহলী হয়ে সামলাতে পারলেন না। লরীতে উঠবার প্রাকালে সদাশিববাবুর কাছে জানতে চেরে বসলেন—না হয় ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাবলে এরকম কান্নাকাটি ঠিক মানাচ্ছে না। কান্দবার কারণই বা কি?

লরীতে ঢুকবার আগে সদাশিববাবু মূখটা বাড়িয়ে নতুন বড়বাবুর দিকে তাকালেন একবার পিট পিট করে। বেশী কথা না বলে গাড়ী ছাড়বার আগে শূন্য বললেন—আমার মত দুর্ভাগ্য আপনার বৈদ্যন হবে সৌদীন বুদ্ধিতে পারবেন টেঁটেগেড়িরা থানা ছেড়ে যাবার সময় কেন বড়বাবুরা কান্দে।

গাড়ি আর দাঁড়াল না। সদাশিববাবু মূখটা ঢুকিয়ে নিতেই গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অতঃপর নতুন বড়বাবু শিবহরির ভট্টাচার্য গাড়ী থেকে তাঁর মালপয় ঠিক ঠিক নামাচ্ছে কি না তার তদারকিতে মনোনিবেশ করলেন।

দেখতে দেখতে বছর দেড়েক কেটে গেল। দেড় বছরে দেড়শ রকম কাণ্ড ঘটল থানায়। কোনটা সামলালেন। কোনটা বা হাতের নাগাল পেরিয়ে কোর্ট পর্বত গাড়িয়ে গেল। ওদিকে পার্টির নেতারা শিবহরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জল্লোক একা খান না, দিয়ে থুয়ে বান। এঁড়িয়ে যাবার চেষ্টা তো করেনইনা বরং যা করেন সবই বলে-কয়ে করেন। হেন ব্যক্তির প্রমোশন হওয়া উচিত।

শিবহরিবাবুও একদিন তালবুকে অনুরোধ রাখেন—ইচ্ছে হলে বলবেন,

সি আই এর দায়িত্ব নিতে আমি পেছপা হব না। বিশেষ করে, আপনারা বললে আমি তো কোনমতে না করতেই পারব না।

ওদিকে এম-এল-এ সাহেব। বিপদ দলের লোক। তাঁর সেই একই কাণ্ড। দফার দফার খবর কাগজে বিজ্ঞাপন দান। দেড় বছরে প্রায় দেড়শ বার—টে'টিগেড়িয়া থানার দারোগা ঘুর খোর। বৃষ নিয়ে কেস চেপে দিচ্ছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এনকোয়ারী হল কয়েক শ বার। কিন্তু ফলং যথা শুনো। মাথার ওপর পার্টি আছে তো। একদিন সম্মুখবেলার শিবহরিবাবু ইণ্টিমস্ট জপ করছিলেন। এটা তাঁর অভ্যাস। এমন সময় একজন কনস্টেবল এসে একটি খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার চিঠি দ্যার। জোড় হাতে প্রণামটি সেরে ধীরেস্থে খামটি নিলেন শিবহরি ভট্টাচার্য। তারপর খামের মূখ্যটি সম্মুখে খুলে ফেললেন। টেনে বের করলেন ভেতর থেকে টাইপ করা একটি তুরতুরে পাতলা কাগজ। আঁৎকে উঠে গিন্নীকে ডাক পাড়লেন—শুনছো নাকি?

—শুনছি, বলো—

—না, শালাটা সম্মুখানশ করে দিয়েছে—

—কে?

—ঐ শালা এম-এল-এ টা। এসে দেখ, কি করবে। আমার মাথা ঝুঁকছে। রান্না সারছিলেন দারোগাগিন্নী। খাবার খেয়ে ওকটু পরে চোর ধরতে যাবেন বলে ঠিক ছিল। অর্ডার পেয়ে নিজে এখন চোরের মতো গুন্টিসুন্টি ঘেরে সে'ধিরে গেলেন মশারির ভেতর। গিন্নী আঁচলে হাত মছেতে দৌড়ে এসে বললল, কি হ'ল? মশারির ভেতর ঢুকলে কেন?

—আর কেন?—কাঁপা গলায় শিবহরি ভট্টাচার্য বললেন—বদলির অর্ডার।

—বদলির অর্ডার!

আতঙ্কিত শিবহরির উত্তর—আরে শূন্য অর্ডার কি বলছ, একেবারে কড়া অর্ডার। পরশুদিন যেতে হবে। শূন্যে জ্বর এসে গেছে তুমি বা করার কর।

—জ্বর এলে চলবে কেন? পার্টি অফিসে যাও, হরিদাকে একটু বল।

—ও তুমি যাও—আমি যেতে পারব না। ওরা ঠেকাবে না কিছুতেই। তবু বুকে বল নিয়ে গিন্নী দৌড়লেন পার্টি অফিসে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। যদি কোন সুযোগ হয়ে যায়। খালি বাবার আগে একবার জোড় হাত করে বাবা বজরঙবলীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন ভাঁড়ভরে। বলাবাহুল্য শিবহরি ভট্টাচার্য বাবার ভক্ত। বজরঙবলী বাতাসে উড়তে পারেন। ধারণা তাই উনাকে সন্তুষ্ট রাখলে বাতাসে উড়ে সব কাজ করে ফেলতে পারবেন।

বাইহোক, পার্টি অফিস কিন্তু কোনা কিনারা করতে পারলনা। মাথা বললে—এতো ঠেকানো যাবেনা বৌদি। শালা বড্ড কবে দিয়েছে একদম।

—কিন্তু তুমি যে বললে, সি. আই. করে দেবে কতাকে।

—পার্টি বলতে বোঝিছিল তাই বলেছিলাম। নিজের ইচ্ছেয় আমরা কথা বলি নাকি?

—তোমরা যে অত প্রশংসা-ট্রাংসা করলে?

—সে তো বেশী করে চাঁদা পাওয়ার জন্যে।

ভোবড়ে গেলেন শিবহরি বাবুর স্ত্রী। বিকল হয়ে এলেন বাড়ি।

স্ত্রীকে ফিরতে দেখে শিবহরি পাশ এলতালেন, কিছু হল? তোমার হরিদার ক্ষামতা কুলোল? কোন সাড়া এলনা। শিবহরি ভট্টাচার্য একটা কাঁচা খিস্তি মারলেন। বলছিলো, যেওনা শুনলে না তো!

পরের দিনই সদলবলে হাসতে হাসতে মাথা উঁচিয়ে থানায় ঢুকলেন পুরনো বড়বাবু—সদাশিব সরখেল। পুরনো জামগা পুরনো মানুষ। সবাই চেনা। কনস্টেবলদের হাঁকডাক করে জানিয়ে দিলেন তাঁর আগমন বার্তা। ফিরে এসেছি হে। তোমাদের টানেই ফিরে আসতে হল। তাছাড়া এখানকার মানুষজন, জলবায়ু। সবাই টানে ফিরে এলাম। তবে—

—তবে কি স্যার?

—তবে কিছু ভাবির ভাগ্যদা করতে হয়েছে। মন্ত্রী পর্যন্ত লড়েছি শুধু এই টেঁটিগেড়িয়া আসার জন্য। এখানকার দাদারা ও বহু উপকার করেছে। প্রসঙ্গ পাশে একসময় জানতে চাইলেন—তা শিবহরি বাবুকে দেখাছি না। হিসেব পত্র দেখাবেন কে?

একজন কনস্টেবল একগাল হেসে বললেন—উনি তো অর্ডার পেয়েই শয্যা নিরেছেন। শুনেনই সদাশিব সরখেল হা-হা শব্দে অটহাস্য করে উঠলেন।

—তাহলে হিসেব পত্র বঝাবে কে?

—মেজবাবু।

—যথারীতি মেজোবাবু তৈরীই ছিলেন। খালি হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন আপনাকে আর এরিয়া সম্বন্ধে কি বলব স্যার, সবই তো আপনার নখদর্পনে আপর্নি বা যা ব্যবস্থা করে গেছেন, সবই ঠিকঠিক চলছে। উনি হস্তক্ষেপ করেননি কোনটাতেই। বরং—

—বরং?

—বরং সবকিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তা বেশ বেশ! —সদাশিব সরখেল শব্দটির নিঃশ্বাস ফেললেন।

নিয়মমায়িক নির্দিষ্ট দিনে সদাশিববাবুর মালভর্তি লরী টেঁটিগেড়িয়া থানা কাঁপরে সদর্পে প্রবেশ করল। এসে সামনের দরজাটা খুলে দিতেই

চান্দ্রবালাদেবী এক লাফে নেমে এল বাইরে। পেছনে পেছনে ছেলে এবং মেয়ে
নেমেই হস্তিতাষি।

—কেমন আছেন বলুন? ভালো আছেন তো সব?

কনস্টেবলদের মুখে হাসি, অন্তরে কিস্তি জ্বালা। মুখে নয় মনে মনে
খালি বলতে লাগল—

ভোর মরতে জায়গা মিলল না? আবার জ্বালাতে এলি?

যার সম্বন্ধে কনস্টেবলদের এমন মধুর সম্ভাষণ তিনি কিস্তি একজনকে নাম
ধরে ভেকে হুকুমটি করে দিলেন—ও কল্লনবাবু এক'শ মিঠে পান এনে দেন
দৌধ, মন দিয়ে দুটো পান খাই', ওখানকার পান খেয়ে মূখ একেবারে খারাপ
হয়ে গেছে।

ওদিকে যেমন সদাশিব সরঞ্জেলের লরীর প্রবেশ হল, এদিকে তেমনি
শিবহরি ভট্টাচার্যের লরি প্রস্থানের উদ্যোগ নিল।

আগেই বলেছি, প্রস্থানের পর্বটা বদ্যাপিও স্নেহের হয়না। গাড়ি ছাড়ার
মুখে। গিল্লী সোজগাছ করে লরিতে উঠে গেছে। এবার শিবহরির পালা।
কাপতে কাপতে এগোতে লাগলেন গাড়ীর দিকে। সদাশিব দেখল শিবহরি
খালি চোখ মছে যাচ্ছে। সদাশিব সাস্তন দিলে বললেন—এখন বুঝতে
পারছেন তো, কেন টে'ঠিগেড়িয়া থানা ছেড়ে যেতে বড়বারুদের চোখে জল
আসে?

সায়িকোর সায়িকোর করে নাকের শিকনি মুহূর্তে মুহূর্তে শিবহরি ভরাগলার
বললেন—হাড়ে হাড়ে টের পেরেছি দাদা বলে, একটু এগিয়ে গেলেন।
তারপর আবার সদাশিবের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠায়—
যাবার সময় একটা অনুরোধ রাখব দাদা?

—নিশ্চেষ্টে প্রকাশ করে বলুন?

—বলছিলাম, আপনার প্রতিশ্রুতি—প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা। মানে,
আমাদের ব্যক্তিগত আয় উপায়ের—

বাধা দিয়ে সদাশিব বলে উঠলেন—ওহো বুঝেছি। বলুন কি বলছেন?

বলছিলাম কি—শিবহরি একটু গলা নামালেন—আমি এই দেড় বছরে কি
করেছি না করেছি নিশ্চিত আপনি সব খবর জেনে গেছেন।

—অবশ্যই। আসল খবরগুলো নিতে, আমি সেকেন্ডও সেরা করি
না। আমার কাছে ঐ সব চোর জোচোর ধরার চেয়ে এই কাজগুলোর মূল্য
অনেক বেশী।

—তাহলে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন, আমি শব্দ প্রতিষ্ঠান বাড়াইনি রেন্টও
অনেক বাড়িয়েছি।

খুশি খুশি মনে সদাশিব বললেন—তাতো দেখলাম। গাঁজা চাষীদের

তিনশর জারগার পাঁচশ করেছেন। জুয়াড়ীরা প্রতি মেলায় আমাকে দুহাজার করে দিত।—আপনাকে তিন হাজার করে দিয়েছে; চোলাইওয়ালরা আমার চেয়ে আপনাকে অনেক বেশী রেট দিয়েছে। শূদ্ধু তাই নয় আপনি গাঁজা চাষীও বাড়িয়েছেন। আপনার উৎসাহে জুয়াপাটি বেড়েছে ভবল। আর ঠেকেরতো কথাই নেই। আমার সময় ছিল সাকুল্যে বারোটি, আপনি বাড়িয়ে ছাত্রশটি ঠেক নির্মাণ করেছেন।

—তাই বলছিলাম দাশা—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিবহরি বললেন—সবই তো আমি বাড়িয়েছি, এতটুকু কমাইনি কি ক্ষতিও করিনি। শূদ্ধু অনুরোধ, আপনি আমার চালু রেটটা যেন কমিয়ে ফেলবেন না।

কৌতূহলী সদাশিব চোখ কপালে তুলে শূদ্ধালেন কেন বলুন তো? কাঁপা গলায় শিবহরি বলনে, আপনি তো শূদ্ধু মন্ত্রী পৰ্ব্বন্ত গেছেন। প্রয়োজনে আমি মূখ্যমন্ত্রী পৰ্ব্বন্ত যাব। টে'ঠিগেড়িয়ার আমি ফিরে আসবই। এসে গেলে তখন? আপনি রেট কমিয়ে নিলে আমাকে নতুন করে রেট তুলতে বড্‌ বেগ পেতে হবে দাদা। তাই বলছিলাম—

ওঃ!—বলে একটি ছোট্ট শব্দ করে হাসলেন সদাশিব। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন শিবহরির দিকে।

শিবহরি শেষ বারের মত চোখমুছে নিয়ে গাড়ীর ভেতরে মুখটা নিতেই গাড়ীটা গাঁ গাঁ করে থানা থেকে বেরিয়েগেল। □

আয়ন।

কৌশিক গিরি

এক □ আজ তবে এইটুকু থাক

প্রায় পনেরো মিনিট ঠার দাঁড়িয়ে থাকার পর নিলয় আর অতনু বাস পেল। প্রথম স্টপেজ ছেড়ে দ্বিতীয় স্টপেজে আসার আগে নিলয় টুক করে একটা সিট পেয়ে গেল। সিটে বসার পর মেয়েটিকে ওর প্রথম নজরে এল। নিলয়ের উল্টো দিকের লেডিজ সিটে, বাসের দরজার ঠিক পাশেই আড়াআড়ি শরীর রেখে বসে আছে। নিলয়ের মনে হল, এত সুন্দর মেয়েদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব। ও পরপর কয়েকবার না দেখে থাকতে পারল না। মনুশীকল হল বাসে তেমন ভীড় নেই। দু'চারজন শব্দ দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় মেয়েটির দিকে এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা ভীষণ অস্বস্তিকর। সামনে পাতলা একসারি লোক দাঁড়ালে তাদের ফাঁক ফোকরে দৃষ্টি গিলিয়ে দেখার সুবিধে হতো।

নিলয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে অতনুও কয়েকবার ঘাড় ঘোরায়ে। বেচারী অতনু। ও এমন জারগার দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটিকে দেখতে হলে অনেকখানি ঘাড় ঘোরাতে হচ্ছে। অবশ্য খানিকক্ষণ পরে অতনু একটু পাশে সরে এসে সামান্য আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে সমস্যাটা মিটিয়ে নিল।

বাস জার্নি কোন কালেই নিলয়ের ভালো লাগে না। ও বাচ্চা ছেলেও নয়, যে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে দেখে সময় কাটাতে। তবে এরকম ফাঁকা ফাঁকা বাসে দৃষ্টির নাগালে সুন্দরী কাউকে পেয়ে গেলে, তারপর থেকে সময় কাটানো নিলয়ের কাছে এক ধরনের শিল্প বলে মনে হয়। অন্য সমস্ত শিল্পের মতো এই শিল্পেরও প্রাগপ্রতিমা হল নারী।

বেলগাছিয়া মেট্রোর সামনে বাসটা আজ খেন বড় তাড়াতাড়ি চলে এল। আশ্চর্য, মেয়েটাও উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। অতনু নিলয়ের গায়ে টোকা দিয়ে বলল, আর এদিকে আর—বলে ও সামনের গেটে এগিয়ে গেল। নিলয়ের ইচ্ছা ছিল মেয়েটির সঙ্গে একসঙ্গে নামবে। আর মাত্র কয়েক মনুহর্ত, তারপর কে কোথায় হারিয়ে যাবে। এখন এই মোহিনী রূপের আবেশের বস্তু যতটুকু সময় থাকা যায়, সেটুকুই বাড়তি পাওনা। কিন্তু অতনু বেবুকুফের মতো সামনের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে নিলয়ও বাধ্য হয়ে ওর পিছন নিল।

অতনু বাস থেকে নেমে একছুটে বেলগাছিরা মেট্রোর চাতালে উঠে পড়ল। ইলেকট্রনিক্স বোর্ডের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, নিলর কুইক, ট্রেনটা ধরতে হবে। বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। নিলও পিড়িমরি করে দৌড় লাগালো। এখন একটা ট্রেন মিস করা মানেই পনেরো মিনিটের খাতা।

টিকিট কেটে চলল সিঁড়ি বেয়ে ওরা যখন প্লাটফর্মে নেমে এল তখনই ট্রেন স্টেশনে ঢুকতে শুরু করেছে। ওরা এদিক ওদিক না গিয়ে সামনে যে কামরা পেল তাতেই উঠে পড়ল। ট্রেনে উঠে দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো নিলয়ের স্বভাব। পছন্দ মতো জায়গার দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে নিলয় বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। বাসের সেই মেয়েটি চলল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। ডানহাত সিঁড়ির হাতলের উপর আশ্রয় করে রাখা। রাধীর মতো দেহভঙ্গী। শব্দ চোখের দৃষ্টিতে মৃদু উদ্বেগের ছোঁয়া। বোধহয় এই জন্য যে মাত্র কয়েক হাত দূর দিয়ে ট্রেনটা বোরিলে যাবে।

ট্রেনের দরজা এখনও বন্ধ হয়নি। তবে দরজা ব্যঞ্ছন পূর্ব সংকেত হিসাবে পরবর্তী স্টেশনের ঘোষণা শব্দ হয়ে গেছে। এখন হিন্দ পর্ব চলছে। তার মানে আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। নিলর ভাবছিল ট্রেনের দরজার একদিকটা চেপে ধরে ওটার স্বয়ংক্রিয়তার সাময়িক বাধা দেবে কিনা। ঠিক সেই সময় একজন বলিষ্ঠ যুবক চলল সিঁড়ির উপর দিয়ে চার পাঁচ লাফে প্লাটফর্মে নেমে দরজার দিকে ছুটে এল। লোকটা কামরার ভিতরে সবে এক পা বাড়িয়েছে, দু'পাশ থেকে দরজার দুটো পাল্লা সশাস্ত্র ছুটে এল। লোকটার বাড়িয়ে দেওয়া পায়ে একটা তীব্র কামড় বসিয়ে আবার ফিরে গেল নিজের দরজার দিকে। মেয়েটি ততক্ষণে ট্রেনের দরজার সামনে চলে এসেছে। খুব সন্দেহিত সলজ্জ ভঙ্গিতে টুক করে ট্রেনে উঠে এল। তার পিছনে পিছনে আরও একজন ভগ্নমহিলা।

তীব্রভাবে কোনকিছু চাইলে মানু'ব একসময়ে সেটা ঠিকই পেয়ে যার। এই চাপ্তার আর এক নাম বোধহয় সাধনা। নিলয়ের আরও ভালো লাগল যে, মেয়েটি এমন জায়গার দাঁড়িয়েছে নিলর খুব সহজেই ওকে দেখতে পাচ্ছে, কোন রকম কসরত ছাড়াই। এত রূপ একসঙ্গে কোথা থেকে আসে। কোথাও ভিলমাত্র ঘাটতি নেই, বাড়তিও নেই। নিলয়ের মনে হল অনেকদিন পরেও একজন সত্যিকারের সুন্দরীকে দেখেছে।

পার্কস্ট্রীট পিছনে ফেলে ট্রেন ছুটেছে তীব্র গতিতে। ট্রেনের এক দরজার নিলর, পরের দরজার মেয়েটি। নিলয়ের দৃষ্টি করুণ বাধ্যতুর হয়ে এল। ও মনে মনে বলল, এখানেই শেষ সুন্দরী, আমাদের ক্ষণিক আনন্দ যাত্রার

এখানেই পরিসমাপ্ত। দৃশ্য-বোধের সঙ্গে আবেগ মিশে এক সুন্দর অনুভূতিতে নিলয়ের ভিতরটা অনুরণিত হয়ে গেল।

মরদানে নেমে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ গাঁততে পা চালাল। এখন প্রায় পৌনে তিনটে বাজতে যায়। নিলয়ের ইচ্ছা ছিল দুটো বাজার আগেই মরদানে পৌঁছে যাবার। যাতে প্রথম থেকেই বইমেলায় ঘুরতে পারে। সাতটার বেশী মেলায় আর থাকা যাবে না। তারপর ওদের ধর্মতলা থেকে জিন্স আর টি শার্ট কেনার প্রোগ্রাম।

বইমেলায় গম্প বা কবিতার বই কেনার দিকে নিলয়ের তেমন আগ্রহ নেই। কয়েকটা উপন্যাস কেনার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু দামের বহর দেখে সে ইচ্ছা উবে গেল। ও প্রচুর বই বেঁটে কয়েকটা আনকমন বই কিনল ওর পছন্দসই বিষয় মতো। এবং অবশ্যই সেগুলো ওর আয়তনের মধ্যে। বেশী ভারী ভারী বই কিনলে ঘর সাজানো হয়ত হয় কিন্তু সেগুলো প্রকৃত অর্থে পড়া হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশের বিশাল স্টল থেকে নিলয় আর অতনু এখন বের হল, বই মেলায় সব আলোগুলো তখন জ্বলজ্বল করছে। নিলয়ের লজ্জারাজ্য নরম শরীর গোখলির ফিকে আলোর বিদ্যায় চুবনে কামাতুর হয়ে উঠছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেলায় জনঘনত্ব ক্রমে বেড়েই চলেছে। নিলয় আর অতনু একটা খাবারের স্টলে ঢুকে পেটপূরে শুকনো খাবার খেল। ওরা সবচেয়ে স্টল ছেড়ে বেরিয়েছে, নিলয় মূখ্য ভুলে নিবিষ্ট মনে কাছাকাছি বইয়ের স্টল-গুলো মেপে নিচ্ছে, হঠাৎ অতনু ওর ডানহাতের আঙুলগুলো চেপে ধরে চাপা গলায় বলে উঠল, ঐ দেখ তোর সেই স্বপ্ন কী রানী।

নিলয় একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। অতনুর ইঙ্গিত ও ঠিক বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, কোথায় কে? কার কথা বলছিস?

—ঐ যে রবীন্দ্রনাথের প্যাস্টারগুলো যেখানে বিক্রি হচ্ছে, ঠেনের সেই মেরেটি বার দিকে বারবার টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল।

এইবার নিলয়ের চোখে পড়ল। অতনু ঠিকই বলেছে। কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো বারবার উচ্চারণ করলেও একেবারে লাগে না, বরং প্রত্যেকবার মনের মধ্যে নতুন নতুন অনুরণিত জাগায়। এই কথাটাও তেমন। স্বপ্ন কী রানী। নিলয় মনে মনে কয়েকবার শব্দগুলো উচ্চারণ করল। আপনা হতেই ওর সারা শরীরে ভালোলাগার ছায়া পড়ল। মেরেটি একটা ছবি হাতে ধরে পাপের ভদ্রমহিলাকে কি যেন বোঝাচ্ছে। ঐ ভদ্রমহিলাকেও তো নিলয় বাসে দেখল, মেট্রোতে দেখল। নিলয় আর একটু এগিয়ে গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। মেরেটি অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রবীন্দ্রনাথের দুটো দূরকম পোস্টার বেছে নিল। ভদ্রমহিলা দাম মিটিয়ে দিলেন। তারপর ওরা অন্য

স্টলের দিকে এগিয়ে গেল। নিলও পারে পারে ওনের অনুসরণ করছিল। অতনু এগিয়ে এসে চাপা গলার বলল, নিলয় ওসব ধান্দা ছাড়। এভাবে পিছনে পিছনে ঘুরতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। সাতটার আগে এখান থেকে বেরোতে হবে খেরাল আছে ?

নিলয় থমকে দাঁড়াল। অগত্যা মানুষের ভিড়ে ওর স্বপ্নসুন্দরী বিস্মদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিলয় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

দুজনে দুটো মন-পসন্দ জিন্সের প্যাণ্ট আর টিশার্ট কিনে পাতাল রেলে উঠল। পাতলা পাতলা পলিপ্যাকে বইদের পাশে জমকালো প্যাকেটে জিন্স ঝুলছে দুজনের হাতে। লম্বা প্লাটফর্মের নিশ্চিন্তা খান খান করে ট্রেন ঢুকল বেলগাছিয়া স্টেশনে। টেউয়ের মতো মানুষের ঢল আছড়ে পড়ল আলো কলমল চক্রে। নিমেষেই চলন্ত সিঁড়ির সামনে একটা অস্থায়ী জটলা তৈরি হয়ে গেল। সিঁড়ি ভর্তি লোক নির্দিষ্ট গতিতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। একসঙ্গে এতগুলো মানুষের ঊর্ধ্বগতিতে এক ধরনের সৌন্দর্য আছে। নিলয় স্থির দৃষ্টিতে ঐ দিকেই তাকিয়ে ছিল। অতনু ওকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, ঐ দেখ নিলয়, আবার। আজ কি হচ্ছে বলতো, আশ্চর্য যোগাযোগ।

তাইতো সামনেই সেই মেয়েটা। ওর গা ঘেঁষে মধ্যবয়স্ক সেই ভদ্রমহিলা। ট্রেনের কয়েকটা কামরা আগে পরে তাহলে ওরা উঠেছে। দু'পাশের চওড়া ভিড় সরু হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চলন্ত সিঁড়ির মুখে। মেয়েটি উঠে যাবার খানিক পরে দুই বন্ধুতে উঠে এল পাতাল রেলের গম্বীর থেকে। রাস্তায় বান স্টপেজেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে নিলয় মেয়েটিকেও দেখতে পেল। শেষ দেখা হতে হতেও হচ্ছে না।

একটু পরে বাস এসে গেল। মেয়েটির হাত ধরে ভদ্রমহিলা বাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। আশপাশ থেকে যাত্রীরা টপাটপ বাসে উঠে যাচ্ছে। নিলয় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অতনু ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, কি হল চল।

নিলয় অনামনস্কভাবে জবাব দিল, এ বাসটা ছেড়ে দে, পরেরটার যাবো।

অতনু অবাক হয়ে বলল, কেন হঠাৎ কি হল ?

কিছু নয়। ততক্ষণ সিগারেট খাইগে চল। বলে নিলয় মৃদু হাসার চেষ্টা করল।

দুই □ বুলবুলিতে বান খেয়েছে

সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘামের স্রোত নামছে। চামড়া ফুড়ে শরীর থেকে তাত বেরিয়ে আসছে দমকা মেয়ে। দেব মাথায় পাগড়ি করা গামছাটা খুলে ফেলে চেপে চেপে ধরল মুখে গলার বুকে। প্রথমে ডান হাত, পরে

বাঁ হাত তুলে পর্যায়ক্রমে বাঁ হাত ও ডান হাতে গামছা নিয়ে কাল মূছল ঘষে ঘষে। গামছা পাকিলে মাথার উপর দিয়ে ঘূঁরিয়ে পিছনে ফেলে সারা পিঠ রগড়ে নিল বেশ কয়েকবার। মাথার করে ঝোড়া বোকাই মাটি বওয়ার সময় কিছু মালুম হয় না, কিন্তু কাজ শেষ হবার পর ঘামে গরমে সারা শরীর আইটেই করে। তারপর ঘাম মুছতে মুছতে শরীরের জ্বলন্ত কমে এলে ফিনফিনে বাতাসে সুখ সুখ স্পর্শ পাওয়া যায়।

শরীর সামান্য ঠান্ডা হলে দেবু কোমরে গৌজা বিড়ির ব্যান্ড বের করল। খুব মনযোগ দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে মাথা তুলেই দেবু স্ব. কৌচকালো। বাঁধের গায়ে বেজাবরের আড়াল টপকে ওর তাঁক্য নজরের আরম্ভে চলে এল যে মরদটা ও গোপাল সর্দার। দেবু বলে সোন্দার। বরষ পঞ্চম ডিঙিরে ঘাটের দিকে এগুচ্ছে অথচ দেখলে টের পাবার উপায়টি নেই এমন পেটানো মজবুত শরীর। সর্দারের দু'হাতে দু'টো ব্যাগ। আর ওর গা যে'বে রূপালি পাছা দু'দিলে দু'দিলে হাটছে। রূপালির হাটার এই ধরণ দেবুর খুব দুঃখিত লাগে। প্রথম থেকেই ও এইভাবে হাটে, নাকি প্রেফ ইচ্ছা করেই এমন করে, দেবু জানে না।

রূপালির রকম সকম দেখলে রাগে দেবুর রক্ত চলকে ওঠে। সারা ভাটার টি টি করে গেছে ওর নামে। ভাটার খবর রাত পোহার না পাড়াময় হয়ে যায়। তবু যদি মেয়ে মানুহটার লিনমাত্র স্বক্কেপ থাকে। সর্দার না হয় ব্যাটা ছেলে, পাঁচ জনের পাঁচ কথা গায়ে মাখে না। সব সময় নিজের ভীটে থাকে। কিন্তু মেয়েছেলে হয়ে তুই সর্দারের সঙ্গে টল্যাটলি করিস কোন আক্কেলে? মেয়েমানুষ লাই না দিলে পরপুরুষ অমনি মাথার উঠবে অত সোজা?

দেবু রাগে ফংসতে ফংসতে বিড়িতে লম্বা লম্বা টান মারে। আশু পুরুষ মানুহ হয়েও দেবু নিজের পরিবারকে বেশ রাখতে পারে না। এই দুঃখ যে কত জোরালো হয়ে আঁতে লাগে, তা দেবুই জানে। ভাটার লোকেরা এ নিয়ে ওর সঙ্গে উল্টোপাল্টা ইয়ারিকি' মশকরা করলে এক এক সময় দেবুর রাগে পাগল হয়ে বাবার উপদ্রব হয়। কিন্তু দাঁতে দাত চেপে সেসব সবে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মালিক ওদের থাকতে ঘর দিয়েই। তার উপর জ্বালানি কেরোসিন তেল, সব দ্বিত। দেবু মাটি ফাতার কাজ করে। রূপালি ভাটার স্ট্রাফেদের জন্য দুবেলা রান্না করে দেয়। মাস গেলে হাতে বা আসে হেসে খেলে দুজনের দুবেলা খাওয়া জুটে যায়। তাই লোকের কথার ক্ষেপে গিয়ে ফালতু হুজুজাত করতে দেবু ভরসা পার না।

দেবু পুরুষ হাত মুখ ধুয়ে ওর খুঁপড়ি ধরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসল। এখন জল সাংঘাতিক অঁতে আছে। একটু রাতের দিকে জল জুড়োলে

তখন দেবু চান করবে। সুবেমাত্র একটা বিড়ি ধরিয়েছে, সদ'র দূটো ব্যাগ এনে হাজির। দূটো ব্যাগেই বাজার ঠাসা। ওর মধ্যে একটা ব্যাগ দেবুদের। তার পেটটাও পোরাতি মেয়ের মতো ফুলে আছে। রূপালি আজকাল খুব হাকত-লম্বা হয়েছে।

ব্যাগ দূটো রেখে গোপাল বলল, কি রে দেবু আজ এত তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিল ?

দেবু রুদ্ধ গলার বলল, সে কথা হারু মাকিকে শুনোগে যাও। কাজ ছাড়ার আমি কে ? সে সদ'র তার কথামতো কাজ হবে।

—আহা রাগছিল কেন ? কুরোনের কাজ, তোদের সদ'র একবেলা ক্লাবে কি নাই ক্লাবে সে তোদের ব্যাপার, আমি এমনি বললাম। দে, একটা বিড়ি দে।

গোপাল ম'ডল গড়নের সদ'র আবার ভাটার মালিকেরও স্টাফ। একদিক থেকে মোটা কমিশন খায় আর একদিক থেকে মোটা মাইনে। তার উপর গ্রামের মোড়ল গোছের লোক। সব গ্রুপের প্রমিকরাই সদ'রকে তাই সম্মুখে চলে। রূপালির ব্যাপারে সামনাসামনি সদ'রকে কিছু বলে, একটা প্রমিকেরও কলঙ্কেতে সে সাহস নেই। দেবুর নিজের পরিবার রূপালি অথচ ওর ও সেই একই দশা। এক এক সময় দেবুর ভীষণ ইচ্ছা হয় সদ'রকে দূটার কথা শুনিয়ে দেয়। মনে মনে অনেকবার মহড়া নিলেও শেষ পর্যন্ত দেবু সদ'রকে স্পটাস্পট কিছু বলতে পারেনি। তাছাড়া বললেই বা কি হতো ! রূপালি নিজেকে বতকণ না শোধরাচ্ছে, সদ'রকে হাজার একটা কথা শুনিয়েও কোন লাভ আছে কি ?

সদ'র বিড়ি ধরিয়ে ভাটার দিকে চলে গেল। রূপালি ব্যাগ থেকে বাজার বের করে গুছিয়ে রাখছে। দেবু সত্ক্র চোখে বউকে দেখতে লাগল। রূপালি ব্যাগ থেকে একটা ঝকঝকে আরনা বের করে দেবুর দিকে মুখ তুলে বলল, একটা আরনা কিনলাম। অনেক দাম চাইছিল। ভাগ্যিস সঙ্গে দাদাবাবু ছিল তাই সম্ভাব্য হয়ে গেল।

দেবু আরনার দিকে झुकंচে তাকাল। তারপর বিরক্তির সুরে বলল, একটা আরনা থাকতে আবার একটা কিনতে হল ! পরসী কি খোলামকুচি ?

—ওটা আরনা ! সাতবার মেঝেতে ফেলে ফেলে আর কিছু বাকি রেবেছ ওটার ?

—ফাঁটা বলে কি কাজ চলে না। ঐ তো ম'খের ছিঁরি। সেই দেখতে আবার নতুন আরনা কিনতে হল ?

আরনাটা দেখিয়ে রূপালি স্বামীর কাছ থেকে একটু তারিফের আশা করছিল। দেবুর ঠেস দেওয়া কথা শুনে রূপালি ম'খ কামটা দিয়ে উঠল,

মুখের এই ছিঁরি দেখে তোমার পিরিতের লোকজনের মাথা টলে বার, জিনে লাল। জ্বজ্ব করে ।

—সে তোর মুখ দেখে নয়, গভর দেখে । বাজা মাগীর সঙ্গে ফস্টিনান্টি করার কোন বেপস নেই তাই ।

রূপালি হঠাৎ চিংকার করে উঠল, সব সময় বাজা বাজা করবেন বলছি । বাজা তো তুমি । রাধাপুত্রের ডাক্তারের শ্রুতিয়ে এসো গে নোষ কার ?

দেবু চোখ পাকিয়ে বলল, তুই ডাক্তার দেখাতে গিরোঁছিলি, আমাকে তো কই বলিসনি একবারও । মন্দ ডাক্তারের সামনে কাপড় তুলতে নজ্জা করলনি তোর ?

—রোগ হলে আবার নজ্জা কিসের ? তাছাড়া আমি একা তো বাইনি । দাদাবাবু সঙ্গে ছিল ।

দেবু ছুটে এসে রূপালির চুলের গোছা চেপে ধরল । গায়ের জোরে টানতে টানতে বলতে লাগল, ঐ লোকটার সঙ্গে অত পিরিত কেন তোর আঁ ? আমাকে বললে আমি কি নিরে বেতুমনি ডাক্তারের কাছে ?

রূপালির পিঠে দুমাম্‌দু করে ক ঘা বসিয়ে ছেড়ে দিল । মনের স্রুখে বউকে যে মারবে তার উপায় নেই । রূপালি সাংঘাতিক বেরাড়া মেরেছেলে । বেশ কিছুদিন আগে দেবু একবার বউকে বেধড়ক মেরেছিল । সেদিন ভাটার মালিক এসেছিল । রূপালি মার খেয়ে সটান মালিকের কাছে গিয়ে হাজির । সেই থেকে দেবু ভীষণ জন্দ হয়ে গেছে । আর একবার মালিকের কানে খবরটা গেলেই দেবুর কাজের দফারফা হয়ে যাবে ।

রাগলে মানুষ আবেগ প্রবল হয়ে পড়ে বউকে মেরেও দেবুর রাগ প্রশমিত হল না, বরং রাগ আরও চড়তে চড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেল । ঘর থেকে বেরিয়ে দেবু হন হন করে হাটতে লাগল । বাঁধ ঘরে অনেকটা হাঁটার পর হঠাৎ দেবু একটা কঠিন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলো । আরও খানিকটা হাটলে নিতাইয়ের ঘর । ও ভাটার করলাম্যান । বিকেলে একপর্ব ডিউটি সেরে ঘরে চলে এসেছে । দেবু সোজা ওর উঠানে নেমে গিয়ে নিতাইয়ের নাম ধরে হাঁক পাড়ল । নিতাই ওর ঘরের মেঝেতে বসে বিড়ি খাঁচছিল । ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেবুকে দেখে অবাক হয়ে গেল । বলল, কি রে তুই !

দেবু ফ্যানফ্যাশে গলার বলল, একবার বাইরে আর, তোর সঙ্গে কতা আছে ।

নিতাই বলল, আর ঘরে আর । তোর কি হয়েছে বলতো ? অত হাঁফাচ্ছ কেন ?

—ঘরে নয়, পেরাইডেট কতা, বাইরে চ ।

—ঘরেই কস না । এখানে কেউ নেই, সব হাটে গেছে ।

দেবু নিতাইয়ের ঘরে আগেও করেকবার এসেছে। এখানে ওর সংকোচের কোন ব্যাপার নেই। দাওয়ার পা ঝুলিয়ে দেবু বসে পড়ল, নিতাই দেবুর দিকে বিড়ি এগিয়ে দিল তারপর নিজে একটা ধরিয়ে খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বল কি ব্যাপার?

দেবু ঝপ করে নিতাইয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, নিতাই তোর হাতে তো অনেক মেয়ে আছে। আমার জন্য একটা মেয়ে দেখে দে। বে করব।

দেবুর অসম্মত আগমনের কারণ নিতাইয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তবু কৃত্রিম বিশ্বাসের ভান করে নিতাই বলল, কেন রে তোর হঠাৎ কি হল বলতো? বৌদির সঙ্গে নির্ঘাত্য ঝগড়া বাঁধিয়েছিস!

দেবু কাতর স্বরে বলল, ঘরে একটাও ছেলে পুঁলে না থাকলে কি কারোর কারোর ভালো লাগে, তুই বল। বাজা মেয়েছেলে নিয়ে আর কদিন ঘর করা যায়? সেরকম বউ হলে এটাও না হয় মেনে নেওয়া যেত। ওর ব্যাপার-স্বাপার তোরা চোখের সামনে দেখাছিস। সংসারে ওর আর মতি নেই।

—বৌদি সবার সঙ্গেই একটু খোলামেলা ভাবে মেখে। তাবলে তোর প্রতি টান নেই একথা ভাবাছিস কেন?

—তুই জানিসনি নেতাই, আমি মরলে ওর হাড় জুড়োর। পারের ছেকল খোলে, তুই মাইরি এইটুকু উপকার কর। গরীব ঘরের একটা কচিমতো মেয়ে দেখে দে। আমি অন্য জায়গায় গিয়ে সংসার পাতব।

নিতাই আগাগোড়া গান্ধীর্ষ বজায় রেখে বলল, ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায়। তুই মাথা গরম করিসনি তো, যা ঘরে যা।

দেবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি দেখিস কিন্তু। সেরকম হলে আমি সামনের হপ্তাতেই এখান থেকে চলে যাবো।

দেবু দৃষ্টির আড়াল হতে নিতাই মনে মনে একচোট হাসল। রও পিছনে লাগার জন্য নিতাই প্রায়ই বলে দেবু আর একটা বিয়ে কর। এভাবে কেন নিজের জীবন নষ্ট করিস। দেবু প্রথম প্রথম কথাগুলো হাস্য ভাবে নিত। বার বার আঘাত করলে পাথরে ও দাগ পড়ে। নিতাইয়ের কথার ফাঁদে পা দিয়ে দেবু তলে তলে নতুন সোনার পাতার খাম্বা করবে তা কে জানত। নিতাই ঠিক করল কাল সকালেই রূপালি বৌদিকে সব কথা বলে দেবে। একটা বৌ থাকতে আর একটা কচিমতো মেয়ে বিয়ে করার মতলব আটা দেবু তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

এতক্ষণ দেবুর শরীর প্রচণ্ড রাগে তেজে জ্বালা করছিল। নিতাই একটু ভরসা দেওয়ার পর দেবুর রাগের তেজ এক চটকায় অনেকটা কমে গেল। বাঁধ থেকে নেমে ঘরের দিকে পা বাড়াত্তেই ও স্বপ্নের একটা গন্ধ পেল। বাবুদের

জন্য সম্মুখে তাহলে মাংস রান্না হচ্ছে। আজ ফুলতলার হাট। নিশ্চয়ই ওখান থেকে মাংস এসেছে। কয়েক পা এগোতে দেবু নিজের ভুল বুঝতে পারল। সুন্দর গন্ধটা মনে হচ্ছে ওদের ঘরের দিক থেকে আসছে। আরও এগিয়ে যেতে দেবু ওদের রান্নাঘরের ছোট ঘুলঝুলির মধ্যে দিয়ে রুপালিকে দেখতে পেল। কেরোসিনের ল্যাম্প বা হাতে জ্বলন্ত ঘরে ডান হাত দিয়ে খুঁতী নাড়ছে। আর তাতেই কড়া থেকে নোলা লাগানো গন্ধটা পাতলা ধোঁয়ার ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। মূহুর্তের মধ্যে দেবুর জিবে জ্বল এসে গেল। নিজের ঘরের সামনাসামনি আসতে সদাঁরকে দেখতে পেল। হারিকেনের আলোর সামনে খাতা খুলে হিসেব করছে। বাবুদের অফিসে কিজলী আলো আছে। বাবুদের লালচে আলোর জোর হারিকেনের আলোর চেয়ে ঢের বেশী। তবু সদাঁর প্রায়ই খাতাপত্র নিয়ে দেবুর ঘরে এসে হাজির হয়। আজ এই যে বিশেষ রকমের খাবারের আয়োজন, এটা পুরোপুরি সদাঁরের খরচে। কড়ার মাংসের পরিমাণ এক ঝলক দেখেই দেবু বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া আজই তো প্রথম নয়। প্রতি মাসেই দেবুর এখানে দু'চার বার এরকম আয়োজন হয়েই থাকে।

নিতাইয়ের ঘর থেকে বেরোনোর পর ওর মনের কোনে বেশ আলো বাতাস খেলছিল। কিন্তু সদাঁরকে দেখার পরই আবার গুমোট ভাবটা ফিরে এল। দেবুর মনে হল ওর সংসারের এই বেহাল অবস্থার জন্য সদাঁরই দায়ী। গেরামে লোকটার পরিবার আছে, ছেলে মেয়ে আছে, তা সত্ত্বেও রুপালির সঙ্গে দিনরাত গুজুর গুজুর ফুসুর ফাসুরের অন্ত নেই। ওরকম ডাকাবুকো লোকের আঁচে এলে কোন মেয়ের না মাথা ঘুরে যায়।

অশুকারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে দেবু জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে সদাঁরের দিকে তাকাল। ওর দুটো চোখাল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে গেল। লোকটা শত্রুরের চেয়েও খতরনাক। সামনে মিঠাই খাওয়ারে আবার পিছনে বাঁশও দেবে। কথটা উল্টে পাশে ভাবতে ভাবতে দেবু মনে মনে একটা উপায় বাতলে নিল। পেটব্যথার অভিনয় করে শব্দ জ্বল ভাত খেয়েই আজকের রাতটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। সদাঁরের পরনার রাজভোগ কিছ'তেই ওর গলা দিয়ে নামবে না।

পুকুরের জল এতক্ষণে নিশ্চয়ই জুড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দেবুর চান করতে ইচ্ছা করল না। দেবু নিঃশব্দে ওদের আধময়লা বিছানার গিঁড়ে শব্দে পড়ল। সারা ঘর গন্ধ ভরে গেছে। উফ্ দেবু কতদিন খাঁসি মাংস খারনি। অনেকদিন ও মাসে এ তল্লাটে দেখাই যায় না। সেই বি. ডি. ও অফিসের সামনে পাওয়া যায় সে কত দূর, বাসে আধঘণ্টা লাগে। একশ তিরিশ টাকা কেজি। দেবুর সাধ থাকলেও সাধো কুলোর না। আজ কি ভাগ্যস

হাটে খাসি মাংস পাওয়া গেল। আর সত্যি বলতে কি রূপালি এই জিনিসটা খাসা রাঁধে। কষতে কষতে ছিবড়ে অংশগুলোকে নরম মোলায়েম করে তোলে। কিন্তু তাতেই বা দেবুর কি এসে যায়। ওর তো পেট ব্যথা।

অপূর্ব গম্বুটা বাতাসে হামাগুড়ি দিলে দিতে দেবুর নাকে এসে বার বার খাক্সা মারছিল। বড় অসময়ে দেবুর খিদেটা তাই চাগাড় দিয়ে উঠল। পেটে হাত বুলোতে বুলোতে ও ভাবতে লাগল সত্যি সত্যিই পেট ব্যথার অভিনয়টা ও করবে কিনা। □

শরিক

গৌতম রায়

ছ' মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেল বিদ্যুৎ। সারা দুখটার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোফটা পাজ্রাবী গারোরানের মত গালের দু'পাশ দিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে নেমে এসে মিশেছে দাড়ির সঙ্গে। চোখ দুটো বসা বসা। সারা দুখটার অকস্মতর একটা সুস্পষ্ট ছাপ। পরনে সেই ছ'মাস আগে পরে যাওয়া পোশাক।

চাইবাসার জেল থেকে বেরিয়ে বাইরেটা একবার ভাল করে দেখল বিদ্যুৎ। বাতাস বইছে। একটা ধীরগামী লরির মাথায় পুঙ্খমুখে লাগানো লাউড-স্পীকারটা তখন ও ঢেঁচাচ্ছে। 'কহো না প্যার হ্যার ?' আর তারই তালে তালে নানান অল্পভঙ্গী করে দশ ব্যারোজন ছেলে নাচছে। কি একটা প্রতিমা লরীতে। কিন্তু সেটাকে দেখা ভার। লরীর সামনে জনা বিশেক ছেলে বড়ো। সেখানেও উৎসব চলছে নাচের। হ্যাঁ, ছেলে বড়ো সবাই নাচছে। বাজনা ও বাজছে। ঢাক-ঢোল কাঁশি নয়। তাস্য। ওর একটা অশ্রুত উদ্ভাদনা আছে। গ্রামে আর ভাসায় কাঠি পড়লেই ছেলে ছোকরাদের পাতলা কোমরগুলো শিরশিরিয়ে ওঠে। পাছটা নানান ভঙ্গীতে দুলে ওঠে।

বিদ্যুৎ ও এতকণ নাচ দেখাছিল আর সবায়ের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকে। দশ'কেরা বেশ তামাশা বোধ করছিল। তাদের মধ্যে থেকে জনাক্রমিক ছেলের লিকলিকে কোমর দুলে উঠল। রাস্তার মোড়টাতে লরীটাকে পেছনে রেখে বৃত্তাকারে ভিড় করে নাচ বাজনা বেশ জমেছে। শালা! বিদ্যুৎ-এর সমস্ত দুখটা বিককার আর ব'গার ভরে উঠল। হারামজাদা!

পাশের লোকটার গারে ফোস্কা পড়ল। কিন্তু বলতে পারল না কিছ'ই। চিন্তা করে দেখাছিল এর কি উত্তর দেওয়া যায়। বিদ্যুৎ ওর উত্তরের অপেক্ষা না করেই হনহনিরে চলে গেল।

চোরার কোথাকার। লোকটাও গজ্ গজ্ করতে করতে সরে পড়ল।

পুলিশের গুঁতো বেয়ে লরীটা গতি ফিরে পেল। ভিড়টাও নড়ল।

মাসটা কার্তিক। তবু ও হিম এখনো ভেমন পড়েনি।

কালী পুজোর রাত। কিন্তু বোম্বার কোন উপায় নেই। বিজলী আলোর রাস্তার অস্বকার—আকাশের অস্বকার সব ঢেকে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ একবার হাসল। তরু হাসি। পান বিড়ি খাওয়া ছোপধরা দাতগুলো অশ্বকর রাতে বিজলী আলোর একবার ঝকঝকিয়ে উঠল। কমল মেঘ বিদ্যুৎ এর পিঠ চাপড়ে বলল, বাধ গুরু। এমন 'মাল' বাধবি যেন শুরুরটার সারা জীবন ইরাদ থাকে।

বিদ্যুৎ উত্তর দিল না। ওর স্বভাব অনুযায়ী মনের জ্বালা মিটিয়ে একবার পচ্ করে থুতু ফেলল।

শালা! ওই শালাই আমাকে সনাক্ত করেছিল। ওদের ফেস্টুনে আমি নামি কম্ মেরেছি? জীবন হালদারের নামে বিদ্যুৎ কথাগুলো ওর স্বাভাবিক ভাষায় উচ্চারণ করল। বিদ্যুৎ বোম কখনও নিজে পটকায় না। থুঃ!

বিদ্যুৎ তার বোমা তৈরীর কাজে মন দিল। তার সামনেই রয়েছে একতাল বাধা বোমা আর কিছু মাল মশলা।

গত বছর পাঁচ মোড়ে ওদের ফেস্টুনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কেন্দ্র করে গোলমাল শুরু হয়। গোলমালটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোডার বোতল, বোমা সহকারে খণ্ডবৃক্ষে পরিণত হয়। কালু, হরেন, জগা জব্ব ও হয়েছিল। রাস্তার মেরেরা বোমার শব্দে যে বেদিকে পারল পালাল। ঐ ভিড়ের মধ্যেই লুকিয়ে লুকিয়ে পালানিচ্ছিল বিদ্যুৎ। বাঘের মত ঘাপটি মেরে রাস্তার রোয়াকের উপর টিনের শেড দেওয়া চারের দোকানটার বসেছিল জীবন। বিড়ি ফুঁকছিল সে। বিদ্যুৎকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামান্য ধমকাধমকা ও হল। নিরুপায় বিদ্যুৎ বাধা হয়েই হাতের শেষ সম্বলটি পটকাল। ধোঁয়ার ভরে উঠল চারিদিক। বিদ্যুৎ পালাতে গিয়েও পারল না। পুঁজি তাকে ধরে ফেলল। জীবন তাকে ভাল করে সনাক্ত করে দিল। রাস্তার দু' একটা সাক্ষীও জুটে গেল।

সমস্ত ছবিটা বিদ্যুৎ এর চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। রাগে ওর ভেতরকার অঙ্গগণটা গরগর করতে লাগলো। একবার খৈনী খাওয়া মুখে পচ্ করে থুতু ফেলে বোমা বাধতে শুরু করল।

বিদ্যুৎ! বাইরে থেকে একটা ব্যস্ত সমস্ত ডাক এল। রমা ছাদ থেকে পড়ে গেছে! সংবাদ দিল নুপেন।

কি? কি বললি?

বিদ্যুৎ হাতের বোমা নামিয়ে রেখে এক দৌড়ে ছুটে যেতে গেল। পারে ছড়ানো দাঁড়ি একটা জড়িয়ে আবার পড়ে ও গেল। আধ বাধা বোমটার টান পড়তেই সেটা একটা বিরাট রাস্কসে আওয়াজে ফেটে পড়ল। নিশ্চুতি রাত সে আওয়াজে থমকে গেল। স্বাধীনতা নিশ্চুতির সাথে কালীপুজো সারা হ'ল।

আজ হাসপাতালে সবাই এসেছে। বিদ্যুৎ এর অবস্থা ভাল নয়।

মাথায় ও বড় রকমের আঘাত পেয়েছে। ডাক্তারদের পক্ষে ওকে আর বাঁচান সম্ভব নয়।

অঞ্জলিজন দেওয়া হয়েছে। জীবন হালদার ও এসেছে ওকে দেখতে, জীবনের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে রয়েছে বিদ্যুৎ। কোন প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে নয়। কেমন যেন অসহায়ের মত জীবনের চোখের তারার পানে চেয়ে রয়েছে ওর চোখের দুটি তারা। জীবন ও তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে একটা শ্বাভাবিক অনুকম্পা। এগিয়ে এসে বলল, জাবিসনে। আর্মি ও রমার দাদা রইলাম।

জীবনের গলাটা কেমন ভিজে এসেছিল। কথা যেন কিছুতেই বেরোচ্ছে না। সেইজন্য অতি সংক্ষেপে অক্টোবরে মৃত্যুর কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ ও যেন কিছু বলতে চাইল। হাতটা তুলে একবার শেকহ্যাঁত করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

অবসন্ন মনে বাড়ি ফিরে এল জীবন। গলির মূখ্যেতে তেতালার বারান্দার সঙ্গে ঝুলানো ফোনটোনটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। □

চাষে রক্তের দাগ

জীবন সরকার

হলুদবাড়ি চা বাগানে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। চারপাশে সবুজ...সবুজ।
দূরে পাহাড়ের কালো রেখা। আকাশটা মনে হয় মেঘে ঢাকা। ছাড়া
মাধুর্য দিয়ে বসে আছে। একদুটি বৃষ্টি নামবে। গায়ে শীত শীত করছে।
শীতের সময় তো নয়, তবে কেন ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব।

এখানকার জল আবহাওয়া মনে হয় এরকমই। শুনিয়েছিলাম ডুরার্সে
বৃষ্টি নামলেই শীত নামে। আর শীতের সময় তো হাড় কাঁপানো শীত।
বেশ ঠান্ডা। আবার এটার সময় বেশ বৃষ্টি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। থই থই
চারপাশে জল। নদী পেট ভাসিয়ে বাড়ীর উঠানে এলোমেলো আছড়ে পড়ে।
এই ডুরার্সে আমার বেশীদিন নয়। কিন্তু এর মধ্যেই জানা হয়ে গেছে।
শীতকাল কেমন। বর্ষাকাল কেমন। চা বাগান ছাড়া কিছু খানজীর্ণ
আছে এই অঞ্চলটোতে, পাটও হয়। উত্তর বাংলার পাট তো একসময় বিখ্যাত
ছিল। এখন আছে। জারগাটা এমনিতে খারাপ নয়। বাইরে থেকে কেউ
অপছন্দ করবে না। কিন্তু কাজের জারগাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এখনো
বৃষ্টির গন্ধ রয়েছে। বেহেতু এই চা বাগানের পশ্চিম বৃষ্টি থাকতেই। এর
মালিকানাও ছিল ওদের হাতেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মালিকানা
বদলেছে কিন্তু মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। এমনিতে ছিমছাম
পরিষ্কার। আগে নাকি আরো পরিষ্কার ছিল।

আসলে বৃষ্টিরদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিকার আছে। ওদের
জীবনযাত্রা চলে বাড়ি ধরে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। তাছাড়া
ওরা কাজটা নিজের কথা ভেবে নিজের মতো করে। বাগান মালিকের বলেও
ওরা অবহেলা করে না। কিন্তু এখন সব পাটে গেছে। কেউ কারোর কথা
শোনে না, কেউ কারোকে মানে না। বে কেউ যা খুশি করে। একটা বাজে
সময় চলছে। কারোর কাজ করার ইচ্ছে নেই। চাকরি একটা দরকার ছিল।
কোন কিছু না ভেবে চলে এসেছি—চা বাগানে।

এই চা বাগানের নাম আছে। বাইরে যার। ফলে ভারতের বাইরে
বিদেশেও বেশ সুনাম আছে।

চা গাছের প্রথম পাতার স্প্রে করা হয়নি। ফলে ঐ গাছকে রেড স্পাইডার
বলে। পোকাকার উপদ্রব বেশী। কিন্তু স্প্রে করলে স্বাদ কমে যাবে ফলে স্প্রে

করা হয় না। পাতাগুলি তুলবার শিশু প্রমিক নেওয়া হয়। ওদের হাতে প্রাণ্টিকের ঠোঙা দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পেটের জন্য পাতা তুলে কিন্তু হাতে পোকাকামড়ে যা হয়ে যায়। ওষুধ দিলেও কিছূ হয় না। আঙুল-গুলি খসে পড়ে। দুটো ভাত খাওয়ার জন্য বাগানে কাজ করতে আসে। তাও পামানেন্ট কাজ নয়। যখন তখন বের করে দিতে পারে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের বেশী পরসাত দিতে হয় না। কাজ করানো যায় বেশী। গালমন্দ করলেও মূখে শব্দ করে না। একটা বয়স্ক লোককে দিয়ে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থাটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

এই ব্যবস্থাটা পাল্টানো দরকার। কিন্তু কলকাতার অফিস থেকে অর্ডার না বের করলে কিছূই করা যাবে না। চারপাশটা একটু ঘুরে চলে এলাম কোয়ার্টারে। এতবড় কোয়ার্টার। ফাঁকা জায়গা। আজ থেকে একটা ছেলে আসবে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত থাকবে। দুপুরের লাগু অফিসের ক্যাণ্টিনেই। কারখানা থেকে অনেক দূরে, হেঁটে যেতে হয়।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকছে। দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েই দেখি একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিছূ বলবি।

মুখ নেড়ে না করল।

—তবে কেন এসেছিস?

—কাজ করব।

—কি কাজ করবি।

—বাড়ীর কাজ।

—তোমার মা-বাবা নেই।

—মা আছে। বাবা নেই।

—মাকে নিয়ে আসবি।

বলতেই চলে গেল। ছেলেটাকে মনে হল মুখটা চেনাচেনা কোথায় যেন দেখেছি। কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না। কিছূতেই মনে করতে পারলাম না। মনের ভিতরটা খুঁখু করতে লাগল। এইটুকু বাচ্চা ছেলে স্কুলে না গিয়ে কাজের জন্য চলে এসেছে। কোথায় থাকে। নিশ্চয়ই কুলা লাইনে। কলকাতা থেকে গিয়ে এই নির্জন জায়গার একদম ভাল লাগছিল না।

কেবলি বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রসদন, নন্দন। এ্যাকাডেমী ফাইন আর্টস। বাংলা এ্যাকাডেমী এইসব জায়গার কথা যারবার মনে পড়ছে।

এইরকমই জারগা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সোব, লাইটহাউস, মেট্রো, কি সুন্দর সিনেমা হল। এই সব জারগার কলকাতার কথা ভাবাই যার না। রাত্রির বাড়ছে। ততই কেমন যেন ভর ভর লাগছে।

দূরের বাগানে কি কি পোকা ডাকছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে পাশের কোয়ার্টারে লোকজন এখন জেগে বসে আছে। মশারি টাঙিয়ে শূরে পড়লাম, কাল আবার সকালেই উঠতে হবে।

বথারীতি ঘুম আসছিল না। চারপাশে নিশ্চুম।

জারগাটা একটু নিরিবালি বলে একটু ভর ভর লাগে। ছেলেটা যদি আগামীকাল আসে তাহলে না করে দেব। কি করব ঐ ছেলেটাকে রেখে। এমনতে শিশু শ্রমিকের বিরোধী আমি। শিশুশ্রমিকদের নিয়ে কতলি খোঁছ। নিজেরই কিনা ওদের রাখব। গালমন্দ করব। না তো আর পারব না দার্জিলিং-এর চা পাতা তোলায় শিশু শ্রমিকদের রাখব না। জেনারেল সিফটের লোকরাই ঐ কাজটা করবে। কিন্তু আমার কথা যদি পরিচালকমন্ডলী না শোনে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হল। পরিচালকমন্ডলী ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়েই কাজটা করাবেন। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাবেন অথচ ওদের পাওনা দেবেন না। উপরন্তু ওদের হাতে দগদগে ঘা। তার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই। এটা হতে পারে না। আপনার কথা মেনে আমি এখানে কাজ করতে পারব না।

জেনারেল ম্যানেজার বললেন—এইখানে এই নিয়ম। এটাই চলে আসছে। আমরা পাল্টাব কি করে। বাইরে যে চা-টা পাঠানো হয়, তাতে স্প্রে করা যাবে না। ফলে ফলন কম। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দিয়ে কাজ করলে খরচ কম হয়। —আপনার স্বাস্থ্য মানতে পারলাম না। আমি চলে যাব। শেব বলার সকলেই চুপ করে গেল।

আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার কথা এখানে টিকবে না। শাসক শ্রেণীর শোষণ বৃষ্টি টাইমে ধেরকম ছিল এখনো তাই আছে। কোনো কিছু পাল্টারনি। বরং সব বিষয়ে নড়বড়ে হয়েছে। আর এই ব্যবস্থা পাল্টাতে চাইলেও পাল্টানো যার না। কেউ পারেনি ঘুঘুর বাসা ভাঙতে আমি কি করে পারি।

হলুদবাড়ি চা-বাগানকে গুডবাই করে নিজের জিনিষপত্র নিয়ে স্টেশনে এলাম। আমাকে সাহায্য করল সেই ছেলেটা। ওর চোখে জল। আমি বললাম, কি রে—এসেছিঁস কেন, কাজে আসনি।

কোন কথা বলল না। মৃদু ধমধমে। এখনিতেই চোখদুটো ছোট ছোট। তার মধ্যে ঠিকমতো স্নান খাওয়া না করে শরীরের আর কিছু নেই। আমি ভাবি এরা কত অসহায়। এত কষ্ট করে কি করে থাকে। কলকাতার ছেলেরা তো খুব সুখে আছে। কোন কাজ করতে হয় না। হয়তো আছে চায়ের দোকানে, ছোট ছোট কারখানায় এখনো অনেকেই কাজ করে। তাদের সম্পর্কে আমার জানা হয়নি, দেখা হয়নি। কলকাতার শহরতলীতে কত ছেলেমেয়েরা দিনরাত কিভাবে কাটায় কে জানে। কথার উত্তর না দেওয়ার আমি একটু রেগেই বললাম : কাজে যা।

যা টাকা পাস, তাও পাঁচি না। ও আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করেই যাচ্ছে। আমার জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে দিল। বাগানের গাড়ী করে রেল স্টেশনে, সেখান থেকে কলকাতা।

স্টেশনে এসে জানতে পারলাম ট্রেন লেট। এই কয়েকদিনেই এই জারগাটোর প্রতি মারা পড়ে গিয়েছিল। যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু থাকা হল না। আমি আবার অন্যর সহ্য করতে পারি না, ছোটবেলা থেকেই এই বোখটা কাজ করে। স্টেশনটা বেশ ফাঁকা। লোকজন কম। দূরে পাহাড়ের কালো রেখা। চা-বাগানের গাছগুলি দেখা যাচ্ছে। শীত শীত লাগছে। একটা বাচ্চা ছেলে কেটলি করে চা নিয়ে হাঁকছে। বাবু চার, বাবু চার, আমার মনে হল কেটলিটা ওর চেয়ে অনেক বড়।

বাচ্চাটাকে দেখে কষ্ট হল। বললাম দুটো চা দে, তখনোও দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, চা খা, আমার নামনে চা খাবে সেটা ওর পক্ষে কঠিন ছিল, কিন্তু আমি ওকে আদর করে বললাম, খেয়ে নে, কাপ্তা। আদরের কথায় কাজ হল। চায়ের গ্রাসটা যখন নিচ্ছে দেখলাম, দগদগে ঘা ওর হাতে। রক্ত ফেটে বের হচ্ছে। এই ঘা নিয়ে আবার পাতা তুলতে যাবে। ঐ পাতাগুলি স্পেশাল ভাবে তৈরী হয়ে ফরেণে যাবে। চায়ের কি মূল্য। চা মানে দার্জিলিং, আমি বুঝতে পারছিলাম। ট্রেনে ওঠা না পর্যন্ত ও যাবে না। একটু পরে দেখি, কিভাবে খবর পৌঁছে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি। আরো কয়েকজন অস্পবর্মানি ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ওদের চেহারা প্রায় একরকম। কে কার বোন, ভাই বোঝা যায় না। ওদের প্রত্যেকের হাতেই ঘা। ওদের দিয়েই চা-পাতা তোলার। গালগুলো ফাটা ফাটা। উসকো খুসকো চুল। অথহে ওদের চেহারা রুক্ষ। মৃদুটা চ্যাটা ধরনের। ওদের মধ্যে নেপালী, ভুটানি, মঙ্গোলীয়রা, রাজবংশী সবই আছে।

ট্রেন এসে গেল। জিনিষপত্র ওরাই তুলে দিল। আমি আর একবার চার-পাশটা দেখে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে গেল স্টেশন। ওরা তখন কামরার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পরে একটা ছেলে কামরার উঠে কামরাটা কাট

দিয়ে টাকা চাইল। অনেকেই দিল আমি দিলাম না। কেন যেন মনে হল।
দিলে এই কাজই করবে, অন্য কাজ করবে না।

কিছুক্ষণ পর ছোট দুটো বাজা গাইছে হিন্দী গান, তারাও পরসা
চাইছে। এই চলন্ত ট্রেনে কি করে। ট্রেন চলছে। ঘট-ঘটাৎ শব্দ হচ্ছে।
মনে হচ্ছে, চারপাশের গাছপালাও আমাদের সঙ্গে দৌড়ছে। কামরার মধ্যে
কলসীর টুকরো বাজিয়ে গান গাইছে। এর মধ্যে কাগজ এসে গেল। একটা
কাগজ নিলাম। প্রথমেই খবরের হেডিংয়ের দিকে চোখ গেল। খবরটা
আর কিছুই না, আজ শিশুপ্রমিত দিবস। খবর না পড়েই কাগজ ভাঁজ
করে পাশে রেখে দিলাম। পাশের এক ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলল, দেখব ?
আমি কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। ততক্ষণে আমার
স্টেশন এসে গেছে। সেদিকে খেয়াল নেই। সকলেই নামছে। আমি তখন
বসে। একসময় দেখলাম, ট্রেন ফাঁকা। কুলি চেঁচামেচি করছে। শরীর
টেনে তুলতে পারছি না ভীষণ ভারি মনে হল। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে
না উঠতে হবেই। এরকম একটা অবস্থায় ট্রেন থেকে নেমে এলাম। ব্যাগটা
ট্রেনেই রয়ে গেল। দেখে নিতেও ইচ্ছা করল না। □

বিপ্লব মাজার কবিতা

ডীপফ্রিজ

একটা পাতা
দুটো পাতা
তিনটে পাতা

উড়ছে এদিক
সেদিক থেকে
ঝরাপাতা

ঝোরার মূখে
কুরাশা ঘন
ঘন কুরাশা

ঠোঁট ফাটে
সিঁহাস্থাপক
সময় স্তম্ভ

এ ওর থেকে
ফিরিয়ে নিরেছে
ঠান্ডা মূখ

ডীপফ্রিজে
জমাট বেঁধেছে
স্মৃতি ও স্বপ্ন

শীত

ঝরা পাতার ফিসফাস, গভীরে
কুরাশার সর, ভোরের আভা
কেমন আঁজব প্রাণীর মত ঘোরাফেরা,
সবাই কেমন খোলের ভেতর

সম্পর্ক

সম্পর্ক এখন
মিশরীয় প্যান্ডুলিপি
এক ফর্দা
শীর্ণ বালিকার মত কেঁপে ওঠে

ফাটের জানালা স্মৃতি
আঁকাবাঁকা কাঠের স্ক্রেনে
একটু ধাক্কা দিলেই
ঝুর ঝুর ভেঙে পড়বে

উৎসবের গর্ভ গৃহে
তুখি কি দেখেছিলেন ?
সময় কি রকম
থমকে দাঁড়িয়ে ছিল

বাইরে বেরোতেই
ফুরফুরে বাতাস—
আনমনা ভাব মূছে গিয়ে
পথ চলার টুপটুপ শব্দ

একটা সিগারেট পেলে
রূপকথার ভেতর চলে যাওয়া যেত

অন্যরকম, চেনা যাচ্ছে না—

সবার কেমন জড়ানো কথা বোঝা যাচ্ছেনা।

শীত যেন অক্টোপাসের শাঁড়,

এই শীত কিছু মানুষকে সে শুষে নেবে,

বরফের মত ডিম্বাণুর রসে, ঠোঁট ফাটা সকালে

পাখির মত উঁকি মারবে খোলের ভেতর থেকে

নীহারিকা ছঁয়ে থাকা মৃত্যুর ব্যাকহোল

প্রিওসিন ঝুগ, শীতের ভুগভ থেকে মানুষের জন্ম দেখে গেছে

অভাব এই শীত

একদিন ঘড়ির কাঁটার মত স্থির হয়ে যাবে দ্রুতের টিলার সমান্তরে।

স্বামিতেশ সরকার-এর কবিতা

ভূত-প্রেত

পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই

পৃথিবীতে প্রেত বলে কিছু নেই

এবং তা নিশ্চিত জেনেও

এই মধ্যরাতে আমরা ভূতের মতো পা দু'লিয়ে গান গাইছি

আর

প্রেতের মতোই আপ্রাণ ভালবাসতে চাইছি পরস্পরকে...

দুর্ভাগ্যবৃত্ত

কথামালা সমুদ্রজারিত, কথামালা অমিবার্ণ নীল

আমাদের দুর্ভাগ্যবৃত্ত

সাবলীল ছঁয়ে থাকে আজও।

পরিশিষ্ট

হেমন্তের পরিশিষ্টগুলি ছঁয়ে যাচ্ছে

আর অপরিশ্রুত গীতিকবিতার মতো দিন

নেমে আসছে চারদিকে

অশ্বকান, সাংকেতিক, ধূমন্ত মেপল পাতার...

১৬৪ / কবিতার কাগজ

ভায়োলিন

তোমার সাপেক্ষে আমি জেউ

তোমার সাপেক্ষে আমি কেউ নই, ভায়োলিন ছাড়া ।

এস. মহীউদ্দিনের কবিতা

তোমার জন্য গোলাপের হাতবদল

১.

তুমি কী সেই কোমল কিশোরী,

ছিন্ন রামধনু যুবকের কঠিন দৃষ্টিতে

মেলে দাও পাপড়ি ফুলের দুটি চোখ ।

৭ তোমার জ্যোৎস্না স্বপ্নে প্রতিদিন ঢুটে ওঠে

খুঁ খুঁ বালভূমি, চরশূণ্য দিগন্ত রেখা, শূন্য হাহাকার ।

আমি কিন্তু ধামাঝর যুবক নই ; বোহেমিয়ান কবি হতে পারি
অথবা

হতে পারি - খেলোর শরীরে অক্ষর মাখানো

বিশুদ্ধ স্বপ্নিল ভূমিপুত্র...

তুমি কী পারো না দু'হাত বাড়িয়ে

নিবিড় করে নিতে ?

১.

প্রতিদিন তোমার জন্য অমরকের প্রার্থনা

প্রতিদিন তোমার জন্য গোলাপের হাতবদল

প্রতিদিন তোমার জন্য যুগল ছবির উপস্থাপন

৩.

ঝরনা হাওয়ার বয়েস গায়ে কঠিন মূখে পাহাড় আদর

দিলাম সোনা, বৃষ্টি কোটা পাতাবাহার টিপ কপালে

ভুল করেছি ? বেশ তা হ'লে এমনই ভুল হাজার কেন

লক্ষ কোটী যোজন ছড়াক তাতে আমার কি আসে যায় ?

৪.

আমি বিষমতার কথা বলি না । তবুও স্পর্শকাতর কথাগুলো আমার

চারপাশে গাছ হ'য়ে দাড়িয়ে থাকে ঠায় । উত্তরের হাওয়ার উড়ে যায় নিজস্ব

কবিতার কাগজ / ১৬৫

হলুদ পাতার ঠোঁট ; মরা পালকের ধূলো । গাছদেরও স্বপ্নে মন্থুল করে
 বিষন্নতা মাখে শূন্য গানের মৃদু স্বরলিপি । আমি বিষন্নতার কথা বলি না ।
 তবুও তোমার মৃদু ধ্বংসের অন্তর্ভুক্তি ছায়া-পথ কাতর প্রশ্নে আমাকে জড়িয়ে
 রাখে কবিতার ধ্রুবস্বরে । আমার বিষন্নতার কথাগুলো চতুর্দিকে বৃক্ষ হয়ে
 দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিদিন জড়িয়ে ছড়িয়ে যার মৃদু অভ্যাস

প্রজন্মের স্বপ্নে

দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে তোমার ধূলো মাটি শরীর ; নীল
 ছায়া মেঘে ওড়ে শূন্য পাতা, ফুলের রেণু ।
 আত্মপনা জড়ানো প্রজাপতিও ভ্রমণে খোঁজে স্নিগ্ধ
 বাতাস, জুঁই ফুলের বাগান । শূন্য গোলাপ, গন্ধরাজ নর
 শালুক, গাদা, কচুরিপানার ফুলসারি, কাশফুলের
 সসোর । তাল-খেজুরের দীর্ঘছায়া, বিস্তৃত শস্য ক্ষেত
 ধু ধু মাঠ, আঁকাবাঁকা গোলকধাড়া পথে নিসঙ্গ হাওয়া
 কেঁদু গাছের গাঢ় আঁধার । হে আমার জন্মভূমি, মাতৃভূমি
 ধন-সম্পদহীন শূন্য দীর্ঘির চারপাশ ঘিরে তুমি
 আজো কেন বসে আছে উত্তর প্রজন্মের স্বপ্নে ! শূন্য
 উদ্বেগ ভঙ্গি সর্বস্ব স্বপ্ন ? নাকি জাগ্রত অন্তর্ভবে
 বেড়ে ওঠে তোমার চিরন্তন ভালোবাসা অথবা
 চিরকালীন আত্মসমর্পনে থাকো কিম্বা সমর ।

সুমিত্রা সাহা

শিক্ষক

আগে ছিল—

এসো । আমার কাছে পড়ো ।
 গুরুদক্ষিণা চাই না ; তুমি কড় হও ।
 পারলে পরে শোধ করো,
 না পারলেও অস্বীকার নেই,
 আপাতত এখন ধার থাক—
 নাও শূন্য করো,
 তোমার জ্ঞানের সাদা খাতা খোলো

আমি আমারটা উজ্জার করে
তোমারটার হিজিবিজি রেখা টানি !

আর এখন —

(গালে পান চিবোতে চিবোতে)
না ! না ! এখন ব্যাচে আর জারগা নেই ।

“হবে না ?”

আমার কিন্তু দেড়শ টাকা

সপ্তাহে একদিন—ফিক্সড রেট ।

ধারবাকি চলবে না—অগ্রিম চাই ।

পারলে সাপনের দিন থেকে আসিস্...

ঐ কোনায় বসতে হবে ।

অস্ববিধা হলে বন্ধুদের মধ্যে নিবি—

আমি কিন্তু বেশী বকতে পারবো না,

হাই ব্রাড প্রেসার...

উৎপল প্রহানের-এর কবিতা

আজ্ঞা

বর্ষা মৃদুখর ক্রান্ত দিনে

অফুরন্ত উল্লাসের বন্যায়

কবিতা আর গানে

ছোট ছোট কথা, হাসি ঠাট্টার

রাত্রি গভীর হ'ল ।

ভালোবাসা জড়িয়ে ধরলো

শরীরের প্রতি রোমক্‌প...

কখনো

লেখা হয় নির্জনতায়

একাকী আগুনায়

বেড়ালের মূখ

নির্জনতায় অবরব...

গভীরতার মূখ

কখনো ফুটে ওঠে

কখনো বা ফুটে ওঠে

ওরা

পায়সার পরিবার খুঁটে খাচ্ছে-দু'এক দানা ক্ষুদ কুড়ো
মাকে মধ্যে কেউ কেউ তাঁড়িরে দিচ্ছে চাক,
তবু উড়ে উড়ে আসে ক্ষুধাতুর পেটে ।
ভেসে যায় নিজস্ব অভিমানে
ওদের অস্থায়ী ঘরদোর, ছেঁড়া অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি
জমা হচ্ছে, ক্রমশই খুঁজে ফেরে
নিভাত দু'একটা খড়কুটো, উজ্জ্বল মলাট !

এখন

হৃদয়ের অলীক জানলা-দরজার শেকল তোলা থাক এখন,
বাতাস বইছে দুরন্ত ভীষণ । স্বপ্নের ক্যানভাসে
আঁকা হোক দুঃস্বপ্ন তুলি,
হৃদয়ের পঙ্কিল স্বপ্নময়তা তোলা থাক
নিবাসিত কবিতার মস্ত অংকার ।

বিপ্লবপ্রিয় গিরির কবিতা

জলছবি সিরিজ

১. রবীন্দ্রনাথ

ঘাসে ভেজা আবছায়া কাঁচের দেওয়াল পেরিয়ে
খুঁ খুঁ বৃষ্টির মাঝে হুঁ হুঁ হাওয়া এলোমেলো ছোটো
তপ্ত-আবেশ-ধূম ছুঁতে যার দাঁড়ে বসে দাঁড় টানা দাঁড় কাকের
চোখ পিটপিট বিস্ফারিত...নির্নিমেষ চোরে থাকে জানলার পারে
বহুকাল পরে জল-ভেজা আবছায়া ছবি—টান মারে
দুড়দাড় খুলে দেয় ঘরের সমস্ত শাসি কপাট
রবীন্দ্রনাথ...রবীন্দ্রনাথ...রবীন্দ্রনাথ...

রিক্সার স্বপ্না এবং ল্যাম্পপোস্টের তলাতে আমি

পুষ্পক রিক্সার ওড়না উড়ে যেতে যেতে
মোড়ের মাথায় পিছুটান—জুঁই হেসে হেসে
চাঁপাকালি ডেকে ডেকে
স্বপ্না চলে গেলে

১৬১ / কবিতার কাগজ

ল্যাম্পপোস্টের তলাতে
মদনের চায়ের দোকানে
সম্মোহনো অপঘাতে মরে ;
ভিজিয়ে দেওয়া টাইটম্বুর মেঘে মেঘে
মধুকর টাইটানিক চলে
রিস্তার পিছু পিছু

৩ কৈলেঘাই

জল ঠেলে ঠেলে
জলের কাছে যাই
কৈলেঘাই
এপার ওপার জন
খড়ির জঙ্গল

মাঝে মধ্যে এক পা ঠাই
পুরোনো শাল
নতুন ইউক্যালিপটাস

রোডের ওপর নতুন ব্রীজ দেখে
নদী চিনতে হয়
মাপতে ন্যামি জলের গভীরতা

উঁচু জমি রুয়ে চলে চাষী
সার বেঁধে কচ্ছপ-পিঠ আনে
শুশুক ছাড়ে জল

নতুন নতুন ভোটে
তথ্যে অদল বদল

ঘরে ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র
মাঠে মাঠে অগ্নি-দহন
ঘর ছেড়ে অচেনা সেই বনে

গ্রামে গ্রামের চাষীর চালে ধোঁয়া
দাবানলে ঝলসে যায় চুনোপুটির দল
পান্তাভাতে সুস্বাদু মাছ-পোড়া
মহাকরণ-সংসদে, খবর কাগজে

চারের আড্ডায়, ডাইনিং টেবিলে
আষাঢ়—বর্ষা নামে
বেহিসেবি হিসেব মতন দিনে
কেলেবাইর ঝোলা ঘূর্ণিতে আদিগন্ত সমান

এপার ওপার জল
খড়ির জঙ্গল
জল ঠেলে ঠেলে
জলের কাছে ষাই
কেলেঘাই

তোমার কাছেই ষাই
ফিরে যেতে চাই
কেলেঘাই

৮. হাওয়া

এখানে হাওয়ার দেশে
সমুদ্রবান্ধ বেগে
জুনপুট আর দীঘা ছেড়ে
মোটরসাইকেলের সীটে
আমার পিঠে ঠেলা দেয়

শালপাতা উড়ে উড়ে
কি করি একে নিরে
পিঠ পাঞ্জা হয়ে থাকে
আন্টেপুন্টে জড়িয়ে
আমাজন পাইথন যেন

ফুঁ দিই, পাঠাই আকাশে
খম মেয়ে থেমে থাকে
রাগ-কালো গোমড়া মূখে
ভারী হয়, নেমে আসে
প্রাণে প্রাণ কর্ণন

১৭০ / কবিতার কাগজ

৫. ভীষণ ভালো লাগা

ভীষণ ভালো লাগা

এইটুকু তো জাগা

আষাঢ়-শ্রাবণ জলে

ভিঙি জিড়াই ক'লে

চুইয়ে গড়ানো সুখ

ভরিয়ে তোলে বৃষ্ণ

শব্দশব্দ পালে পালে

ঢেউ ঢেউ মেঘ রোদ আলো

৬. শৈশব চকিত

বৃষ্টির শব্দে মাখামাখি

শৈশবের মাটি ভিজ়ে যায়

অনেক দিনের গান আর তার সুর

সৌদাগন্ধ শিরায় শিরায়

মনের ওপার ওপার জুড়ে

পানকোড়ি ডুবে ডুব়ে যায়

৭. অকারণে পিছনের টানে

ঘনঘোর প্রবল বর্ষা-ভেজা ময়দানে

লাগামহীন ঘোড়ার নাক্সা পিঠে চড়ার দিন

না বুঝে অনেক আগে ভোগ্রার শহরে

ফুটপাথে হঠাৎ বসে থাকা ডাস্টবিনে

বছর-ছোড়া জল-ভেজা দুর্গন্ধের মাঝে

কলা খাওয়ার শেষে কলার খোসা যেন

অবহেলার উপড় অর্ধবৃত্তাকারে

ভিড়ের মাথার আকাশ পাথে ছুড়ে দিলাম

স্নান করার পর যেমন করে গা ঝাড়ে

বোনের আদরে বাদর বিলেতী কুকুর

প্রত্যেক আঘাতে ভাল পড়া শুরু হলে
 মেঘ-সমুদ্রে ডালপালার সোনালী কীপন
 পুকুরের জলতরঙ্গ পাতার ম্যারাকাস
 এখনো এ ভেজী ঘোড়ার লাগামের টান
 উচ্চৈশ্রবা হুঁষা রবে মেঘপথে যার
 সেই উচ্ছ্বাসে দৃ'হাত ছড়াই মেলে ডানা
 আছড়ে পড়ি—পিছল কাদার মাখমাখি
 নাদাজল, আকাশের জল, চোখেও তো জল
 জলই সমোচ্চশীলতা ধর্ম মানে
 চলছিবি জলে ভেসে দুলে কে'পে যার...

স্বপ্না ফেরে ঘরে

পি'পড়ের সার ভেঙে যায়

বর্ষার

স্বপ্নার ভিড় জানলায় ঘরের কোণে

শ্রাবণে

সেতার

রবিশঙ্করের সেতার বাজানো তখনো শুনিনি নি

ছোটবেলার দেখেছিলাম স্বর্ণার জল গড়িয়ে নামছে

পাথরে পাথরে জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে

মালবেশীর রবারের বল

সেতারের মূর্ছনা ঘরে ঘরে নেচে গেছে সেদিন

আপাদমন্তক আমার চারপাশে

সেই থেকে আমার জ্ঞানলা দিলে যখনই তাকিয়েছি

দ্রের পাহাড়—ভোর ভোর কুয়াশার চাদরে মূড়িসুড়ি

তুমুল বৃষ্টিতে ঘসাকাঁচে পর্দানসীন আবছারা

একটানা ভালো লাগা সুরে

রবিশঙ্করের সেতার মায়ার মায়ার ভিঞ্জে ভিঞ্জে যার

আমার সামনে সেই সেতার শোনান

১৭২ / কবিতার কাগজ

তবু অন্তহীন

মধ্যাহ্ন সূর্য, পূর্ব দিগন্তের দিকে

অগস্তা যাত্রার পথ পিছু ফিরে দেখি

ভোরের শিশির বস্ত্র বেশী গগনছারী

কুয়াশার ঢেকে গেছে আগুপিছন পথ

তবু আলোর আলোয়া নাচন দেখেছি

নির্নিমেবে, মশালের দীর্ঘ প্রতীক্ষার

নিজের কৃতকর্মের জীর্ণ হতে হতে

হাওয়া আর তাপে তিরছট ছুটে চলে যাই

মেঘে মেঘে ক্রোড় ঢেকে যাই আমি

মাঝ আকাশে চোর চোর উঁকি দিয়ে দেখি

পূর্ব পারে অন্তহীন সবুজ জমিনে

অশ্ব আবেশে, অঝোর স্বরন বরিষন

জলছাঁবি জমে জমে যার শিরায় শিরায়

দেই ছবি ছড়ার ছিঁটার প্বেলী হাওয়ার

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

বলশেভিক

১

স্বদেশ এবং পতাকার উড়ছে রবিবার

আমার জন্মদিন আমাকে ছুটির ঘণ্টা শোনায় ।

ছাদ বিহীন রাতে আমার নিষুন্ম রাতে চাঁদ দেখা

জ্যোৎস্নার সহবাসে পড়তে থাকে ঘোবন ।

দিনের পর দিন কেমন যেন হলে যাচ্ছি বরষক পাথর

ব্যক্তিগত রঙিন চশমা জুতার পাণীর কিছন্ন প্রসিদ্ধ শব্দ নিয়ে

আমি বলশেভিক

নতুন প্রোগানে ভোরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রঙিন ঘুড়ি উড়াই ।

২.

আজ্ঞাধীন শিবিরে সেই একই ধারাপাতে গতানুগতিক নামতা পড়ি
একই সুর একই টেকনিক পদ্ধতি প্রক্রিয়া
আমি যেন তার বাধ্যতামূলক বশবদ দৃশ্য বদলের পদা নাচাই।

চাঁদ চেনা জনগণ ভুলে গেছে বাড়তি সংযোজন
কোড়পত্রে জ্বলছে আদিম বর্ণমালা
অ্যাণ্টেনার পা গুটিয়ে বসে থাকা নাগরিক
বুড়ো আঙুল চুষছে
সারাদেশ জ্বলে যাচ্ছে হর্ণহীন তেজে।

স্ট্রীট কর্ণারে ভাষণ দিতে দিতে গলা ফেটে রক্ত ঝরছে
রক্তে ভেজা মাটিতে দূ'পা রেখে
আমি ফুটন্ত গোলাপের ঠিকানা খুঁজছি।

নাশনিক হাওয়ায় হাওয়ায় দূলে দূলে উঠুক গোলাপ বাগান বাড়ি
আমি দেখে যেতে চাই খুলো কাদামাথা মানুষগুলো
আগুনের পাশা খেলতে খেলতে
অসভ্য সভ্যতার মুখে সজোরে লাথি মারছে।

কুবেরের পাশা

আমার চেতনা ছুঁয়ে যে নদী চলেছে একা একা
আমি তাকে চিনি
সে শব্দ জলের বাঁশী বাজাতে বাজাতে
মাঠ ক্ষেত ধনু উপত্যকা আর বাঁশির পাহাড়
ভেঙে দূরে চলে যায় – জেনে গেছে সমুদ্র শাসন।

আমার নদীকে আমি কান্না ভেজা নকাস কাঁথা দিয়েছি একদিন
ভাটিয়ালি সুরে সুরে বুকে তার নৌকা ভাসিয়েছি
আমার রমণী তাই অভিমানে ফিরিয়েছে মদুখ।

বৌবনের কৃষ্ণচূড়া বসন্ত বেলায় তবুও আশ্চর্য গান
রক্তের ভিতরে বাজে
যে গানে ঠেতনে জাগে মহুল মদিরা
ফিক্ ফিক্ হেসে ওঠে চাঁদ।

সময়ের রক্ত রাঙা বিষয় বেলার
দাঁড়িয়ে আয়নার সামনে নিজকে নিজে দেখি
প্রতিবিক্ষেপ আগুনের ফুল ।
আমাকে আমার নদী কুরুক্ষেত্রে চক্রবাহে
দেখালো যে যুদ্ধ তুমুল
এই যুদ্ধে জয় পরাজয় নেই পেয়ে গেছি বিশল্যাকরণী ।

মৃত্যুর উপরে মৃত্যু নাচ করে গিদম্বরী শ্যামা
নাচো মা নাচো মা শ্যামা
আমি এক সক্ষম পুরুষ উদাত সংহার মূর্ছে
সদমের অজস্র মৃত্যুর
নদীর তরঙ্গ তোলা ঢেউ নিয়ে জীবনকে দেখি
সে জীবন সমুদ্র শাশন করে নদী আর রমণীর
ভালবাসা বুকে নিয়ে ভেঙে দেয় কুবেরের পাণ্য ।

দেবাশিস প্রধানের কবিতা

মহিলা বিকাশ

দিনগুলি গড়িয়ে যাচ্ছে কি রকম গত দিনের দিকে ; এমনই বর্ষার কারি
এমনই আনন্দের বাগান, শিশুমুখ জ্বলে ওঠো, চকচক আগুনের ঈর্ষা
বুলিয়ে ঠোঁটে, এরকমই অস্তিত্ব ব্যবহার জেনেছো, প্রান্তিক মহিলা মহল !
ক'ছড়ির আকাশে বাতাসে হা-ডু-ডু খেলে হাওয়া লাগাতার বর্ষার মিছিল !
এখানেই মেলে ধরো অনাগত কালের ভূগোল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও ভোর ;
ঢালো ঢালো শান্তির তরল-নিজস্ব সময়ের অকিঞ্চিৎকর লেনা-দেনা
সদপেই বলো, বলো-সাক্ষর যাত্রের ছেলে নিরঙ্কর থাকে না...

ভাবো, অ.র একবার

আমার কাছে কোন কোন কথার তাৎপৰ্য চার্জিকদের হুপাল মারা আবহাওয়া
নিয়ে রেঁ রেঁ ছুটে আসে ; তুমি হাঁ করে খেতে চাও মেয়ে মানুষের শরীর ।
—আরে ছোঃ এতটা ভাবলে কি করে ? মানুষ মানুষী নিয়ে রোজ চুলচেরা
বিচার বিশ্লেষণ করি, মেধা ও মননে খুঁজি অতলের নিশিডাক বিষয়ক
তত্ত্বতাল্য । উৎসে ওড়ে আনন্দের ডানা । এ সময়ে অন্য কিছু ভাবো,

অন্য কিছু কাটাছেঁড়া চলুক, ভাঙা সময়ের ছত্রিশ ইঞ্চি বুদ্ধের
পাটা, হাড়গোড়।—হারে খোকারা, বড় বেশি খ্যাতিয়েছে বুলি ছেড়ে
ও পাশের মানুষজনের মধ্যে জীবনের গান শোনাও, অন্য কিছু মানে
খোজো, খোজো সময় শাসনের অশুদ্ধ ব্যবহার। মহার্ঘ সময়ের
করিডোরে রেগেমেগে লাল হ'রে ফ'সতে ফ'সতে উঠে আসছে
অস্ত্র আলো...

মহারা মিত্রের কবিতা

জাহ্নবী

জাহ্নবীর বয়স ছাত্রিশ
উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি
সুন্দরী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। শিক্ষিতা।

স্বপ্ন থাকলে যোগাযোগ করুন, এই
বিজ্ঞাপন প্রায়ই রবিবারের—
সংবাদপত্র পাঠ পক্ষের নজরে ধরলেছে...

বছর গড়িয়ে গেল
বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল
মিনিটের প্লেটগুলোতে একটা হলদে ছোপ।
বিজ্ঞাপন তবু একই রইল। শব্দ বয়স
ছাত্রিশ থেকে ছত্রিশ হ'লো।

এরপর নিজেই বিজ্ঞাপন বদলে দিল।

আমি জাহ্নবী। আপনাদের বন্ধু পেতে চাই।
প্রতি রাতে আমি নতুন কৃষ্ণ এনে দিতে পারি।

এবং অবশ্যই আমার শরীর
আপনার মনের মতন।

১৭৬ / কবিতার কাগজ

হোগলা সন্ধ্যা

তারপর...

হোগলার বনে সন্ধ্যা নেমে এলে
দূরে আলপথে জোনাকিরা জ্বলে
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা খাল পথে নিঃশব্দ
আমি একা হেঁটে বাই
বহরের পর বহর...

জীবনের যত ভালো লাগা
এক সাথে ভাঁড় করে আমার দৃঢ়তা

জীবনের সব স্বপ্ন লুটোর এখানে
সব মারা লুকোনো এ বনে
ভানা ভেঙে পাখিরা প্রান্ত হ'রে ঘরে ফিরে যায়
সব আশা সরে যায় ঘন কুরাশার

রাজকিশোর ঙ্টাচাৰ্ণেৰ কবিতা

১. শিরোনাম

ছাঁবি কুমারীরা বসেছে গাভেঁন চেরারে । সকালের,গারে
জলরঙ্গ তুচ্ছকথার । তাদের পাশেই তুমি টুকে রাখো
করেক মাইল মরুর আছাদ । কিশোর বেলার গাটনোটে
বেজে ওঠে প্রাণ সঙ্গীত । আজ সমস্ত মূৰ ছাপই
তোমার কেউ না । হাসি লাগা কাগজও উড়ে গেছে
টুকিটাকি পাখির শরীর । দ্যাখো পড়ার টেবিলে এই
বর্ষা অভিধান । একমাত্র 'কদম' শব্দটি উধাও সেখানে ।
পাতায় পাতায় পরিব্রাজকের শব্দ ছক । স্বপ্ন-দৃষ্টির
ময়েচায়াইজার লেগেছে পূর্বাত্তের মূখে । দূরে
পম্ৰীত ক্যানডাসে রণরাস্তা জলবারু । একা এই ধূসর বাত্মারে
দীর্ঘব্যর্থতা শিরোনাম থাকে ।

২. চিত্রনাট্য

ভূগমরা । সবুজ হলুদ । সব ইচ্ছে বেঞ্জে যায়
চিত্রনাট্যের গারে । একটা টব গোপন কথা বোনে
বৃষ্টি কাণিসে । আমরা তাকে ঘিরে সাজিয়েছি জোনাকী আসর ।
যে বন্ধুরা উদাস দর্শনের আলো ছড়ায় । তারাই আজ
মায়ী পুষছে রাধিকামঙ্গলের । দূ'হাত শূণ্য ঝুলিলে
একদল আলখাল্লা আমোদ ওড়াচ্ছে । কত পায়চারি ।
আভ্যন্তরীণ হিন্দুস্থান ভাগ । এ সবের ভুল নামতা টুকে
যারা গোলা ভ'রে নেন, তাদের মৃত্যুর কত প্রবাদকুসুম ।
মাঠ পার হ'লেই প্রত্যাশাদের গান । লতায় পাতায়
গুনগুন । গ্রাফিক্স শিশুরা কান পেতে রাখে...

শ্যামলকুমার বিশ্বাসের কবিতা

১. চতুরঙ্গ

এক একটি নারী বেন সজ্জাস্থির শীত
যতই উত্তাপে থাকে ভিতর কাঁপায়
এক একটি নারী আছে দাবাগ্নি শেষ তবু
তমস্রূপের নীচে এখনও জ্বলন্ত এককণা
চলন্ত ট্রেন থেকে এক একটি শ্যাম-বালা
নয়নজ্বলির পাড়ে সৌদাল ফুলের মায়াবীণা
এক একটি বাকাসিঁথি চকিত চাওয়ার
তছনচ করে দ্যায় মনু সংহিতা

২. জীবনবন্দি

আমরা ক'জন এক-পালকের পাখি
আধার মাণিক গ্রামের সীমানা থাকি ।
দিল-গলানো নীল শরভের নীচে,
: চাবির গোছা, ক্রেডিটকার্ড
ছুড়ে তেঁতুলগাছ—

সজনে বিলের কলমি কোপে
দু'হাত মেলে রাখি ;

দু'খ জামা গায় একটা বকও
বসলে চরণ চাখি ।

৩. এই আশ্চর্য কোহিনূর

যে-মুহূর্তে ব'লে উঠলে ইরাবতী তোমার খুব প্রিয়,
আমি ঠিক ছেনে গেছি : মাথাভাঙা কিংবা ভাগীরথী ।
প'চিশে কৈশোরের ভোরে জোড়াসাঁকো যাবে বলে
যে রকম চলে গেলে রবীন্দ্রসদন ।

৭ ডুবো পাহাড়ের গারে বারংবার ঠোকা খেতে খেতে
কবে যেন একদিন সমর ঘুর্ণির হাত
মিলিয়ে দিয়েছে এই আশ্চর্য স্ফটিক

যে-কোনও বৃক্ষেরই বৃক্ষ স্পর্শ কোরে বৃক্ষে ঘাই
মোহিনী বঙ্কলহীন স্বাধ-কাণ্ড কতখানি !
তোমাকে সবাই খুব ভালবাসে বলছো যখন—
আশ্চর্য স্ফটিকে দেখি—ও-চোখের শূন্য কনীনিকা ।

আমি এই কোহিনূর দীর্ঘ ট্রাকের মধ্যে
দাঁড়ানো ও ছেলেটার
গলায় দু'লিমে চলে যাব ।

সোমব্রত সরকারের কবিতা

আলোয়া

ভোর থেকে তুলে নেব অনুষঙ্গ কিছ', বকেরা সিন্ধতা
জব্ব্বব্দ অনাগত অতিক্রম করার পর
বে'হুদা সমারোহ, শূন্য যৌবনের কথা মনে পড়ে...

আলোড়িত সনাতন সামনে এসে দাঁড়ায়

কবিতার কাগজ / ১৭১

দীঘল স্বপ্নগুলো - হাপিতোশ পুরে দিলে
বন্দ্য ভাবনা নিয়ে বেপরোয়া যুদ্ধক মন
ভোর আনতে যায় হার্ড জিরঞ্জিরে রাতির
জরপরাজরে

ভাষা প্রমানের দেশে

মনে কর একটা স্বপ্ন—ছিন্ন আঘাতে
মৃত স্মৃতির উল্লাস, শীর্ণ আঙুল
কেন্দ্রবিশ্ব থেকে হেলে পড়ে
প্ল্যানটেট পতনের ইতিহাস

মনে কর অলৌকিক তৃতীয় নির্বাক
স্বপ্ন আততায়ী অকস্মাৎ ঘোরাঘুরি,
মেঘাবী বুনন বাক নেওয়া গিলির ভেতর
ভাষা ধ্বংস লৌকিক কোলাহল

মনে কর ফেসে গেছি, শব্দময় প্রীতিতাহানি
আপাতমাত্রক অশ্বকারে বাক পটুতার
প্রতিনি-অনুভব...

প্রবীর দালের কবিতা

গতি

আসলে একই কথা বলে দুজনে দুভাবে, তাদের বলার ভঙ্গিমা এবং ভাষাটুকুর
তফাৎ, আর তফাৎ তাদের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠা এবং নড়াচড়ার। আসলে
দুজনে একই শব্দ তাদের ভাবনা চিন্তার রঙ আলাদা হ'তে পারে, আলাদা
তাদের গতি প্রকৃতি, যেমন একজন হয়তো সমুদ্র থেকে বেলাজমিতে উঠে
আসছে আর একজন স্নান করার জন্য নদীতে মাঝে কিস্তু তাতে কী এসে
যায় কেউ জানে না কারণ এটুকু বলা যার দুজনেই বই ভালোবাসে তবে একজন
সহজ গদ্য আর অন্যজন জটিল পদ্য এবং দুজনেই স্মৃশান ভালোবাসে যাদের
প্রথমজন পোড়াতে চায় আর দ্বিতীয়জন ছোট পড়ে বেতে...

প্রকৃতি

কতকাল তুমি এই শূন্যতার আছো
কতদিন তুমি ভিজে বাতাস পাওনি
নিশ্চাপের খবরে খুঁশি হয়েছিলে কবে
জিজ্ঞাসা করতেই চৌচির মাঠ
খুলে দিল ঝাঝরা বৃষ্টির কপাট
দীর্ঘ-বাস ছুঁড়ে দিলে বলে গেলো

ফেরানো বার না যেসব দিন
যেসব ফুল ও পাতা ক'রে গেছে
যে প্রেমিক শূন্য প্রেমে থেকেছে
টিকে আছে স্মৃতি ব্যবধান জুড়ে
জিজ্ঞেস করো না আজ কিছই তাকে

অংশুমান চক্রবর্তী'র কবিতা

রিটার্নাড

লাঠিগ্দুলো বসেছেন স্টেশনে সাম্খা আন্ডার—
—‘কাল বৃকে বস্তুগা, মনে হ'ছিল প্রাণ বার...’
—‘ভাক্তার ?’
—‘ছেলে বলে, কিছুন্য বরসের দোষ,
পেনসন পেয়েছিল, নসিয়া দে, বস্ পাশে বস্
তুই বল—’
—‘শেষ দাঁত এতদিনে সজ্জীকে ছেড়ে—’
—‘পালালো ? আমারও দ্যাখ হ'পানিটা গেছে খুব বেড়ে ।
কোন দিকে বাবি বল ? কি বার আজ ? শনি ? রবি ? সোম ?
—‘আমাদের রোজ রবিবার । পথ ?
সেতো দু'টো—ওন্ডেজ হোম আর বম !’

দশটা মানে

দশটা মানে অফিস মূখ্য, কুলন বানে ট্রামে
দশটা মানে চাকুরিজীবী অফিস পাড়ায় নামে
দশটা মানে স্নান বাওয়া শেষ মগ্ন তাড়াহুড়ো
দশটা মানে হাতছানি দেয় প্রমোশনের চুড়ো

দশটা মানে প্রাটফর্মে চেনা মূখের খেঁজে

দশটা মানে এই শহরে কে কার কথা বোঝে

দশটা মানে ফাইলে, চোখ বসের কথা শোনা

দশটা মানে ঝগড়াঘরে কিছুটা আনমনা

দশটা মানে মাসের শেষে ঘাম বেচে হয় টাকা

দশটা মানে রবিবারের জন্য ব'সে থাকা

আবদুল মান্নানের কবিতা

পার্থিব

সারারাত হেঁটেছি শান্ত আলোয়

দু'হাতে জীবন মূঠো মূঠো বিলিয়েছি মূল্যে

পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে আসে সকাল

পূবের সোনালী মূখ লাঙল আত্মান নিয়ে

দুঃখ সূখের দিনলিপি খাতা মেলে ধরে

পার্থিব মানুষজন হিসেব নিকেশ করে রোজ...।

আত্মজৈবনিক

তোমার কথার সাথে কথা রেখে বলবো

বাইরে বিষাক্ত হাওয়া,

নীলকণ্ঠ শিশুদের জন্য বিশ্বকোষের চলতি

ডাইরী নিয়ে ষাও—আমলা পাচক ।

পাহাড়ের ওপর থেকে সমতলভূমির শৈশব

প্রত্যবেগে ছুটে চলে...বিশ্বের মাটি ছোঁয়া

একদিন ঘরে বসেই দেশান্তর চুক্তির স্বাক্ষর

ভুলেও নিজস্ব ভাষায় লেখা হোক আত্মজীবন...।

কুসুমকথা

সেই কবে থেকে পড়াছলাম কুসুম বালিকা-কথা
রাতের গভীরে উঠে উঠে দেখেছি অগ্নিস্তি তারা
নৈশেন্দ্র্যে পাখির জুড়ি জুড়ি ঘাপটি ধাম
চোখে মায়ের দেওয়া কাজল কঁসি মোছোনি এখনো,
কুসুমবাঝারে চলে হাতবদল দিনেরা,
বাতাসে ভাসে অস্পষ্ট সংলাপ
নদী ছুঁয়ে বনভূমি, খোড়ো চালের ভেতর
এখন কি গভীর রাত্রি !

এখনো তো কুসুমরা জেগে আছে !

শিবানী গুপ্তের কবিতা

বিস্তার

স্বপ্নের অঙ্গনে এক একটা ছুর সময়

চারপাশে উড়ে যায় সুগন্ধ বিশ্বাস

এ সময়ে সবকিছু অনারক্ষ্য ।

একে অন্য শব্দ ব্যবহার করা...

তবু ভালবাসা খুঁজে ফেরে উজতার বুক

ডানায় সুখের গন্ধ, অকাতর আলোর বিস্তার ।

এই তো জীবন

এক একটি হারিয়ে যাওয়া দিন, হঠাৎই স্নান কোষে

শিহরণ তোলে, স্মৃতির বালুতটে সুখের সর্বনাশ

অনাগত অনুভূত আঁকড়ে একে ধাই শিকড় হারানোর

ছবি । উঁকি মারে যৌবন সকাল, প্রোতে ভাসা

শ্যাওলার আঁত । জীবনের স্মরণলিপি দগ্নিতের নিবিড়

চুম্বনে লেখা হয় ছন্দ-গমক সময়ের নিপদন

আঁচড়ে ! এভাবেই অস্ত্রের কাটাকুটি, ম্বাপদের

হিংস্রমুখ লালার জিহবার, জীবন এমনই হার,

শব্দই শ্বেত পাথরের থালা উন্মুখের নৈবেদ্য সাজাই ।

ফান্দুস

হৃদয় ভরা রঙের ফান্দুস
ছড়িয়ে দিলাম তারার মালায়
রাত পড়ে যায় স্বপ্নগুলোর
ধূসর আকাশ, মাতাল বাতাস
বৈশাখী মেঘ ছন্দ হারায়
কিটার ভরা স্বপ্ন ফুলে

ইচ্ছে আমার আকাশ কুন্ডম
ছড়িয়ে থাকি বেদম বেহাশ
গা ঢাকা দেয় খুলোর পথে
আসছে ছুটে মেঘের রথে
মীড়-গমকে বাজছে মাদল
চোখের কাঁচে ঝরছে বাদল

বিরূপাক্ষ পাণ্ডার কবিতা

পরাজয়

অনুভব বিষয়ক স্বর চর্চায়
প্রেম বিষয়ক দহনপর্বে
রৌদ্র বিষয়ক ক্রান্তিরেখায়
মনে পড়ে অবৈধতা
প্রজাপতির জন্য রক্তরাগে
চিঠির জন্য সংযোগে
একর জন্য বিকোভে
অস্থির হয় সব সরলতা
প্রগতি বিষয়ক রথ দেখায়
স্বদেশী বিষয়ক কলা বেচার
শাসন বিষয়ক ধাম্পাবাজিতে
মনে হয় আমি মৌলবাদী
পেশার জন্য পড়ার নেশায়
নারীর জন্য রাগি চষায়
নদীর জন্য জল পিপাসায়
খুলে যায় পরাজয়ের কান্দ

দুর্পণ

গ্রামীণ আরশিতে মূখ রেখে
এগোচ্ছে রাজনীতি, শত্রু ও সন্ত্রাস
লুপ্তপ্রায় সভ্যতার মৃত উচ্চারণে
সব বর্ণ সব ভাষা নীল পীতবাস ।

হলুদ নবান্ন ধানে রক্তের হোম
 যন্ত্রনার কথক নাচে কত প্রিয়জন
 স্থাবর ছবির শবে সমাজবিরোধী পা
 উল্লাসে রচনা করে অন্ধকার শাসন ।

জীবন তো যন্ত্রনার, তবু ও জটিল জাল
 আদিম হিংসায় দু-ফাঁক গাটিও নিঃশ্বাস
 দূরবীণেও দৃশ্যের কোন পদছাপ
 গোপন খবরে প্রকাশ, ওরা হারাচ্ছে বিশ্বাস ।

জানন্দমোহন দাশের কবিতা

প্রণয়মুদ্রা

যেন এক ঘন নীরবতায় নৈনর্গ মূর্তি
 জানালার শিক্ ধরে কাঙাল হৃদয় দেখে
 বৃষ্টির স্ফটিক নিঃস্রমে কেমন ভিজে যায় মাটি ;
 সে মেয়ের পাড় ভেঙ্গে নোনাজলে ভেসে গেছে
 স্বপ্নপিণ্ডের রক্তবাহী শিরা...

অনন্ত আবেশে স্রবের অঙ্গুথে গাঢ় এক নেশা
 প্রণয়মুদ্রার বালিশে অবিরাম আঁচড় কেটে কেটে
 রচনা করে পোড়া স্বপ্ন, মৌন নক্ষত্র !

যেন এক ঘন মেঘচূলে মাল্যাবতী শরীর
 সে মেয়ের নাভিচন্দ্রে
 হিজিবিজি ঝড়ের বিস্তার, বাধা...!

বৃষ্টি ভোর

তার কথামালা ফাগুনের গান হরে
 আমাকে জড়ায়
 অকাতর শিশিরের মজলিশে
 সে মন্থে আহা শিউলি বিহ্বলতা ।

পাতার ছন্দে ঠেলে উদ্মুখ পাপড়ির বেদনার
কুসুম কুমারীর রাগি যাপন
অপরিমের ফুলার অন্য ঢেউ-এর টানে
বাকের চর আবেগে উথাল পাথাল
কুসুমের ফুলার্ত ঋতু কেটে গিয়ে
আমোঘ বৃষ্টি পতনের ভোর...

রাতিলিপি

কালখরিশের গভীরে ফুসে উঠছে রাতি
ভাগ্যিস তুমি নেই এই রাতে
ডুন্দর পাতার চিকণ চাঁদছবি চেটে নের শিকারী ঠোঁট
রাতি বেন অভিশাপ শিহরজালা কিলাস...
তুমি দিয়েছো মহা অরণ্য ঘোর
জন্মদাগে স্থির মারাটোন
বজ্রপাতে ছিঁড়ে যায় পৃথিবীর নাভিমূলে
তবু নিখাদ সন্তোষে স্বপ্ন-সন্টারী পরিবারী পাখি...

রক্তের গান

রক্তের সিস্কফনি গান হয়ে মিশে যায়
জীবন প্রবাহ স্রোতে,
জ্বালো জ্বালো নিঃশেষ শর্তে নিভস্ত দীপ
রাতি চোখে অশ্রির সময়ের ধূসর
বোধের ঘরে গুহামানবের রক্ত সঞ্চাল !
জীবনের মাটি, মেঘ, জলের পাহারায়
নতুনতর চেতনার খোলস ভাঙ্গে স্বপ্ন বীজ
জ্বরের লিপিবদ্ধ ইতিহাসে মানব ছুটে গেছে
তীর জেদে ধূলোদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে
রক্ত নিশানে
উত্তরপথে জেগে থাক বল্মলে সভ্যতার সকাল...

ইনাসউদ্দীনের কবিতা

১. ওর বয়সী মেয়েরা

চারের গেলাস হাতে আসবে মেয়েটি
তারই অপেক্ষার আছি
বাংলোর বারান্দার সকাল থেকে আমি
তারই অপেক্ষার আছি

ওকি জানে ওর বয়সী মেয়েরা
ভেতর ভেতর বন্ড পাকা ফোর ফাইভে পড়ে
ওর বয়সী মেয়েরা ধর্মিতা হয়, বিকোর বিদেশে
ওতো শুনছে বিশ্বাস করে না
সুর্ভাষিত স্বীমের হোর্ডিং
টিভিতে নারকেল তেলে নাচে যে মেয়েটি
সেও ওর সমান বয়সী
বহুলোকে ভাবছে তারই কথা, সে বিশ্বাস করে না।

ওর বয়সী মেয়েরা বেশ নাচতে পারে
টিভির মেয়েটি তাকেও দেখতে পার
উদাসীন গ্রাসে চা খেতে খেতে
আমিও যে ওর কথা ভাবি
ও বিশ্বাসই করে না

আমার কণ্ঠের কথা জানানো বলেই হয়তো
মেয়েটি দিব্য ভালো আছে।

২. ভূমিকম্প

ভূমিকম্প হয়ে গেছে রাতে
অধারে অধারে ঘটে গেছে লোকসান
সকালে শোভাযাত্রা হলো
হাতে কাগিল মলাটের রঙীন কাগজ
দান করো শ্রাণ তহবিলে !

সামনে ঐ যে সমাজসেবী
হাতে দরাদর স্বর্জ নিশান
ও জানত, রাতে ভূমিকম্প হবে।

৩. দেশরক্ষা

মিথ্যেই দূষণ ওকে
দেশরক্ষার ভার যে ওর হাতে
হোক না সে মরুভূমি, মরা বরফের চড়া
দুর্ভিক্ষশো প্রাণবলি, মামুলি ব্যাপার
মাটির জন্য টাকা মাটি, দেহ মাটি
মাটির দেহ মাটিতে মিলাবে
দেশের মানুষ থাক বা না থাক দেশে
দেশ রক্ষা তো হবে !

৪. চিচিং ফাঁক

নমস্কার হে মহাপতি, আপনাকে মানি খুব
আপনি কাঁপাতে পারেন, তক্তা বানাতে পারেন
জন্দ করে দিতে পারেন প্রাণের ভৌতা মূখ

চিচিং বন্ধ ! অর্মান বন্ধ গাড়ি ঘোড়া দোকান বাজার
স্কুলবাস হাসিমূখ একমস্তে স্ট্যাচু

আপনি বললে খোলেনা শিশুর গোমড়া মূখ
আপনার কাছে কোন চিচিং ফাঁক নেই...

৫. শান্তি এসেছে

শান্তির কথা বড় বেমানান
প্রতীকী শান্তির জন্য অশান্তির সহস্র শিখা
তাতে পুড়িয়েছি শত জওয়ানের দেহ
তাদের প্রিয়রা অশান্ত বদকে গুমরে কাঁদে
আর আমরা সুগন্ধি ফুল দিয়ে বলব
শান্তি হও ! দেখছ না শান্তি এসেছে !

তোমরা কি রহস্য আড়াল শান্তির মূখ চেনো
কোটি টাকা দিয়ে শান্তির বেশাতি চলে
শব্দ সত্তাগ্ধে রেডিও টিভিতে বহুতা হবে বলে
ঠিকাদার দিয়ে শান্তির মূর্তি বানায়

বদমাশ'। ভণ্ড লোকেরা মালা দেয় তাতে
কমিশনে বিকানো ফুলেরা অপ্রমানে শৃঙ্খল
আর আমরা বলি, হাততালি দিয়ে
আহা কি স্বপ্নের দিন ! দেখছ না শান্তি এসেছে !
তাজা রক্তের আলপনা দিয়ে সাজে চিতা
সামরিক স্যালুটের চোঙা হৃদয় দেবে
অ্যাটেনশান্ । ছুপ রও ! দেখছনা শান্তি এসেছে !

ততক্ষণে কুচি কুচি বারুদেরা
জমাট বাধছে হৃদয়ের তলায় ।

পরশর

গোপাল মল্লিক

কুরাশার ভিতর উঁচু শিরীষ গাছের মাথা টপকে
কুরাশার মতো তোমার চলে বাওয়া...
নদী জল, সাম্যশীত, পাতা স্বরার উল্লেখ
নাইলন জালের উপর টেমির আলো,
উদ্দেশ্যে ফটে ওঠা ঝোল,

মৎস্যগন্ধার সঙ্গে
সহবাসের আগে পরশর,
আপনি কি এমনই এক ছবির ভিতর
মগ্ন হ'য়ে ছিলেন...

দৃষ্টিকোণ : বাজারসর্বস্ব অর্থনীতি

প্রণব সিংহচৌধুরী

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম মূহুর্তে দেশের সামরিক পরিস্থিতির যে ধ্বংস চিত্র বর্তমান প্রজন্মের সামনে ফুটে উঠেছে তা নিসন্দেহে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিল্প, শক্তি—সর্বক্ষেত্রে দেশ আজ এক চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। বৃজ্জোয়া রাজনীতির আভ্যন্তরীণ সংকট ও তার ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বি. জে. পি - জ্যেট সরকারের কেন্দ্রে আত্মপ্রকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শে সৃষ্ট তাদের অনুসৃত নীতি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক লম্বা পর্জির হাতে তুলে দিয়েছে। এই সরকারের ঘোষিত দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী আদতে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র এবং পরিষেবা মূলক ব্যবস্থার উপর এক সুপরিচালিত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবাধ অর্থনীতির নামে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিকে তার নিজস্ব ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়ার মতো বিপজ্জনক সব নীতি ইতিমধ্যেই তারা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আমলাদের ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কতৃৎ বাক্তিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত বৈপ্যক্ষিক চুক্তি অনুসারে আগামী ২০০১ সালের পরলা এপ্রিলের মধ্যে বিদেশের ১৪২৯টি পণ্যের আমদানির হেত্রে সমস্তরক্ষা পরিমাণগত নিরস্ত্রন তুলে নিতে আমাদের দেশের সরকার বাধ্য থাকবে। এরই পরিণতিস্বরূপ এ বছরের পরলা এপ্রিল থেকে ৭১৪-টি পণ্যের আমদানির উপর থেকে পরিমাণগত সবরক্ষা বিধানবোধ সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা মারফৎ প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই পণ্যগুলির মধ্যে বেশ কিছু দেশের কুটির শিল্পজাত হওয়ার সরকারের এই একতরফা নিষ্পত্তি ছোট ছোট কারবারীদের এবং ঐ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের এক নতুন সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রের শাসক জ্যেট ক্রমে আরও বৈপর্যায়্যভাবে দেশের মানুষের পক্ষে সর্বনাশা নীতিপ্রণয়ন করে চলেছে। বৃহৎ বাণিজ্য গোষ্ঠীর আচ্ছাদন এই সরকার উদারনীতি এবং বেসরকারীকরণ নীতি গ্রহণের প্রেক্ষাপটে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেবার বা বিরাস্ত্রীকরণের উদ্যোগ আয়োজন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে। “ইম্পাত” ও “করলাখনি”—এমন দুটি ক্ষেত্র যার উপর দেশের শিল্পাভিভি

অনেকটাই নির্ভরশীল, সেইসব শিল্পসহ ৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে বিক্রী করে দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ, তৈল শোধনাগার কেন্দ্রের শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী বিনিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়ে গেছে। টেলিকম, বাঁমা-এই দুই ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে। এখন টেলিকম পরিষেবা সরকারী নিয়ন্ত্রণ মূল্য করে কর্পোরেশন গঠন করে তার হাতে তুলে দেবার প্রস্তুতি চলছে। টেলিকম পরিষেবা দপ্তরকে কর্পোরেশনে পরিণত করা হবে ১লা অক্টোবর, ২০০০ সাল, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঐ দপ্তরটিকে বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ভুগছে দেশের কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র-শিল্প। কৃষিক্ষেত্রে বিদেশী বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশ কৃষি উৎপাদনকে ক্রমশঃ বাধ্যরম্ভী করে তুলেছে। অব্যাহত আমদানি-তালিকায় কৃষিজ সামগ্রী থাকায়, থেকে আমদানিকৃত প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের ঢালাও ব্যবস্থার সুযোগে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামীণ কৃষিশিল্প। অব্যাহত নীতির আতিশয্যে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীর জীবন জীবিকার উৎসগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, আর্থিক সংস্কারের নামে সরকারী এবং বেসরকারী—উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান কমেছে ব্যয় কমানোর অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোতে বড় সংখ্যার কর্মী ছাটাইয়ের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থলব্ধী প্রতিষ্ঠানগুলি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তও চাপের কাছে এমন নিলজ্জ্ব আত্মসমর্পণ ভারতবর্ষকে বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে মূল্য বাজারে পরিণত করেছে।

আশির দশক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া বৈদেশিক ঋণ এবং ব্যালেন্স অব পেয়েন্টের সংকট থেকে চট্‌জলদি পরিগ্রাণ পেতে ১৯৯১ সালের জুন মাসে পি. ভি. নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের অন্যান্য শর্তাবলী সন্মিলিত নয়া-অর্থনৈতিক নীতি এবং এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে দেশে নয়া-শিল্পনীতি প্রণয়ন করে। ঐ সব নীতির কার্যকরী রূপ দিতে প্রশাসনিক স্তরে পরিকাঠামোগত বিন্যাগের যেসব পরিবর্তন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ঘটিয়েছিল তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ কৃষিজ, শিল্পজ, খনিজ ও মানবসম্পদে চির সমৃদ্ধ এই দেশের স্বনির্ভরতা ও সার্বভৌমত্ব ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশী ও বিদেশী পুঁজির গতিবিধির উপর থেকে এককালের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহত হওয়ার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র নিজেই সম্প্রসারিত করার ক্ষমতা ক্রমশই হারাতে থাকে। এক কথায় বলা যায়, ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর

সূত্রপাত ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেশের শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণতা কে বিদেশী পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা জারী হয়েছিল।

১৯৯৮ সালে বি. জে. পি-জোট সরকার প্রথমবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সময় থেকেই রাও সরকারের অনুসৃত ঐ উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ বা ক্রিস্টিয়ানাইজেশন ও বিশ্বায়নের অর্থনীতি আরও তৎপরতার সঙ্গে অনুসরণ করতে থাকে। প্রথম বাজেটেই আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের ব্যাপক ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়। খাদ্যশস্য ও সার উল্লেখ্যেই ভর্তুকীর পরিমাণ হ্রাস করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলির শেরার স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করার প্রয়াস শুরু হয়। অব্যাহত পণ্য আমদানির তালিকায় ৩৪৪টি পণ্যের নাম ঘোষণা করেন তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে। পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও পেট্রোজাতীয় সবরকম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থে দেশীয় পেটেট আইনের সংশোধন ঘটিয়ে ঔষধ শিল্প ও কৃষি পণ্যের উৎপাদনের উপর ভর্যাবহ আক্রমণ নামিয়ে আনে। পেটেট মানে হলো একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ মালিকানা বা একচেটিয়া অধিকার।

১৯৯৯ সালে মারাকেশ চুক্তির পরে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেও পেটেট আইনের বিশ্বায়নগত সূচীটি অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরই সুবাদে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ভারতবর্ষ থেকে “নিম্ন”-এর নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীর ৫০টি দেশে তাদের পেটেট করেছে। প্রায় আট হাজার ঔষধি গাছ পাওয়া যায় আমাদের দেশে এবং এর ওপর ক্ষুধাতুর দৃষ্টি রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির।

১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সাল উদারীকরণের আতিশয্যে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দূর্নীতি মাত্রাছাড়া আকার নেওয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে সর্বনাশ নেমে আসে। দেশের তাবড় তাবড় নেতারা শেরার কেলেকারি, সার কেলেকারি, টেলিফোন কেলেকারি ইত্যাদির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলির আর্থিক সংকট এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে বেশকিছু সংস্থা বন্ধের মুখে এসে দাঁড়ায়। দারিদ্র, বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি নিভা প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন দুর্ভিক্ষ হয়ে ওঠে।

১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বি. জে. পি-জোট পুনর্ব্যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয় এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে প্রতিরক্ষা বাদে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলির ৭৬ শতাংশ শেরার বেসরকারী পুঁজির কাছে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে আমদানি শুল্ক ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হলো দেশীয় শিল্পক্ষেত্রে পণ্যের উপর অসুশুল্ক চাপানো হয়েছে ০২৫২ কোটি টাকা।

আমদানি শুল্ক কমেছে ১৫২৮ কোটি টাকা। রান্ধারও ব্যাক ও বাঁমাঞ্চলকে দেশী ও বিদেশী পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে সেওয়ার সরকারী প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রান্ধারও ব্যাকের ৬৭ শতাংশ শেয়ার বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২৮শে এপ্রিল, ২০০০ সাল টেলিকম মন্ত্রকের “বেসরকারী বিনিয়োগ সেল” টেলিকম কমিশনকে যে নোট পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, পরিকাঠামো পরিষেবার ক্ষেত্রে সড়ক, বন্দর, বিমানক্ষেত্র বন্ধন অবাধ করা হচ্ছে তখন দেশের টেলিকম পরিষেবা অবাধ করে সেওয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকতে পারে না। নোটে আরও বলা হয়েছে যে, টেলিকম পরিষেবার সুপ্রসারণে ২০০৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগের প্রয়োজন ৩৭০ লক্ষ ডলার এবং ২০১০ সালের তা বেড়ে হবে ৬৯০ লক্ষ ডলার। এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ একমাত্র বিদেশী সংস্থাগুলির মাধ্যমেই সম্ভব। তাই বিনিয়োগের বর্তমান হার ৯৯ শতাংশে সীমাবদ্ধ না রেখে তা ১০০ শতাংশই করা উচিত বলে টেলিকম মন্ত্রক মনে করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে আলোচনাকালে ভারতবর্ষ পরিস্কার করে জানিয়েছিল ২০০৪ সালের আগে পৰ্ব্বত টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনরকম পরিবর্তন করা হবে না টেলিকম পরিষেবা সরকারী নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রক করে কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে হস্তান্তর ঘটাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে টেলিকম মন্ত্রক। ২ শে জুন, ২০০০ টেলিকম পরিষেবা দপ্তরকে দৃষ্টান্তে বিভাজন করলো কেন্দ্র—টেলিকম পরিষেবা দপ্তর এবং টেলিকম অপারেশনস দপ্তর। টেলিকম মন্ত্রক যা কিছু করছে তার মূল উদ্দেশ্যই হলো বেসরকারীকরণ এবং শোনা যাচ্ছে এরই লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর মাস থেকেই প্রস্তাবিত কর্পোরেশন নিজেস্ব পরিচালনগত কাজ শুরু করবে। অন্যদিকে, “মহানগর টেলিফোন নিগম”—এই সংস্থাটিকেও বেসরকারী হাতে তুলে দেবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। টেলিকম পরিষেবা ক্ষেত্রের এই বিরাস্ট্রীকরণ কর্মসূচী অবশ্যই দেশের নিরপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ। কারণ নিরাপত্তাজনিত গোপনীয়তার হানি ঘটবে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির ক্রম বর্ধমান আধিপত্য এক নতুন পর্বাত্মক সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃস্থলে সে সত্ত্ব স্তম্ভ অবস্থার রয়েছে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে লগ্নী পুঁজি বা ফিনান্স পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও। অনেকগুলি দেশের একটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এই লগ্নী পুঁজিকে পরিচালনা করছে এবং এর আন্তর্জাতিক চরিত্র এমনই যে এর প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। সারা বিশ্বে অবাধ বিকরণের স্বার্থেই এই ঐক্য বিশেষ প্রয়োজন, যার সম্মিলিত প্রভাবে লগ্নী

পুঁজি তৃতীয় বিশ্বের সম্পদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলির উপর তার স্বপরিচালিত নিয়ন্ত্রণ কার্যে করতে সমর্থ হবে। ১৯৯০ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্ভব এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৃহত্তর একত্রের আধিপত্যকে এই তিন সংস্থা একযোগে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির এই উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিপ্লবের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জ করে তুললেও সামগ্রিকভাবে উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, লগ্নী পুঁজির বিশ্বায়ন শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলিতেই যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিতে প্রগতি করে দিয়েছে তা নয়, এর প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বও অভ্যন্তরীণ তুলনায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমে শূন্য করেছে। উদারনীতির পথে অগ্রসারমান তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি বর্তমানে এমনই সঙ্কটের মুখোমুখি যে একদিকে উন্নত মূল্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ার পরিণতি-স্বরূপ দেশগুলিতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বেড়েছে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের মূল্য অংশটাই চলে যাচ্ছে উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে। পরিস্থিতিগত দিক থেকে বিচার করলে যা পরিণামিত হয় তা হলো, আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির এই অব্যাহতিগত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সামনে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যতদিন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব ছিল ততদিন ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র গড়ে তোলার প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদের চাপকে বেশ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং পূর্বে ইউরোপের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান পুঁজিবাদের ইতিহাসে এক নতুন পর্বারের সূচনা করে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রসারের উপর যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের কৌশল এককাল অনুসরণ করে আসছিল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়করা, তা এই অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র তার স্বার্থবাহী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্য তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরী করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে আমাদের দেশে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন যখন অতি আক্রমণাত্মক রূপ নিয়েছে তখন এই অব্যাহতি অর্থনীতি অনতি বিলম্বেই দেশকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে বিক্রিয়ে দেবার নীতি হিসেবে পর্বর্ষাসিত হবে। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জহওয়ারলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের উন্নয়ন কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—একটি

শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী কেন্দ্র গড়ে তোলা যা তুলনামূলকভাবে সাম্রাজ্য-
বাদের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকবে। দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের
জোরারকে শ্রম্য করতে সময় সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বিভিন্ন ধরনের
সাহায্য নিলেও, তৎকালীন শাসকশ্রেণী বিদেশী পণ্য ও পুঁজির প্রসার রোধে
দেশের উৎপাদনের সংকল্পণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব প্রদান
সেই সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ অবস্থান ও গণতান্ত্রিক নীতি প্রণয়নে নিজেদের
অবস্থানকে দৃঢ়তার সঙ্গে জাহির করা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষকে বিশ্বের
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-
শ্রেণী রাষ্ট্রস্বত্বতা অধিকার করে এবং অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতিতেও নিজেদের
অবস্থানকে স্থিতিশীল করতে ঐ শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের
অর্থনীতি নিজেদের অন্তর্ভুক্ত ধরে রাখতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী দেশীয়
পুঁজিপতি গোষ্ঠী দেশের বিাক্ত শিল্প শাখায় কারখানা স্থাপনে তৎপর হয়ে
ওঠে। এইসব কারখানা স্থাপনে অবশ্যই প্রয়োজন ছিল ইম্পাত, ভারী
যন্ত্রাদি, কয়লা, বিদ্যুৎ, রুমার, ধাতুর তৈরী প্রব্যাাদি, পরিবহন সামগ্রী, রাস্তা,
রেলপথ, বিমানকেন্দ্র, বন্দর ইত্যাদি যা ভিক্সমূলক শিল্পী (BASIC
INDUSTRIES) হিসেবে গ্রাহ্য। ভিক্সমূলক শিল্পগুণির দ্রুত বিস্তার
না ঘটালে যেমন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়ে, আবার যথেষ্ট সময়সীমা
এইসব শিল্প শাখায় এক একটা গড়ে তুললে বেশ কয়েক শো কেটি টাকার
প্রয়োজন এবং এর থেকে মুনাক্ষ অর্জনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু
পুঁজিতান্ত্রিক ভাবনার যেখানে মুনাক্ষ হারই হলো বাজারে টিকে থাকার
সম্ভিকারের নিয়ানক, সেখানে দেশের শিল্পোন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে এইসব
ভিক্সমূলক শিল্পশাখা স্থাপনে বিশাল অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে
দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী মোটেই আগ্রহী ছিল না। অথচ এই অবস্থা চনতে
দিলে দেশের শিল্পোন্নয়ন একেবারেই থমকে যাবে, অগত্যা সরকারী উদ্যোগেই
এইসব ভিক্সমূলক শিল্পশাখা গড়ে তোলার নীতি অনুসরণে বেশ কিছু
রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর জন্য সরকারের সে
বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার মধ্য অংশ সংগৃহীত হয়েছিল
সাধারণ প্রমজীবী মানুষের ওপর চাপানো কর থেকে এবং বাকী অর্থ সংগ্রহ
করা হয় বিদেশী ঋণ মারফত।

স্বাধীন পুঁজিবাদী উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত শিল্পগুণির প্রসার ঘটানোর
সরকারী পরিকল্পনা সমূহ এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যাতে দেশের

পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। এমন কি বিভিন্ন শিল্প শাখায় ব্যক্তিগত মালিকানার গড়ে ওঠা কারখানাগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনজাত পণ্য স্থলভে সরবরাহ করার সমস্তরকম সরকারী প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত টাটাদের ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণেও রাষ্ট্রশক্তি সে সময় ঢালাও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেছিল বলেই পরবর্তী সময়ে এই কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতার বিচারে অতি অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প গড়ে তোলা হয় প্রধানতঃ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থসাধন্থেই এবং এই একই ভাবনা মাথায় রেখেই আমাদের দেশের রাষ্ট্রপরিচালকরা একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। ইন্দীরা গান্ধীর শাসনকালে করলা শিল্প ও ব্যাক জাতীয়করণের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে প্রগতিশীল মনে হলেও, তার এইসব সিদ্ধান্ত মূলত কিস্তি দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার্থেই গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের দেশের বৃহৎ বৃজ্জোঁলাগোষ্ঠী রাষ্ট্রসম্মতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীন পুঁজিবাদী উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হলেও এরা কখনই ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছিন্‌ন করে ধনতান্ত্রিক বলয়ের বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় নি। স্বাধীন দেশে ইস্পাত শিল্প স্থাপনের জন্য যখন আমাদের দেশের সরকার বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে আর্থিক ঋণ ও কারিগরি সাহায্যের কথা বলে তখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে তাদের দেশের উৎপাদনজাত ইস্পাত বিক্রী করতে রাজী থাকলেও এদেশে ইস্পাত কারখানা গড়ে দিতে মোটেই রাজী ছিল না। কিস্তি যখন সমাজতান্ত্রিক নোভিয়েত রাশিয়া ভিলাইতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, তখন ব্রিটিশ সরকার দুর্গাপুরে এবং পশ্চিম জার্মানী রাউরেকেলার ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এগুলি স্থাপিত হবে সরকারের এই শর্তও সেইসময় ত্রৈসব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র চূপচাপ মেনে নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিশ্ব রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি শত্রুশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকার ফলেই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঋণের সমাধানে আমাদের মতো সদ্যস্বাধীন অন্তর্ভুক্ত দেশের নেতৃত্বে আসীন বৃহৎ বৃজ্জোঁলাগোষ্ঠী আশাতিরিক্ত স্তুতিধা অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রচ্ছন্ন চাপ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জোট নিরপেক্ষ অবস্থানকে বজায় রাখতে পেরেছে। তবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার এই সাহায্য কখনই আমাদের রাষ্ট্রশক্তির মূল চরিত্রকে সংশোধিত করতে পারেনি। সময় বতই এগিয়েছে আমাদের রাষ্ট্রবন্দ্র দেশে ১৯৬ / কবিতার কাগজ

খনতন্ত গড়ে তোলার চেষ্টায় ক্রমেই বিদেশী পর্জিবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে সর্বস্তরে সহযোগিতার লিপ্ত হয়েছে। যার নেতৃত্বে দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে, যাকে নিয়ে দেশের মানুষের এত আশা, উদ্দীপনা, একসময় মন্ডির স্বপ্নকে গেঁথে দিয়েছিল সেই মানসকন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সংগৃহীত স্বপ্নের পরিমাণ ছিল মোট বিদেশী স্বপ্নের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম। পরবর্তী সময়কালে যখন দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রতিশ্রুতিমতো পরিবর্তিত আকার না নেওয়ায় নিজের জনপ্রিয়তা খর্ব হতে চলেছে, তখন দেশের আর্থিক পরিবেশে চটক আনতে আমাদের দেশের শিল্প ব্যবসার আঙিনায় বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহকে উৎসারিত করার তাগিদ অনুভব করেন ইন্দিরা গান্ধী।

স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রশক্তি দেশের সর্বস্তরে পর্জিবাদী বিকাশের গুরুত্বকে ভীষণভাবে প্রাধান্য দেওয়ার আমাদের দেশের অর্থনীতি কখনই সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়নি। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভাব প্রথম থেকেই এতটা বেশী ছিল যে, রাষ্ট্রশক্তির নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা হয়ে পড়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা সীমিত করার প্রয়াসে এবং রাষ্ট্রিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে আশির দশকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ব্যাপক বিদেশী পুঁজি আমদানি করার নীতি গ্রহণ করে। আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক মরদানো প্রতিপক্ষ বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীকে ধরাগারী করে নিজেদের ক্ষমতা বা আধিপত্যকে বিদেশী পুঁজির দৌলতে অপ্রতিরোধ্য করে তোলা, স্বাধীন অর্থনীতি গড়ার পথে না গিয়ে বিদেশী পুঁজির উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ, সস্তর দশকে দেশের বৃহদাংশ মানুষের আস্থা অর্জন করতে এই শাসকদলই সামন্ততন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বিরোধী সমস্তরকম প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রাভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি কৃষকসমাজের স্বার্থে কৃষির উপর থেকে দেশের সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর আধিপত্যকে খর্ব করার স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কারের প্রাথমিক চিন্তাভাবনা তৎকালীন বেটে খাওয়া গ্রামের মানুষদের ভিতরে এক নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হয়। স্বাধীন বৈদেশিক নীতির প্রবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত করার একটা প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বাতাবরণ দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কালের নিয়মে দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক বংশগুলি যতই তীব্রতর

হয়েছে, রাষ্ট্রশক্তি ততই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের পথে দেশের বাজারকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে ভেঙে দিতে উদ্যত হয়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বন্দ ও আঁতাতের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিকাশের যে পথ স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে চলেছে তার কোন বাস্তবিক ইহিদ্দা গাম্ভীৰ্য্য আমলেও ঘটেইনি, বরং বলা যায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভাষণভাবে এক।

ভারতবর্ষের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে প্রবেশাধিকারের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি মোটামুটি তিনটি উপায়ের ওপর নির্ভর করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হয়—

প্রথমতঃ বেশ কিছু বিদেশী কোম্পানী এদেশে তাদের নিজস্ব শাখা স্থাপন করে সরাসরি উৎপাদন ও ব্যবসা আরম্ভ করে দেয়। দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের তুলনায় ঐসব বিদেশী কোম্পানীর পুঁজির ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী হওয়ার দেশের শিল্প ব্যবসার বাজার দখল করার ব্যাপারে এদের আধিপত্য দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু বিদেশী কোম্পানী এদেশের প্রভাবশালী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সব বোধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্রশক্তির উপরে ঐসব একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য বেশী থাকার বোধ কোম্পানীগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে নিয়ে চালু অপেক্ষাকৃত ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বকৌশলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এমন কি, সাধারণ ব্যবহার্য পণ্য-সামগ্রী বা এতকাল দেশের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত হতে সেইসব উৎপাদকদের বাজার থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে ক্ষমতাবান বোধ কোম্পানীগুলি ঐসব পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে তাদের পুঁজির একটা অংশ বিনিয়োগে তৎপর হয়ে ওঠে। উৎপাদনের সার্বিক ধরণটাই তারা উপড়ে ফেলে দিয়ে উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে ঐসব পণ্যের উৎপাদনের হার ও মানের উৎকর্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করলেও শিল্প সংস্থার কর্মী-সংকোচন ঘটিয়ে মূল্যফা অর্জনের পথ খোলা রাখাটা তাদের ব্যবসার এক নতুন ধরণ বা পদ্ধতি হিসেবে আমাদের শিল্পজগতেও তা চালু হলো। দেশের কুটিরশিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রচুর প্রমিত বেকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতার অভাবে পণ্যগুলির দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার সবচেয়ে বেশী কর্তিগন্ত হলো সাধারণ মানুষ।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতিতে সামাল দিতে দেশের সরকার বৈদেশী ঋণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করার নামে পুঁজি ও কারিগরি সম্প্রদায়

বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় বেশ কিছু বিদেশী সংস্থার সঙ্গে। এই স্বযোগ ব্যবহার করে উন্নত দেশের কোম্পানীগুলি তাদের গুদামজাত বস্তুাদিগুলো, যা ঐসব দেশে ইতিমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে, সে সমস্ত বস্তুাদি বাজার সম্প্রসারণে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে শাসনে রেখে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি যেমন, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার দেশের বিভিন্ন প্রকল্প রূপারণে ভারত সরকারকে ঋণ দিতে এগিয়ে আসে।

প্রথম প্রথম সরকারী তরফে বলার চেষ্টা হয়েছিল যে, দেশের উন্নয়নের পথে যতটুকু পরিমাণ পুঁজির অভাব অনুভূত হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই বিদেশ থেকে ঋণ মারফৎ সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে সেই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির গতিবিধিকে অবাধ করতে ভারত সরকার দেশের অর্থ-নৈতিক দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থবাহী, এদের মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও স্বনির্ভর উন্নয়ন কৌশলের দেশীয় ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিকাশকে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দেওয়া। “রাষ্ট্র” ও “শিল্প”—এই দুইয়ের মধ্যকার সংযোগ যত দুর্বল হবে এদেশের নানা ধরনের সম্পদকে তারা সহজেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে।

১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল—এই সময়কালের মধ্যে ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব নীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ঘটিত হয়। দেশকে দ্রুত আধুনিকীকরণের পথে নিয়ে যেতে যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী রাজ্যীয় গাম্ভীর্য সরকার গ্রহণ করেছিল সেই আশির দশকের শেষ দিকে তারই পরিণতিতে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ ও ব্যালেন্স ভার পেমেণ্টের ক্রমবর্ধমান চাপে জর্জরিত ভারতবর্ষের সরকার আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ভাবগভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দ্রুত মুনাকার সম্মানে বাস্তব উন্নত ধন-তান্ত্রিক দেশের পুঁজিবাদী সংস্থা সমূহের বিনিয়োগকে স্থানান্তরিত করতেই দেশের স্বতন্ত্র আর্থিক উদারীকরণের নীতিকে প্রয়োগ করতে আমাদের দেশের সরকারকে নির্দেশ দেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাংক এবং ঐসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৯৬ সালে গঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর রূঢ় বাস্তব চহারারই আশুপ্রকাশ ঘটেছে ১৯৯১ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত নরসিমা রাও পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষিত অর্থনীতি

ও শিল্পনীতির মধ্যে। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরুর হয় দেশের আর্থিক নীতির সংস্কার প্রক্রিয়া। দেশীয় শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে নয়—দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারকে বিশ্বের দরবারে উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক বুনয়াদ সুদৃঢ় করার প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে নরসিমা রাও সরকার এতকাল অবধি দেশের অর্থনীতির যেসব মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত ছিল তার একটা বহু অংশকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। শিল্পে উদারনীতির প্রচলন, লাইসেন্স প্রথার অবসান, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শিথিলীকরণ, উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রাদি আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পূর্বের আরোপিত সমস্ত রকম সরকারী বিধিনিষেধের প্রত্যাহারীকরণ, আর্থিক বিনিয়োগের প্রমুখ দেশীয় একচেটিয়া শিল্পপতিদের ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাসমূহকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান, বিদেশী মূলধার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী ১৯৭০ সালের “FERA”-আইন প্রত্যাহার, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে লাভের মাত্রাকে স্থানান্তরিত করতে সরকারী তরফে গ্যারান্টি প্রদান এবং সর্বোপরি নয়া শিল্পনীতি ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পৃক্ত করে তুলতে রাষ্ট্রায়ত্ত্বক্ষেত্রের অযোগ্যতা প্রমাণেও রাও সরকার যথেষ্ট মাত্রায় সৌচ্চার্য্য হয়ে ওঠে। সরকারী ছত্রছায়ার পৃষ্ঠে গণমাধ্যমগুণিলির নিরন্তর প্রচারে দেশের একটা অংশের বুদ্ধিজীবীদের মনের মধ্যেও এই ধারণা বন্দমূল হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা মানেই অলাভজনক অনুৎপাদক সংস্থা, অতএব মূল্যবোধ ভিত্তিতে ব্যর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রগুলির বিরাস্ট্রীকরণই সমাধানের একমাত্র পথ।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির এই করণ অবস্থার জন্য যে যে বিষয়গুলি দায়ী তা চিহ্নিত করার ব্যাপারে সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা লক্ষ করা যায়নি। অথচ সি. আই. আই (C. I. I—Confederation of Indian Industry)-এর সম্মীক্ষানুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৯৯-২০০০ সাল, এই আর্থিক বছরে দেশের সর্বোচ্চ লাভকারী দশটি সংস্থার মধ্যে নয়টি সংস্থাই হলো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের এবং সর্বোচ্চ লাভকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে একমাত্র বেসরকারী সংস্থা “লারসেন অ্যান্ড টুরো”। প্রত্যেক বছর ৩৫ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে আসছে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা-গুলি। দীর্ঘদিনের চরম অব্যবস্থা, লাভ পরিচালন-পদ্ধতি, চূড়ান্ত পরি-কল্পনা, পুঁজি বিনিয়োগে সরকারের চরম অনীহা, শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী নৈতিবাচক মনোভাব পোষণ, এবং সরকারে অধিষ্ঠিত মন্ত্রী ও আমলাদের স্বজন-পোষণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্নীতি দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রগুলিকে ধীরে ধীরে রুদ্ধ করে তুলেছে। এদেরই দৌলতে

কলকারখানা প্রভৃতিতে বন্দ হতে শুরু করলো। রুশ রাষ্ট্রের সংস্থাগুলিকে BIFR (Board of Industrial & Financial Reconstruction)-এর মাধ্যমে হয় চিরন্তনে বন্দ কিংবা দারিদ্র থেকে অব্যাহতি পেতে প্রায় বিনামূল্যে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে তুলে দেবার যে নীতি রাও-সরকার নিয়োগিলেন তা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুনরুদ্ধার-সম্পর্কে ঐ সরকার মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না।

“বিদায়-নীতি”—প্রয়োগের মাধ্যমে সব রকম সরকারী সংস্থার ব্যাপকহারে কর্মী সংকোচন এবং পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের দারিদ্রকে গুরুত্বপূর্ণ অস্বীকার করার দেশে দারিদ্র ও বেকার সমস্যা অতি জটিল আকার ধারণ করে। রাও-সরকারের নয়া শিল্পনীতির সৌজন্যে বেশ কিছু বেসরকারী শিল্পপতি তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে রুশ শিল্পে পরিণত করে বন্দ করে দিয়েছে এবং অধিক মূল্যে ভাঙনের ভাগিদে ঐসব শিল্পের পুঁজি অন্যত্র অধিক লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। সরকারের এই বিদায়নীতির বিরুদ্ধে প্রমিত সংগঠনগুলির আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার কেন্দ্রের সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ছাটাই প্রমিতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সাহায্য কম্পে “জাতীয় পুনর্গঠন তহবিল” গড়ে তোলে। এখানে উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির রুশতা নিরসনে সরকার যদি অনুরূপ জাতীয় তহবিল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতো তাহলে অবশ্যই তা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থবাহী পদক্ষেপ হিসেবে দেশের প্রমিতের মানব সাদরে স্বাগত জানাতো।

আমাদের মতো দেশে সেখানে চাহিদার তুলনায় প্রমিতের স্বোগান বহুগুণ বেশী সেখানে যদি “বাজার-অর্থনীতি”-কে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র সোপান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে শিল্পে নিষৃত্ত প্রমিতদের মজুরার হার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেতে বাধ্য। এই সূত্রকে প্রাধান্য দিয়েই ১৯৯১ সালের “নয়া শিল্প-নীতি” এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই “নয়া আর্থিক-নীতি” তৎকালীন রাও-সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ভারতবর্ষের অস্ত্রশুলে অত্যন্ত সুচারু উপায়ে প্রয়োগ করেন। যদিও এই আর্থিক নীতি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ১৯৯১ সালে প্রথম উদ্ঘোষিত হলো, তবে এই নীতির উৎস সম্বন্ধে করতে গেলে দেখা যাবে যে ১৯৮০ সাল থেকে পৃথিবীর অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বব্যাঙ্কে, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভান্ডারও “জি-সেভেন”-এর অন্তর্ভুক্ত ধনী দেশগুলির শর্তাধীন অর্থনৈতিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে এই আর্থিক সংস্কার নীতির অনুপ্রবেদ ঘটেছে এবং অষ্ট্রোপালের মতো আজও তা বিরাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালী—এই সাতটি উন্নত পুঁজিবাদী

দেশের সম্মুখে গঠিত “জি-সেভেন”, যারা সমগ্র দুনিয়ার অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্ত সম্পদ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়। নব্বের দশকের শুরুর দিকে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়নে আর্থিক ঋণ প্রদানকারী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক বর্তমানের সরাসরি হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত “জি-সেভেন” তত্ত্বাবধায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির যারা নিরাস্তত বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাকা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। “জি-সেভেন”-এর স্বাধীনতা এইসব আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভাবিত আর্থিক উদারীকরণের নীতি কার্যত বিশ্বব্যাপী পুঁজির কেন্দ্রীভবনের একটি পন্থা যার সার্থক প্রয়োগে উন্নয়নশীল দেশগুলির দেশীয় শিল্পায়নের পথ ক্রমশ রুদ্ধ হয়েছে এবং পণ্যের বাজার দেশী পণ্যের পরিবর্তে বিদেশী পণ্যে ছেড়ে গেছে।

বিত্তীয় বিশ্ববৃদ্ধি শেষ হওয়ার অব্যবাহত পরে, ১৯৪৪ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেক্টন সম্মেলন থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ বিশ্বব্যাঙ্ক, যার আসল নাম “International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)”, এর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৪৪ টি। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। প্রকরণগত দিক থেকে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও গঠনতন্ত্রের দিক থেকে এই দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে :

(১) রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে হলেও এই দুই সংস্থার সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত।

(২) রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ পদে তৃতীয় দুনিয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হলেও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ডিরেক্টর জেনারেল পদে ইউরোপের কোন একটি দেশের নাগরিক এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে।

(৩) রাষ্ট্রসংঘের সদস্যভুক্ত সকল রাষ্ট্রের সমান ভোটাধিকার থাকলেও বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে বিভিন্ন দেশের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে ভোটাধিকার সংক্রান্ত ক্ষমতা নিধারিত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন করা হয় একটি বিশেষ কাপ্পনিক মুদ্রার মাধ্যমে, যার নাম “Special Drawing Right (SDR)”。 এই SDR-এর মুদ্রামাত্র পাঁচটি প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রার উপর নির্ভরশীল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ডলার”, জার্মানীর “ডয়েন্সমার্ক”, জাপানের “ইয়েন”, ফ্রান্সের “ফ্রাঁ”, ব্রিটেনের “পাউন্ড স্টার্লিং”। আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভা'ডারে ভারতবর্ষের গচ্ছিত কোটার পরিমাণ ২৯০ কোটি ডলার। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৫৫-র বেশী এবং সংস্থার পরিকালনগত নীতি নির্ধারণে সদস্যভূক্ত দেশগুলির মধ্যে ভোটাধিকার প্রসঙ্গের ক্ষমতা বা মান নির্ধারিত হয় অর্থ'ভা'ডারে মঞ্জুত প্রত্যেকটি দেশের অর্থের পরিমাণের দ্বারা। যেমন, গচ্ছিত অর্থের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটার পরিমাণ ১৯'০ শতাংশ, গ্রেট ব্রিটেন : ৬'৭ শতাংশ ভোট, জার্মানী : ৫'৮ শতাংশ ভোট, ফ্রান্স : ৪'৮ শতাংশ ভোট, জাপান : ৪'৬ শতাংশ ভোট, চীন : ২'৬ শতাংশ ভোট, ভারতবর্ষ : ২'২ শতাংশ ভোট। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নে কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ ভোটারের প্রয়োজন। অথচ মোট ভোটারের ৪২'২ শতাংশ অধিকার করে আছে মাত্র পাঁচটি শিল্পোন্নত দেশ যারা "জি-সেভেন"-এর সদস্য ভূক্ত। স্বভাবতই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে "জি-সেভেন"-গোষ্ঠীর প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডারের উপর।

(৪) বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডার সর্বদা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডারের সদস্যপদ গ্রহণ না করলে এবং তার শর্তাবলী মেনে না চললে বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্যপদ লাভ করা যাবে না।

এই দুই সংস্থার জন্মলগ্নে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কোনো সদস্য রাষ্ট্রে যদি বৈদেশিক মূল্যায়ন সঙ্কট দেখা দেয় তবে তা পূরণে আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডার সংশ্লিষ্ট দেশের গচ্ছিত বা মঞ্জুত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে। তাবার প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সহায়তা করবে বিশ্বব্যাঙ্ক। উভয়ের ক্ষেত্রেই ঋণের উপর কোনো-রকম শর্ত আরোপের কথা বলা ছিল না। কিন্তু আশির দশক থেকে এই দুই সংস্থা বেশ কিছু প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে যা সদস্য দেশের গচ্ছিত অর্থের থেকে অনেক বেশী হলেও তা অত্যন্ত কঠোর শর্তাবলী সম্বলিত। এগুলি হলো :

(১). Compensatory & Contingent Financing Facility (CCFF)

আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডারের সদস্যভূক্ত কোনো দেশ যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে রপ্তানি পণ্যের মূল্য হ্রাস বা আমদানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ব্যালেন্স অব পেমেন্টের সংকটে পড়ে, যারজন্য সংশ্লিষ্ট দেশটিকে কোনো-ভাবেই দায়ী করা যায় না, তবে CCFF খাতে আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডার ঐ সদস্য দেশের গচ্ছিত অর্থের ১২২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ঋণ হিসেবে দেবে। যেসব সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অর্থ'ভা'ডারের নির্দেশিত অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণে এবং তা রূপায়ণে রাজী হবে তাদের পক্ষে এই ঋণ পাওয়া অনেক সহজ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে রাও-সরকার এই

থাতে ৬১.৫ কোটি ডলার ঋণ পেয়েছে এবং প্রায় একই সঙ্গে গচ্ছিত ব্যবস্থাপনা খাতেও ২২০ কোটি ডলার ঋণ দেয় আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার।

(২) Structural Adjustment Facility (SAF)

সদস্যভুক্ত কোনো দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের সমস্যা দূরীকরণে এই ঋণ দান প্রকল্প চালু করা হয় ১৯৮৬ সালে, এই ঋণে সুদের হার কম এবং ঋণ দেওয়ার সাড়ে পাঁচ বছর পর থেকে পরিশোধের কিস্তি শুরু হয়। সদস্য দেশ যদি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার এই দুই সংস্থার পরামর্শ মতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের “কাঠামোগত সংস্কার” সাধনে সক্ষম হয় তবেই সেই দেশ তার নিজস্ব কোটার ৭০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ঋণ হিসেবে পেতে পারে।

(৩) Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF)

১৯৮৭ সালে এই ঋণদান প্রকল্প চালু করা হয়। সদস্য দেশ যদি বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার—এই দুই সংস্থার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে দেশের আর্থিক কাঠামোগত পুনর্নির্মাণে যে রাজস্ব আছে এবং এরজন্য স্থান নির্দিষ্ট প্রস্তাব এই দুই সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর কাছে পেশ করার পরই সদস্য দেশটি তার নিজস্ব কোটার ২৫০ থেকে ৩৫০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ঋণ হিসেবে পেতে পারে।

(৪) Extended Fund Facility (EFF)

যেসব সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের নির্দেশ মতো দেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্নির্মাণ ক্রমসূচী রূপায়ণে সক্ষম হবে তারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে সেই দেশের কোটার ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ পেতে পারে।

বিশ্বব্যাংক গড়ে তোলার প্রাথমিক বা মূল উদ্দেশ্যই ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাহায্য ও ঋণ মঞ্জুর করা যাতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার উন্নয়নের বৈষম্য দূর করা যায়। কিন্তু আশির দশক থেকে “প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ (Project Loan)”-এর পরিবর্তে “বিভাগীয় পুনর্নির্মাণ (Sectoral Adjustment)”-খাতে বেশী ঋণ বরাদ্দ করার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় দেবার কথা ঘোষণা করে। “প্রকল্পভিত্তিক ঋণ”-এর সঙ্গে “বিভাগীয় পুনর্নির্মাণ ঋণ”-এর তথ্যগত পার্থক্য হলো, ঋণের কিছু অংশ মাত্র নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করে এর বেশীর ভাগটাই ব্যয়িত হয় বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত ঐ প্রকল্প যে দপ্তরের অধীনে গড়ে উঠেছে সেই বিভাগ সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের ক্রমসূচী রূপায়ণে। এছাড়াও “কাঠামোগত পুনর্নির্মাণ (Structural Adjustment)”-খাতে ঋণ প্রদানে বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রেখেছে বিশ্বব্যাংক। ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে রাও-সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে “কাঠামোগত পুন-
২০৪ / কর্তৃত্বের কাগজ

বিনিয়োগ" খাতে ৬০০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করে, যার শর্ত ছিল—বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশমূলক ব.বস্থাপনার সরকারী ভরত্বিকর পরিমাণ হ্রাস করতে হবে, উৎপন্নজাত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা কমাতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কেন্দ্রের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে, বাণিজ্য ও শিল্পনীতির উদারীকরণ করতে হবে ইত্যাদি।

"আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠান (ILO)"—তার এক নিজস্ব পরীক্ষার উল্লেখ করে যে, "রাও-সরকারের বাজার অর্থনীতির ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৮০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হতে পারে।"

বর্তমান শতকের পূর্বমুহূর্তকালে বিশ্ব পুঞ্জিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক মন্দা এত নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে যেমন আগের বৈষম্য বাড়ছে, দরিদ্র, বেকারী ও কর্মহীনতা বাড়ছে সঙ্গেসঙ্গে সম্পদ ক্রমেই মনিটরের মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকার দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থার মূনাফার রাস্তা বোলা রাখতে নীতিবান বাজারে আধিপত্য বাজার রাখার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সব প্রকার পুঞ্জিপতিরা। বৃহৎ পুঞ্জির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম পুঞ্জির ক্রম অনিবার্যভাবেই এক নতুন উচ্চতার উন্নীত হয়েছে।

অতি উৎপাদনের সমস্যার জর্জরিত বর্তমান পুঞ্জিবাদ যখন অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলির বাজারে বিশেষ স্থানলাভে বঞ্চিত হচ্ছে, তখন সেখান থেকে সরে এসে পুঞ্জির গতিবিধিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবাধ সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত আর্থিক সংস্কারনীতি প্রসব দেশে কার্যকরী করার পক্ষে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করছে। ভারতবর্ষে এধাবৎ-কাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পুঞ্জি অতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং অবস্থার পরিবর্তন সাধনে এই দারিদ্র নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার মতো সামর্থ্য দেশীয় বেসরকারী পুঞ্জির যে নেই তা জানা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণের এই পরামর্শ সরকারের মনে নেওয়ার অর্থ দেশকে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে সমর্পণ করা।

৫ই জুন, ২০০০ সাল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোন্ট কোলার দুদিনের ভারতবর্ষ সফরে এসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিংহা, ষোড়শা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ কে. পি. পান্থ, বিদেশ মন্ত্রী যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু

ছিল—বিশ্ব অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ভূমিকা, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকে আর্থিক সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপ ইত্যাদি। এছাড়াও অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রথম প্রবক্তা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গেও আলোচনার বসেন হোমট কোলার। ৬ই জুন ২০০০, অর্থাৎ আলোচনার দ্বিতীয় দিনে শশবন্ত সিনহা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, বোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কে. পি. পম্বকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রধান বসেন যে, “ভারতবর্ষ ৮ থেকে ১০ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে তা উচ্চাকাংক্ষী হলেও অজ্ঞানযোগ্য, যদি অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি আরো বাড়ানো যায়।” কোথায় কোথায় এই গতিবৃদ্ধি প্রয়োজন হোমট কোলার তারও সুস্পষ্ট দৃষ্টি চিহ্নিত করেছেন, যেমন—

(ক) রাজনৈতিক ঐক্যমত্য সহকারে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই আর্থিক পরিস্থিতি সংহত করতে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(খ) ব্যাংক শিল্প ব্যবস্থার সার্বিক বেসরকারীকরণ সহ বীমা ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও এ ধরনের সংস্কার অত্যন্ত জরুরী।

(গ) দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের পক্ষে লাভজনক করে তোলা একান্ত আবশ্যিক।

(ঘ) বিদেশী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে ভারত সরকারকে এমন সব নীতি প্রনয়ন করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুরার আরো বেশীমাত্রার উদ্ভব হয়।

আলোচনা কালে বোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ কে. সি. পম্ব প্রস্তাব দেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাদের নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করুক এবং এদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুক যাতে ভারতবর্ষের বাজারে বিনিয়োগ করতে বিদেশী সংস্থাসমূহ আরো বেশী উৎসাহিত হয়।

এক দশক আগে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সূত্র মেনে কাঠামোগত পুনর্বিবিন্যাস ঘটানোর মধ্য দিয়ে যে সংস্কার নীতির রূপায়ণ স্বাও-সরকার শুরুর করেছিল, অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের বি. জে. পি জোট সরকার তুলনাগতভাবে অনেক ব্যাপক আকারে এবং দ্রুততার সঙ্গে সেই সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে রতী হয়েছে। “দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার”—কর্মসূচীর দাপটে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে শিথিল হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয়ও সংস্থার বিলম্বীকরণ প্রক্রিয়ার গতি

বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শর্ত অনুসরণের ফলাফলে দেশের কৃষি, গবেষণাক্ষেত্র, বৈদ্যুতিন ক্ষেত্র, প্রত্যেক বাণিজ্যক্ষেত্র আন্তর্জাতিক পুঞ্জির সামনে আজ পুরোপুরি উন্মুক্ত। বিপুল বিদেশী পুঞ্জির স্বতঃস্ফূর্ত অন্তঃপ্রবাহকে মেনে নেওয়ার যখন চিহ্ন, উন্নয়ন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন, তখন বিদেশী পুঞ্জির গতিবিধির উপর শক্ত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল বলেই চীন তার দেশের আর্থিক উন্নয়নে পুঞ্জিবাদকে যথেষ্ট মাত্রার সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং কোনো অবস্থাতেই তা দেশের সামগ্রিক স্বাধের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারেনি।

১৯৮৮ সালের আন্তর্জাতিক সম্মিলনের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত হিন্দাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সারা বিশ্ব ব্যক্তিগত, বাঁমা, টেলিকমিউনিকেশন, পরিবহন ইত্যাদি পরিষেবামূলক বাণিজ্যের মোট রপ্তানীর ৬৩ শতাংশ রয়েছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। এখানে উল্লেখ্য, সারা বিশ্ব রপ্তানী যোগ্য পণ্যের সংখ্যা ৪,৫০০টি এবং এর মধ্যে পরিষেবা সংক্রান্ত রপ্তানীর পরিমাণ হলো প্রায় ৭০০ বিলিয়ন ডলার। পরিষেবা ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার তুলনামূলকভাবে কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী হওয়ার, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ব্যক্তিগত সার্ভিস ও বাঁমা সার্ভিসের মাধ্যমে সংগৃহীত নিশ্চিত পরিমাণমূলধনের উপর বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি তথা উন্নত পুঞ্জিবাদী দেশগুলির নজর তাই স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। ভারত-বর্ষকে স্পেশাল ৫০১ ধারার অন্তর্ভুক্তির কারণ দর্শাতে গিয়ে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি গ্রীমতী কার্ল-হিলস্ বলছিলেন, “ভারতবর্ষে বাঁমা ব্যবসায় ৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে, যা এমন পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের পরিষেবা বাণিজ্যের রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যদি অংশ গ্রহণের দাবী তোলে তবে তাকে অবশ্যই নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ বাঁমাব্যবসা সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গুণাগার দিতে হবে”। ৫-৬ই জুন, ২০০০ সাল, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের প্রধান হোষ্ট কোলারের প্রস্তাবিত আর্থিক সংস্কার সূচীর বক্তব্যের মধ্যেও গ্রীমতী কার্ল-হিলসের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি বারংবার শোনা গেছে।

১৮ই মে, ২০০০ সাল, কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর তরফে পার্লামেন্টে পেশ করা সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাজার থেকে সংগৃহীত কণের পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে ভারতবর্ষ অব্যাহতবী “কণ

ফাঁদ (Debt-trap)"-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বি. জে. পি.জোট সরকারকে সতর্কীকরণের মধ্য দিয়ে এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে—

(১) মূলধনী খাতে ব্যয় হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বখাতে আশানুরূপ অর্থ জমা না পড়ার বাজার থেকে গৃহীত ঋণের অর্থের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) গত পাঁচ বছরে সুদ প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে ১১০ শতাংশ এবং বর্তমানে গৃহীত ঋণের প্রায় পুরোটাই ব্যয় হচ্ছে অতীত দিনের ঋণের সুদ প্রদান করতে। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে প্রদেয় সুদের পরিমাণ ৭৭,৮৮২ কোটি টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে হিসাব করলে এই পরিমাণ সুদ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে যা দেশের কোষাগারের মোট ঘাটতির পরিমাণের ৬৮ শতাংশের সমান।

(৩) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের GDP-র ৬.৭৪ শতাংশ এবং প্রদেয় সুদের পরিমাণ GDP-র ৪.৪২ শতাংশ। ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বছরে প্রদেয় সুদের পরিমাণ ছিল GDP-র ১.৬২ শতাংশ। ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বর্ষে গৃহীত ঋণের মোট পরিমাণ ছিল GDP-র ৫.৩৯ শতাংশ।

(৪) বর্তমানে সংগৃহীত কর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে GDP-র মাত্র ৮.১৬ শতাংশ যা সর্বকালীন স্বল্পতার রেকর্ডকে স্পর্শ করেছে।

(৫) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বর্ষে অব্যবহৃত বহির্ঋণের পরিমাণ ৫০,১৫৬.৬৭ কোটি টাকা, যা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ঘটাতে ব্যয় করার কথা ছিল—যেমন ১০,০২০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে, ১০,০৫০ সামাজিক উন্নয়ন খাতে, ৭২০৫ কোটি টাকা জল প্রকল্পে, ৫০৪৪-কোটি টাকা জনপথ খাতে ইত্যাদি।

বর্তমানে ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার দেশের মধ্যে মনুদ্রান্যতির হার যেমন বেড়েই চলেছে সেইসঙ্গে টাকার পরিমাপে বিদেশী ঋণের বোঝাও বাড়ছে। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম দু' মাসের মধ্যেই অর্থাৎ এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ০২,১৮০.৪৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেলেছে, যা এই আর্থিক বছরে মোট ঋণ নেবার লক্ষ্যমাত্রার ২৭.৫ শতাংশ। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসেব পর্যন্ত আমাদের দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯৯০০ কোটি ডলার। বর্তমানে এর পরিমাণ নিচেরই ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং বাজেটের ঘোষণা অনুসারে ২০০০-২০০১ আর্থিক বর্ষে মোট সরকারী খরচের ২৬ শতাংশ হবে ঋণ শোধ করতে।

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বর্ষে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ এবং ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বর্ষে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। এই এক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১'৫ কোটি কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৫০ লক্ষ টন। ২০০০-২০০১ আর্থিক বর্ষে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে সার, বিদ্যুৎ, খাদ্য, পরিবহন ইত্যাদির উপর প্রদেয় ভর্তুকি ছাটাই মারফৎ সঙ্গৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য, দেশের মোট ব্যয়ের মাত্র ৬ শতাংশ ব্যয় এই ভর্তুকি দিতে। দেশের আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে বাজপেয়ী সরকার জনগণের খাদ্যের দামের ক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকির ১২ শতাংশ ছাটাই করে সঞ্চয় করেছে ১১০০ কোটি টাকা। অথচ, সাময়িক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা এবং মোট ব্যয়ের ১৫ শতাংশ বাবে এই সাময়িক খাতে। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বর্ষে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮১০ কোটি মার্কিন ডলার। আর ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বর্ষে এই ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশ্বায়নের আভিষেক রত্নানীর বাজার বৃদ্ধি করার তাগিদে দেশে উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী অনুসঙ্গ আমদানি করতে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ২রা জুন, ২০০০ সাল যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহের তুলনায় বৈদেশিক মূল্য সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার কমে যাওয়ার তা দাঁড়িয়েছে ৩৭০৬ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। এই একই সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মূল্যায় সম্পদের পরিমাণ কমেছে ২১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার এবং সোনার (স্বর্ণ) সঞ্চয় হ্রাসের পরিমাণ ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।

প্রসঙ্গত স্মরণে থাকতে পারে যে, ১৯৮৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ভারত-মরিশাস চুক্তি কর পরিহার চুক্তি অনুযায়ী মরিশাসে নিবন্ধীকৃত “মরিশাসের অধিবাসী সংস্থা” ভারতবর্ষে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করলে তার থেকে সে পরিমাণ লাভ হবে সেই লাভের অংশের উপর কোনোরকম কর দিতে হয় না। বি. জে. পি. জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর “কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ” সরকারের অর্থমন্ত্রকের নির্দেশে ১০ই এপ্রিল, ২০০০ এ-এক বিজ্ঞপ্তি (নং ৭৮৯) জারি করে যে, ভারত-মরিশাস চুক্তি কর পরিহার চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষে “মরিশাসের অধিবাসী সংস্থা”-র মর্যাদা পেতে হলে কর্তৃপক্ষের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। মরিশাসের আভ্যন্তরীণ আইন অনুযায়ী মরিশাসে বিনিয়োগীকৃত মূলধন লাভের উপর কোনো কর দিতে হয় না, কেবল বছরে ১৫০০ ডলার লাইসেন্স ফি জমা দিলেই যেকোনো বিদেশী সংস্থা মরিশাসে নিজের নাম নিবন্ধীভুক্ত করে মরিশাসের অধিবাসী

সংস্থা"-র সাটি'ফিকেট পেতে পারে। আর সেই সাটি'ফিকেট দেখিয়ে মরিশাসে নিবন্ধীকৃত-বিদেশী সংস্থাগুলি ভারতবর্ষে মূলধন বিনিয়োগ করে সে লাভ করছে তার উপর ভারত সরকারকে কর দেওয়ার দায় থেকে পূরোপুরি মুক্ত থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই নিদে'শের মধ্য দিয়ে বিদেশী বেশ কিছু সংস্থাকে ভারতবর্ষে ন্যায্য আয়কর ফাঁকির স্বযোগ করে দেওয়া হয়েছে। Securities And Exchange Board of India (SEBI)-র কাছে নিবন্ধীভূত যে ৫১১টি বিদেশী বিনিয়োগকারী সংস্থা ভারতবর্ষের বাজারে ব্যবসা করছে তার মধ্যে ১০৬টি সংস্থা এই "মরিশাসের অধিবাসী সংস্থা"-র নামে প্রত্যক্ষ কর ফাঁকির স্বযোগ নিচ্ছে, যার মধ্যে মা' একটি সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর মরিশাসে অবস্থিত।

চলতি বছরের ১৯ ও ২০ জুন দু'দিন ধরে কাররোর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগঠন জি-১৫-র (G-15) শা'খ' বৈঠক। ভারতবর্ষ, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, জামাইকা, মালয়েশিয়া, মোস্কো, নাইজেরিয়া, পেরু, সেনেগাল, ভেনেজুয়েলা, জিম্বাবোয়ে, কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কা—বৈঠকে যোগ দেওয়া এই ১৭টি দেশের নেতৃবৃন্দ বর্তমান বিশ্বায়ণ সংক্রান্ত বিষয়গুলির মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে গতিশীল অর্থনীতি রূপায়ণের বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকের সভাপতি মিশরের রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারক দশম জি-১৫-র সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে উন্নত দেশগুলির সংগঠন জি-৭-র সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্ত বলেন, "পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার বর্তমান যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলির উচিত দরকসাক্ষির ক্ষেত্রে নিজেরাই এগিয়ে এসে নিজেদের জন্য বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেওয়া উন্নয়নশীল দেশগুলির বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ঐক্য দেশের দাবীগুলি বিবেচনার মধ্যে আনতে উন্নত দেশগুলি বাধ্য"।

শুধুমাত্র ভূতীয় বিশ্বের দেশগুলিই নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলিও আজ যথেষ্ট সর্বস্ব। ৯ জুন, ২০০০ বার্লিনে অনুষ্ঠিত "ইউরোপীয় ইউনিয়ন"-এর একটি বৈঠকে কলা ও হরমোন সম্পৃক্ত গোমাংস চালান দেবার বিরোধী ইউরোপীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারির যে প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে "ইউরোপীয় ইউনিয়ন"—ভুক্ত দেশগুলি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও দায়ের করেছে "ইউরোপীয় ইউনিয়ন"। উল্লেখ্য, গতবছর কয়েকটি ইউরোপীয়

ইউনিয়নের সদস্যদের পণ্যের উপর মার্কিং নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঐক্যব দেশগুলির বাণিজ্যে ক্ষতি হয় প্রায় ৩০ কোটি মার্কিং ডলার। অপর একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের "অ্যাণ্টি-ডাম্পিং"; আইনকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব বাণিজ্য বিধির বিরোধী বলে রায় দিয়েছে। ইস্পাত রপ্তানীকে কেন্দ্র করে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ বিচার করেছে এই রায় দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্যানেল কমিটি।

স্টিল অর্থটি অব ইন্ডিয়া (সেইল)-র দপ্তর মারফৎ জানা গেছে, ১৯৯৮ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ে ৩৪০ ডলার প্রতি টন দরে মোট ১লক্ষ ৩৫ হাজার টন বিভিন্ন দৈর্ঘ্য কাটা ইস্পাতের পাত মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে সেইল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে এই রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এই রপ্তানীর দরুন মার্কিং দেশের দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র সরকার। প্রতি মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ট্রেড কমিশন তাদের রায় দিয়ে বলেছে, ভারতীয় ইস্পাত আমদানিতে মার্কিং শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে সেই কারণে ভিলাই ইস্পাত কারখানার তৈরি বিভিন্ন দৈর্ঘ্য কাটা ইস্পাতের পাতের উপর মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৭২৪৯ শতাংশ "অ্যাণ্টি-ডাম্পিং"-ডিউটি আরোপ করেছে। এছাড়াও এই পণ্যের উপর ১১.৭৫ শতাংশ "কাউন্টার ভেইনিং ডিউটি (Counter Veining Duty)" আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় ইস্পাতের ওপর এই "অ্যাণ্টি-ডাম্পিং" ডিউটি আরোপিত হওয়ার বিরুদ্ধে ভারতসরকার বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১লা জুন, ২০০০ বি. জে পি-জোট সরকার বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের পুরনো বিধি Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973 বাতিল ঘোষণা করে Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) চালু করে। এর মধ্য দিয়ে শিথিল করা হলো বিদেশী মুদ্রা কেনদেন সংক্রান্ত নিয়মকানুনের এবং এ ব্যাপারে সরকারের আইন লঙ্ঘন কারীদের শাস্তির পরিমাণও বেশ কিছুটা হ্রাস করা হলো। বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গকারী আর ফৌজদারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে না, অপরাধকে কেবলমাত্র দেওয়ানি অপরাধ হিসেবে দেখা হবে। এর বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলাও রজ করা হবে না। এনফোর্সমেন্ট দপ্তর একটি আবেদন সংক্রান্ত ট্রাইয়ালে অভিযোগ জানানোর পরে যদি তা প্রমাণিত হয় তবে যে পরিমাণ অর্থ কেনদেন নিয়ে অভিযোগ তার তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানাই হবে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি। উল্লেখ্য, FERA, 1973-আইনে জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট কেনদেনকৃত অর্থের পাঁচ গুণ। জরিমানা না

দিলেই একমাত্র আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্তকে জেলে পাঠাতে পারবে এনফোর্স'মেন্ট দপ্তর। ফাটকা বাজারে বিদেশী মদ্যার স্রোত বাড়ার পর থেকেই FERA আইনটি তুলে দেবার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিচ্ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য-মন্ত্রক ১ জুন, ২০০০ খ্রিঃ হিসাব পেশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৫৪ লক্ষ মার্কিন ডলার। আর এপ্রিল, ২০০০ সালে এই ঘাটতি বেড়ে হয়েছে ১১০ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রায় ১১২ শতাংশ। আমদানি বৃদ্ধির কারণেই এই বাণিজ্য ঘাটতির বৃদ্ধি ঘটেছে! এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৩১০ কোটি মার্কিন ডলার, যা এপ্রিল, ২০০০ সালের বেড়ে হয়েছে ৪৫০ কোটি ডলার। অর্থাৎ, এক বছরে আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ। এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে দেশের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৬০ কোটি ডলার এবং এপ্রিল, ২০০০ সালে এর পরিমাণ হয়েছে ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ, রপ্তানী এই এক বছরে বেড়েছে প্রায় ৩০.৬ শতাংশ। গত এক বছরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি বেড়েছে প্রায় ১২০ শতাংশ। ২০০০-২০০১ আর্থিক বর্ষের প্রথম মাসে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য প্রায় ১২৯ কোটি মার্কিন ডলার যা মোট আমদানিকৃত পণ্যের প্রায় ২০ শতাংশ। বাজপেয়ী-সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী রাম নারায়ণ জানিয়েছেন যে, চলতি আর্থিক বর্ষে অশোধিত তেল আমদানি পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে ৮ কোটি টন।

১৯ জুন, ২০০০ ভারত সরকারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের কাষনির্বাহক সমিতির অধিকর্তাদের এক আলোচনার ভারতের বর্তমান আর্থিক সংস্কার নীতির প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের অধিকর্তাদের সুপারিশ আর্থিক ঘাটতি কমানোর জন্য ভারত সরকারের উচিত একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মধ্যবর্তী আর্থিক কাঠামোগত বিনিয়োগের কাজ শেষ করতে হবে। দেশের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগের পক্ষপাতী এই অর্থভান্ডার। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কর্মসংকোচন, প্রমোজারের নমনীয়তা, রাষ্ট্রায়ত্ত্বাবধায়িত পুর্ণ বিরাষ্ট্রীয়করণ করার ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ভারত সরকারকে। এখানে উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সরকারের শেয়ার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত নামিয়ে আনা হবে। অর্থভান্ডারের অধিকর্তাদের মতে ভারতবর্ষকে পণ্য ও মূলধনী বাজারের ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের পূর্ণস্বীকৃতি গ্রহণ করতে হলে দেশের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে আরো দ্রুত বিনিয়োগের প্রয়োজন।

বর্তমান বি. জে. পি-জোট সরকার রাষ্ট্রারও ব্যাকের ৩৭ শতাংশ শেয়ার বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই বিদেশী পুঁজির কন্ট্রোল হবে এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে কম সুদে এখন যেসব ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য বর্তমানে রাষ্ট্রারও ব্যক্তিগতদের পরিচালনা কর্তৃপক্ষরা বেশ আশঙ্কার মধ্যে কালান্তিপাত করছেন। কারণ এইসব ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা আর ফেরৎ দেয়নি। মার্চ, ২০০০ পর্যন্ত মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৫১, ৬৬৬ কোটি টাকা। এই ঋণের মধ্যে ২০ শতাংশ পড়ে আছে পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ধরে এবং ৩৭ শতাংশ পড়ে আছে দু'বছরের কম সময় ধরে, ৪০ শতাংশ পড়ে আছে দু'বছরে বেশী সময় অথচ পাঁচ বছরের কম সময় ধরে। অর্থমন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছে, ১৫ জুলাই, ২০০০ এর মধ্যে এই বকেয়া ঋণ উদ্ধারের ব্যাপারে নির্দেশিকা প্রকাশ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া আত্মবিকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমাদের দেশে ৭ শতাংশ মানুষ প্রত্যাক ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জমির প্রায় ৫ শতাংশ কৃষিকাজে যাবদ্বত হয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৭.৪ শতাংশ আসে এই কৃষি থেকে এবং দেশের মোট রপ্তানার ১৮ শতাংশ হলো কৃষিনির্ভর উৎপাদন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে সার ব্যবহারে ভারতবর্ষের স্থান বর্তমানে তৃতীয়, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই ভারতবর্ষের অবস্থান। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত বার্ষিক কৃষি উৎপাদনের হার গড়ে ২.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শেষ "ন্যাট" আলোচনার পরিণতিস্বরূপ ১৯৯৪ সালে "মারকেশ চুক্তি" সম্পাদিত হওয়ার পরে এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের কৃষি উন্নয়নের নামে ধীরে ধীরে দেশের কৃষিযোগা জমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যক্তা নিজেদের নিরস্ত্রণে আনার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সার, কৃষিযন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করে একদিকে যেমন দেশের কৃষি উপকরণ সামগ্রীর বাণিজ্য ব্যবস্থাকে তারা ধরতে চাইছে, অন্যদিকে গ্রামের চাষীর হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ, উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ তুলে দিয়ে তারা তাদের নিরস্ত্রণে পুঁজিবাদী কারবার খামার গড়ে তোলার কাজে হাজার হাজার একর জমি লিজ নিচ্ছে। এমনকি, চাষের জমিতে "জল বিভাজন প্রকল্প" কার্যকরী করার কাজে প্রত্যাকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাংক, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক গোষ্ঠী, সুইস উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থা ও দেশগুলি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯০-৯৯ সালে কৃষি জমিতে জলের সব্যবহার স্থানান্তরিত

করতে আমাদের দেশের বৃষ্টি কবলিত এলাকাভূক্ত ২৫টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে এই জল বিভাজন প্রকল্প গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। নিকড় সংরক্ষণ, উন্নতিকরণ ও প্রাকৃতিক ধারণক্ষমতা-পূর্ণের জলের ব্যবহারের বিষয়ে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাই “জল বিভাজন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ঐ আর্থিক বর্ষেই ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ২৮ লক্ষ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমিকে এই কর্মসূচীর আওতার আনার একটি লক্ষ্য-মাত্রাও ধার্য হয়। হিরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—এইসব রাজ্যের প্রায় ১’৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই কর্মসূচী রূপায়ণে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ হিসেবে ১৮৭’০১ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ঋণের শর্ত হিসেবে বীজ, সার, অন্যান্য উপকরণ, সেচ, কৃষি ঋণ বণ্টন পদ্ধতি, শ্রম মজুরি, উৎপাদিত ফসলে বাজার, কি ফসল ফলানোর কাজ কোন জমিতে হবে ইত্যাদি সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে। একই শর্তে গুজরাট, উড়িষ্যা এবং রাজস্থানে ২’৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই জল বিভাজন প্রকল্প গড়ে তুলতে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে ১৮০’৫০ কোটি টাকা।

কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও উড়িষ্যা রাজ্যে এই একই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণে সারাসরি অর্থ বিনিয়োগ করেছে ডেনমার্ক সরকার। ১৯৯০-৯১ সালে ঋণটিকে ৪১’০০২ হেক্টর জমিতে জল বিভাজন প্রকল্প গড়ে তুলতে ব্যয় করেছে ৮’৮০ কোটি টাকা। এরপরে তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রথম দফার ১৮,০০০ হেক্টর জমিতে ব্যয় করে ৮’০৪ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফার ৬২ হাজার হেক্টর জমিতে অনুরূপ প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় করে ৪১’৭০ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বর্ষে উড়িষ্যার কোরাপুটে ১০’২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে ঐ একই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলে। লাজের অক্ষের কথা মাথায় রেখে ডেনমার্ক সরকারের পরবর্তী জল বিভাজন প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরমে ১১ হাজার হেক্টর জমিতে ১০’০০ কোটি টাকা ব্যয়ে।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী উত্তরপ্রদেশে “দুনভ্যালী জল বিভাজন প্রকল্প” হাতে নিয়েছে ৮০’৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১,৭২,১৫৫ হেক্টর জমি। বিদর, গুলবার্গ, বিজাপুর, রায়চুর, চিকমাগালুর—কর্ণাটক রাজ্যের এই পাঁচটি জেলার মোট ৭৭,৯৬৮ হেক্টর জমিতে ২০’৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত সরকার সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে “ইন্ডো সুইস সংস্থা”—নাম দিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরুর করেছে। সরকারী জল বিভাজন প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও অনাবাদী জমিতে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত না করে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে এইসব কর্মসূচী তুলে দিয়ে ভারত ২১৪ / কবিতার কাগজ

সরকার কার্যত বৈদেশিক সংস্থাগুলিকে আমাদের দেশের কৃষিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

বাজপেরী-সরকারের অবাধনীতি দেশের কৃষি ব্যবস্থার জন্য স্বর্নাশ ডেকে আনছে। শস্য-উৎপাদন নীতির পরিবর্তন ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিত্তীয় অঙ্গুলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর্থিক সঙ্কটের অঙ্কুরে কৃষিসেচ ব্যবস্থার সরকারী বিনিয়োগ ক্রমশ হ্রাস করা হচ্ছে। যে দেশে ০৫ কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে সেখানে গণবন্টনে খাদ্য শস্যের দাম বাড়ানোর সরকারী সিদ্ধান্ত দেশের ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যে বিঘ্নিত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যে কোন উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের দারিদ্র্যকে সরাসরি আঘাত করা। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে এ ব্যবস্থাকাল যতগুলি আর্থিক সংস্কার নীতি রূপায়িত হয়েছে সেগুলির আতিশয্যে দেশের মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও বহুদাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি ঘটেছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের দরিদ্রতম মানুষদের আর্থিক সঙ্গতি প্রদানের পাশাপাশি দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যপূরণকে স্থানিক্ত করতে সরকারী তরফে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও প্রশাসনিক দীর্ঘ-সূত্রতা এবং সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিচালনগত ত্রুটির দরুন তা কখনই দেশের বহুদাংশ মানুষের জীবন যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারেনি। সামাজিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে আর্থিক বিকাশকে যুক্ত না করতে পারলে এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো কখনই সম্ভব নয়। আমাদের মতো দেশে যেখানে ৬৫-৭০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেখানে কৃষির সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এমন সব শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল। ঐ পথে না গিয়ে দেশের শাসকদল তার শ্রেণী স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে পুঞ্জিবাদ বিকাশের রাস্তাকে সুপ্রশস্ত করতে ক্রমাগত বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে ভারতবর্ষকে আজ দেউলিয়া করেছে। ঋণের সুদ এবং কিস্তির টাকা শোধ দিতে নতুন করে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজনে বারে বারে দারিদ্র হতে হয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যে প্রক্টিয়া আজ দেশের সবস্তরে ধারণিত হচ্ছে তার ফলে বেকারত্ব বাড়ছে দ্রুত গতিতে, দারিদ্রসীমার নিচে কসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে অবিরত, অন্যান্যদিকে মুন্টিমের বিস্তারনের আর ও সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে অবিস্বাস্য গতিতে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারের মতো এবং সেখানে ৭২ শতাংশ টাকা সঞ্চিত রাখেন দেশের সাধারণ মানুষ। কিন্তু পদ্ধতিগত বিন্যাস এমনই যে এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার সমস্তরকম ব্যবহার মধ্য দিয়ে পারতপক্ষে উপকৃত হন দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি বা শিল্পপতি গোষ্ঠী। আবার সরকারী রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ঋণের ৯০ শতাংশ অর্থ ফেরৎ না পাওয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তগুলি চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। অথচ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ঐসব বৃহৎ পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে কোনোরকম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিসরভেদে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তগুলিকেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার অঙ্কহাতে বশ্ব করে দিতে চাইছে বা বিরাস্ট্রীকরণে উদ্যোগী হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শিথিলতা বজায় রাখতে এবং বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সেসব সামাজিক কল্যাণ প্রেরণ করা মোটেই সম্ভব নয় সেগুলি প্রেরণ করার লক্ষ্য নিয়েই ১৯৫০ সালে “জীবন বীমা” ও ১৯৭২ সালে “সাধারণ বীমা” জারী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ একই লক্ষ্য প্রেরণে দেশের ব্যাক্তাংশল জাতীয়করণও করা হয়। কিন্তু, বিজ্ঞোপ জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত অর্থনীতির বাস্তব রূপায়ণ সংঘটিত করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে তাতে ভারতবর্ষের মতো দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব নিয়ে অচিরেই সংশয় দেখা দেবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তগুলির বিরাস্ট্রীকরণের যে সুপারিশ ইতিমধ্যেই ডাক্তার কমিটি করেছে এবং বীমা-শিল্প বেসরকারীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠিয়েই বি. জে. পি. জোট সরকার সংসদে যে “বীমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন বিল (Insurance Regulation and Development Act-IRDA)” পেশ করেছে তা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে ভারতবর্ষে অচিরেই বিদেশী লব্ধী পুঁজির মূগুনা ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অথচ সাম্রাজ্যবাদী যে দেশগুলির চাপে পড়ে এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আর্থিক সংস্থাগুলিকে বর্তমান ভারত সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে উন্মুক্ত করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে, সেইসব দেশের সরকার কিন্তু তাদের দেশের কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করতে এখনও এইসব শিল্পে কড়া সংরক্ষণ নীতি বজায় রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জাপান—এইসব উন্নত দেশের বীমাক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধই বলা চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বীমা ব্যবসায় সীমালিড প্রিমিয়াম বাবদ যে আয় হয় তার ৯৫ শতাংশ আয় করে মার্কিন দেশীয় কোম্পানীগুলি এবং ৫ শতাংশ আয় করে ২১৬ / কবিতার কাগজ

অন্য বিদেশী কোম্পানীগুলি। মহারাজ্যে পুণে ন্যাশানাল ইন্সওরেন্স একাডেমি-তে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, গত ১২ বছরে মার্কিং যন্ত্রায়ণে ০৭২-টি বীমা কোম্পানী দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দা আজ উন্নত দেশগুলির বুকে ভীষণভাবে চেপে বসেছে। বড় বড় বেশ কিছু শিল্প বন্ধ হয়ে পড়ার মার্কিং যন্ত্রায়ণের বীমা কোম্পানীগুলির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এমতাবস্থায় মার্কিং সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন সংস্থাগুলিকে ওদের দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলির জন্য উদ্ভাবন করে বর্তমান ভারত সরকারকে অবরত চাপ দিচ্ছে।

বুজিয়া অর্থনীতিবিদদের যে মূল কথা, জমিদার শ্রেণীই হলো জমির আসল মালিক, পুঁজির মালিক হলো পুঁজিপতিশ্রেণী, আর শ্রমের মালিক হলো শ্রমিক ও কৃষক—আমাদের রাষ্ট্রপন্থি প্রথম থেকেই এই তথ্যকে অশ্বভাবে প্রয়োগ করে চলেছে আমাদের দেশের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে। দেশে শিল্প বৃদ্ধির হার ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। সর্বশেষ তথ্য দিয়েছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন (সি. এস. ও.)। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের মে মাসে দেশের শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫ শতাংশ এবং এপ্রিল, ২০০০ এ হার ছিল ১২.২ শতাংশ। মূলতঃ পণ্য উৎপাদনক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার কারনেই দেশে শিল্প বৃদ্ধির হার এত ব্যাপক হারে কমেছে।

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন সংস্থা সমূহের বার্ষিক সমীক্ষার সরকারী রিপোর্ট সংসদে পেশ করার রীতি থাকলেও বেসরকারী ক্ষেত্রে বার্ষিক অবস্থার কোনো রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয় না। নথি তথ্য ও পরিসংখ্যান কোথাও উল্লেখিত না হওয়ার বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনোরকম স্বচ্ছ ধারণা দেশের মানুষের থাকে না। রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন সংস্থা সমূহের ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরের বার্ষিক সমীক্ষার রিপোর্ট চলতি বছরে সংসদে পেশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে মূলধনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে প্রায় ৭৮ হাজার কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে সরকারের প্রদেয় ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এই সংস্থাসমূহে উল্লেখিত আর্থিক বছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন সংস্থার ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, বছরের শেষে দেখা গেছে তার ১৪.৫ শতাংশ অর্থ ফেরত এসেছে লভ্যাংশ হিসাবে, বার পরিমাণ প্রায় ৩৯ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সুদ বাবদ দেওয়া অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার ৩২ কোটি টাকা এবং কর বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। লাভ জনক সংস্থার সংখ্যা ১০৬টি এবং বি. আই. এফ. আর-এর কাছে নথিভুক্ত রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ৬৭টি, বার মধ্যে ৫৫টি সংস্থাকে কোনো না কোনো সময় রুগ্ন হয়ে পড়ার কারণে

কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করেছিল। বি. আই. এফ. আর-এর হিসাব অনুযায়ী, এই ৬৭টি রুদ্র রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার লোকসানের পরিমাণ ৫ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বি. আই. এফ. আর বেসরকারী খেতের ২ হাজার ২৯০টি সংস্থাকে রুদ্র হিসেবে ঘোষণা করেছে, যাদের মোট লোকসানের পরিমাণ ১০ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা। রুদ্র হয়ে পড়া ৬৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অধি-গৃহীত সংস্থার কর্মরত মানুষের সংখ্যা ৫ লক্ষ ১২ হাজার ২০২ জন এবং ২ হাজার ১৯০টি রুদ্র বেসরকারী সংস্থার এই সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০৪ জন। এহেন পরিসংখ্যান সত্ত্বেও, বিলম্বীকরণের প্রবণতারা চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে বিক্রী করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নেগোলিয়ার মধ্যে যেমন বেশ কিছু লাভজনক সংস্থা আছে, তেমন জাতীয় অর্থ-নীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এমন সংস্থাও রয়েছে। সংস্থাগুলির প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ বিশাল। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের নির্দেশে এই বিপুল সম্পদসহ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে কম দামে বহুজাতিকদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ দেশকে একটি নিশ্চিত পুঞ্জির অংশ থেকে বঞ্চিত করা। এর ফলে অচিরেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরো ঘনীভূত হবে। বৃদ্ধি পাবে বাণিজ্য ঘাটতি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা, পণ্য আমদানির হার! বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করবে এবং তার জন্য তাদের প্রস্তাব অনুসারে দেশের নিম্নপণ্যীদের সমপরিষ্ফুট করে তুলতে সমস্ত রক্ষণ আন্তর্জাতিক আইনের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এগিয়ে আসবে। ভরতুকি বিহীন মুক্ত বাজারের দমকা হাওয়ার যে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটবে তার ধাক্কা সামলানো আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এবং এর শিকার হবে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ। ভারতবর্ষের জমিতে তৈরী হবে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এক নতুন ধরনের ঔপনিবেশিকতা। □

বথরা

চিম্ময় দাল

এখানে এই জংশন স্টেশনটার ওভারব্রীজে যাত্রীদের ব্যস্ত আনাগোনা, সবসময় দেখেই আছে। কারও তাড়া ঘরে ফেরার। সদা গাড়ি থেকে নেমে এখন ঘরমুখো। কথার বলে, ঘরমুখো গরুর সাঙ ধরা দার। এদেরও সেই অবস্থা। কারও গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ভর। কোনও মতে গাড়িতে সঁথিরে বসতে পারলে নিশ্চিন্ত। তারপর গাড়ি যখন ছাড়়ে ছাড়়ক। তাছাড়া, যাত্রীর তো আর হাত নেই গাড়ি ছাড়ার ওপর। রেলগাড়ি বলে কথা!

তাই ওভার ব্রীজটার ওপর দিয়ে ব্যস্ত আনাগোনা যাত্রীদের! দূ'দ'ন্ড থেমে থাকা তো দূরের কথা, একটু ধীর পায়ে চলারও উপায় নেই কেন কারও। সবাই যেন ঢেঁকা দিতে চায় সময়কে:

তার মধ্যেও দূ'চারজন কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। ওভার ব্রীজের ওপরেই।

বেলস সময় কাটাতে আসে কেউ কেউ। তারা স্টেশনের ভেতরে ঢুকে যায়। নিরিবিলি দেখে প্রাটফর্মের বেঁধিতে বসে পড়ে। মাঝেমধ্যে জোড়ার জোড়ার প্রেমিক-প্রেমিকাকেও দেখা যায়। সে-ও প্রাটফর্মের বেঁধিতেই। রেল পুলিশ, ভবঘুরে, ডিঅরির, ফেরিওয়ালার সকলেরই ঠিকানা প্রাটফর্ম।

ওভারব্রীজে দাঁড়ায় সামান্য ক'জন যাত্রী। রেলের হালচাল, হাল হকিবুত যারা ওয়াকিবহাল। কোন গাড়ী কোন প্রাটফর্ম আসবে, তার ঘোষণা শুনে তবেই তারা তৎপর পায়ে নামে ওপর থেকে। ঘোষণাগুলোও হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। প্রাটফর্ম বদল করা তখন এক ঝকমারির ব্যাপার। তাই ওপরে, ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে থাকা।

এজন্যে যারা ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে, খুব একটা মন্দ সময় কাটে না তাদের। পূবে চোখ মেলে দেখা যায়, দূরগত দূ'জোড়া লাইন কীভাবে এগিয়ে এসেছে স্টেশনমুখো। স্টেশনে ঢুকেই শাখার প্রশাখার ভাগ হয়ে গেছে লাইনদুটো। শিরা উপশিরার মত ছড়িয়ে গেছে গোটা এলাকা। এরাই আবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে ছুট লাগিয়েছে। কেউ মাঝে কাঁসাই পেরিয়ে লালমাটির ওপর দিয়ে। কেউ মাঝে ইম্পাত নগরীর পথে। শাল মহুয়ার জঙ্গল ছুঁ'রে। আর একজন চলল দক্ষিণপানে। সমুদ্র টানছে তাকে।

লোনা হাওয়ার দম নিতে নিতে সে চলে যাবে একেবারে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ।

ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ির ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত । হঠাৎ নাচ দিয়ে ছুটে গেল একটা খালি ইঞ্জিন । কোনও একটা গাড়িতে হয়ত জুড়ে দেওয়া হবে এবার তাকে । অথবা কোনও গাড়িকে টেনে নিয়ে এল এইমাত্র । এখন একটু দম নিয়ে জিরোবার পালা । ছুটিতে চলেছে । কিংবা পার হয়ে গেল একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বা অতি দীর্ঘ একটা মালগাড়ি । যতদূর গাড়িটা পার হতে থাকবে, ততবড় লম্বা ওভারহীজটা কাপতে থাকবে খরখর করে । ছাউনির নাটকই আলগা থাকলে স্বনস্বন শব্দ উঠবে সেই কাপুনিতে । শব্দ উঠে আসবে নাচ থেকে । রেল লাইনের জোড় মূখগুনোর উপর জোড়া জোড়া ঢাকা এসে পড়লে, ঢিপঢাব শব্দ হতে থাকবে । অচিরেই সেই শব্দমানাকে ছন্দে গেঁথে দেবে কেউ যেন । নিয়ম মেনে উন্মিত হ'তে থাকবে, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ।

এই গাড়ি পার হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে ওভারহীজের মাদুলি-ওলাটা । কালো লুঙ্গি, ডোরাকাটা একটা টি শার্ট পরে সারাদিন তার তাবিজের গুনপনা বর্ণনা করছে । তাবিজের গায়েই যত্ন করে সাজানো হরেক রকমের পাথর । লাল, সাদা, কালো, নীল, সবুজ—হরেক রঙের । হরেক রকম নামও তাদের নীলা, পাল্লা, গোমেদ, প্রবাল, ক্যাটস আই ইত্যাদি ।

তাবিজ আর পাথরের সর্বরোগহর গুনপনা । সর্বসংকট মোচন ক্ষমতা । সারাদিন এক নাগাড়ে তারই ঘোষণা করে যায় মানুষটা । নীচের গাড়ি পেরোনোর শব্দ ছাপিয়ে যায় তাবিজঅলার গলা । সেজন্য এসময়টাই দু'দ'ড বিগ্রাম নেয় সে । যে-কথা মানুষ শোনে না তার উচ্চারণ নিরর্থক ।

একটা গোমেদ নেড়েচেড়ে দেখাছিল রামপুজেন । জানবার বড় আগ্রহ তার গলায়, তার চোখেমুখে । তাবিজঅলা সবিস্তারে বর্ণনা করছিল পাথরটার গুণ । আচম্বিতে একটা নারী কণ্ঠের আত'নাদ সমস্ত দৃশ্যপটটাকে যেন ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল ।

রামপুজেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কাদতে কাদতে ছুটে যাচ্ছে একটা স্ত্রীলোক । তার কোলে একটা বাচ্চা । পেছনে ওভারহীজের মেঝের ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে যাচ্ছে তার লম্বা আঁচল ।

মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে । ভ্রমনি দ্রুত পারে । তার আঁচলটাও নামছে সুন্দর নৃত্যের ভঙ্গিমায় ।

রাখ দেও, ভাইয়া ! বলে উঠে দাঁড়াল রামপঙ্কজ । মেয়েটার পথ ধরে চলে
এল চার নং প্রাটফর্ম ।

সেখানে তখন হাতিয়া প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে । গাড়ি ছাড়তে দেরী অধ
ব'টাটক । এরই মধ্যে বেশ প্যাসেঞ্জার জমেছে । হাওড়া লোক্যাল থেকে
নামা যাত্রীর আগভাগে এসে বসে পড়ে গাড়িটাতে ।

হাতিয়া প্যাসেঞ্জারের যাত্রী প্রাটফর্মের উটকো লোকজন মেয়েটাকে
ঘিরে ভিড়ে ভিড়াকার হয়ে যাচ্ছে । বারো দূরে দূরে ছিল, মেয়েটার চিল
চিংকারে এসে জুটছে তারাও । চুম্বকের টানে লোহার মত ।

রামপঙ্কজ এসে দাঁড়াল ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা মানববৃত্তার বাইরে ।
বুড়ো ব্যাঙুলে ভর করে বাড়ি উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল । বড় একটা সুবিধা
হোল না । মেয়েটা চিংকার করে কে'দেই চলেছে । আরে বাবুলোগ, মেরা
মুন্না কো ক্যা হোগা । মেরা বেটা মর যাতা হ্যার রে । ও মা-জী, হামার
বাচ্চাটাকে বাচান, মা-জী । হে ভগমান, মেরা লালকো ইলাজ কর
দো...

বুকে, কপালে করাঘাত করছে মেয়েটা অনবরত । আঁচলটা এখনও
প্রাটফর্মেরই পড়ে আছে মেলে রাখার মত । সেটা সম্বন্ধে ছেড়ে রেখে গড়ে
উঠেছে মানববৃত্ত ।

ঠেনেঠুলে ভীড়ের ভেতরে ঢুকে পড়ল রামপঙ্কজ । একেবারে সামনের
সারিতে পেঁছে, তবেই থামল সে ।

আরে, এ বিটিয়া, কা হুধারে তেরি ?

এতকন ভীড় করে দাঁড়ানো মানবজন কেবলই শূনে যাচ্ছিল মেয়েটার
কাহা । বা, রামপঙ্কজের মনে হোল, দেখে যাচ্ছিল । ফেননা, কান্নার বেগ
আর বুক চাপড়ানোর চোটে কাপড়ের অঁচল কখন কাঁধ থেকে পড়ে গেছে
সেদিকে খেয়ালই নাই মেয়েটার । রামপঙ্কজ দেখল, বলার কিছু নাই ।
দেখারই মত বটে । স্বাস্থ্য আছে মেয়েটার । জামা অনেক সংকীর্ণ । ওপর
দিক থেকে চানড়ার উজ্জ্বল রং চোখ টানে । বসার ভাঁজও কেমন স্নেহ
মেয়েটির !

প্রায়ই পান'বার, দেখলেই বোঝা যায় । নাকে একটা ফুলকাটা নাকছাবি
ইমি'শনের । বখ জেল্লা এনেছে মূখে । সব মিলিয়ে চোখ আঁকে
রাখার মত দৃশ্য । লোকজনকে মনে মনেও দোষ দিতে পারল না
রামপঙ্কজ ।

একটানা কে'দে যাচ্ছিল মেয়েটা । তার চঞ্চল চোখ দ্রুত ঘূর্ণীপ করে
যাচ্ছিল ভীড়ের লোকজনদের । একটার পর একটা মূখের ওপর দিলে সরে

সরে যাচ্ছিল দৃষ্টি। লোকজন যে বেণীটাই তার শরীর জরীপ করছে, বেশ বন্ধুতে পারছিল সে। সেদিকে তার মেন হুঁশ নেই।

এতক্ষণে কেউ একজন প্রশ্ন করল। জানতে চাইল তার বিপদের কাহিনী।

সামনে ঋপিরে পড়ে রামপুঞ্জনের পারে হাত দিল মেয়েটা। জামার ফাঁক গলে পুরো বুকটাই তার দৃশ্যমান হয়ে পড়ল, সে বিষয়েও সে উদাসীন।

হামার লালকে তুমরা বাঁচিয়ে দাও, বাবা।

কী হুঁশ তেরে লালকো?

বহুত বাঁমার হোল, বাবু। মেরে লাল মালুম হয় আউর বাঁচবে না। হার-হার ভগমান মেরে লালকো ক্যা হোগা?

বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদে আবার। ভাড়ের মধ্যে গুঞ্জন। হাজারো মন্তব্য।

বাঁমার তো বুকলাম। কী বাঁমার হুঁশ? ডাগদারকে পাশ দা। পেলাওফরমে কেন?

ততক্ষণে জামার ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে মেয়েটি। তখনো সে খোলা করে না, বুক শাড়ির আড়াল নেই।

রামপুঞ্জন কাগজটা হাতে নেয়। কাগজটার ময়লা পাতার ঘাম আর উত্তাপ জড়িয়ে আছে তখনও।

কাগজটার ভাঁজ খুলে, ভাড়ের একজন বাবুগোছের লোকের দিকে এগিয়ে দেয় রামপুঞ্জন। লোকেরা ঠেলাঠেলি করে দেখতে চেষ্টা করে।

হুঁশ, একটা প্রেসক্রিপশন এটা। মনে হচ্ছে টি.বি. হয়েছে ছেলেটার।

ভাড়ের মধ্যে আবার গুঞ্জন ওঠে। রামপুঞ্জন প্রশ্ন করে—তেরা বেটা কীহা?

ঘরমে পড় রহা, বাবু!

রামপুঞ্জন এক একটা প্রশ্ন করে। মেয়েটা উত্তর দেয়। জনতার জিজ্ঞাসা, কৌতুহল নিবৃত্ত হতে থাকে সেই প্রস্রাবের।

রামপুঞ্জন—তেরি লালকো টিবি হুঁশ।

মেয়েটি—হুঁশ, বাবু।

রামপুঞ্জন—হাসপাতালে হাস নি কেন?

মেয়েটি—গেলাম তো। এ্যাডমিট নিল না।

রামপুঞ্জন—কী বলল?

মেরেটি—বড়ি দিয়ে দিল।

রামপুঞ্জ—তোমার মরদ তোথার ?

মেরেটি প্রথমে আবার কে'দে উঠল। সেটা খামলে উষ্মা, জ্বাধ, হতাশা
থরে পড়তে লাগল তার গলা থেকে মরদের জন্যই তার আরো এই দুর্দশা।
কিছু কাম করে না। সারাদিন দারু গিলে পড়ে থাকে। লোকজনের কাছে
কান্নাকাটি করে, ডিথ মেগে যা নিয়ে যায়, বেশিটাই কাড়াকাড়ি ক'রে নিয়ে
ভাটিখানার চলে যায়।

রামপুঞ্জ—তব তোকে ডিথ দিয়ে কীফায়দা ?

মেরেটি—মরদ অব ঘরমে নাই, বাবু।

রামপুঞ্জ—কুথা গেল সে ?

মেরেটি—দারু খেলে রাস্তামে মারপিট করেছিল। পল্লুস গাড়ি থি'চে
লিয়ে গেছে। করাব সাত-আট রোজ তো ফাটকমে রাখবে।

রামপুঞ্জ—বড়ি খিলাস না তেরি বাচ্চাকো ? কায়সা হ্যার।

বিলাপের উৎস থেকে ঘেন খানিক সরে এসেছিল মেরেটি। এ-প্রশ্ন
আবার তাকে নিয়ে এল মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। আবার কে'দে উঠল সে। কান্না
খামিয়ে বলল—মুখে খুন নিকালতা হ্যার, বাবু। মেরা বাচ্চা আউর
বাঁচবে না। হার হার ডগমান...

রামপুঞ্জ—ডাগদার কী বলে ?

মেরেটি—ডাগদারসাব সাব বলে, শব্দু বটিমে ইলাজ হোবে না, মতিয়া।
ভিটামিন খিলাতে হোবে, টনিক খিলাতে হোবে। কাগজমে ডাগদারসাব নাম
ভি লিখ দিয়া ! হ্যার কি না ?

আগের সেই বাবুলোক, যিনি ভাঁজ করা প্রেসক্রিপশনটি পড়েছিলেন,
সার দিলেন। মতিয়া তখন আবার রামপুঞ্জের পায়ের দিকে হাত বাড়ায়।
তুমার পাও পড়তা হ্যার, বাবু। মেরে লালকো লিয়ে টনিক মিলা দে।

আরে রাম রাম। হামিভি তুমার মামিক গরীব আদমি আছে। হামারা
ইতনা রু'পিরা কাহা !

মতিয়া—সব বাবুলোগ দু'-পাঁচ রু'পিরা দিবে তো, টনিক একটো
হোরে যাবে বাবুলোগ। কিরপা কিজিরে আপনে। খুন বার হচ্ছে হামার
লেড্কার মনুসে।

আবার একটা গুঞ্জন ওঠে ভাঁড়ের ভেতর। রামপুঞ্জ সেই গুল্লোলকটির
দিকে ফিরে জানতে চায় কিতনা দাম হোবে বাবুসাব এ-টনিককা ?
প'চাশ ? শও ?

বলে, উস্তরের অপেক্ষা করে না। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ার নিজের।
ভাঁড়ের সামনেই হাত মেলে গুণে দেখার মোটামোট বারা রু'পিরা হোল। লে,

লে বিটিরা, সব তু লে লে। মেয়া ভি ঘরমে বালবাকো হ্যার। একটা শ্বাস ছাড়ে সে—লেকিন আজ কা কামখান্দা বতম। ঘর ওয়াপস চোলে যাব। প্যাকিট খালি কর দিয়া।

বলে হাত পেতে পেতে ভীড়ের ভেতর ঘুরতে থাকে। দ্যান, বাবুলোগ। এ জেনানাকো দ'-পাচ রুপিরা দোয়া করুন। বস্তটার ভেতরে ঢুকে পড়েছে সে। তার আবেদনে সবাই সাড়া দেয় না। আবার অনেকে হাত বাড়ায়। মতিয়া সেদিকে নিনি'মেবে চেয়ে থাকে। তার কাষা নীরব এখন। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে ছেলেটার। বাবুরা টাকা দিচ্ছে। টনিক নিরে ঘরে ফিরবে আজ। একটু একটু করে নিশ্চরই রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে ছেলেটার। তার চোখেমুখে একটা খুশীর আভা ফুটে ওঠে। রামপুজেনের পাতা দ'-হাতের ওপর চোখ আটকে থাকে তার।

গাড়ী ছাড়বার ঘোষণা হচ্ছে। লোকে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। হাতিরা ছাড়ছে। লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রামপুজেন ভীড়ের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে, আর তেমন একটা লোকজন নেই রুপিরা দেনেবালা। তখন মূর্তি বন্ধ করে মতিয়ার সামনে দাঁড়ায়।

মতিয়াও উঠে পড়েছে ততক্ষণে। বেশ উজ্জ্বল আলোর মত জ্বলছে তার মুখখানি। খানিক আগের দৃষ্টিভ্রান্তা উবেগ মূছে 'গেছে শ্বখ' তাই নয়, বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে এখন মেয়েটাকে। মাতৃ স্বর ঘেমন কোমল, তেমনই আশাবাদী।

মতিয়া হাত বাড়ায় রামপুজেনের দিকে। কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। আঁচল এসেছে তার শ্বস্থানে। যথেষ্ট আশ্রু টাকা শরীর। মাতৃশ্বের উবেগ মূছে যেতেই ফিরে এসেছে নারীর সঙ্কমবোধ।

বহোত, বহোত স্ফুরিয়া বাবুজী। দে দিজিয়ে মেয়েকো রুপিরা। বহোত মেহেরবানি আপকা।

রামপুজেন সাড়া দেয় না তার কথায়। হাতের টাকাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। তার মূখেও আনন্দবিভা। সে জবাব দেয়—নেহি, নেহি। তোর হাতে রুপিরা দিব তো, তুভি ফু'কে দিবি। তোর মরদকে নাযিক।

মেয়েটা বলে—হার্মি এয়াইসি জানবার না আছি। বাবু। ক্যা কথা রহে হো আপ।

নেহি বাবা, হামারা বিশোয়াস নেহি আছে তুদের ওপর। হামারে সাথে চল। নিধা কোইভি দাবাখানা যায়েগে। টনিক কিনে দিব তোকে। উসকে বাদ ঘর লোটনা। ইতনে বাবুলোক পইসা দিয়েছে। চল মেরে সাথে।

পাতলা ভাঁড়ের লোকজন সমর্থন করে। রামপুজেন আগে আগে বেরিয়ে আসে। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে পেছন পেছন আসে মতিয়া।

স্টেশনের বাইরে এসে পড়লে, দৃশ্যপট বদলে যায়। কেউ আর তাদের খেয়াল করে না। ট্যান্ডি স্ট্যান্ড, ফলের দোকান সারসার। পথের উল্টোদিকে খাওয়ার দোকান। মাছি ভগভগ করছে চারদিকে। রিক্সা, সাইকেল, পথচারিতে রাস্তা টাইটবুদর।

ভীড় কিছুটা কমে আসে। আরও কিছুটা সামনে এগোবার পর রামপুজেন দাঁড়িয়ে পড়ে। তোর কোঠি কিধার ?

কোঠিমে কা কাম ?

বাবুলোগকো আসু দিখালি, বুক দিখালি। তেরা লেড়কা দিখা হামকো ! খুন নিকালতে হুরে তেরা লালকো ! বাঁকা হাসি এখন রামপুজেনের মুখে

মতিয়ার গলার স্বরও এখন সুন্দর বদলাচ্ছে হামার এহি একহি লেড়কি হয়। লেড়কা উড়কা কুছ নেহি হয় হামারা।

ও নোটকি হাম তো পহলেহি মুম্বা লিয়া।

তব ? হিস্যা লে লে। ভাগ যা !

কোঠিমে থাকে গেঙ্গে।

আরে, চুটু, ধান্দাবাজি ছোড়। ভাগ যা আডি। আগে মাত বাড় আউর।

রামপুজেন দাঁড়িয়ে পড়ে। আর কথা বাড়ায় না। হাতের মুঠো খুলে প্রথমেই বার টাকা নিয়ে পকেটে পোরে তার নিজের আমানত। তারপর প্রশ্ন করে—হিস্যা ?

লে, আধাআধি লে যা।

গুনে গুনে দু' ভাগ করে হাতের টাকাকে। এক ভাগ দিয়ে দেয় মতিয়াকে নিজের হাতের মুঠোর খরা পুরোপুরি সাতাশ টাকা। বার টাকার আর। দিনটা মন্দ নয়।

চলে যাওয়ার আগে খুঁড়ে দাঁড়ায় রামপুজেন কাল সন্বেরে চলে আর বাস স্ট্যান্ডমে। হাম উবারই হোসে। সোচ লো। আয়েগি তো সন্বেরে আনা। কি'উ কি সন্বেরেমে দিল কুছ খুশ থাকে আদমিলোককা। □

কাঁকড়া

সসীম কুমার বাড়ে

মাতলা ফুঁসছে। আকাশের মেঘ আর মতলার চেহারা ছন্দ মিম্মার বৃকে ভর ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বাড়ি ফেরার কথা। সাহস হয় না। ছন্দ মিম্মা পাউকার মূখ ঘুরিয়ে দেয় নালার ভিতরে সে একাই বৈঠা ফেলেছে। ছপাত-ছপাত। দু'টি মাত্র প্রাণী। সে আর তার বউ মন্মেনা বিবি। অন্যসময় মাঝে মাঝে তার সাথে থাকে হাফিজুর লস্কর। একই পাড়ার বাড়ি। হাফিজুর একটু আধটু লেখাপড়া জানে। আর পাড়ার মাতশ্বরীও করত মাঝে মাঝে ডবন ফজলে মাস্টারের সাথে খুব ভাব। ফজলে মাস্টারের পিছন পিছন ঘর ঘুর করত। মধ্যে কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে গেছিল হাফিজুর লস্কর। ফিরে এসেছিল একেবারে বিধবস্ত অবস্থার। সেই থেকে ছেলেটা কেমন বোবা বনে গেল। খবর এসেছিল সাতজেলেতেও, সাজিদপুরে ডেড়ি দখলের লড়াইয়ে খুন হয়েছে নাতজন। মৃতদের মধ্যে মালিক পক্ষের কেউ ছিল না। যারা খুন হল তাদের গ্যারেই সে'টে গেল সমাজ বিরোধীরা তকমা, এবং কারো গণবোলাই পু'লিশও বুজেপেল না খুনিদের। পরপরই ফজলে মাস্টার পাটি'তে একটা উ'চু পদ পেয়েছিল। হাফিজুরকে রাজনীতির কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে—ওরাক খুঁ! গা গুলিয়ে ওঠে, অন্য কথা বল মাঝি। এবার হাফিজুর মিম্মা আসেনি। ক্যানিং গ্যাছে দাওয়ার তেতে। বড় খালার মেয়ের বিয়ে। নালার ভিতর অনেকটা বৃকে একটা খাড়ি। খাড়ির পাড়ের একদিকে এক ঝাড় হেঁতাল। আড়ালে লগি পু'তে পাউকাখানা বাঁধে ছন্দ মিম্মা অশ্বকারে ভুবে গেছে। কয়েক ঝাপটা হাওয়ার পর আকাশ আন্তে আন্তে ফসা হয়ে ওঠে। মারামারীর গরান গাছের মাথার ওঠে—পঙ্খীর চাঁদ।

মাঝি একটু খাইয়া লও দিকিনি-মন্মেনা হাড়ি থেকে জলভাত বের করতে করতে বলে—

—কি খামু?

ক্যান, দু'পুরের ভাত আর কাঁকড়ার খোল।

লঠনটা জ্বলছে দন্দু দন্দু বৃকে। লঠনের আলোর পাটাতনের উপরে খালা রেখে তারা খাওয়া সারে। খাওয়ার পর মন্মেনা গা ছেড়ে দেয় জ্বালিতে। সারাদিন কাঁকড়া ধরার যা খসল। চোখ বুজে আসে। মন্মেনা

পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছুরের বুম্বালে চলবে না। ভাসায় বাব, জলে কুমির। জেগে থাকতে হবে। কলকেতে আগুন দিয়ে হুঁকা টানতে থাকে। বৃষ্টি থাশি ভাব, কাকড়া পেয়েছে ভালই। মায়াম্বীপের জঙ্গল অতৃদ নিস্তম্ভ। রাত্রির স্তাস্তি আসে। হঠাৎ বন কে'পে ওঠে—হালুম, হালুম কোলাক কোলাক, একঝাক পাখির পলায়ন! মূসেসার ঘুম ভেঙ্গে যায়। জাপটে ধরে ছরুকে। ছরুর বুক উত্তাপ বাড়ে। মনে পড়ে যায় দুপূরের কথা—

—দ্যাখো মি'রা এই গতে' এ্যাকজোড়া কাকড়া আছে কুড়ি কানার নামিয়ে ছরু মাথা নিচু করে দেখে—কি করে বুঝলি?

তুমি মি'রা অ্যাখনও আগের মতনই আছ। অ্যাতদিন কাকড়া ধরল। দ্যাখো, এই পারের ছাপটা মন্দা কাকড়ার। বুক চাপা হালকা ছাপ মাইরা কাকড়ার। আর গর্তটা দ্যাখো জোড়াটা খুঁড়ি বড় হবে। মূসেসা শিকের বশির মদুখটা গতে' ঢোকায়! শিকটা প্রায় পুরোপুরি ঠিকিয়ে গতে'র গায়ে চাড় দিয়ে সুরু করে টেনে আনে এক জোড়া কাকড়া। ছরু মিরার চোখ চক্চক্ করে ওঠে। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। পা দু'টো এক হাটু কানার জবজবে গেড়ে আছে যেন।

আরে মুনু তুই তো কিল্লামাত করাইয়া দিলি। হংকং বাবুরা এক একটার দাম দিবে কুড়ি প'চিৎ টাকা। রাক, রাক, কুড়িটার রাক।

মূসেসা কথা বলে না। কাকড়া জোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মন্দা কাকড়াটা অন্যটাকে বুক বুক রেখে দাঁড় দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে। ছাড়ার কোনো তাগিদ নেই।

কি হল। রাক।

না। ছাইরা দিব।

কস কি?

দ্যাখছ না, এদের অ্যাখন দেয়াদের সময়। এই সময় এ্যাদের ধরলে ঈকনিবিবি গোসা করবে যে, আর কত কত গুঁড়া কাকড়া হবে জানো। এরা মরলে আমাগো প্যাট বাঁচবে না। ছরু কথা বাড়ায় না। মূসেসা কাকড়া ধরা, কাকড়ার জীবন সম্বন্ধে অনেক বেগী বোঝে। তার মনেও কেমন একটা দুর্বলতা জন্মায়। মূসেসা নিজের খেল্লালে কোমরে জড়ানো ভাম্বার তারটা খুলে নেয়। ফকিরের দেওয়া। এদের কোনো ছেলমেয়ে নেই। তারপরার গুনে নাকি মূসেসা মা হতে পারবে। ঘরময় ঘুরঘুর করবে একটা ছোট্ট ছেলে। মূসেসা ভাম্বার তার থেকে দু'টুকুরা ভাঙে। বাঁশের চিমটা দিয়ে চেপে ধরে এক একটা, কাকড়ার বড় দাঁড়ে তার পে'চিয়ে দেয়। ছরু মি'রার মনে পড়ে যায় সাদির সময় বহু কষ্টে দু'আনার সোনার আংটি

দিরেছিল মূষেসাকে। সোনা বলতে ঐটুকুই। সব ঘেরের সোনার উপর একটা অশ্ব আদম দূর্বলতা থাকে, আর মূষেসার কাছে আংটিটা ছিল বড় সোহাগের। সে বার বানের জলে ভেসে গেল তাদের সব কিছু, আর পেটের দায়ে মূষেসার আংটিটা। হাসি মুখে নিজেই দিগেছিল। কিন্তু ছরু ভিতরের কান্নাটা দেখতে পার। দ্যাখো মিন্না কাকড়া জোড়ারে আংটি পরিয়ে দিলাম। চল মাতলার পানিতে ছাইরা দেই। ছরু কথা বাড়ায় না।

ছরু মূষেসাকে আরো বৃকের কাছে টেনে নেয়। না মিন্না ছাইরা দেও। বেগুনা হ'বে। নৌকার উপর একজ করলে বনদেবী আমাগো অমঙ্গল করবে। ছাড়া, দেবী কিন্তু সব দ্যাখছে। কিন্তু ছরু মিন্নার বৃকে তখন জোড়া কাকড়ার আগুন। নৌকা দুলে ওঠে। আর নেচে ওঠে খাড়ির জলভরঙ্গ।

দুই □

ছরু তুই হারামের কাজ ছেড়ে দে। আমরা হ'লাম আল্লার বান্দা। আমাদের কাকড়া খাওয়া নিষিদ্ধ। কিতাব তো পড়িসনি, জানবি কি করে। আচ্ছা ছরু তোরা অন্য কাজ তো করতে পারিস। সামান্য ক'টা টাকা পরসার জন্য শরতানের বান্দা হ'বি—ছরুদের মাটির দাওয়ার বসে তুখন আলি তাকে বোঝাচ্ছিল। স্থানীয় মসজিদের মাতোরালা উত্তর থেকে এসেছে। তার কথায় ছরুর মনে স্ত্র জন্মায়।

গোলপাতার ছাউনী দেওয়া ঘর ছরু মূষেসার। বাশের চাটাইশের বেড়া, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছগন আলির কথাগুলো শুনছিল মূষেসা, ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস করে বাচব ক্যামনে। কাকড়া ধরার আগে নস্দু সেখদের জমিতে খেত মজুরী ষাটতাম। ষাট বাচেন। সামান্য জমিটুকু প্রথমে পরন বন্ধক, পরে পুরোপুরি কবলা, নস্দু সেখরা গ্রামের আরো অনেকের জমি কিনে মাছের ভেড়ি বানাইছে। বি. এস. আরও বাবু আসেন মাঝে মাঝে ভেড়ি দেখতে। তাদের খুঁউব খাড়ির, ধান জমিতে হল আর দাদন এখন সমান সমান। চিংড়া বিদেশে যায়। ছরুর তখনও এখানে ছিলেন। কিছুই কন নাই। আর কবেনই বা কি কইরা, নস্দু সেখদের বাড়িতে আপনারেও ভো খাড়ির কম নাই কিন্তু কিছু বলতে সাহস পারনা। ছগন আলি চোখের সামনে তো কম সংসার ভাঙেনি। তার চলা ফেরা বড় রহস্যময়।

—চলিবে ছরু। আল্লার বান্দা হয়ে আল্লার দূসমান করিস না, বেপদ হবে। সেরফানখান গলার এক প'য়াচ দিগে চলে যায় ছগন আলি।

বৈশাখে ত্রৈশ জাঁকজমক করে বর্নাবিবর পূজা হয়। গ্রামের পশ্চিমদিকে মাউলার পাড়ে বর্নাবিবর বাধান। হোগলা পাতার ছাওয়া দোচালা মন্দির। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই বর্নাবিবর পূজা দেয়। হিন্দুরা দেয় ফলমূল আর মুসলমানেরা নিম্ন। ঝনের দেবী বর্নাবিব। মাউলি এবং জেলেজোতাদের কাছে বড় জাগ্রত দেবী! বাঘের থাথা থেকে রেঁচে আসা নাড়ু ঢালিতে নাকি সাপাং বর্নাবিবই বাঁচিয়েছে, সে এক কাহিনী! দলের থেকে নাড়ুকে টেনে নিয়ে গেল দণ্ডিনেরাই। বাকিরা প্রাণ নিয়ে পালাতে বাস্তু। হঠাৎ সারা বন আলোর আলোয়, তাঁর আলোর চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম, বাঘ বেচারিরও একই অবস্থা আর কি। কিছুক্ষণ পর আলো মিলিয়ে গেল, বাঘ নেই। নাড়ু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মানুষের জীবনের বড় মামা। বর্নাবিবর পূজার ধুম-ধামও বাড়ে। পূজো উপলক্ষে সাতজেলে আর আশেপাশের গ্রামের প্রচুর মানুষ জড়ো হয় বাথানে। পাঁচ সরদার ও ভল্লারের একাধারে মহাজন আর নৌকোর মালিক। ডিঙ্গি আর পাউকা মিলিয়ে নাও আছে খান বিশেক। নেও এসেছে।

ছরু মূসেসা আর হাফিজুর লস্করকে নিয়ে এবারও তিনজন্যর দল। যদিও ছরু তাদের বড় মাঝি, কিন্তু মূসেসাই ওদের চালায়। ছগন আলির মোটেই সেটা পছন্দ নয়, সাতজেলে থেকে অনেকগুলো দল খার চামটা বা মায়াধাপে কীকড়া ধরতে। অন্যদের সাধারণত সাত আট জন্যর দল। পাঁচ সরদার পূজোর মধ্যেই মহাজন কারবার সেরে নিচ্ছিল।

অ ছরু কীকড়া ধরতে বাঁধিনি?

হ্যাঁ, ঠো। এবার একখান ডিঙ্গি দিও দির্কিনি।

ডিঙ্গি লিবি, দাদন লিবিনি?

ছরু মূসেসার দিকে তাকায়। পাঁচুর অভিজ্ঞ চোখ এড়ায় না তাদের চোখের চাহনি। ছরুরা আজকাল আর অনেক সময় তার কাছ থেকে দাদন নেয় না। কীকড়া শিকারি গ্রামে হংকং, জাপানী বাবুদের আনাগোনা। তারাই দাদন দেয়। দু'দের হার অনেক কম, এবং দাদনের পরিমাণও অনেকটা। শত একটাই—মাথার কীকড়া চাই, পেনে চড়ে হংকং জাপান, মালয়েশিয়া পাড়ি দিচ্ছে কীকড়া। ভল্লারের ছোঁয়া লেগেছে কীকড়া শিকারীদের জীবনেও। এখন সমুদ্রে কীকড়া ধরার অনেক নতুন হাত। হংকংবাবুরা বড় কীকড়া বেছে নেওয়ার পর ঝড়তি পড়তি কীকড়া খায় ক্যানিং আড়তে। তাও দালাল, ফড়িয়া আড়ৎদার, হয়ে খেদের, পাঁচুদের একটা চাপা রাগ আছে হংকং বাবুদের উপর, কে সহ্য করতে পারে ব্যবসার সতীনদের?

—ডিঙ্গি লিবি ঠিক আছে। ডিঙ্গির ভাড়া পড়বে দু'শো টাকা আগাম পাটল।

অন্যদের বড় মাঝি বতীন গলুই, তাদের কথা শুনছিল; তাদের ও ডাড়া ডিজি দরকার। তার কানে টাকার পরিমানটা খাঙ্কা খায়—কও কি খুড়ো? আগের শোনে ডিজি ডাড়া তো নিলা দেড়শো টাকা করে?

হ ঠিকই কইছিল! আমাগো কথাও একটু ভাবইও কচি। শালের দাম কামন আকাশ ছোঁয়া। প্যাট তো আমাগোও আছে না কি? ডিজি লাগলে নিবি, না লাগলে নিবি ক্যানে। তোমাগো আইজকাল অনেক মাথা আছে।

দোন ফেলে ছরু মাঝি গলুই-র উপর বসে আছে। দূরে দূরে বেশ করে কটা ডিজি মারাত্মক ঘিরে রেখেছে। সাতজোলে থেকে আসা জেলেরাই বেশী। আমাবস্যার কটালে কাকড়া পড়ে বেশী। জোরারে জলে গভীর কাকড়া বোরোর খাবারের খোঁজে। পেটই আসল কথা, কাকড়ার জীবনেও ব্যতিক্রম নেই, শূদ্র খাবারের জন্য কাকড়া কাকড়াদের খুন করে না, যা মানুষ করে বাচার সম্বন্ধের লড়াইতো প্রাচীন ব্যাধি। এক একটা মনান্তর নাকি খাদ্য বাটতি থেকে নয়, উষ্ম থেকে। কাকড়ারা অন্ত সব বোঝে না, খাবারের গন্ধ পেলেই সুড় সুড় করে গভীর থেকে বেরিয়ে আসে। লম্বা নাইলন দড়ি থেকে এক দেড় হাত অন্তর ঝুলে থাকে টোপ। ফাসে আটা শটকি মাছের টুকরো। কাকড়ার প্রিয় খাদ্য মরণ ফাদ, মাঝে মাঝে জাঁবি। বাঁশের সাথে দড়ির একটা দিক বাঁধা, অন্যদিকে ডিজি। এক দেড় ঘণ্টা পর পর দোল তোলে ছরুরা। ডিজির দিকে দড়ি আস্তে আস্তে তোলে। লোডী কাকড়াগুলি দাঁড় দিয়ে শক্ত করে কামড়ে থাকে টোপের দড়ি। টোপের ভার থেকে জেলেরা হাতে টের পায় কোনটার কাকড়া আছে আর কোনটার নেই ডিজির কাছে আসতে ছাঁকনি। জাল দিয়ে ছেকে তুললেই হয়। বেশ করে কবার সোন তুলেছে ছরু মিস্রা। কাকড়া পড়ছে না একদম, গলুই-এ ছরু মাঝি গুম মেরে বসে আছে, হাফিজুর খাল থেকে জল সেচতে সেচতে বলে—মাঝি গোসা করছ ক্যানে?

ছরুর কোনো ভাবান্তর হয় না। টুপটাপ বসে থাকে। ডিজির গায়ে জল ডাঙা ঢেউ। ছলাং ছলাং। সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া হল প্রায় নিশেষে। মৃষেসার বুকে শব্দ বাড়ে। বাড়ি থেকে আসার আগে ছগন আলি এসেছিল। দূরে জেকে নিয়ে কি সব ফিসফিস করে বলছিল ছরুকে। ছগন আলিকে দেখলে মৃষেসার বড় ভয় হয়। লোকটার চোখ দাঁটো কেমন সরস্প-শীতল।

আলো আধারে মারাত্মক বড় রহস্যময়। আধার ভেঙে হঠাৎ শোরগোল ওঠে। হাফিজুর...হাঁক দেয়—পালান মাঝি, কি হইছে?

—নার বাঘ পড়েছে ! বাব !

—কার নার ?

—নতু খুড়ার নার । গনারে নিরা গেছে ।

পাপে দ্যাশটা ভরে গেছে । দাঁকনরাই কাউরে ছাড়বে না—হরু নি'রা বিড়
বিড় করে কি সব বলে ।

দাওয়ার ভাত দিতে দিতে মূসেসা হরুর দিকে তাকায়—মাঝি । তুমি রাগ
করছ ক্যান ।

—তুই বুঝিস না । হাফিজা হারামিটার সাথে তোর অত পিরিত
ক্যান ।

—মাঝি কও কি ? আল্লার কছম, ইসব কথা মাথায় এনো না ।

—মুই কই ? সম্বাই কর । তলে তলে রস খাও, ভাবো জুট
বুঝি না ।

ছগন হুজুর তোমো পিরিতের কথা সব কইছে ।

—তুমি ছগন আলির কথা বিশ্বাস কর ?

—কি কইলি মাগি, ছগন হুজুর মিথ্যাবাদী । তুই সতি, না । তোরে
তালাক দিলাম ।

—মাঝি ইসব মিথ্যা, সব মিথ্যা মূসেসা জুকে কে'দে ওঠে ।

হ তোরে তালাক দিলাম । তালাক-তালাক-তালাক । তিন তালাক
দিলাম । বাড়ি খাইক্যা বেরিয়ে যা । তালাক শব্দটা চারদিকে ধ্বনিত
হতে থাকে । মূসেসা বিবির কানের তি'র থেকে গভীর ভিতরে । হরুমি'রার
মনের গভীরে...

তিন □

ও মাঝি চূপচাপ বসে আছ ক্যানে—?

পা দু'টো ছাড়িয়ে মাথা নিচু করে বসেছিল হরুমি'রা । পাশেই শিক আর
ঝড়ি । দু'একটা ছোট কাকড়া । মাথা তোলে—অ তুই ! বুকের মধ্যে
বিদ্যুৎ খেলে যায় । সামনে দাঁড়িয়ে মূসেসা । পরনে সবুজ ডোরাকাটা
শাড়ি । নিজেকে সামলে নেয়—এয়ার্মিনই বইসা আছি ।

—আরে তোমার হইছে কি ? পাক্সের পাতা যে রক্তে ভাইসা
গ্যাছে ।

—না আমন কিছু হয় নাই । গজলার চিরে গ্যাছে ।

—দাঁড়াও মাঝি, কনস্টুলির পাতার রস দিরা দেই । সেরে বাবে ।

—না, না, তুই ক্যানে দিবি ।

—ক্যানে মাঝি, মোর উপর তোমার রাগ এখনও পড়ে নাই—ছরুর বৃকের মধ্যে মোচড় দেয়। বৃকের ষষ্ঠনাটা বাড়ে। মুনেন্সার সাথে কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। রাগ ভাঙতেই মনে হরেছিল মুনেন্সা ছাড়া তার আর কে আছে। কিন্তু ততক্ষণে খা হবার হরে গেছে! ছগন মাতোরালাঁর রায়—তালাক শারিরত অনুসারে হালাল। মুনেন্সা তখন তিনমাসের পোয়াতি। পেটে মায়াধাপের সন্তান। কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে উঠেছিল। তারাই হাফিজুরকে অনেক বৃক্সিয়ে মুনেন্সার সাথে বিয়ে দিয়েছে। হাফিজুরও কি কম চেঁচা করেছে—ছগন আলির মত পাণ্টানোর জন্য ছগন আলির এক কথা—তোরা কি চান আমি খোদার আইনের বিরোধিতা করি? তালাকের পর ছরুর এই প্রথম কাকড়া ধরতে আসা। অভাবী শরীরও আর টানে না। বনসুন্দির পাতা হাতে ঘষে মুনেন্সা ছরু মি'রার কাটা জায়গাটার চেপ ধরে—

—আখন আর কাকড়া ধরতে আসো না ক্যান মাঝি?

—কি করমু কাকড়া ধরে? কোনরকম বাচলেই তো হইল।

—না মাঝি তোমার শরীরটা একদম পড়ইয়া গ্যাছে। একটা সাদি কর। ভাল দেখে একটা মাইয়া আইনবা, দ্যাখাশুনা করতে পারবে। ছগ্নু অসহায় দৃষ্টিতে মুনেন্সার দিকে তাকায়।

মাঝি পোলাটারে দেখতে গ্যালা না তো একদিনও। ছোট মাঝি তো কর, ও তোমার পোলা। ছরুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

—তা মাঝি কার সাথে আইছ?

—সতু মাঝির নাম।

—কাকড়া তো ধরতে পার নাই একটাও! দাঁড়াও তোমারে কয়টা কাকড়া দেই। মুনেন্সা ব'ংশের চিমটা দিয়ে কাকড়া তুলতে গেল জাল থেকে। না খাউক। তুই ক্যানে আখার দিবি।

মোর কাকড়া নিবা না মাঝি? আচ্ছা চলো এক সাথে কাকড়া ধরি।

গত থেকে মুনেন্সা এক একটা কাকড়া ধরে। ছরু মাঝি ঝুড়ি এগিয়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে একটা গরান গাছের গোড়ার আসে। ঢালুতে বড়সড় একটা গত। মুনেন্সা শিক ঢুকিয়ে দিয়েই টেনে তোলে মস্ত বড় একটা কাকড়া। জানো মাঝি গত? আরো একটা কাকড়া আছে। ছরু মি'রার কানে সে কথা যায় না। চোখের সামনে কাকড়াটা দাঁড়া উঁচু করে রয়েছে। দাঁড়ার গোড়ার দিকে তামার তার বাঁধা। একটু একটু শ্যাওলা ধরেছে।

ন্যাথো মাঝি এই কাকড়াটার দাঁড়ায় তামার আংটি পরানো, মুনেনসা
কাকড়াটাকে এনে আগেরটার পাশে রাখে। দু'জনার চোখ স্থির হয়ে যায়।
চেনা গরান গাছের নীচে কাকড়ার ঘর, তারা কাকড়াদাঁটোকে ছেড়েছিল
মাতলার জলে। খেলাচ্ছিল ছরু মশ্বাটাকে ছেড়ে দিল অনেক দূরে।
হরু পাগলের মতো মুনেনসার হাত জড়িয়ে ধরে। মারাত্মকের নিস্তথতা
ভাঙে তার জড়ানো স্বরে... মনুবিবি মোর ঘরে ফিরিয়া আর...

তুমি ক্যান মোরে তালুক দিলা মাঝি—মুনেনসার বুক ভেঙে যার
উথলে গুঠা কান্নার। ছল্যৎ জল ভাঙছে মাতলার পাড়ে। □

কবিতার কাগজ—চার

আপনার আন্তরিক

সহযোগিতা ও সহমর্মিতা...

ডাল লেখা ছাপতে

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ !

ফুলঝুরির বর

ব্যোমকেশ জ্ঞান

চাক্‌ডিহীতে ঠেঠ সংক্রান্তির চড়কের মেলা বসে প্রতি বছর। পরের দিন চলে যাত্রাগান। চাক্‌ডিহী, ডিহিপাড়া, আসানসই, বাঘাপুড়ের এমনি আরো পাঁচ দশ গ্রামের উপজাতি বাসিন্দাদের মেলা। তখন ঠেঠ দিনের দখিন হাওয়ার পাতা করা গাছের শাখার শাখার লাগে নতুন পাতার হিম্মোল। কোকিল ডাকে। মহুরা ফোটে। কুচ্‌চুড়া, পলাশ গাছ ভরে যায় রঙীন রঙীন ফুলে। গরুর গাড়ী চলা মেঠো রাস্তার ওড়ে ধূলো। সন্ধ্যার সন্ধ্যায় বাদ্যের সুরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা রাখালের গান ভাসে বাতাসে—

ও কণ্যা ও.....

খুলাখাল, খুলা ডাক

খুলায় গড় ঘর।

তোমার নিরা বাম্‌ আমি

কোলকাতা শহর।

নাচ ঘরের মেয়ে ফুলঝুরি ভাবে—এমনি করে নটবর যদি একদিন দূর হতে বহুদূরে তাকে নিয়ে গিয়ে সংসার গড়তো। দু'জনের একটা ছোট্ট ঘর—তা' ভালপাতা বা খড়ের যাই হোক না কেন। ভাবতে ভাবতে উদাস হ'য়ে যায় ফুলঝুরি। সাঁওতাল পল্লীতে মাদল বাজে। পরবের মেলা বসে এ সময় মকরমের সুবিশাল দিঘীর পাড়ে। চাঁদনী রাতে ঠেঠি হাওয়ার দিঘীর নির্মল চম্পল জলতরঙ্গে চাঁদ হাসে। নরানবো, সান্তাবো, কিরণবোর সাথে ফুলঝুরি আসে মেলায়। হেঁড়ায় নেশার মত্ত হর আদিবাসী যুবক, যুবতীরা। পাশাপাশি পাঁচ-সাত গ্রাম থেকে আসে আদিবাসী পুরুষ-নারী, ভেলে-মেয়ে। মাদলের তালে তালে যুবক, যুবতীরা দল বেঁধে নাচে। সাঁওতাল যুবক পছন্দ করে সাঁওতাল যুবতীকে। আর পছন্দের মানুষ হ'লে তার সাথে চলে গিয়ে ঘর বাঁধে। তেমন অভাবীদের সামাজিক বিয়েটা পৰ্ব্ব হ'লে না। সদ'ারদের কাছে কোন কথা টিকে না তখন। মকরমের এই মেলা থেকে চলে গেছে সুরমী, বৃন্দা, মংলী। তারপর পছন্দের মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। বৃন্দা, মংলীর নাচ দেখেছে ফুলঝুরি। সুরমার কথা শুনছে। নিজের মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রতিবছর মেলায়। পাশাপাশি কসবাস—রাজবংশী, গলিরা উপজাতি আর সাঁওতাল,

কোল আদিবাসী। তবু সামাজিক বর্ণিতনীতিতে কত হেরফের। তাই আদিবাসী সমাজের সাধারণ ঘটনা, উপজাতি সমাজে হয় অঘটন। আর এমন অঘটন নাড়া তোলে সংসারে সমাজে। সেবার উপজাতি সমাজে আবার একটা সাড়া তুললো চাক্‌ডিহীর ফুলঝুরি

২ □

হেমন্তের অপরাহ্ন। নরান রাজবংশীর উঠানে ফিকে হলুদ রঙ্গের হোদ পড়েছে গড়িয়ে ঝাওয়া বেলার। বেলা তাড়াতাড়ি বেতে শুরু করেছে সবে। উঠানের একপাশে বাঁশের কণ্ঠি টালির চালে ঠেকানো। কণ্ঠিতে ভর দিয়ে উঠে গেছে লাউ আর চালকুমড়োর গাছ। উঠানের পাশে পেঁপে গাছের সারি। তার দ্বারা পড়েছে উঠানে। নরানবো আগামী দিনের হাটের জন্য আনাজপত্র পরিষ্কার করে গোছগাছ করার জন্য বসেছে। ছেলে পলতাকে নিয়ে নরান গেছে ন' দিঘীর হাটে। সূর্য অস্তে ফিরবে। দু' তিন ঝুড়ি আনাজপত্র উঠানে ফেলে আবার ঝুড়ি ভরতে গেছে ছোট মেয়ে কুমা। এমন সময় পাশের বাড়ীর সান্তাবো এল। আনাজ গোছগাছ করতে সেও বসলো। ভরি-ভরকারীর জন্য আনাজপত্রের অভাব হ'লে নিয়ে যার শাকটো, সিমটো। কিছু পরে সান্তাবো পাড়লো কথটা—'দিদি, ফুলঝুরি যা করে গ্যাল তো গ্যালই। বাপ ভাইর ঘর ছাড়ন হ'ল চিরদিনের জন্য। তবু যা শুনাম' পাচ্ছি—'ম্যারাটার সুখ নেই কপালে। বরটার জেল হ'য়ে গ্যাল। ছাড়ন হবেক নাই।' কথটা অনেক আগেই কানে এসেছে নরানবোর। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বলতে শুনছে কুমা। নরান বো কাকে জিজ্ঞেস করবে? ছি-ছি করছে সবাই আড়ালে-আবডালে। প্রকাশ্যে ও আর কিনা বলতে বাকী আছে?' কেলেকারী করে গেল ফুলঝুরি! নরান রাজবংশীকে অর্থদণ্ডের সঙ্গে দিতে হ'য়েছিল গাছপুজার দিনে তালরসের তাড়ি। তাতেও চাপা থাকেনি কথা। শ্রীদাম মালার আলকাপ গানে ফুলঝুরির প্রসঙ্গ ভিন্‌গ্রামে একটা দৃশ্য সংযোজিত হ'রে তাদের গানের কদর বাড়িয়েছে। এ কথা দু' দশ গায়ের কে না জানে? নরানবোর কথার কুমার কথার সত্যতা বুঝতে পারে নরানবো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—'মাতাদলের থাকন খাওনের ব্যবস্থা করছিল মোড়ল মহাজনরা। মেলার পাশে বাড়ী। না করে ক্যামনে। ছৌড়ার মনে যে পাপ আছে, তা তো জানান' নাই। জনম দিরা আর ভাগ্য কারো লিখন দ্যাই নাই।'

—তাতো ঠিকই। কি ছিল না ম্যারার? কমা কিসে—রূপে না গুনে। আসল কথা কপালটাই কামান নাই।' সান্তাবো এরপর তোলে লখিরার কথা।

—একটা বিহার পর কি এমন মন্দ ঘরে পড়েছে লখিয়া? দু'তিন ছ্যানা

মায়ার মা । দিব্য কাটাচ্ছে সতীর ছালামায়াকে নিয়া । কিন্তু কি বুঝান দিল ছোড়াটা । কেউ টের পেল না ঘর ছাড়ান দিয়া জ্যা গ্যাল ।’ বলে যায় সান্তা বৌ,—তবু রুখ পেল না মায়্যাটা । ভাগ্যের লিখন নাই ।’

—‘মায়ার মা হওনের যত জ্বালা ! কত আর সহ্য যায় ।’ অন্তরের ব্যথা জানান নরানবৌ ।

—তা বটে, আর কি লিখন আছে কে জানে ? আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায় তার গৃহকাজে । নরানবৌ কহু গোছগাছ করে রামার জোগাড়পত্র করতে থাকে । সকাল সকাল রাম্রাপত্র সারতে হয় ।

হাট থেকে ফিরে আসে নরান । ন’ দিঘার হাটে ভাঙ্গাপাড়ার লোকের মূখে সেও খবরটা শুনেন এসেছে । রটনা যে মিথ্যা নয় বোঝা যায় ক’দিন পরে এক সন্ধ্যা রাতে । ডিহীপাড়া থেকে যেঠো সদর বড় রাস্তা থেকে যে গলিপথটা নরান রাজবংশীর এ’দোপকুরের পাড় দিয়ে সিধু মহাজনের বাশ ঝাড়, হারাণ মন্ডলের কামাদ বাড়ী ছাড়িয়ে চলে গেছে চাক্‌ডিহীর শেষপ্রান্তে, সেই সদর রাস্তার সাঁঝের আভা শেষ করে ফিরছিল বিগার, রাজবংশী । নরান রাজবংশীর এ’দোপকুরের গলি পথটার যেতে যেতে দেখে এ’দোপকুরের পাণে বাঁশঝাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৌ । চলেও যেতো হয়তো বা । কিন্তু থেকে থেকে কামার কণ শব্দ কানে আসে তার । অশ্বকারে ঠিক চিনতে পারে না । তখন নরানের বাড়ী যায় । দেখে নরান, নরানবৌ খাওয়া-দাওয়া সেরে আগামী দিনের হাটের ঝড়ী সাজাচ্ছে—পে’পে, ঝিঙ্গে, বেগুন, কুমড়া । গ্রামের বসুংবাদ কার কানেই না গেছে ? বরং তিল হ’লে তাল হ’য়ে রটে । এবার পুরোটা আন্দাজ করতে পারে বিগার । তাই কি ? নরানের পাশের বাড়ী সান্তার । ক’ঠ ছাড়িয়েই বলে—‘সান্তার বৌ কাদে ক্যানে এ’দোপকুরের বাঁশ ঝাড়ে ? দ্যাখ গিন্না নরান—’ হাট থেকে শুনেন আসার পর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে নরান । গলার ঝাঁজ ছাড়িয়েই বলে—কাদন এমনতেই আসে ? গরজ যখন তোর—দ্যাখনা তুই । আভা জমাতে পারাবি ব্যাস ।’

বিগারের চরিত্রের স্বরূপ স্পষ্ট করে দেওয়া সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার প্রতি-বন্ধকতার কারণ বুঝতে পেরে হাঁটা দেয় সে । এক ঘর পর কিরণকে ডেকে মনের ঝাল জুড়ায় খানিকটা, বলে—‘চার্‌ডিহীকে কে কবে ভুলেছে কিরণ । ফুলঝুরির এখনো ফুল ঝরানো শেষ হয়নি । আবার ফুল ঝরানো বলে ? এ’দোপকুরের পাড়ে খুব কাদন ছড়ার । বাপেরও খুব ঝাঁজ ।’ কিরণের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে আবার হাঁটা দেয় সে । এত তরতাজা টাটকা খবর তার কে জানে ? সিধু মহাজনের বাড়ী আরও ঘণ্টা খানেক আসার জমবে ভালো । দু’পাত হবেও বা । বিগার, রাজবংশী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ

পরে নরানবো আলো হাতে বাহিরে বেরোর। সান্তাবো তখন খাওলাদাওরা
নেরে মূখ ধুইছিলো। কথাবার্তা আর আলো দেখে নরানবোর কাছে
আসে। তারপর নরানবোর সাথে কথা চলে এ'দোপুকুরের পাড়ে। দেখে বাশ
কাড়টার পাশে ঠার বসে কাদছে ফুলঝুরি। চোখের জলে দ'গাল ভেজা।
দেখেই নরানবো ঝাঁঝেরে ওঠে—'কি রে, আবার এখানে কি করতে
এলি? আর কত জ্বালাবি? বাপের আর কত টাকা আছে দ'ড
জরিমানা দ্যাকনের। সূখের ভাত তো কপালে নেই।' সান্তাবো হাত
ধরে ওঠায়, বলে—নিজের দোষে সব হারালি, কি না ছিল তোর? বাপে
বিহা দিলে সূখে ঘর সংসার করতিস।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা, তারপর
ধরে নিয়ে যায় ঘরে। নরান রেগে যা কতক দেয় নরানবোকে। সান্তাবো
ঘরে চলে যায়। নরানবো জানে এতে নিশ্চিত নয়। দ'ড, জরিমানা
দিতে দিতে ফকির হ'য়ে যাবে নরান। কানাঘুয়ার সবই জানা হ'য়ে গেছে
সবারই। ফুলঝুরির ফিরে আসার অপেক্ষার ছিল মোড়ল, মহাজনেরা।

পরদিন ভোরেই জড়ো হয় একে একে সিধু মহাজন, যতীন রাজবংশী,
মতীন ঝাকসু, সূফল প্রভৃতি সমাজের মোড়ল, মাতস্বরেরা। নরানের আর
হাটে বাওলা হয়নি সেদিন। হাটে বাওলা বন্ধ রেখে বসেছিল উঠানে।
সমাজে যে সাড়া পড়ে গেছে তা' তার জানা। মোড়ল, মাতস্বরেরা পাতানো
তালপাতার পটীতে বসে। প্রায় সব এসে গেছে। দ' চারটি এ কথা সে
কথার পর আসল আলোচনা শুরু হয়। শুরু করে সূফল রাজবংশী—'কি রে,
নরান, সমাজের বো ঝিরা আর ঘরে থাকবে? না—তুই আর তোর ম্যারা
ফুলঝুরি সমাজের বিধান দিবি?

—ম্যারাটা গলার দাঁড়ি দিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যেতো মোড়ল।
আমি তো আর শিখান্ পড়ান্ দ্যাইনি। লেখাপড়ানের ব'গ আইচে।
ম্যারাটাকে লেখাপড়ান্ করাইছি। আমন হবে তা' তো মূই জানবার
পারনি। মূই আর কি করুম। তোমার ফের যা করনের হয় তাই করেন
গে। মারণের হয় মারণ, রাখনের হয় রাখন।' সতীন রাজবংশী ঝাঙ্কের
সঙ্গেই তুখাড় ভাবে বলে—ডাঙ্গাপাড়ার মরদের ভাত রুচল না, এখন চাক্-
ভিত্তে চাক্ তৈরী করুক আর কি? আমরাই করব যা করনের তো—রাতে
ঘরে উঠালো কে? বিগারুও এসেছে। মোড়ল মাতস্বরের পিছন পিছন।
আজকের নরান রাজবংশীর কথা শোনার জন্য। আর গতকালের না বলা
কথার জবাব দেবার আশায়। বিগারুর কথাটাও নরানের গায়ে লাগেনি তা'
নয়। বিগারুকে দেখতে পেয়ে শক্ত হ'য়ে উঠে নরান। বলে—তোমরা কি
বল? ম্যারা ফেলন যায়? না—কাট্যা ফেলন যায়? দুয়ার মানা করবে?
যাওলা আসা ছাড়ল দিব। তাতে না হয়, গাঁ ছাড়ল দিব।

বিগারু এবার সুযোগটা হাতছাড়া না করে বলে — ‘হক কথার এত ঝাল। পরিস্থিতি আশ্বাস করে সিধু মহাজন এবার বলে — গা ছাড়বি ক্যানে? আর ছেড়ে যাবি বা কোথায়? কার মুকে চাপা দিবি? কি যে দিনকাল হল? গারে আর তো ম্যারা বো আছে। আরো পাঁচ দশ ঘর বসবাস করে। সম্ভ্যার বনে যা হক একটা বিহিত কর। সিধু মহাজনের কথা সবাই মেনে নেয়। শেষে তাই ঠিক হয়।

সম্ভ্যার বৈঠক বনে। নয়ানকে মূড়ি, লংকা, পেঁয়াজের সঙ্গে আনতে হয়েছে তালারদের তাড়ি। পরপর জড়ো হয় মোড়ল, মাতশ্বররা। বৈঠক শুরুর হয় নিজির আসে ফুলরা বদন কোলের লখিরা কান্ত বৈরাগীর। ফুলরা ঘর ছেড়ে চলে গেছে বদন কোলের সাথে। আর ফিরেই গিয়ে। কেউ কখন দেখেছে বদন কোলের সাথে ফুলরাকে কোথায়। লখিরা চলে গেছিল কান্ত বৈরাগীর সাথে। কান্ত বৈরাগী জেলে যাওয়ার পর লখিরা ফিরে আসে। তারপর পুনরায় বিয়ে দিতে সতীন আর নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরোদস্তুর গৃহিণী। দণ্ড স্বরূপ লখিয়ার বাবা সুদাম রাজবংশীকে দিতে হয়েছিল গাছপুজার অর্ধেক খরচ। দিনকাল বদলেছে। মোড়ল-মাতশ্বরদের কথা এখন খাটে না সবসময়। আবার মোড়ল মাতশ্বর না হ’লে গ্রামে চলে না। তবে শেষ অঙ্গি ঠিক হয় মেরেকে আমত্রে না রাখা, পুণরায় ঘরে তোলায় জন্য পুজোর জন্য অর্ধেক টাকা। আর ঠিক হয় — হয় নটবরের কাছে শীঘ্র ফুলঝুরিকে পাঠানো, নয় লখিয়ার মতো পুণরায় ভাড়াভাড়ি বিয়ে দেওয়া। ফুলরা, লখিরা আর বুনী চলে যাওয়ার নিজির দু’দশ গায়ের উপজাতির সমাজে আছে। বৃদ্ধী ঘর ছেড়ে চলে গেছে লক্ষ্মীপুরের কাগ, পল্লির সাথে। একই জাতের বলে তেমন দণ্ড জরিমানা না হ’লেও এসব কথা নতুন ঘনো ঘটলে পুরানো দিনের কথায় আসে দণ্ডান্ত খাড়া হয় পরপর গায়ের বেগায়ের। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ এসে পড়লেও পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না লেখাপড়া না জানা অধিবাসীরা। এরা বোঝে না প্রেম-ভালোবানার কথা। নয়-নারীর অন্তরের রাগ, অনুরাগ, প্রণয়ের কথা বোঝে না বৃদ্ধিতে চায় না প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের বাধা বেদনা। পিতা-মাতা যা বোঝে, সেটাই সম্মতান সম্মতির চরম মঙ্গল। তাই ঘটে অঘটন। স্বধ-স্বল্প চরিতার্থ করার জন্য কিশোরী স্ববতীরা ঘর ছাড়ে ভালো লাগা মানুষের সঙ্গে ঘর গড়ার জন্য। তখন এ তল্লাটে সাড়া পড়ে। অপরাধ পড়ে পিতামাতার উপর দণ্ড জরিমানা হয় সমাজ বান্ধন অটুট রাখতে। নিন্দা আলোচনার মুখর হয় অধিবাসীরা। এইভাবে এগিয়ে চলে তাদের সমাজিক শাসন।

০ □

বহর যায়। স্বাভাবিক হ’লে যায় গ্রামের অধিবাসীরা। নটবরের জেল
২০৮ / কবিতার কাগজ

থেকে ছাড়া পেতে আরো তিন বছর। এত মন্ড, জরিমানা, বৈঠকের পর ধিস্মি মেয়েকে ঘরে রাখবে সে সাহস নব্বান রাজবংশীর নেই। আর সে পরিস্থিতিও নেই। নটবরের সাথে ফুলঝুরির সামাজিক বিয়ে হয়নি। ছেলেপুলেও হয়নি। নব্বান ফুলঝুরির বর খোঁজে। ফুলঝুরির রূপ বেশ দিনে দিনে বেড়েছে। ভারের ভরা নদীর মতো টাইটুস্বর তার যৌবন। পুষ্পের মত না হলেও বর জোটে। দেখে বার। বিয়ের দিন ঠিকঠাক হতে চলে। এমনি ভাবে বিয়ের কথা ভাবতো ফুলঝুরি একদিন। বর আসবে, বরন করে নেবে পাড়া প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীদের বিয়ের উৎসবে ডাক পড়তো তার। বরষাটীদের সিঁদুর আলতা দিয়ে বরন করতো। রাতভোর বিয়ের সানাই বাজতো, বাঁশী বাজতো, গানের সাথে সাথে নাচতো বৌবидের সঙ্গে ফুলঝুরি। মনে ভাসতো নটবরের শান্ত সুন্দর রূপটা। ভাবতো, এমনি কারো বরষাটী হ'লে আসতে পারে না নটবর? তাহ'লে দেখতে পেতো ফুলঝুরিও বিয়ের আসর জমাতে কম যায় না! কিন্তু তা' এখন হয় না—তাকিরে থাকতে হয় চড়কের মেলার জন্য।

চৈত্র সংক্রান্তির চড়কের মেলা বসে। মেলার দিনে আসে চারুবালা অপেরার কেট যাত্রার দল। মেলার ঘোরে যাত্রাদলের লোকজন। নটবর। গায়ের আরো বৌ ঝির মতো ফুলঝুরি আসে। দেখতে পার যাত্রাদলের অন্য লোকজনের সঙ্গে নটবরকে। ইচ্ছে করে দু' একখানা পান দিলে কেমন হয়? আবার না পারলেও লজ্জা-ভয় সংকেত কাটিয়ে তাই দিচ্ছেলো ক' বছর পর মেলায়। নটবর মৃদন হেঁসেছিলো ঠিক যেমন হাসে 'মান ভজন' পালায় কৃষ্ণ সাজা নটবর। 'রাধাসাজা' চারুবালার কাছে। মেলার ভীড় এড়িয়ে দলের লোকজনকে ছেড়ে আরো আড়ালে এঁসেছিল নটবর। নব্বান রাজবংশীর বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার সময় ফুলঝুরির নামটাই জেনেছিল সে? না—কয়েক বছরে তারও অস্তর দেশে আঁকা হয়ে গেছিল 'ফুলঝুরি' ঠিক চিত্রপটের মতো? তাই পান দিয়ে ফুলঝুরি যখন লজ্জা-ভয়-সংকুচিত হ'লে পড়োছিলো, তখন নটবরই প্রথমে কথা আরম্ভ করে আলাপ জমিয়েছিল ফুলঝুরির সঙ্গে। —আমার অভিনয় তোমার ভালো লাগে, ফুলঝুরি?

—ভালো না ছাই? চারুবালাকে দেখতে দেখতে মস্ত হয়ে যাও ক্যামন? ফুলঝুরি তোমার কে যে তাকে বলবার হর? নিজের অজান্তে সেদিন কেমন ভাবে তার অস্তরের আসল কথা বেরিরে গেছিল, তা' ফুলঝুরি নিজেই জানে না। তারপর...তার বৃকটা সত্যিই দ্রুত দ্রুত করে উঠেছিল। কেউ শুনল? দেখলো? দেখেছিল ক'জন উঠতি বয়সের বখাটে শুবক কথা বলার সময়। সেই ক'বছর থেকেই তাকে একা পেলে সুযোগ নেয় পিছন নেওয়ার, সখ্যায় মহাজন বাড়ীর ই'দারায় জল আনতে যাওয়া আসার পথে কিংবা পাড়া প্রতি-

বেশীর বাড়ীতে যার দরকারে যাতায়াতে। সদ্য যৌবনা ফুলঝুরি কি কিছুই বৃদ্ধতো না? কিন্তু ভালোলাগার পার্যনি কাউকে। নটবরের জুড়ি পার্যনি। সেদিনও তারা স্বযোগের ধান্দার ছিল আশেপাশে। কিছু দেখতে বা শুনতে পেলে কিছু বাদ রাখবে তারা? তিলকে তাল করে ছড়াবে গ্রামে। সেই ভয়ে ফুলঝুরি সিধু মহাজনের মেয়ে প্যাঁচার সঙ্গে ছিল বাকীটা স্মর। নটবরের উত্তরের অপেক্ষায় থাকেনি। নটবর তার কথার উত্তর দিয়েছিল যাত্রা-গানের পরদিন। থাকা খাওয়ার জন্য ওস্তাদের সঙ্গে নটবর করাবরই নয়ান রাজবংশীর বাড়ীতে পড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নয়ানবৌ তখন রান্নায় ব্যস্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকালে চলে যাবে যাত্রাগানের দল। দলের অন্যান্য লোকজন রাতি জাগরণে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু নটবরের ঘুম সেই মেসার দিন থেকেই গেছিল হারিয়ে। ফুলঝুরির কথার উত্তর দেওয়ার স্বযোগ খুঁজছিলো সে। অভিনয়ের ‘কৃষ্ণবেশী’ নটবরের প্রশংসা কেউ কি করে না এক আশু? তাই ঘরের চালরাস্তায় গিয়ে তেঁটের জল সঞ্ছান করে। ফুলঝুরি সবে রান্নার আনাড়পত্রের কাজ শেষ করেছে। জলের কথা শুনে জল নিয়ে আসে, সঙ্গে একখানা পান। জলপানের পর নটবর ফুলঝুরির কোমল হাতে হাত রেখে খানিকটা অভিনয়ের ডাবার বলিছিলো—‘তুমিই আমার ফুল’ আর আমি ‘নই কালো স্মর।’ তারপর খুবই পাশাপাশি বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল সোহাগে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে আশ্রি আশ্রি ছাড়িয়ে নিরোঁছলো ফুলঝুরি। মৃদু কণ্ঠে বলিছিলো—‘আঃ ছাড়ো’ তারপর ঘটি ঘাস তুলে পান দিয়ে রান্নাঘরে আবার চলে গেছিলো। কেউ টের পার্যনি। এখন নটবর নানান অছিলায় থেকেই যার চাক্‌ডিহীতে। নয়ানের বাড়ীতে। কখন ফুলঝুরির সঙ্গেই করা ‘রাধাবেশী’ চারুবালা কোথায় হারিয়ে যার। ফুলঝুরি নটবরের সঙ্গে চাক্‌ডিহী ছেড়ে চলে যার কোন একরাতে। কাক পক্ষীও টের পার্যনি। সিধু মহাজনের বাশঝাড় ছাড়িয়ে হারাণ মন্ডলের কামাদ বাড়ী পর্যন্ত পথটা বেতে কঁটা কুকুর তারস্বরে চিংকার করে উঠেছিল শূন্য। তাহুঁক ডেকেছিল চলতি পথের দু’ধারে এ’দোপ’কুরগুলিতে। ব্যোপঝাড় জঙ্গলে জোনাকী জ্বলছিল অজস্র। সোজা পথ ছেড়ে নিরাপদে অঁকাবাঁকা পথে যেতে হ’রোঁছা দেবী। গা বাঁচিয়ে শেষ রাতে পেঁচেছিল নটবরের গ্রাম ডাক্ষাপাড়ার।

সামান্যই ভিটেমাটি। ক’ বিঘা জমির অধে’কটা বিত্তী হ’রে গেছে ওস্তাদের পরামর্শে, অংশীদার হিসাবে যাত্রাদল টিকিয়ে রাখার জন্য। কেঁট যাত্রাগানে বছরের ক’মাস যার? একার কোনরকমে চলে যেতো। ফুলঝুরি আসতে যাত্রাগানের নেশা গেল কেটে। বাকী জমি বাঁধা রেখে একা করলো নটবর। এদিকে যাত্রাদল ছাড়ার জন্য দল গেল কিমিয়ে। তা’ছাড়া নতুনতর

কায়দায় নতুন দলের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গেল হেরে। ভেঙ্গে যাওয়া দলের কেউ গিল অন্যপথ। রাতে জাতীর সড়কে চলা লরী থেকে মালপত্র কেটে আনে। রাতারাতি বিক্রীতে অবিক্রীতে মালপত্র জমা রাখে নটবরের বাড়ী। বাধা মানে না। ভয় দেখায়। তারপর একদিন পুলিশ আসে। সরজামিন মালপত্রসহ ধরা পড়ে নটবর। নিয়ে যায় থানায়। লরী ক্রীনাররা খুন হয় কখনো কখনো। সেই অপরাধের বোঝাও পড়ে তার উপর। একা বিক্রীর টাকার কেসের ভীতির জোয়ার ফুলঝুরি। ফল হয় না। জেলে যায় নটবর। নিরুপায়, অসহায় ফুলঝুরি আবার ফিরে আসে চাকুড়িহাঁতে।

৪. □

নটবর ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত কোনরকমে পিড়গৃহে কাটিয়ে দেবে ভেবে ছিল ফুলঝুরি। আগের থেকে দিনকাল বদলেছে। মোড়ল মাতাম্বরদের কথা আর খাটে না সবসময়। কান্ড বৈরাগীকে দেখেছে সে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চাকুড়িহাঁতে এনেছে। খোঁজ করেছে লখিম্মার। লখিম্মা তখন সতীন ও নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরান্দুড়ের গৃহিণী। তাড়ির নেশার মত্ত হয়ে ক'দিন পরে কান্ড বৈরাগী চলে গেছে কোথায়। কেউ তার অন্তরের ব্যথা-বেদনা, হাহাকার বোঝেনি। বুঝতে চায়নি। পুনরায় বিয়ের আগে লখিম্মার অন্তরের বেদনা কেউ বোঝেনি। অসহায় অবস্থায় তার মনও পায়নি ভাষা। ঠেকাতে পারেনি সমাজের অলিখিত রীতিনীতিকে। সমাজের লেখা পড়া না জানা বাসিন্দারা জানে—পুনরায় বিয়ে থা'র পর আবার সব ঠিকঠাক হ'লে বাবে। সমাজে সকাল সকাল বিয়ে দেওয়া, বিয়ে করার রেওয়াজ। বুঝতী মেরো ক'বছর থাকে পিড়গৃহে? কাদের ঘর আলো করার জন্য তাদের বাড়-বাড়ন্ত যৌবন? 'কুড়ার পর ম্যাম্বারা বুড়ী।' বিয়ে দেওয়া তখন দায়! মেরো রাজী অরাজী এ নিয়ে কেউ মাথা খামায় না কোনদিন; প্রপ্নও তোলে না কোন দিন। এ সবই জানে ফুলঝুরি। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ঘনি়ে আসে। রুগ্মা স্ত্রীর অজুহাত দিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছে পরাণ রাজবংশী। ফুলঝুরির কেলেকারী করে পুনরায় ফিরে আসার জন্য সমাজকে খোদারতির টাকা পর্যন্ত দিতে এক কথায় স্বীকার।

বিয়ের তোড়জোড় পড়ে যায়। ভাবতে ভাবতে ফুলঝুরির অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হ'লে যায়। কান্ড বৈরাগীর মতো নটবর ফিরে আসবে একদিন। অকৃত্রিম প্রেমে যে একদিন ভারি তুলেছিলো তার জীবন, সেই একই প্রেমের অনল জ্বলছে তার অন্তরে। তাকে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? এক নারীর অন্তরে ক' পুরুষের স্থান? বিদ্রোহী হ'লে উঠে ফুলঝুরির মন। সেই

যেমন একদিন রাতে নিদ্রামগ্ন চাকার্ডহী ছেড়ে নটবরের সঙ্গে সবার অগোচরে চলে গিয়েছিলো, অতি সন্তপণে ঘর বেঁধেছিলো নটবরের সঙ্গে, তাদের প্রেম খুঁজে পেয়েছিলো স্বার্থকতার পথ ; সেই স্বার্থকতার জন্যই তেমনি রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়া সবাইকে ছেড়ে খিড়কীর দোর খুলে এ'দো-প'কুরের গলিপথে পথ হাঁটে। সিধু মহাজনের বাঁশঝাড় ছাড়িয়ে হারান ম'ডলের কামাদ বাড়ী পেরিয়ে নটবরের গ্রাম জঙ্গাপাড়ার পথ ধরে সে। দু' জন সাঁওতাল হ'ড়ো কিংবা মহুরার নেশায় ঢলতে ঢলতে টলে যায়। তাদের চোখে তখন নেশার ঘোর। মহুরা গাছের আড়াল হর ফুলঝুরি। মহুরার শাখায় শাখায় ভর্তি ফুল। তারপর আবার পথ হাঁটে...ভাদু মহাজনের বাড়ীতে ঝি-গিরিতে কারোরই বছর টেকে না। চলতি পথে ঝরে পড়ে মহুরার সাদা সাদা ফুল। □

লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলায়

‘কবিতার কাগজ’ এর স্টলে

আসুন।

আপনার সান্দ্রাণ সাহচর্যে

ভরে উঠুক আমাদের সম্মুখ উচ্চারণ...

অমৃত-প্রেম-কথা

স্নেহেন্দ্র মাইতি

স্থান : কুশিনগর । হিরণ্যবতী নদীর তীর । উরুবেলা । নৈরজন্য নদীর তীর ।
কাল : ৪৮৬ খঃ পূর্বাব্দ । বৈশাখী পূর্ণিমা ।

পাত্রপাত্রী : গৌতমবৃন্দ । তাঁর শিষ্যরা—আনন্দ, অনুরূপ, কাণ্যপ,
মহানাম । সূজাতা । রাখাল বালকগণ

[বৃন্দ শালবৃক্ষের মাঝখানে খাটের উপর ধবধবে সাদা বিছানা । নির্মালিত
চোখে গৌতমবৃন্দ তার উপরে শাসিত । মাথার কাছে প্রধান শিষ্য আনন্দ
তাপলাতার পাখার হাওয়া করছেন । তাঁকে খুবই চিন্তাকুল ও উদ্বেগ
দেখাচ্ছিল । পারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অপর দুই শিষ্য—কাণ্যপ ও
ও অনুরূপ ।]

বৃন্দদেব । [চোখ বুজে] আনন্দ, আজ আকাশে সেই পূর্ণচন্দ্র । জ্যোৎস্না-
লোক পৃথিবীকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে । আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, তাই না ?
আনন্দ । হ্যাঁ ভগবন । (কিছুক্ষণ নীরবতার পর) ব্যথার কিছু উপশম
হচ্ছে প্রভু ?

বৃন্দদেব । [দূর্বলস্বরে] একথা আবার কেন বলছ আনন্দ ? তোমাদের
কতবার তো বললাম, আমি আর কেনো দৈহিক ক্রেশ অনুরূপ করছি না ।
অপেক্ষা করছি, কখন চন্দ্র মধ্যাকাশে আসবে । এখনো অর্ধ প্রহর বাকি ।
[তিন শিষ্যই মাথা নত করলেন ।]

আনন্দ । [রূপনজ্জড়িত স্বরে] প্রভু, এ আপনার কী কঠিন উচ্চারণ !

অনুরূপ । ভগবন, আপনি আশ্রমের আহার গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ সময়
নীরবতা পালন করে আসছেন । পাখা থেকে কুশিনগর আসার মধ্যে
যথেষ্ট ক্রেশ বোধ করছেন । আমরাও আপনার শারীরিক ক্রেশের সমভাগী ।
বৃন্দ শালবৃক্ষের মধ্যে যখন আপনার খাট স্থাপন করালে, বিদ্রোহের জন্যে
আপনি শয়ন করলেন, কিন্তু তাকিয়ে আছেন স্বপ্নের আকাশের দিকে—

আর মাঝে মাঝে এরকম নিম্ন উচ্চারণে আমাদের হৃদয় বিব্ধ করছেন।

আমাদের পক্ষে এ অসহনীয়।

কাশ্যপ। প্রভু, দীর্ঘকাল ধরে আপনার সংগে অতিবাহিত করে আসছি—
কোনদিন এরকম অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে দেখিনি। আপনি দিবাকরের মত নিরম-
রসকারী ও নিরলস। দিব্য পদ্যের মত আপনাকে চির অমর দেখে
আসছি। আপনার ধর্মপ্রভার আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিলীন। সেই
ধর্মের পরিপোষকরা আপনার সর্বনাশ কামনার বিচরমান।

বৃন্দদেব। [হাত তুলে কাশ্যপকে ধামতে বললেন এবং মৃদুস্বরে বলতে
থাকলেন] কাশ্যপ, তোমার এ ধারণা অমূলক। (আনন্দ ও অনুরুদ্ধের
দিকেও চেয়ে বললেন) তোমারা আমার প্রিয় অনুগামী। সর্বদাই আমার
মূর্তিরূপ তোমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, তোমরা
যেমন সংঘের মধ্যে আমার প্রতিভু—জনজীবনে আনন্দ ও আমার বাণী
প্রচার করছে। তোমরা চিরকাল আমার বাণী সত্য বলে জানো। এই
আশ্রয়কালে প্রিয় শিষ্য ধাতুকর হুস আমাকে যে ভিক্ষা দিয়েছে, তা গ্রহণ
করে যে তৃপ্ত পেয়েছি সন্তোষী লাভের অব্যবহিতপূর্বে ও আমি এরকম
ভিক্ষা পেয়েছিলাম। (স্বর ক্ষীণ হল। নীরব হয়ে আত্মস্থ হলেন।
দুঃখ নিম্নীলিত হল)

আনন্দ। [অনেকটা আশ্বস্তভাবে] আমরা কেবলমাত্র উরুবেলা গ্রাম,
নৈরজনী নদী ও অশ্বখবৃক্ষের কথা জানি। সন্তোষী লাভের পূর্বে প্রভুকে
কেউ ভিক্ষা দিয়েছিলেন বলে আমরা শুনিনি।

অনুরুদ্ধ ও কাশ্যপ। বলুন প্রভু, আমরা শুনতে বড় ব্যাকুল।

বৃন্দদেব। [অত্যন্ত মৃদুস্বরে] আনন্দ অনুরুদ্ধ, কাশ্যপ, আমার প্রিয়
শিষ্যেরা, তোমরা যেন কোনক্রমেও হুসকে ভুল বোঝ না। যারা বৃন্দ-
বাণীকে তিলমাত্র প্রমথ্য করে তাদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে
দেবে।

আনন্দ। প্রভু আপনার অনুজ্ঞা আমরা বৃদ্ধোঁছি। নির্দেশ বধ্যবধ পালন
করব। এখন শান্ত হুন। মধ্যাহ্নের পরে আপনার কথামতে তৃপ্তি
দ্রব করব।

বৃন্দদেব। [শ্মিতহাসি] আনন্দ, আমার মনের কথা বৃদ্ধোঁ ও মায়াবশতঃ
না—বোঝার মত আচরণ করছ। সত্য পাষণের মত কঠিন হলেও হৃদয়ে
তা গ্রহণ করা কঠব্য। আমি মধ্যাহ্নের অপেক্ষায় রয়েছি। তার আগে
তোমাদের বা-বা জিজ্ঞাস্য সমস্ত শূনে সাধ্যমত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।
আমার শারীরিক পীড়ার কথা ভেবে নিরস্ত হতো না।

আনন্দ। আপনার এই নিম্ন উচ্চারণের চেয়ে মৃত্যু অনেক সহনীয়।

অনুদ্রব্দ । আপনার মহাপরিনির্বাণের কথা চিন্তা করে আমাদের সমস্ত রকম জ্ঞানার ব্যকুলতা অন্তর্হিত হয়েছে ।

বৃন্দদেব । [শ্রিত হাস্য] আমার প্রিয় শিষ্যেরা, কেন তোমরা বার বার আমার মহাপরিনির্বাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছ ।

আনন্দ । ভগবন, আমি মোহগ্রস্ত যে হইনি তা নয় । কিন্তু মানবজাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে কোটি কোটি নরনারীর সুখশান্তি বিধানের কথা চিন্তা করে—নিজেতে সংবরণ করতে পারছি না ।

বৃন্দদেব । বানন্দ, তুমিই আমার সারিধো সবচেয়ে বেশিদিন থেকেছ । আমার ধর্মের গুরুত্ব তোমার অজানা নয় । আমার বাণীতে কী তোমার পরম বিশ্বাস নেই বানন্দ ?

আনন্দ । [অনুতাপে আহতস্বরে] একথা বলে আমাকে আর আঘাত করবেন না ভগবন ।

বৃন্দদেব । [শান্তস্বরে] আমার প্রিয় শিষ্যেরা, পূর্বে তোমাদের কাছে বার বার বলেছি, ব্যক্তি বা বস্তু যতই প্রিয় হোক, কালক্রমে তাকে ছাড়তে হয় । প্রিয়বস্তু কিংবা প্রিয়ব্যক্তি বিরোগ ইহলোকে অনিবার্য । ব্যক্তি বা বস্তুর মৃত্যু ধ্বংস । মৃত্যু জন্মের সহগামী । আমার এই নশ্বর দেহও রক্ষা করা কোনমতে সম্ভব নয় । তোমরা আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও । যদি কোন জিত্রাস্য থাকে জানাও, নিরসন করার চেষ্টা করি । (নীরব হলেন ।) তিন শিষ্য একটু দূরে সরে গেলেন । নিজেদের মধ্যে করুণার্দ্ৰ স্বরে আলাপ করতে লাগলেন । কোনক্রমে কাশ্যপের কঠিনস্বর থেকে ‘চন্দ’ নাম বৃন্দদেবের শ্রুতিগোচর হল)

বৃন্দদেব । কাশ্যপ, আমার প্রিয় শিষ্য, এখনো তুমি আমার বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করছ । এই নশ্বর দেহের মারা আমার বাক্যের চেয়ে অধিক গ্রহণীয় মনে করছ ।

কাশ্যপ । [বৃন্দের পদতলে] প্রভু, আপনার এই বাক্য কী নির্ভর্য ।

বৃন্দদেব । [তাঁর দীর্ঘ বাহু মেলে শিষ্যকে কাছে টানলেন] তুমি এখনো ভাবছ, আমার প্রিয় শিষ্য চন্দের দেওয়া আহাৰ্য্যে আমার এই অসুস্থতা । মনে রেখো, আমার সঙ্গে এই আহাৰ্য্য তোমরাও গ্রহণ করেছ । চালের পিঠে ও শৃঙ্গ শৃঙ্গের মাংসের বাজন সকলেই পূর্ণ ভৃষ্ণিতে গ্রহণ করেছি । অথচ তুমি বৃষ্ণিতক বিচারশূন্য হয়ে চন্দকে দোষারোপ করছ । কেন আমার পারার্থিক অসুস্থতাকে জৈবিক দেহধর্মের ক্রিয়া বলে গ্রহণ করতে পারছ না ! তথ্যগতের এই পার্থিব জীবন নিত্যন্ত লৌকিক । বৃন্দের জীবন ও ধর্ম অলৌকিকের কোন স্থান নেই । তাই আমি আবার বলছি, চন্দের দেওয়া আহাৰ্য্য ও সন্ধ্যাধিলাভের আগে মহীরসী সুমাতার

মেওয়া আহার সমান অমৃত-আশ্বাদযুক্ত। তথাগতের ইহজীবনে এই দুই আহার তুল্যমূল্য।

আনন্দ। ভগবান্। আপনি পূর্বজীবনের কথা বিশেষ কিছু বলেননি, আমরা অশোভনভাবে কোনদিন জিজ্ঞেসও করিনি। সন্সেবাধিলাভের পূর্বে বারী অন্নগ্রহণ করেছিলেন আজ আমরা সেই মহীময়ী সৃজাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি। যে মহাজ্ঞান সারা বিশ্বে আলোকবর্তিকার মত জ্বলছে—তাতে সেই মহীরসী নারীর স্থান কোথায়?

বৃন্দদেব। আমার প্রিয় শিষ্যেরা, সন্সেবাধিলাভের যে চিত্রাচারিত রীতি আমি তাই অনুসরণ করেছিলাম। সেই কঠিনতম ব্রহ্মস্বসাধনার তপস্বিতা, রুক্ষাচার, জগুপনা ও প্রবিবেক গভীরভাবে অনুশীলন করতে অধাহার, অল্পাহার ও অনাহারে যখন জীবনী শক্তির শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছেছি, চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায় (নিম্নীলিত নয়ন বৃন্দের কণ্ঠস্বর কণি থেকে কণিগতর হতে হতে মিলিয়ে যায়।) স্মিত হাসিতে মুখমণ্ডল দ্যুতিময় হয়ে ওঠে তিন শিষ্য ভূমিতে বসে গভীর মনোনিবেশে যা শূন্যছিলেন, বৃন্দের কণ্ঠস্বর শ্রবণ হয়ে গেলে নিজেরদের মধ্যে ইঙ্গিত করলেন, যাতে তথাগতের পূর্ণ বিভ্রামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। বৃন্দদেব নিজস্ব চিন্তার মধ্যে আত্মস্থ হলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জুদে অশ্বকর নেমে আসবে। অল্প অল্প ভোরের আলো। এখন স্থান নৈরজনী নদীর তীর। উপবন। এক পাষাণবেদীর কাছে পদচারণা করছেন উপবাসসিক্টি ঋষি গোতম। অশ্বিরচর্মসার। মাথায় জটাভার অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে আছে। পদচারণাতেও ধ্যানমগ্নতা। একটু দূরে সোনার মত উজ্জ্বল বর্ণের সৃজাতাকে দেখা গেল। প'চিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। পরণে গোপিনীর পোষাক।)

সৃজাতা। [আশ্চর্যভাবে] অশ্রুত এই ঋষি। দীর্ঘকাল ধরে ইনি তপস্যা করছেন—নিরাহারে রয়েছেন অথচ সূবর্ণকান্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। ইনি বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন তাই সমস্ত কিছু দেখেও দেখছেন না। ইনি লক্ষ্যে স্থির কিন্তু অন্ন গ্রহণ ছাড়া প্রাণরক্ষা কী সম্ভব! যদি তা সম্ভব হত, কী প্রয়োজন ছিল পিতার একশত গাভী ও পঞ্চাশটি বৃষ পালন! যদিও ইনি উজ্জ্বলতর হচ্ছেন, একথাও তো ঠিক, কৃশ থেকে কৃশতরও হচ্ছেন। ইনি ঠিক কী যে চান, কোনদিন তা প্রকাশ করেননি। হাজার প্রশ্ন করেও ঘুরে তাকান না। জীবনের কোন দুর্নিরীক লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির করে আছেন কে জানে।

[তিনজন রাখাল বালকের প্রবেশ। কারু হাতে পাকা বেল, কারু হাতে জাম ও ভূমুর।]

১ম রাখাল । আজ সন্ধ্যাসী এখানে ! ও'নাকে এই পাকা বেল খেতে দেব ।
এ ফল আমরা গাছের তলার কুড়িয়ে পেয়েছি । (স্নজাতার দিকে চেয়ে)
মা, তুমি ঠিক যে ধরনের ফল আনতে বলেছিলে এগুলো সেরকম—আমরা
গাছ থেকে ফল তুলিনি । কিন্তু মা, তুমি কী করে জানলে, সন্ধ্যাসী
এখানে থাকবে ?

স্নজাতা । তোদের মত আমিও সাধুকে ব'জাছি । পিতার কাছে শুনছি,
সন্ধ্যাসীরা যখন তপস্বিতা নিরম্বে থাকেন এধরনের ফল গ্রহণ করলেও
স্বস্তে পারেন । আজ আমিও সঙ্গে করে পারসাম এনেছি । গতরাত্রি
দিবির এক পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে ।

২য় রাখাল । এই পারসাম কী সন্ধ্যাসী গ্রহণ করবেন ! আজ বাড়িতে
উৎসব—তবু ও তুমি এসেছ !

স্নজাতা । [স্বগত] কেন যে আসি ! (প্রকাশ্যে) তোদের মত দুষ্টুদের
জন্যই এক জাগরণ ঘুরে বেড়ান । দূর থেকে লক্ষ্য রাখি যাতে কেউ না
হিন্দু করতে পারে । মনে পড়ছে তোদের সেই মারাত্মক দুষ্টুমির কথা !

৩য় রাখাল । সে কথা মনে হলে বড় কষ্ট হয় মা । হঠাৎ বনভূমিতে
সন্ধ্যাসীকে যেভাবে দেখেছিলাম, কঙ্কালের মত একটা বটের তলার বনে-
ছিলেন । দৃষ্টি চোখ কোঠরের অন্ধকারে । সাধু যেভাবে নিশ্চল হয়ে
বসেছিলেন, আমাদের সম্মুখে হয়েছিল, ইনি কী বেঁচে আছেন ! নাকি
কোন অপদেবতা ।

স্নজাতা । [রাখাল বালকের মূখে হাত চাপা দিয়ে] চুপ, এরকম কথা বলতে
নেই । তা বলে বা তোদের কোনমতে উচিত হয়নি, গাছের শব্দ নো
ডাল দিয়ে ওভাবে আঘাত করা । তোরা পাথর ছুঁড়েছিস, দেহে নোংরা
নিক্ষেপ করেছিস, তথাপি উনি কিছুই বলেননি । নীরবে উপেক্ষা
করেছেন ।

৪য় রাখাল । এর আগে আমরা এ রকম সাধু আর দেখিনি । অন্যান্য সাধুরা
আমাদের দেখে দূর দূর করে ভাঙিয়ে দেন, অভিগাপ দেন । তুমি যদি
আমাদের বাধা না দিতে কী মহাপাপ করে ফেলতাম ।

স্নজাতা । আমি দৈবাৎ এসে পড়েছিলাম । দূর থেকেই দেখলাম, সাধু
তোদের বনছেন, তিস্ত বাছারা ।

১ম রাখাল । আশ্চর্য, আমি কিন্তু কিছুই শুনতে পাইনি ।

২য় ও ৩য় রাখাল । আমরাও না ।

স্নজাতা । কিন্তু তোরা আমার কথা শুনিয়েছিলি । যখন তোদের শাসন করে
বললাম, খবরদার, একী করছিস দুষ্টুরা ! ইনি বনদেবতা ।

৩য় রাখাল । আমরা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম । আর সেই প্রথম দেখলাম,

কবিতার কাগজ । ২৫৭

কোটরগত চোখ থেকে অশ্রুত এক নরম আলো আমাদের স্নান করিয়ে দিল। আমরা তিনজনেই ঝড়সড় হয়ে গেলাম।

সজ্ঞাতা। [স্বগত] সেই প্রথম আমি দেখলাম, কীভাবে ফুল ফোটে! (প্রকাশ্যে) তোরা জোট বেঁধে ভরে ভরে পিছিয়ে যাচ্ছিল। সাধু হোদের ইশারার ডাকলেন। আমি বললাম, যা ক্ষমা চা।

৩য় রাখাল। অপরাধের মাতাটা আমারই বেশি ছিল। আমি এগিয়ে গেলাম। পায়ে পড়ার আগেই উনি আমার মাথার হাত রাখলেন। আশ্চর্য যেন মায়ের হাতের স্পর্শ।

১ম ও ২য় রাখাল। আমাদেরও মাথার উনি হাত রাখলেন। মনে হল, মা তুমি ছাড়া এ রকম আদর কেউ আর করেনি। উনি আমাদের কিছুই বললেন না, হাসলেন মাত্র। তারপরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সজ্ঞাতা। [আত্মগতভাবে] ঠিক তাই। অশ্রুত সন্ন্যাসী। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রীলোক বলে ভয় হয়, যদি তপস্যাবিঘ্নকারী বলে দেন। কিন্তু উনি আমাকে এভাবে দেখলেন, যেন আমি ও রাখালবালক। (প্রকাশ্যে) তিনি এখন পারচারি করছেন, কাছাকাছি যাওয়া ঠিক নয়। লোক চক্ষুর আড়ালে থাকার জন্যেই বোধহয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে তপস্যা করেন। তিনি যখন ধ্যানে বসবেন আমরা আস্তে আস্তে ফলমূল ও পারসান উনার কাছে রেখে আসব।

তিনজন। তাই হবে মা।

সজ্ঞাতা। চল, আমরা ঐ কোপের আড়ালে যাই। দেখি সন্ন্যাসী কখন তপস্যার বসে। (কোপের আড়ালে সকলে চলে যায়।)

[এবারে মন্ডের আলো সরাসরি ঋষি গৌতমের মূখের উপরে এসে পড়বে যদিও পদচারণাতে তিনি ধ্যানমগ্ন—তস্পষ্ট হলেও আত্মজিজ্ঞাসা শোনা যাবে]।

বৃন্দদেব। [আত্মগতভাবে] চতুর্দশ সাধপথ অবলম্বন করেও মনের শান্তিও তো মিলল না। শরীরের সাথে সাথে চিন্তাশক্তি ও নিশ্বেজ হয়ে আসছে। আগে যেটুকু ও বা চিন্তা করতে পারতাম, এখন তাও যেন ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ধ্যান ব্যতিরেকে যেমন উড়ুল হয় না, দেহ ব্যতিরেকে ও সেরকম মনের অস্তিত্ব নেই। দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব! (ইতস্তত পদচারণা) না, আমি আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। চিন্তা ও করতে পারছি না। যে সমস্ত উত্তেজিত চিন্তা আসছে, এ সমস্ত দূর্বলতার ফলস্বরূপ। অসার শূন্যকাণ্ঠে যেমন কীট আগ্রস্র করে তাকে জীর্ণ করে ফেলে আমার অবস্থা ও তাই। চেতনায় বিস্মৃতির

মসীলিপ্ত হাত। একী! কোনমতেই আর শ্বির থাকতে পারছি না।
 অশ্বখব্ধের ঐ শিলাখণ্ডে আগ্রস্র নিই (কোনক্রমে পতন থেকে অশ্বখব্ধকে
 গিলেছে রক্ষা করলেন। বাহ্যজ্ঞানলব্ধ-প্রার অবস্থার কিছুকণ অবস্থানের
 পরে স্থগতি যেন কিছুটা ফিরে পেলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।
 আবার পদচারণার রত হলেন। কত কতদিন আগে কিছু ফল ও দুগ্ধ পান
 পান করেছিলাম। দিগেছিল—হ্যাঁ মনে পড়ছে—এক রমণী ও কতিপয়
 রাখালবালক। হ্যাঁ সেই রমণীর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। উষাকালে
 অরুণরশ্মিনাতা কুম্বের মত পল্লব পবিত্র সেই শরীর পরম শ্রদ্ধাভরে
 কতিপয় রাখালবালকের সঙ্গে সদা দোহনকরা দুগ্ধ ও কিছু ফলমূল এনে
 রেখেছিল। পূর্ণমাত্রার আঁখি পল্লব উন্মীলিত করার কমতাও ছিল না।
 সেদিনও মনে প্রগ্ন জেগেছিল আত্মনিপীড়নে কী আমার অভীষিত
 সিদ্ধিলাভ সম্ভব! ঠিক সে সময় কানে ভেসে এসেছিল বীণার ঝঙ্কার।
 দূরে কোথাও বীণার তার বাঁধাছিলেন সুরসাধক। কখনো ব্রহ্মভাবে
 কখনো বা কঠোরভাবে! কিন্তু যখনই বীণার তার কাঠিন্য ও ব্রহ্মতার
 মাঝামাঝি বাধা হল, অমনি সুর লহরীর স্রমধর ছন্দে অন্তর অকিঞ্চিৎ
 যেতে লাগল। মনে হল, হাতের কাছে অমৃত ভাণ্ডার। সাধনার সঠিক
 পথের সম্ভান পেয়েও যেন পাচ্ছিলাম না। অশ্বিরতার আঁখিপল্লব খুলে
 গেল আর দেখলাম, সংসারী অথচ মূর্ত্তিময়ী পরম পবিত্রা সেই বালা।
 দেখলাম, সেই নারী ও রাখাল বালকেরা প্রথম ভিত্তিরে শিলাখণ্ডের
 নীচে গভীর অভিনিবেশে প্রতীক্ষার। ঐ শরীর দেহপাত জীবনরসে
 কানার কানার পূর্ণ। মনে হচ্ছিল, সম্বোধীলাভের মহামন্ত্র এনেছে।
 লিপ্তাসা করেছিলাম, 'কে তুমি বালা?'

[কিছুকাল আগের ঘটনা। সূজাতার আবির্ভাব। তার মুখে
 ও আলো পড়বে]

সূজাতা। গোপবালা—সূজাতা। [ধীরে ধীরে সূজাতার মুখ থেকে আলো
 সরে যাবে।]

বৃন্দদেব। নারী কণ্ঠস্বর বীণার কন্ঠারের মত সুরলগহনে সুরলহরী তুলল।
 এতদিন আমার সাধনার সিঁধি বোধহয় এই নারীর অপেক্ষাতেই ছিল। কী
 নাম, সূজাতা! অপূর্ব। সংসারে থেকে ও সংসারী নয়—বনচারিনী—
 সম্ভানহীনা হোক বা না হোক, রাখাল বালকেরা সম্ভানের মত—দেহ
 উপবাসিস্থিত নয়, অথচ কোথাও ভোগের চিহ্নমাত্র নেই—এই শরীর পথ
 —নীতি ও তত্ত্বের দিক থেকে বা মধ্যপথ ভা আমার গ্রহণীয়। সঙ্গে
 সঙ্গে আমার হৃদয়ের রম্ভে রম্ভে ঝঙ্কত হয়ে উঠেছিল অদৃশ্য বীণাতন্ত্রী।

অমৃত আশ্বাদে আবিষ্ট হইবে যাঙ্জিলাম । এমন সময় স্বজাতার সেই
বীণানিষিদ্ধতব্বর আবার শুনলাম—

[সুজাতার মূখে আলো পড়বে]

সুজাতা ॥ ভগবন্ নিরাহারে থেকে শরীরপাত করে কোন মহাপুণ্য লাভ
করবেন ? দেখ সুসুহ রাখলে মন ও সুসুহ থাকবে । দেখমন সুসুহ রেখে
ত্রিতাপ হরণের পথ সম্পাদন করুন । মধ্যমপথ অবলম্বন করে এই দুঃখ ও
ফল গ্রহণ করুন ।

[ধীরে ধীরে আবার সুজাতার মুখ থেকে আলো সরে যাবে]

বৃন্দদেব ॥ চোখ মেলে দেখলাম, সেখানে কেউ নেই । কিন্তু শিলাখণ্ডের
উপরে দুঃখ ও ফল রয়েছে । আমি তুষ্টি সহকারে সেই দুঃখ পান
করলাম । সঙ্গে সঙ্গে নিস্তম্ভ বন্যহলীর বক বিদীর্ণ করে উচ্চারিত হল, —
মহানাম ॥ [নেপথ্যে] ঋষি গৌতম, তুমি তপস্কেট হয়েছে । দীর্ঘ সাধনার
বা লাভ করেছিলে, তা সমুহ বিনষ্ট হয়েছে । তুমি সংসারে ফিরে যাও ।
আমরা তোমাকে ত্যাগ করে চললাম ।

বৃন্দদেব ॥ তোমরা কারা ?

[মস্তুর একদিক থেকে মহানামের আবির্ভাব]

মহানাম ॥ আমরা তোমার পূর্বতন পাচিশস্য । আমি মহানাম । ঐ দেখো
চারজন তোমার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে—বৃন্দদর্শন করতেও ঘৃণাবোধ
করছে । আমরা পাঁচজন, কৌণ্ডিন্য তাম্বজিৎ, বাস্প ভদ্রক ও আমি তোমার
ত্যাগ নিষ্ঠা ও মেধায় আকৃষ্ট হইয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম । যখন
তপস্যার জন্যে অরণ্যে প্রবেশ করলে, কিছুদিন ইতস্তত নানান জাগরণ
পরিভ্রমণ করে এই অরণ্যে তোমার অনুসন্ধান করি । রাজগৃহে ভ্রমণকালে
যা শুনছি, তাতেই আমাদের সন্দেহ জেগেছিল, তুমি যথার্থ মোক্ষলাভের
উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করনি ।

বৃন্দদেব ॥ আমি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছি কখনো একথা
বলিনি । আমার প্রিয় শিষ্যেরা, ত্রিতাপ হরণ করার যথার্থ পথ অনুসন্ধান
করতে চেয়েছি । যে আত্মসত্য অর্জন করে দুঃখ জয় করা যায় তাই
আমার লক্ষ্য ।

মহানাম ॥ [উপহাসের সঙ্গে] রাজগৃহে অবস্থানকালে আমরা জানতে
পেরেছি, তুমি শাক্য রাজকুমার । ভোগসুখে প্রতিপালিত ও বর্ধিত ।
কোলাহল ও শাক্য রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যে রোহিনী নদী চাষাবাদে জলবন্টন
নিরে একবার স্রম বিবাদ হয় । কোলীররা অন্যায়ভাবে জল চুরি করে ।
এতে শাক্যবীরগণ কোলীররাজ্য আক্রমণ করে প্রতিবিধান করতে চাইলে
তুমি ভীরুর মত আপোষের পথে বিবাদের নিরসন চাও । গণসংঘে

মতামত নেওয়া হলে তুমি পরাস্ত হও। তোমার আপোষণস্বী দুর্বলনীতি
 যাতে যুদ্ধবাদের প্রভাবিত করতে না-পারে সেজন্যে শাকাগণসঙ্গে তোমাকে
 নির্বাসনভেদে দণ্ডিত করে। মোক্ষলাভই সন্ন্যাসজীবনের উদ্দেশ্য। তোমার
 সাধনার উদ্দেশ্য যে চিরাচরিত পথ থেকে অন্যরকম হতে পারে এ আমরা
 চিন্তাও করতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত তোমাকে অনুসরণ করে
 আমাদের সন্ন্যাসজীবনের অনেক অমূল্য সময় অপব্যয় করেছি। তোমার
 সন্ন্যাসগ্রহণ অনেকটা মৎস্যশূণ্য পুষ্করিণীর ধারে বক ধার্মিকের
 অবস্থানের মত।

বুদ্ধদেবঃ আমি শাস্তির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে গৃহত্যাগ করেছি, দুর্বলতা
 কণ্ঠঃ নয়। কারণ ইতিহাস পরম্পরায় প্রমাণ দেয়, যুদ্ধের মধ্যে অনেক
 যুদ্ধবীজ বপন করা হয়। বিজয়ী হত্যাকারী অথবা তার উত্তরাধিকারী
 অপরের দ্বারা বিজিত কিংবা নিহত হয়। হিংসার স্থায়ী সমাধান হিংসা
 হতে পারে না। আমি সেই শাস্তির নীতিতে এখানে অবিচল আছি?

মহানামঃ [স্বেযাশ্বক স্বরে] রাজকুমার, কোল্লীগদের সংগে শাক্যদের বিবাদ
 দূর হয়েছে। তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও। শাক্য বংশধর করেকজন
 রাজপুরুষ বালদেব রাজকুমারের সংগে সাক্ষাত হলে ফিরে যেতে অমুরোধ
 করিও।

বুদ্ধদেবঃ [বাহুস্বরে] বিবাদের নিরসন ঘটেছে? নিশ্চয় পারস্পরিক
 আলোচনার শাস্তির পক্ষে।

মহানামঃ [সরাসরি উত্তর না দিয়ে] রাজকুমার, তুমি আমাদের মোহগ্রস্ত
 করে মোক্ষলাভে বিঘ্ন ঘটিয়েছ। রাজ্যে ফিরে 'বধমে' গিয়ে ব্রতী হও।
 প্রস্থান।

বুদ্ধদেবঃ [আশ্রয়ভাবে] কোন উত্তর তো পেলাম না। মহানাম এখন
 আর আমাকে গোড়মুষ্টি স্বর্ষি বলেও সম্বোধন করছে না। আমার পূর্ব-
 জীবনের রাজকুমার পরিচয়ে দীর্ঘদিনের তপস্চর্চাকে উপহাস করছে।
 কিন্তু গৃহত্যাগের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এমন এক জীবনচর্চার
 অনুসন্ধান করব, যাতে হিংসা চিরকালের জন্যে ভিরোহিত হয়। আমি
 সেদিন মহানামকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি এক নতুন সাধনপথের
 সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে কোন কবাই শুনল না। কিন্তু চিন্তা আমার
 আবার খিঁচিয়েছিল। আঁকি কাঁড়ুল করছি? আবার কঠোর তপস্চর্চার
 শরীরপাত করছি। আজ আমার মনে হচ্ছে—সে পথই স্বার্থ। মধ্যম-
 পথই পথ। দেহ সেদিন আহার গ্রহণে স্নান খাওয়ার মহানামের সংগে
 হৃদয়পূর্ণ তর্ক করতে পেরেছিলাম। যে জ্ঞানগার দুষ্ট ও ফল পেয়ে-
 ছিলাম, আজ আবার সেই জ্ঞানগাভেই ফিরে এসেছি। কেন ফিরে এসলাম।

সেই প্রাণময়ী পরম পবিত্রা সৃজাতাদে দেখার জন্যে । নাকি তার নৈবেদ্য-
লাভের তাগিদে । আজ কিম্বু চিত্তের বিধাশ্বিত্ত্যাব তিরোহিত ।
কৃষ্ণপুত্র আশ্বপীড়ন ছাড়া কিছ্ নয় । এ এক রকমের প্রমত্ততা । প্রাণ
অন্নময় । সকল প্রাণী আহাৰ নিৰ্ভর । এই মহাপ্রাণময় উষালয়ে
নিরঞ্জনানন্দাতে স্নান করে আসি । (উঠতে গেলেন, কিম্বু পারলেন না ।
বুরে পড়ে গেলেন । অনেক কণ্টে শিলাখণ্ডে উপবেশন করে অশ্বখবৃক্ষে
দেহরক্ষা করলেন । দুটি চোখ নিম্নীলিত হয়ে এল । সৃজাতা ও রাখাল-
বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক । ঋষি উঠতে গিয়ে আবার ধ্যানে বসেছেন । একেবারে নিশ্চল
হয়ে আছেন ।

সৃজাতা । আমি অতি সাধারণ নারী । কোনমতেই বৃক্ষে উঠতে পারছি না
ইনি কী অবস্থায় আছেন । যাই হোক তোরা আর আমরা তার উদ্দেশ্যে
নৈবেদ্য রাখি । (রাখালবালকরা এবং সৃজাতা ফলমূল, দূধ ও পায়সাম
পাষণবেদীর উপরে রাখল । অস্পষ্ট কোলাহলে গৌতম ঋষির হস্ত-
চেষ্টনা ক্রি়ে আসে । তিনি অধোমুখীলিত অবস্থায় বলতে থাকেন ।)

বৃন্দদেব । এই তো সেই পরম প্রতিময়ী বনবালা, সৃজাতা । কী অসামান্য
লাবণ্যময়ী । আমার দেহমন সতেজ হয়ে উঠছে । নিজেকে উপলব্ধি
করতে পারছি । অনুভব করতে পারছি, জীবনের মধ্যে দিয়ে এক আনন্দ
নিষ্করিত্য বয়ে যাচ্ছে । এই বনবালাকে দেখে আমি সম্যক দৃষ্টি লাভ
করিছি । হে নারী, আমি তোমাকে আরো নিকট থেকে দেখতে চাই ।
উপলব্ধি করতে চাই । তোমার মধ্যে দিয়ে জাগতিক তৃষ্ণার অবিদ্যা-
মোহজাল ছিন্ন করতে চাই ! (কিম্বু তাঁর বাক্যফীতি হাঁচিল না । তিনি
কেবল দুটি হাত অল্পমাত্রায় প্রসারিত করলেন) ।

সৃজাতা । হে প্রভু, বহিস্তে প্রস্তুত এ পায়সাম গ্রহণ করুন । দেহমন স্তম্ভ রেখে
জাগতিক দূষ দূর করুন । (ভক্তিতরে শিলাখণ্ডের উপর প্রণতা হলেন ।)

রাখাল বালকগণ । প্রভু, আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করুন । (প্রণত)

বৃন্দদেব । কী অপূৰ্ব নরন শোভন এই রাখালবালকরা । নির্বেদিত প্রাণ
অখণ্ড নিরুদ্ভিগ্ন । সংসংকল্পে এই বালা ও রাখালবালকরা কী অপূৰ্ব
দ্যুতিময় । এদের কণ্ঠ নিঃসৃত সংবাক্যে আমি বিমোহিত হচ্ছি । সংকম
ও সহজসরল জীবনযাপনে প্রলুপ্ত হচ্ছি । মানুষ্যের জন্ম ও জীবনভোগের
তৃষ্ণা অমোঘ । কিম্বু আৰ্থ সত্যের দ্বারা এই তৃষ্ণা জয় করা সম্ভব ।
কিম্বু বারে বারে কেন এই বনবালার উপরে আমার দৃষ্টি আবর্তিত
হচ্ছে । সাগরের স্নানিমল জলরাশি নরনমুখকর সন্দেহ নেই—কিম্বু
তার গহনতলে যে রহস্যজিহা অর্জন করা জীবনের অন্তিম লক্ষ্য । এর

জন্যে প্রয়োজন সম্যক শক্তি ও সম্যক স্মৃতির । সুজাতা, তুমি উৎসাহিত হও । (চক্ষু নির্মালিত)

সুজাতা ॥ সম্যাসীর চক্ষু নির্মালিত হুল । অধোরোষ্ঠ মাঝে মাঝে কে'পে উঠছে । মাঝে মাঝে মৃৎমণ্ডলে বিদ্যাচ্ছমকের মত দৃষ্টি খেলে যাচ্ছে । বাছারা চল, তস্তুরালে বাই । আমরা নৈবেদ্য নিবেদন করছি । দৈব প্রভু গ্রহণ করেন কিনা । (অন্তরালে চলে গেল ।)

বৃন্দদেব ॥ ধীরে ধীরে সাধনার সোপান স্তর আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে । বহুদূর পৰ্ব্বত দেখতে পাচ্ছি । এখন দরকার মনের সুসমাহিতভাব— যাতে আশ্রয়তা প্রতিভাত হতে পারে । দূর হোক সমস্ত দৈহিক জড়তা । শান্তিদায়িনী নৈরঞ্জনা, আমার দৈহিক তাপ হরণ কর । (সমস্ত দৈহিক শক্তি একত্রিত করে নৈরাজ্যনাতে অবগানে করে এসে শিলাখণ্ডে উপবেশন করলেন । আপনমনে বলে উঠলেন) সম্ভব সস্তা আহারাঠিঠকা—প্রাণ অশ্নময় । ভোগবিলাস অথবা কঠোর তপস্চরণ এই উভয়বিধ পথ বর্জন করে মধ্যমপথ অবলম্বন করলাম । এই সাধনপথ যদি সত্য হয়, কঠোর তপস্চরণ ভেঙে গ্রহণ করলাম এই পারসাম্ন । সুজাতার অন্তলোকের মত পরম পবিত্র এই পারসাম্ন সন্মোহিতাভের শক্তিরূপে গ্রহণ করলাম ।

[পারসাম্ন ডকন । কমন্ডলুর জলে দৃ' হাত প্রকাশন করলেন । সুজাতা ও রাখাল বালকগণের অন্তরাল থেকে প্রবেশ].

সাজাতা ॥ ভগবন্, আর্পনি তৃত !

বৃন্দদেব ॥ হে মহাম্বিনী সুজাতা— আমি তৃত । আমার শিরে বিশ্বাস অমৃতত্বলা এই পারসাম্ন গ্রহণ করে যে পরম শক্তি লাভ করেছি সাধনসাগর মগ্নন করে অচিরে অমৃতলাভ করব । এর পরোভাগে তুমি ।

সুজাতা ॥ ভগবন্, আমারও বিশ্বাস, অচিরে আর্পনি সিংখলাভ করবেন । [এরপরে অনেকটা আশ্বগতভাবে] কিন্তু তারপরে—তারপরে হরত আমাকে চিরকালের জন্যে ভুলে যাবেন ।

বৃন্দদেব ॥ ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতে থাকলেন] হে পুণ্যময়ী সুজাতা— যদি আশ্রয়তা লাভ করি - তা যতদিন জগতে থাকবে ততদিন তোমার নামও ঘোষিত হবে । তোমার সাধনসিদ্ধ অন্তলোকের পুতময়ী রূপবাহি গোতমখ্যাচি চিরকাল বৃকে করে নিয়ে বয়ে যেড়াবে ।

[ধীরে ধীরে মগ্ন জুড়ে অশ্বকার । তারপরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে সেই প্রথম দৃশ্য । কুশিনগর]

বৃন্দদেব ॥ [নিমীলিত অবস্থার আত্মগতভাবে] স্থূলবৃন্দসম্পন্ন মানুষ
এই মহামিথুণী নারীর অন্তলোকের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে হ্রত
কিঁকৃত করবে। (ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন) আমার প্রিয় শিষ্যেরা,
চেষ্টা দেখ, বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মধ্যাকাশে। আমার সময়
আগত। তোমরা সুজ্ঞাতা সম্পর্কে কেবল এটুকু জেনে রেখো, উরুবেলার
গোপগৃহবাসিনী সেই অগ্নিশিখাতুল্যা পুত্ৰ রমণীর যদি সাক্ষাৎ না
পেতাম—বৃন্দবাণী জগৎবাসী শুনতে পেত না।

[ধীরে ধীরে চক্ষু নিমীলন। পর্দা নেমে আসবে]



এই প্রথম বাংলার ভারতবর্ষের মূখ

গৌতম রায় সম্পাদিত

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের গল্প সংকলন

নীলহুঁআকাশের তারা (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

১৩০ টাকা

সীমা রায়

প্রযুক্তি সিংভদ্র সাহিত্য প্রকাশনী

চক্রধরপুর : সিংভদ্র (পশ্চিম)

বিহার সূচক : ৮৩০১০২

সুন্দর কি হারার

বিকল্পদ বিশ্বাস

একটা পাখি সেই কোন ভোর থেকে ডেকে চলেছে। বাতাসে উড়ে উড়ে ডাকছে। গলা বাথা করা ডাক। অনেকটা কান্নার মত। ডাক চেনা চেনা। স্বজাতা মনে করতে পারছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না। এটা কি বৌ কথা কও! বৌ কথা কও পাখির ডাক তো কান্নার মত নয়।

গ্রামের স্কুলে মাইক বাজছে। রবীন্দ্র সংগীত। আজ রাইশে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিন। নক্ষত্র পতনের দিন। গানের সুরের তারতম্য জন্মদিন আর মৃত্যু দিনকে আলাদা করে। এও যেন কান্নারই মত। প্রাণের মানুষ হারানো চোখের জলে ভেজা বাইশে শ্রাবণ।

বারে বারে পড়ার ফলে ছেলের চিঠির কথাগুলো স্বজাতার মনে গেঁথে গেছে, জিঞ্জের ডগায় জড়িয়ে আছে। মনে করতে মার কুকটা আনন্দে নেচে ওঠে, গবেঁ ভরে যায়, 'আমরা মূসকো দখল নিয়েছি, গেল রাতে; দু-এক দিনের মধ্যে জঙ্গী মৃত্যু করবো সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল।'

স্বজাতা বারান্দার বসে আকাশের দিকে চোখ রাখে। বাতাস চিরে বারে বারে ডেরার ফেরা পাখিটাকে খোঁজে। মনে মনে ক্যাগিলে যুদ্ধরত জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বলে সমস্ত দেশ তোমাদের পেছনে। তোমরাই দেশের গৌরব।

সংসারে এই মহিলা এখন বড় একা। হঠাৎ পাখিটার মতই। বাতাসে করুন গানের সুর। এ সুরও মানুষকে বড় একা করে দেয়। বড় বাথা। ফলস্বরূপ মোচড়ানো ব্যথার বিকল করে দেয়।

এখন সকাল নটা। দেয়াল ঘড়ি ৫৫ ৫৫ শব্দে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় সময়ের হিসেব। অধেক আকাশ জুড়ে মেঘ। মেঘের তলে তলে বেড়ে উঠে বেলা।

আজ একেবারে খিদে নেই তাঁর। কিছু মুখে তুলতেও ইচ্ছা করছে না। ছেলেটা সকালেই আসবে। সেরকমই লিখেছে। সাড়ে সাতটা-আটটাত্তে হাওড়ার নামবে। রোডও আজ আর ছাড়া হল না। ট্রেনের খবরটা জানা যেত। কি ভুলো মন। কোন কিছুই ঠিক ঠিক মনে থাকে না। এই যেমন

সময়ের কাজটা সময়ে না করা। থাকতো তো। শুনেনি বা কি হতো? হরতো শনতে হতো, আজ হাওড়া জম্মু-তাওয়ারি এন্ট্রপ্রেস অসম্ভব দেবীতে আসছে। এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা; নাকি তারও বেশি! ট্রেন লেট তো সব লেট। অনেক কিছুই পেছনে পড়ে যাওয়া

রেডিওটা ছাড়তে হবে, অন্তত সংবাদটা। বারান্দা থেকে উঠতে কোমর টানটানিয়ে ওঠে। ঘরে গিয়ে রেডিওর নভটো ঘোরান ক'বার কড় কড় করে বেজে ওঠে। বিয়ের রেডিও। বরসও হয়ে গেল। আঠাশ। হ'্যা আঠাশই হবে। আঙুলগুণে ছেলের বরস হিসেব করতে ক' আঙুল গুনেই জিভে কামড়, বালাই ঘাট, ছেলের বরস কি গুণতে আছে! অখণ্ড পরমারু ছেলের। আর তো কেউ নেই। স্বামী নেই। কেবল এই ছেলের মুখ চেয়ে থাকা। সে তো চার-ই নি, স্বপন সৈনিক হোক। বরং অমিত তাকে প্রথম কৈশোর থেকে খেলনা বন্দুক কিনে দিতেন। আর একটু বরস বাড়তে বেলুন ফাটানো বন্দুক দিয়ে ক'-হাত দূরে দেয়ালে কাগজ সে'টে কাগজের মাঝখানে আলতার লাল ফোঁটা দিয়ে তাক করতে বলতেন। তাঁর উৎসাহে স্বপনের সৈনিক হওয়া। স্বজ্ঞাতার আকো মনে পড়ে তাঁর কথাগুলো, যে দেশের আলো অশ্রু আমাদের জীবনধারণ, সে দেশ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের, আমাদের সন্তান-সন্ততি।

তখন '৭১-এর মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভারতীয় ফৌজ। কাম্বীরের হারানো ভূখণ্ড ভারতের দখলে আনার কথাও তখন পত্র-পত্রিকাগুলিতে ফলাও করে ছাপা হচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর পাক-সেনাদের অত্যাচারে ভিটেমাটি হারানো বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চাপ তখন গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে। কলকাতার ফুটপাথে, স্টেশন চত্বরে উদ্‌যাত্তর ভিড়। তাদের কি দুঃসহ পরিস্থিতি। দেখতে দেখতে সদ্যজাত স্বপনকে বুকে ধরে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন স্বজ্ঞাতা।

ন'টা পনরোর সংবাদ হচ্ছে এখন রেডিওতে। 'সমগ্র কার্গিল এখন ভারতীয় সৈনিকদের দখলে। গত রাতের তুমুল যুদ্ধে নিহত তেইশজন পাক জঙ্গী। সমস্ত পাহাড়ী বাস্কার এখন জঙ্গিমুক্ত। গাইশালে মর্মাস্তিক ট্রেন দু'ঘণ্টার নিহত তিনশ'রও বেশি বাগী। দু'ঘণ্টার পেছনে আই-এস-আই-এর হাত সন্দেহ করা হচ্ছে।

ভ্যাপসা গরমে কপালে বিস্মদ বিস্মদ ঘাম ফুটে ওঠে স্বজ্ঞাতা দেবীর। সংবাদটা অনেকখানি '৭৭-এর ১৫ই অগাস্টে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংবাদের সঙ্গে দেশ ভাগা আর জাতি দাপার মতই আনন্দ-বেদনার মেশামেশি, মাখামাখি। ভারতে দীর্ঘশ্বাস ঠেলে ওঠে নাভিমূল থেকে।

রেডিও বন্ধ করতে আবার সেই পাখিটার ডাক। বাতাসে কান্না ছড়াচ্ছে।
ছড়িয়ে চলেছে। বাইরে কাঠের গেট টানার শব্দ। স্বপন! ক' পা এগিয়ে
যান তিনি। বারান্দার খুঁটি ধরে হতাশ ভাবে তাকান।

—নিতু! স্বপনের কাকার মেয়ে। বছর ঘোল-সতেরোর। পাশেই
বাড়ি।

—হাতে কি?

—নারকেল পিঠে। মা বলগো, তোর দাদা আসবে আজ। দিয়ে
আয়।

—আসবে তো, কিন্তু কত আর দেির করবে! কি জানি ট্রেন লেট
কি না!

—রান্না ঘরে রেখে আসি জ্যেঠিমা?

—আয়।

বাটি হাতে নিতু রান্না ঘরে ঢুকে যায়। এটা-ওটা নাড়তে নাড়তে, 'কন্যাং।'
শব্দটা বৃকে বাজে সজ্জাতার, থালা পড়লো?

—হ'্যা জ্যেঠিমা।

নিতু এসে পা কুলিয়ে বসে বারান্দার। ঘরের তাক থেকে এনেছে কটা
পত্রিকা।

আকাশের দিকে চোখ রাখেন সজ্জাতা। পাখিটাকে খোজেন। পাখিটাকে
কেন ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না? স্কুল থেকেও আর গানের করুণ সুর ভেসে
আসছে না।

স্কুলের অনুষ্ঠান কি বন্ধ হয়ে গেল নিতু?

—ভখন তো এমনি হ'চ্ছিল। বিকেলে হবে। অনেকক্ষণ চলবে।

একটা পত্রিকার পাতা ওল্টায় নিতু, অজ্ঞান আহাজার ছবি। যুদ্ধ কিমানের
পাইলট। কি রকম নিম্নমভাবে মারা হয়েছে তাকে। তার নাক, কান কেটে—
পাকিস্তানী সৈনিকরা কি ব'র, ন'শংস! চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে।
এক একটা করে পাতা ওল্টাতে থাকে। যুদ্ধ আর মৃত্যুর খবরে ভরা। সংশয়
জড়ানো প্রশ্ন, এখন কি শব্দ যুদ্ধই হচ্ছে জ্যেঠিমা?

—এ যুদ্ধ যে মাজুচুঁমি রকার। আমাদের চারদিকে হানাদার, শত্রু।
চার চারবার পাকিস্তান কাম্মীর আক্রমণ করলো! আমরা জিতলাম, কিন্তু
কত মানুষের বৃক যে খালি হয়ে গেল! অজান্তেই কথটা বেরিয়ে আসে
সজ্জাতার মূখ থেকে। উঠে আসে হৃদয় মোচড়ানো দীর্ঘশ্বাস।

নিতু উঠে পড়েছে। ঘরে যাচ্ছে। পত্রিকাগুলো রাখবে। এবার চলে

যাবে। একা থাকতে হবে স্নজাতাকে। কি জানি কতক্ষণ একা থাকবেন !
 চোখ তোলেন আকাশের দিকে সেই একা ডাকা পাখিটাকে খোঁজেন। তাকান
 সামনে। খাবার মুখে একটা শালিখ। নিশ্চয়ই যা শালিখ; ক'দিনই তো
 নিয়ে যাচ্ছে। সামনের বকুল গাছটাতে বাসা। বাচ্চাগুলো এখনো উড়তে
 শেখেনি হয়তো। একটা দুটো কাকও ক'দিন খুব জ্বালাচ্ছে। শালিখ
 দুটোও মরিয়া। তাদের ছোট ছোট পাখনার, পায়ে, ঠোটে শত্রু মোকাবিলার
 শক্তি। শব্দ উঠছে 'কিচির মিচির,' 'বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও।' এ সংগ্রাম
 সন্তান রক্ষার, আত্মরক্ষার। এসব দেখতে দেখতে স্নজাতা মনে করেন, পাখিহীন।
 যুদ্ধবাজদের স্বভাবটাও এই সব কাকদের মত। অন্যের সম্পদ, প্রাণ খুবলে
 নেবার জন্যে এদের ঠোঁট, নখ সব সময়ই ব্যস্ত। কাক দুটোও নাছোড়বান্দা।
 আর শব্দ দেখা নয়। স্নজাতা উঠে দাঁড়ান। উঠোনের পাশ থেকে একটা
 ডিল তুলে নেন। 'স্যাং' করে ছুঁড়ে দেন কাকটাকে লক্ষ্য করে। কাকটা কা-কা
 শব্দ করে উড়ে যায়।

একটা শালিখ গাছের মাথার ওপর কবার পাখনা নাচিয়ে বাসায় গিয়ে
 বসে। শাখা-প্রশাখা পাতার আড়ালে। আর দেখতে পান না। হয়তো আদর
 করছে তার বাচ্চাদের। শিশু শরীরে ঠোঁট ঠুকরে বলছে, ভয় নেই, ভয়
 নেই।

এখন দুপুর। তেমনটা খটখটে, ঠকঠকে নয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হলে
 হয়তো তাই হতো। দু-একফালি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আকাশে। রোদ-ছায়ার
 প্রকৃতি লাভ শীতল। বাতাসে জল মাটির গন্ধ।

গাছ-গাছালির দিকে তাকান স্নজাতাদেবী। মনের উৎকণ্ঠা হাল্কা
 করার চেষ্টা করেন। ওঝ মনে হয়, আজ দিনটা বুঝি হারানোর সুরে বাঁধা।
 সকাল থেকে বাতাস যেন সেই কান্নার সুরকে আঁকড়ে আছে। মনে হতে
 আকাশের দিকে তাকান, সেই পাখিটা, আর তো ডাকছে না। প্রাণ ছেঁড়া
 কান্নার মত ডাক।

এক একবার ভাবেন, কান্নাকে খোঁজা কেন? মানুষ কি ভেতরে ভেতরে
 কান্নাকেই ভালবাসে। মাথা পেছনে হেলিয়ে সূর্যের দিকে দেখেন। ছায়া
 মেরে দেবার মত মাথার ওপরে সূর্যটা, শত্রু মেঘে ঢাকা ঢাকা। ছোট স্বপনও
 এক একসময় দু-হাতে চোখ ঢেকে বলতো, 'মা, হারিয়ে গেছি আমি।' মেঘ
 সূর্যের যেন তেমনি লুকোচুরি খেলা চলেছে সারাটা দিন।

স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে কটা প্রায় বোটা শূন্যকরে আসা জবা ফুল তুলে
 স্নজাতাদেবী তুলসী তলায় রাখেন। ইঁটে বাঁধানো থাক-থাক ফুট দুই উঁচু
 বেদীর মাঝখানে তুলসী গাছ। বৃষ্টি মাটির রসে সবুজ সতেজ। গলার

দাঁড়ি জড়িয়ে প্রণাম করেন। প্রায় সাদা মাটি চন্দনের মত কপালে উঠে আসে।

ভিজে কাপড়টা পাশে উঠানোর টেব থেকে দূরত্ব রজনীগন্ধা নিয়ে স্বামী আর ছেলের ফটোর নিচে গুঁজে রাখেন। ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া প্রাণের মানুষদের। একশ'ও কালো মেঘ আর মেঘের বৃকে চিরক দেওয়া বিদ্রোহের মত স্মৃতি ঘুরে ঘুরে পাক খায়।

অমিতের চোখে তিনি প্রথম ধরা পড়েছিলেন। তারপর একদিন গুঁড়ি গুঁড়ি লজ্জা জড়ানো পারে তাঁর এই সংসারে ঢোকা। সেই আড়ম্বর, আনন্দ, উন্মত্ততার মধ্যেও সানাইটা যেন কান্নার মত বেজেছিল। তবু সে ছিল তাঁর জীবনে নতুন সূর্য ওঠার দিন। কিংবা অনন্ত সমুদ্র থেকে অন্য এক পৃথিবীর শব্দ জন্মলগ্ন। তখন দিন ছিল সোনার পাতে মোড়া, রাত রূপকথার—রাজপুত্র, রাজকন্যার।

একসময় স্বপন এল। স্বপ্নে পাওয়া ধন। এই তো বছর তিনেক আগে, স্বপন ছুটি নিয়েছিল একমাস। সবাই মিলে গিরেছিলেন অমরনাথ দর্শনে। ফেরার পথে পাহাড়ের ধসে নেমেছিল। ধসে এটাকা পড়েছিল অনেকে। চাপা পড়েছিল মাত্র ক'জন। তাদের মধ্যে ছিলেন অমিত। মৃতদেহটাকেও আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। ভরা বৃকে ষাওয়া, আর খালি বৃকে কান্না নিয়ে ফেরা। দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে তাঁর বৃক ঠেলে। পেয়ে হারানোর বস্তুনা মাখানো দীর্ঘশ্বাস।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অমিতের ফটোর ওপর হাত রাখেন তিনি। স্বগত উজ্জ্বল মত উচ্চারণ করেন, আজ আমাদের ছেলে ফিরবে বৃদ্ধ জয়ের গৌরব নিয়ে। তুমিই ওকে পাঠিয়েছিলে, এ গৌরব তো তোমার।

ডান চোখের পাতাটা কীপছে কেন? বাইরে একটা কাক ডাকছে যেন, কখন থেকে! কটা শালিখের কিচির-মিচির, ঝট-পট, পাখা ঝাপটানোর শব্দ।

ব্যস্ত পাজে সুজাতা দেবী বারান্দার আসনে, 'হাই—হাই' হাত তুলে কাক ডাঙান। ছুটে উঠেনে নামেন। বকুল গাছটার নিচে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েন। একটা বাচ্চা শালিখ, চোখ ফুটেছে, পালকও গাঞ্জিয়েছে। শব্দ ওড়াটাই শেখেনি। আর শিখবে না কখনো! ডান হাতের তর্জনি দিয়ে নাড়তে থাকেন বাচ্চাটাকে। নিখর। মন কেঁদে ওঠে তাঁর। দাঁচোখ টল্ টল্ করে ওঠে জলে। একটা অন্য আশঙ্কা তাকে আহত করতে থাকে। ওপরের দিকে তাকান। শালিক দূরত্ব বসে পাশাপাশি দূরত্ব ডালে। শান্ত। হয়তো বা হারানোর লোকে স্তম্ভ। ওদের চোখে জল আছে কিনা বোঝবার চেষ্টা

করেন। সম্ভান হারানোর বেদনার দিক থেকে মানুষের সঙ্গে পাখির কোন তফাৎ বুঝতে পারেন না তিনি। ভাবনাটা মনে হতেই সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে ওঠে।

আবার সেই কান্দার সুর। মুখ তোলেন স্জাতা দেবী। পাখিটা কি খুব একা! ওরও সম্ভানকে কি ঠুকরে খেয়েছে কোন কাক! নাকি চিল, শকুন!

উঠে দাঁড়ান তিনি। মরা হোক, তবু এটাকে কাকের মুখে ফেলে দেওয়া যাবে না। অন্তত, তার মা-বাবার সামনে। সে বড় খারাপ দেখাবে। ঘর থেকে একটা খুড়ি এনে গাছের নিচেই ঢেকে রাখেন মরা বাচ্চাটাকে।

চাপ চাপ মেঘ মুখে নিরে সূর্যটা ঠিক মাথার ওপরে। এখনো এলো না কেন ছেলেটা!

কত যে অশুভ চিন্তা! ক্লান্ত স্জাতাদেবী গড়িয়ে পড়েন বিছানায়। বাইরে গেট টানার শব্দ। ‘স্বপন’ ডাকটা যেন তাঁর নার্ভিস্‌য়েল থেকে উঠে আসে। খাট থেকে বারান্দায়, হোঁচট খাওয়ার মত দ্রুত পারে।

—কাকীমা আমরা।

...ওঃ, হতাশ, ক্ষীণ কন্ঠ তাঁর, এস।

—না কাকীমা, শিন্নালদা নর্থ লাইনে ট্রেন বন্ধ প্রায় সকাল থেকে। এই সবে লাইন খুললো। খুব ভিড়! আমরা স্টেশনে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ বাবা, যাও ভো। একটু খোঁজ নাও। জম্মু তাওয়াই হাওড়ার পৌঁছেছে কিনা? স্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলে—

—হ্যাঁ জেনে নেবো।

ছেলেগুলো যেমন এনোছিল, তেমনি বেরিয়ে যায়। স্জাতাদেবী সৈদিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বেশ ভালো ছেলেগুলো। স্বপনের বন্ধু ওরা। শহীদ স্মৃতি সংঘের। কার্গিল ফ্রন্টে টাকা পাঠাবার জন্যে খুব খাটছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করছে। যে যা পারে। সামর্থ্য অনুযায়ী দান। স্জাতাও দিয়েছেন পাঁচশো এক টাকা। পাঁচশ' টাকার ওপরে হলে তা আর শহীদ স্মৃতি সংঘের নামে পাঠাচ্ছে না। দাতার নিজের নামেই যাচ্ছে টাকাটা। ছেলেগুলো এসে রাসিদ ধরিয়ে দিয়ে যায়। বেকার তবু সং। গ্রামের নবাব প্ররোজনে বেশ করেও। রাত দিন মানে না।

আবার বিছানায় এসে গড়িয়ে পড়েন তিনি। চোখের কাছে ধরেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পাতা ওলটাতে থাকেন একটা একটা করে। ‘কাশ্মীর কেন ভারতের?’ হানাদার পাকিস্থানের হাত থেকে কাশ্মীর রক্ষার জন্যে রাজা

হরিসিং-এর ডারতে যোগদান ! তবু পাকিস্তানের কাম্বীর আক্রমণ। পরাজয় আর মৈত্রী ছুঁতি। এক দূবার নয়, চার-চারবার। যেন শান্ত শান্তির আর স্বর্ণরাজ্যে মাঝে মাঝে অসুন্দর তাড়ব। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়েও পাকিস্তানী জঙ্গীদের কাম্বীর হানার প্রস্তুতি। এ সমস্যার কি কোন সমাধান আছে ? ভুলটা কি নেহরুর, নাকি !

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্—ঘড়ির কাঁটার শব্দ। নৈশেন্দ মানুসকে উৎকীর্ণত করে, যন্ত্রণা বাড়ার। ছেলোটো এখনো এলো না।

স্বনাৎ' রান্নাঘরে আবার থালা পড়ার শব্দ। বিছানা ছেড়ে এগিয়ে যান তিনি। 'নিশ্চই কিডাল। না তো। নিতু কি রকম যে রাখে সব !

বারান্দার এসে আকাশের দিকে তাকাল। ব্যাথা জাগানো পাখিটাকে খোঁজার চেষ্টা করেন। কি জানি, হয়তো বা যন্ত্রণাকেই খোঁজেন।

জ্যোতিষা নিতু পথের গেট ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে বলে, অনু, পুন্ডদদারা তো এখনো এল না। স্টেশনে যে গেল। বললো তো এখুনি আসবে।

—হয়তো হাওড়ার গেছে।

নিতু এখানে প্রায় সারা দিন থাকে। এক-একবার বাড়ি যার আসে। রাস্তারটা থাকেই।

—মাকে বলে এসেছি। আজ বিকেলে স্কুলে যাব। ২২-শে শ্রাবনের অনুষ্ঠান। তুমি যাবে তো জ্যোতিষা ?

—কি করে যাই ? তোর দাদা তো এখনো এল না। একটা চিন্তা। এলে ওতো যেত।

—জ্যোতিষা, হেডস্যার বলছিলেন দাদাকে বীরের সম্বন্ধনা দিবেন।

সুজাতাদেবীর মন গর্বে আনন্দ ভরে ওঠে। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা কিন্ কিন্ করে বাজতে থাকে। সেই একা পাখিটার কান্নার সুরের মত। সে কি হারাবার ! জানেন না তিনি।

বেলা পড়ে আসে। আকাশের সব মেঘ যেন কোথায় উঠাও। দিনের শেষ আলো অশ্রুদ মারার জড়িয়ে শীতল গাছ-গাছালির শরীরজুড়ে। বাতাসে রবীন্দ্রনাথের বিরহ বেদনা জড়ানো গান, হয়তো আমার এ পথে আর হবে নাকো আসা।

সেই পাখিটার ডাকও শুনতে পান সুজাতা। এতক্ষণ কোথায় ছিল পাখিটা, কি জানি !

একটা গাড়ি মোরাম রাস্তা ধরে ছুটে আসছে। পেছনে পেছনে দঙ্গল বেঁধে লোক। কোন চিংকার নেই। জাতীয় পতাকা উড়ছে গাড়িটার ওপরে। গাড়ি থামলো ঠিক তাঁর পথের কাছে।

স্বজাতাদেবী জানালা দিয়ে সবটাই দেখলেন। সব বৃক্কতেও পারলেন একটা আত'নাদও তার গলা বেয়ে ঠেলে বের'ল না। চিংকার করে কে'দে উঠলেন না। শুধু দু' ফোঁটা জল দু' চোখের কোনায় আটকে গেল শিশির বিন্দুর মত। কিছুক্ষন দেয়ালে ছাঁবি দ'টোর দিকে দেখলেন। শান্ত-সুন্দর। ভাবলেনহীন। জীবনের সমস্ত ভর আশঙ্কা উৎক'ষ্ঠার বাইরে জীবনের প্রতিমূ'র্তি'।

ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। স্থির, দাঁড়ালেন ট্রাকটার কাছে। কথা হারা উপাস্তৃত সবার নিঃস্বাসের শব্দ শুধু মম'রিত হতে থাকলো। একজন জওয়ান স্বজাতাদেবীকে স্যালুট করে স্বপনের মূ'খের ওপর থেকে জাতীয় পতাকাটা সরিয়ে দেয়। অশ্রুগামী সূ'র্যের হলুদ আলোর উজ্জ্বল ম'ত মূ'খ। কিছুটা বিবর্ণ। তবু প্রসন্ন সুন্দর আশ্চ' ত্যাগের গোরবে ধীপ্ত।

স্বজাতাদেবী মাথা নিচু করে চুপ খাওয়ার মত মূ'খটা ছেলের মূ'খের পরে রাখেন। গোটা বনে শব্দ ওঠে—শান্তি-শান্তি।

স্কুলের অন'স্থান ছেড়ে দলে দলে সবাই সেখানে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু তাঁর মনে হল, মাইকটা যেন আরো কাছে বাজছে, রেজেই চলেছে, এ মহা বিশ্বে কিছু কি হারায়. হারায় না কিছুই। □

প্রসঙ্গ : নারীমুক্তি ও রামমোহন

অনিল সামন্ত

বাঁদ প্রশ্ন করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গের উন্নয়নযোগ্য ব্যক্তিত্ব কে? নির্দিষ্ট করে বলা যায় রাজারামমোহন রায়। এর সম্ভব কারণ কি? তাহলেও একবাক্যে বলা যায় তিনি তাঁর কথার কর্মে সমগ্র ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবজাগরণের ভাবধারার উদ্ভেদ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনকে ধর্মীয় উদ্ভাদনার বিরুদ্ধে পরিচালিত করে শিকড় ধরে টান ঘেরে সম্মুখে সম্মুখপাতিত করেছেন ধর্মীয় উদ্ভাদনা সহ নারী নির্যাতন, দাসপ্রথা সত্যীদাহ প্রথার মত বর্বর কুপ্রথা। সেদিন আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ করে ডঃ বিপিনচন্দ্র রামমোহন সম্পর্কে বলেন, "Rammohan Roy was the brightest star in the Indiga sky during the first half of the 19th century but he was not a lone star."

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম পদ্ধতিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে 'ভারত পথিক' বলে অভিহিত করে ভাবাবেগ সম্বরন করতে পারেনি। ই. এম. এস নাথুরহিলাদ এক ধাপ এগিয়ে বলেন, "Raja Rammohan Roy who was the best known among those who led this movement was not a mere social reformer, he was also a brilliant representative of the bourgeth is nationalist ideologies."

অধ্যাপক সুনীতি সরকার অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, Rammohan's achievements as a moderniser were thus both limited and extremely ambivalent the limitations were basically those of this times."

সমালোচনা, পাল্টা সমালোচনা, সুখ্যাতি, বশ অপরূপ ষাইই থাকুক না কেন তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের নাড়ী-স্পন্দনে হাত রেখে রোগ নির্গণ করে রোগ সারিয়ে তোলার সং সাহস দেখিয়ে ছিলেন। রামমোহনের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ধর্মসংস্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। কেননা, হিন্দু সমাজের প্রচলিত গলদ ও কুসংস্কারের বেড়াঝাল ধর্মীয় বিধান ও রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হত। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে শ্রী জাতির প্রতি অমানুষিক অবিচার তাকে গভীর

ভাবে আশ্রিত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে বাঙালী নারীর না ছিল কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা, না ছিল স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার। জন্ম থেকেই কেনা বাদী। নিজের স্বয়ং, নিজের ভালমন্দ বুঝে ওঠার অনেক আগেই চালান হয়ে যেত পুরুষের দখলে। বহুপত্নী স্বামীর চাষের জমি হিসাবে বছরে বছরে দিয়ে যেতে হত কৌচা কৌচা ধান। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মাহুতি দিয়ে, আত্মহুতির জলপড়া খেয়ে সহমরণের সার্টিফিকেট হাতিয়ে বাঁচতে হত ভারতীয় ললনাদের নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে। বহু পত্নী স্বামীর চাষের জমি হিসাবে বছরে বছরে দিয়ে যেতে হত কৌচা কৌচা ধান। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মাহুতি দিয়ে আত্মহুতির জলপড়া খেয়ে সহমরণের সার্টিফিকেট হাতিয়ে বাঁচতে হত ভারতীয় ললনাদের নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে, সমাজপতিরা নারীর কোন অধিকার মানতে নারাজ। নারীকে খেলিয়ে তাদের আনন্দ। নারীকে গোসল করে কি ভাবে ভোগ করা যায় এই ছিল স্বপ্নবাদের চিন্তা। নারীকে আপন ভাগ্য গুণ করবার কোন অধিকার ছিল না। এই সব অসহায় নারীদের সহানুভূতির আলোকে স্পেনহে' বুকে টেনে নিয়ে মাথার হাত বুলিয়ে নাচা অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি আর কেউ নয়, আনাদের ঘরের ছেলে রাজা রামমোহন।

তিনি নতুন করে আমাদের নারী মন্দির কথা শোনালেন। অন্ধকার তমিস্রা ভেদ করে নারীকে নিয়ে এলেন শিকার পাদ প্রদীপে। অবশ্য এ ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টকে ধন্যবাদ না জানিয়ে ছোট করতে চাই না। লর্ড বেন্টকের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। সতীদাহ প্রথা সুপ্রাচীন কাল থেকে মাটির গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। বিশেষত রাজ পরিবারে এর উঠা বসা ছিল একেবারে নিয়মতান্ত্রিক, এক সময় এ দেশের গভী ছাড়িয়ে প্রাচীন গ্রীস, মিশর, চীন, মালয়েশিয়া, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল।

বৈদিক সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারতে হিন্দুধর্মে ভারতের নানাস্থানে সতীদাহ প্রথার রীতিমত রেঞ্জোজ ছিল। এই প্রথা রদ করার যে চেষ্টা একে বারোই হয়নি তা নয়, হারেছিল; তবে দার সারা ভাবে। বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে ঝুঁকে পড়া নয় একান্ত গা সওয়া ব্যাপার ছিল। মধ্যযুগে আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশা তাঁদের রাজত্বকালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়ে ছিল, কিন্তু হালে পানি পায়নি। কেননা নিজেরাই হাজার বাদীর প্রসাদ ২৩৪ / কবিতার কাগজ

পুষ্ট। এক বাদীতে মন ভিজেনি। দু চারটা যদি নাই খেলাই তবে...কি খেলাম।

আধুনিক যুগে খ্রীষ্টান মিশনারী থেকে শুরু করে কর্মচারী মধ্যস্ব-
ভোগী এমন কি গভর্নর জেনারেল পর্যন্ত সকলেই এই জঘন্য বর্বর প্রথা রদ
করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। তবে উদ্যোগে ভাটা ছিল। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টক
রামমোহনের সহযোগিতায় মরা গাঙে ঢেউ তুলেন। বৈদিক আর্থ নমাজ
পুরুষ শাসিত হলেও নারীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। নারীরা স্বাধীন হলেও
স্বোচ্ছাচারিণী ছিল না। স্বামীর অধীনতা মেনে পরিবারের বিভিন্ন আচার-
অনুষ্ঠানে স্থান করে নিতে তাই স্বামীর সংসারে স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা
হত। আবার পতির যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত বলে জ্ঞানাকে পত্নীও বলা
হত। পার্শ্বাশ্রিত্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে 'পুত্ৰানো যজ্ঞ সংযোগে'। বৈদিক
যুগে নারীদের উপনয়ন পর্যন্ত হত। নারীরা ধর্মতত্ত্ব দর্শন চর্চা ও বিদ্যা
চর্চা পর্যন্ত করতে পারত। তাই স্ত্রীদের 'ব্রহ্মবাদিনী সদ্যোধাহা' বলা
হত। এই যুগে বিদুষী রমণীদের মধ্যে মৈত্রেয়ী, গাণ্ডী, বিশ্ববারা, অশ্বিনী,
ঘোষা, মমতা প্রভৃতি রমণীদের নাম প্রখ্যাত সঙ্গ্রে উচ্চারণ করা হত। বিষ্ণুলা
ও মৃণালিনী অসিচালনা ও যুগ্মবিদ্যার পারদর্শিতা দেখিয়ে সকলের দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছিল। ঋগ্বেদের প্রথম স্কন্দের মন্ত্রগুলিতে নারীর স্বাধীনতা
ছিল এবং বহু বেদ মন্ত্রের রচয়িতা ছিল নারীরাই ঋগ্বেদের কোথাও সহ-
মরনের উল্লেখ নেই। পরিণত বয়সে নারীদের বিবাহ সম্পন্ন হইত। বাল্য-
বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। স্বামীর মৃত্যুর পর
স্ত্রীরা সারা জীবন বৈধবা জীবন যাপন করত। তবে নিঃসন্তান বিধবা দাতৃ-
জ্ঞানাকে দেবর কর্তৃক বিবাহের বিধান ছিল; অর্থাৎ নারীদের সমাজে স্ব-
ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। ধর্ম বা সমাজের দোহাই দিয়ে নারীকে
তখন চিতার আগুনে পুড়ে মরতে হত না। সতীদাহ কন্যাপন্য ও নারীদের
বহুবিবাহ প্রথাগুলি তখন একমাত্র রাজপরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ
ছিল। পিতার সম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ অধিকার ছিল। স্ত্রী পরিত্যাগকারী
স্বামী যে কঠিন শাস্তি ভোগ করত স্বামী পরিত্যাগকারী স্ত্রীও সেই শাস্তি
ভোগ করত। অথবা বেদেই প্রথম সহমরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারীকে
তখন ভোগ্য বস্তু হিসাবে দাঁড়িপাল্লার ওজনে কেনা হত। রামায়ণে সহ-
মরণের উল্লেখ থাকলেও রামচন্দ্র সীতাকে পরহস্তগতা নারী বলে ভোগ করতে
স্বীচিতে বাধে বলে সকলের সামনে প্রত্যাখ্যান করতে বিধা বোধ করেনি।
রামায়ণে এও দেখা যায়, কৈকেয়ীর সাথ হয় রাজাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞার বাধতে।
লক্ষ্মণ বনগমনকালে রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও উমিলা তার সঙ্গে পা
যেলারনি। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর রানীরা কেউই 'সতী' হননি...বিধবা

অবস্থাতেই বেঁচে ছিলেন। মস্লেদরী বিলাপকালে স্বামী নিশ্চয় মৃত্যুর হরে উঠেছিল। আবার মহাভারতে চোখ ফেরালে দেখতে পাই কোন কোন নারী স্বামী অনুগামিনী হলেও অনেকেই সে পথে পা মাড়াননি। মহাভারতে রাজা পাণ্ডুর মদতপড়্গেট দুই স্ত্রীর মধ্যে মাদ্রী স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বেচ্ছায় সহন্বতা হলেও কুন্তী ভূপেও নামোচ্চারণ করেনি। বৈদিকযুগে আর্থদের মধ্যে সহমরণ প্রথা ছিল না। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার করের মতে এই প্রথা দাস প্রথার মত বিদেশী আমদানীকৃত।

সিদ্ধ সভ্যতার যুগে অর্থীৎ দ্রাবিড় সভ্যতার নারীর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব দুইই পূর্ণমাগার বঞ্চার ছিল। মধ্যযুগে আকবর বাদশার রাজত্বকালে পুড়ে মরার ভয়ে অনেক হিন্দু বাল্যবিধবা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে বাচতে চেরেছিল।

সুপ্রাচীনকাল থেকে নারী জাতির এত মর্যাদা, এত প্রভাব, প্রতিপত্তি, এত বীরবন্তী থাকি সত্ত্বেও অবমূল্যায়নের খড়্গ খাড়া করে শাস্ত্রকারগণ বৈশ্যায়ন নৃত্ত ও মনুষ্যত্বতে উল্লেখ করেন,

১। স্ত্রীলোক বালিকা অবস্থার পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর আজ্ঞাবহ দাস হরে, স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের অধীনে দিনাতিপাত করবে। কোন মতেই স্বামী বা পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হরে থাকি চলবে না।

স্বামী দুর্গল পরদার নিরত এবং একেবারে গুণবর্জিত হলেও স্বামী স্ত্রীর কৃতব্য সেই স্বামীকে উপেক্ষা না করে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করা।

বধ্য স্ত্রীকে বিবাহের দশম বর্ষে, একমাত্র কন্যার জননীকে ষাদশ বর্ষে, মৃতবৎসা স্ত্রীকে পঞ্চদশ বর্ষে এবং কলহপরায়ণা স্ত্রীকে অনতিবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত।

পতির মৃত্যু হলে স্ত্রী ফলমূল আহারাতির দ্বারা সেহাতিপাত করবে, তথাপি কোন অবস্থায় পরপুরুষের নামোচ্চারণ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

স্ত্রীলোক আমৃত্যু সহিষ্ণু নিরমচারিণী এবং পতিব্রতা থাকবে এটাই তার পরম ধর্ম।

স্বামী ছাড়া পরপুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের পদদ্রোণপাদন করা চলবে না।

স্বাধীন স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহের কোন বিধান শাস্ত্রে উল্লেখ নেই।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্বাধীন স্ত্রী ব্রহ্মচর্য পালন করবে। অপুত্রা হলেও সে রকম স্ত্রী স্বর্গে আরোহণ করে।

৬। পুত্রলাভে কোন বিধবা নারী যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তবে সে

ইহলোকে যেমন নিম্ননারী পরলোকেও তেমনি স্বর্গস্থ থেকে বঞ্চিত হয়।

এত সব কথাই পরমন্দের অরণ্য একথাও বলেছেন কন্যাকে সবচেয়ে পালন করাও শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতার করণীয় কর্তব্য। মন্দেরার বিবাহ-পতি সেবা এবং গৃহকৃত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারীকে মর্খ করে রাখার বিধান তিনি কোথাও দেননি। নারীর বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কথা মন্দেরা কতৃক স্বীকৃত। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করে সমাজ মনস্ক হিসাবে গড়ে তোলে। শাস্ত্রকারদের নির্দেশিত সতীদাহ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথার মত কুপ্রথা যাকে বাজের আঘাত হানে। কতৃক চলে যাওয়ার ভয়ে শাস্ত্রকারগণ চোট খাওয়া বাঘের মতো যন্ত্রণার ছতপট করতে করতে শ্রী শিক্ষার বিরোধিতা করে শ্রীদের অজ্ঞানতার অশুভকারে রেখে রাখতে সেবাদাসী বানানোর হান খেলার স্বেতে উঠে বোষণা করে।

১। শাস্ত্র কোথাও শ্রী শিক্ষার উল্লেখ নেই।

২। মেরেরা লেখাপড়া শিখলে ব্যাভিচারিণী হয়। স্বামী শব্দর ও শ্বাসুড়ীকে অবজ্ঞা করতে শেখে।

তাছাড়া মেরদের বহুর বহুর ছেলে বিয়োতে হয় বলে অর্থ উপার্জন করতে হয় না। তাই তাদের বিদ্যা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

৪। মেরেরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।

উনিবিংশ শতাব্দীর মূচনার বাঙালী মেরদের সহমৃতা হওয়াই ছিল জল ভাতের ব্যাপার। ব্রিটিশ ভারতে তখন সারা কলকাতাজুড়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও আধুনিকতার এক বিচিত্র সহকৃৎহান। একদিকে হিন্দু কলেজের ইংরেজীমানা ইউরোপিয়ান শিক্ষক হেনরী লুই ডিভিভান ডিরোজিওর নেতৃত্বে সারা কলকাতাজুড়ে দাস প্রথার মত বিভিন্ন কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীনির্বাসন ও অন্যান্য সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দাবার গণআন্দোলন অপরদিকে কলকাতার আশেপাশে অসহায়ভাবে চিতার আগুনে জ্বলে পড়ে রহে অগণিত আধ ফোঁটা কুন্মিত প্রাণ। মানুষ ভেবে ঠিক করেছে আর মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে নতমস্তকে মেনে নেওয়া নয়, এবার দাবার গণ আন্দোলন। মানুষ ক্রমেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। শূদ্র হল প্রথা ভাঙা ও প্রথার পক্ষে জোরদার আন্দোলন। সোঁদিন আন্দোলনের প্রথম সারিতে চিতাবাঘের মত বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন রামমোহন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার মত বর্বর কুপ্রথাকে রোধ করে নারীকে জ্বলন্ত চিতার অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে সমাজে জন্মভাবে বেঁচে থাকার ছাড়পত্র আদায় করে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন প্রথম পঁচাত্তিতে।

ভারতীয় নারীমুক্তির পথে ১। সহময়ন ও অনুগমন ২। বাল্যবিবাহ

৩। কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ ৪। বিবাহ সংস্কার ৫। বিবাহ বিবাহ
৬। পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ৭। শ্রমী শিক্ষার ন্যায় যে সব
অস্ত্রায় সেদিন পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল তার কিছুটা প্রচার, কিছুটা
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পিছ হঠতে শুরু করল।

রামমোহন নারীকে শুধুমাত্র জননী জায়া, ভগিনী কন্যা কিংবা কেবলমাত্র
পুত্রের শ্রম্যস্বিক্তি হিসাবে দেখেননি। তিনি নারীকে নতুন যুগের ভোরে
দাঁড় করিয়ে নারীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন নারীমুক্তির নিজস্ব পতাকা।
রামমোহনের সময়েই সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল
সবচেয়ে বেশী। সতীদাহ প্রথা রোধ করার আন্দোলন যে রামমোহনের আগে
কেউ করেননি ব্যাপারটা এমন নয়। আন্দোলন হয়েছিল তবে এতটা বিস্তৃত
আকারে নয়। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণে আন্দোলন
হয়েছিল—তবে তাতে প্রদাহ ছিল না। উইলিয়াম কেরীর সতীদাহ সংক্রান্ত
শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা অনুমোদনের পরে ও এই প্রথা রোধ করার চেষ্টা
কার্যকর হয়নি। কোন আন্দোলন চোখে পড়ার মত নয়। লোকের ধর্মমতে
আঘাত লাগে এমন কোন কাজ ব্রিটিশ সরকার করেনি। ইংরেজ সরকার
সাম্রাজ্যবাদ প্রসারে ধর্মকে সহাবস্থান নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ
গভর্নরদের সতীদাহ প্রথা রোধে সায় ছিল তবে আন্দোলনের পথে নয়। কেউ
যদি আন্দোলন করে বসে, আন্দোলনের চরিত্রবৃত্তে সায় দিতে আপত্তি নেই।
তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীবিরোধী মনোভাবের
পরিচয় দিলেও পরবর্তী পর্ষায় তাকে এ নিয়ে কোন বড়সড় আন্দোলন করতে
দেখা যায়নি। সতীদাহের পক্ষে সেদিন রাধাকান্তদেব ভবানীচরন
মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট মানুসজ্ঞ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেও
রামমোহনের এ ব্যাপারে কিছুই মনে হয়নি। তবে এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর
অভিমত বিশেষ প্রনিধানযোগ্য, “socialist দিগের কতকগুলি literature
কিনিয়া আনিতে হইবে। আমরা যে সমাজ গঠন করিতে যাইতেছি তাহার
সম্মুখ পথে কি কি আছে তাহার জ্ঞান আবশ্যক। এই জন্য জাতীয় গ্রন্থ
পড়া আবশ্যক”। রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র
লেখেন তাতেই নবযুগের সাময়িক শব্দধর্ম শোনা যায়। রামমোহন এক
প্রকার বৃন্দ হয়েই লেখেন—“Now we find that the Government
are establishing a Sangscrit school uner Hindoo pundits to
import such knowledge as is already current in India.

সংস্কৃত শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তার মতে দেশের মানুষকে
অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দেওয়া। এক তিষ্ঠিতেই তিনি স্বদেশবাসীর মূখ
পূর্ব থেকে পশ্চিমে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নারীদের অর্জ্যত্বনা করতে

গিরে প্রাচীনের বন্ধ থেকে পা সরিয়ে নেননি। হিন্দু জাতির মহাব কীর্তন করলেও পৌত্তলিকতাবাদ পরিহারের স্বপক্ষে জোরালো মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রাচ্যাত্ম জ্ঞানবিজ্ঞান, নীতি নৈতিকতা, পাশ্চাত্য জন হিতৈষনার স্বপক্ষে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। ১৮২৪ খ্রীঃ রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ছত্রছায়া থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করা...বার উদ্দেশ্য সত্যীদাহ প্রথা ১৮২৯ খ্রীঃ বোর্টকের সহযোগিতায় সত্যীদাহ প্রথা নিবারণ...নেপথ্যে প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন। এত কিছুই পর ও কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুগণ তাদের এতদিনকার তুর্দপের তাস সত্যীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ক আইন নিষিদ্ধ করার জন্য আবেদন পত্রে স্বাক্ষর অভিযানের পথে নেমে বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেছিলেন। এমনকি লর্ড বোর্টককে ধন্যবাদ জানিয়ে রামমোহনের পক্ষে যে অভিনন্দন পত্র লেখা হয়েছিল তাতে রামমোহনের গুটিকতক বন্ধু ছাড়া বেশীর ভাগই নির্লিপ্ত থেকে ছিল। তবে রামমোহন যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের পথে ছিলেন সে বিষয়ে ১৮২৯ খ্রীঃ বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত মিসেস মার্টিনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, মার্টিন লেখেন, "Would not be brought into effect but for The powerful Through unacknowledged, aid to The great Hindu philosopher, Rammohan Roy sympathy, intelligence and fearless energy displayed through a Course of eightcenyears by their great and at length successful advocate. Rammohan Roy" এ সম্পর্কে সোমেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন সরকারী প্রচেষ্টা রামমোহনের সাহায্য ছাড়া সফল হত না। আঠার বছর ধরে রামমোহন আন্দোলনের পথে ছিলেন। শব্দ লেখনী ধারণ করে বা ছাত্ত মতকে খণ্ডন করেই তিনি তার আন্দোলন শেষ করেন নি। তিনি বিপদের কড়ি মাথায় নিয়ে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়ে জ্বলন্ত চিত্ত থেকে বিশ্ববাদের উদ্ধার করেন। এইভাবে নিজের মস্তকে দেশের লোকের যাবতীয় নিন্দা ও কুৎসা বহন করে অর্থ সামর্থ্য প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার মতো সংসাহস দেখিয়ে ছিলেন। রামমোহন সত্যীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য বাংলায় তিনটি এবং ইংরাজীতে চারটি গ্রন্থ রচনা করেন গ্রন্থ গুলি বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। বইগুলি হল (১) সহমরন বিষয়ক নিবর্তক সম্বাদ ১৮১৮ (২) প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ ১৮১৯ (৩ 'সহমরন বিষ' ১৮২৯। 'সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' সত্যীদাহের বিরুদ্ধে তার প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রামমোহন নিবর্তকের ভূমিকা পালন করেন। প্রবর্তক ও নিবর্তকের কথপোকথনের মধ্য

দিয়ে রামমোহন তার কঠোর তর্কজালে প্রবর্তক অর্থাৎ রক্ষনশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজকে ধরাশায়ী করেন। এর ফলে রামমোহনের উপর অত্যাচারের খবর খাঁড়ি কোঁপ হয়ে নেমে আসে। এমনকি গুন্ডা লাগিয়ে প্রাণনাশের হুমকি ও বিচিত্র কিছুর নর। অকুতোভয় রামমোহন সব কিছু উপেক্ষা করে, বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে চলাফেরা করতে থাকেন। পরে পরে অবশ্য জন সমর্থন পেতে শুরু করেন। যুগের সংকীর্ণ গোঁড়ামির উদ্বেগে উঠে রামমোহন তার সূচিচিহ্নিত মতবাদ ব্যক্ত করেই থাকতেন হিন্দু; তা সন্দেহকরার পেছনে তার এ্যামেদোলন অসাধারণ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের নিগুড় পরিচয় বহন করে। রামমোহন সত্যদাহ প্রথা নিবারণে সারাজীবন বুদ্ধিবাদী ভূমিকা পালন করে গেছেন। নারাজাতির মধ্যে তিনি অন্বেষণে কেঁদেছেন, সহানুভূতি হয়ে করে পড়েছেন। বহুবিবাহ রোধে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ-এ তিনি তার দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। হিন্দুনারীর সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন এবং তাঁরা যাতে তাদের ন্যায় অধিকার বুদ্ধি পায় সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীগণ মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় কার্যত সমান অধিকারী। কিন্তু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে বিরুদ্ধবাদীরা নারীকে গায়ের জোরে তার ন্যায় প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার কথা লিখে প্রকাশ করে গেছেন। এর ফলে নারীরা আত্মীয় স্বজনের গালমন্দে স্বীকার হয়ে নানা দুঃখে কষ্টের ভাগিদার হন। এই দারিদ্র্যের অন্যান্য ব্যবহারের ফলে এক সময় সহস্রাব্যবসায় লাইন পড়ে যায়।

নারী শিক্ষা প্রসারে রামমোহনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পঞ্চমুখে উচ্চ প্রশংসিত। যদিও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বিদ্যালয় স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন, তথাপি রামমোহন স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে প্রথম সারির নাগরিক যার কোন আগ্রহের শেষ নেই। নারী শিক্ষা বিষয়ক একাধিক বই লিখে তিনি উন্নতিশীল সভ্যতার সংস্কার এ্যামেদোলনে সর্বোত্তম তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন, আর তারই ফলশ্রুতি আজকের স্ত্রী শিক্ষা।

রামমোহন সচেতন ভাবেই জানতেন নারী শিক্ষার প্রসার না ঘটলে, নারীর বর্ণনায় দশা কোন মতেই ঘুচবে না। নারী শিক্ষিত হলে সে তার নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখবে, অন্যান্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ফলে সমাজ থেকে অন্যান্য অবিচার কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। রামমোহন তার একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন নারীরা বুদ্ধিমান হন। কি করে— যদি তাদের বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ দেওয়া না হয়। নারীকে আপন ভাগ্য জ্ঞান করবার অধিকার দিতে হবে। এ বিষয়ে তিনি তার একাধিক প্রবন্ধে নারীর স্বপক্ষে সাওয়াল করে গেছেন। রামমোহন কতখানি দূরদর্শী ছিলেন

তা প্রমাণিত হয় আজ যখন দেখি নারী শিক্ষা বিস্তারে রাজস্বয়মঙ্গলসহ তত্ত্ব চাকুরির নিরাপত্তা, বিধান সভা, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে আসন সংরক্ষণের জোরদার ব্যবস্থা। ভারতীয় সমাজে চিরকাল নারী তার সেবা সঁহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও পরিত্রস্তের বিনিময়ে পুরুষের কাছে পেয়েছে অবিচার লাঞ্ছনা নিষ্পত্তি। পুরুষেরা নারীকে জুতোয় শূকতাল্লা ছাড়া কিছুই ভাবতে শিখেনি। নারীরা পুরুষের দুর্দিনে গাছের ছাল হয়ে, লতায় পাতায় জড়িয়ে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সুদিনে যখন দুটো পরসাহাতে আসে তখন স্বামীরা নারীর মূখে শুভু দিয়ে বাজারের নাম করা দেহপসারিণী নিয়ে নাচের আসর জাঁকিয়ে বসে। নারীর এই রকম অবস্থার প্রতিকারের জন্য রামমোহন তার সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন। শুধু লড়াই করেই সন্তোষ হাননি, নারীকে অবমাননা, অত্যাচার ও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিয়ে নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন নারীমুক্তির বিজয় পতাকা।

আজ যখন দেখি নারীরা প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভুলে, যুগ পুরুষ রামমোহনের কথা ভুলে স্কুল কলেজ পানিয়ে সিনেমার করিডোরে হিন্দী ফিল্মের নায়িকার ভঙ্গিতে খুশির জোয়ারে ভাসে, প্রেমিকার হাত ধরে রাস্তায় বেলেঙ্গা-পনার মস্ত হয়, তখন নিজেকে গলা টিপে খুন করে আত্মঘাতী হতে হয়। মনে প্রশ্ন জাগে এই জন্যই কি রামমোহন ঘাম ঝরিয়ে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। প্রেমেরও একটা শূচিশুদ্ধ দিক থাকে। কিন্তু এ কোন বেলেঙ্গা-পনা? ভাবতে বলছি এই কারণে...নারীরা নারী হলেই তবেই ভারতের উন্নতি...তা না হলে সব কিছু শুথ হয়ে যাবে। "জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় সংসারের পসরা।" □

নির্মিত আত্মপ্রকাশ হচ্ছে :

একটি ঈর্ষণার গল্পের পত্রিকা

নতুন গল্প

নতুন গল্পকাররা গল্প পাঠান।

জীবন সরকার

৪, অনন্ত ফান্ট লেন,

কলিকাতা-১৪

দ্রষ্টব্য : ০০০-২২৬১১১৮

জমজমাট আসর

সুভাষচন্দ্র মাস্তা

ভুবনমোহন সর্দার। বরেন্দ্র হরেছে ঢের। স্বপনের বাবা তার উপর খোঁড়া। তবে জন্ম খোঁড়া নয়। ডাক্তারের জুল চিকিৎসার জন্যই ডানা পাটা গেছে। ইচ্ছে মত এদিক-ওদিক হাটা চলা করতে পারে না। বসে-বসে আর শূরে-শূরেই দিন কাবার করতে হয়। বাড়ীর পাশ দিয়ে কারুর বাতাসাতের গন্ধ পেলে ভুবন খুঁজে পায় আনন্দের জীবন। দু-চার কথা বলে অন্তত এক ঘেরোমি কাটাবার চেষ্টা করে। পান বাড়িতে কিছু খরচা বাড়ে বাড়ুক। তাতে অবশ্য স্বপনের কোন আপত্তি নেই। গল্পগদ্যে কিছুটা ক্রী থাকতে পারলেই ভাল। সংসারের সবার এক আধটু স্বাধি আসে।

গল্প তিনি খুব ভালই জানেন। ঠাকুরমার ঝুলি, গোপাল ভাঁড়ের সরস গল্প, ক্রিশ্ণের গল্প এ সব যেন তাঁর কণ্ঠস্থ। এছাড়া আরও মজার হল— বানিয়েবানিয়ে এমনই আশ্চর্য গল্প ভাঁজেন, পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেউই আর বাড়ীতে থাকতে চায় না। খাওয়া-দাওয়াও শিকের উঠে যায়। বাপু মায়ের হাঙ্গরো তলব সবেও নড়তে চায় না তারা।

আকাশবাণীর গল্প দাদুর আসর যেমন জাঁকিয়ে বসে, তেমনি। তবে এখানে হুঁকিখাটা আরও বেশী। সকাল-দুপুর-বিকেল নেই। যখন খুশী তখন। ডিউটের রুমের মত গ্রুপ গ্রুপ ছেলেমেয়েরা জুটে যায় আসরে। তাদের কি খুশার তুফান। উপছে পড়ে। পড়বে না? ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে কতই না ভালবাসে। ঠাকুর দেবতা, পশুপাখি, চোর ডাকাতের গল্প, সবচেয়ে মজার হল—ভূত পেড়ার হালচাল, রাক্ষসের তাণ্ডব, দৈত্য দানবের ধানাই-পানাই কোন কিছুতেই ঘাণিত নেই ভুবনের।

স্বপল সর্দার একদিন মনদিয়ে শুনছিল বাপের 'হুতুম পে'চার গল্প'। পে'চার তো দিনে বেরোবার সাহস নেই। রাতেই যত কারবার। কেউ কেউ আবার নিশাচরও বলে। পে'চার মুখ দেখলে নাকি অমঙ্গল হয়। হুওয়া কাজও প'ড হয়ে যায়। তাই পে'চার থেকে সবাই দূরে থাকতে চায়। কিন্তু পে'চা এমনই কৌশলবাজ—মা লক্ষ্মীর বাহন সেজে বসে আছে। জগতের ধনরত্নের যত খবর-সবর ওর কাছে। কোথায় আছে? কিভাবে হাতাতে হয়? সব কিছুই ওর নখদর্পণে।

খাস ভাল্লুকের প্রজাদের স্বপ্ন-দুঃখের হিসেব নিকেশও ওর কাছে। যেন সবার টিকি বাধা। যট গাছের কাছি দিয়ে আটপে'টে। শব্দ ওদের ২৭২ / কবিতার কাগজ

নয়, ওদের বাচ্চাদেরও। চড়ুইর বাচ্চা চড়ুই হবে। চালে কিংবা কাড়ি কাঠের ফোকারে বসে থাকবে। খুদ কুঁড়ো যা পাবে খাবে। তা বলে এ গাছে ও গাছে উড়ে উড়ে ফল খাবে। এত স্পর্ধা। নট এলাও।

গাধার ছেলে গাধাই হবে। ঘোড়া হওয়ার চেষ্টা করলে—বড় জোর খচর করে রাখা হবে। তাতে যদি বিশ্ব যশ্ব খাখে—তা বাখরুক। ডজন-ডজন রণতরী, শরে-শরে যশ্ব বিমানের হামলা, ক্ষেপনাস্ত্রের কটাক্ষ দৃষ্টি লক্ষ্য। বশ্তুকে ধংস করবেই। প্রয়োজনে উপগ্রহ থেকে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগে গোটা দুনিয়াটাকে ধ্বংস পাড়াতোও পারে। এমনি মারাজ্ঞাল বুনতে জানে ওরা।

টিটু আর ভোলা বলে ওঠে—ওরা দৈত্য হতে পারে, রাক্ষসও হতে পারে? ভুবনবাসী তখন গাল ফাঁলিয়ে বলে—হ্যাঁ, পারে। দৈত্যের লম্বা লম্বা হাত দিয়ে চুলের মূঠি ধরে আছড়ে ফেলতে পারে। রাক্ষসের নরুন নখে কলিজা ছিঁড়ে ফেলতে পারে। আর মল্লের মত দাঁতগুলো দিয়ে হাড় গুঁড়ো করে জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে গুঁড়ি মিশিয়ে ছাতু খেতে ওরা খুবই ভালবাসে।

রানা আর পড়া বলল—আমরা তো মূর্খির ছাতু, ছোলার ছাতু খাই, ওরা হাড়ের ছাতু খায়? শব্দ কি আর খায়! বস্তাবন্দী করে নিরুদ্দেশেও পাঠায়। মূর্নিয়া বলে ফেলল—ওখানে ওদের কে আছে? মানি, পিসি, আশ্চর্য স্বপ্ন? সারা দুনিয়াটা চষে বেড়াচ্ছে। উত্তর এলো—হ্যাঁ, চষে বেড়াচ্ছে। বাঁজ বুনছে। নতুন নতুন বাঁজ। হাইব্রীড। স্বাদে ঘাইহোক, পাঁচ কিলো কুমড়া দেখতে দেখতেই পঁচিশ কিলো। মেদ জমে জমে ভূঁড়ি তো নয়—গাছের গুঁড়ি। টিপ্পানি বসে না। এমন শব্দ।

বিশু বলল—আচ্ছা দাদু, ওরা মরলে ভূত হয়? হ্যাঁ, ভূত হয়, পেত্নী হয়। বিশু আবার চেঁচিয়ে বলল—কারা ভূত হয়, কারা পেত্নী হয়? পুরুষ মরলে ভূত আর মেয়ে পেত্নী। যাকে ভয় করে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে—সে আর সে থাকে না—বুঝলে। কেমন যেন পাণ্টে যায়। তোমাকে চিনবে না। কাউকে চিনবে না। যাকে ইচ্ছে—তার ঘাড় মটকে খাবে। রক্ত শুষে খাবে। গুণেও ছাড়ে না। খালি খাউ মাউ করবে, ঢিল ছুঁড়বে, আলু বেগুন কুমড়া, পোড়া কাঠ—যা পাবে তাই ছুঁড়বে। আর বিরাট বিরাট সরা জেরলে ঘুরে বেড়াবে। মারা বলল—হ্যাঁ। সেদিন মা বলেছিল—ওটা ভুতের আলো। আমাদের বাড়ীর কাছেই তো শ্মশান। তাই প্রায় দেখি। দেখি আর ভয় পাই। ভয়ে দরজা জানলা ভালভাবে এঁটে তবে ঘুমোই।

রুমকি আর রুমকি বলল—ওরা বুঝি শ্মশানে থাকে? হ্যাঁ,—শ্মশানে থাকে। ঝোপঝাড় জঙ্গলইতো ওদের আশ্রয়। পরিষ্কার জায়গায় থাকতে ওরা ভালবাসে না। প্রয়োজনে রাজত্ব করার জন্যে ভুতুড়ে বাড়ী বানিয়ে নেয়।

কখনও এখনও বা চলে আসে। কি ভয়ানক কাণ্ডটাই না ঘটায়। রাতের ঘুম কেড়ে উহারপুহার করেই ছাড়ে।

লিলি আর তুলি একই সঙ্গে বলে উঠল—দাদু, দাদু, তুমি ভূত দেখেছো? দাদু তখন হো-হো হেসে বলে ওঠে—আমরা যদি দেখলাম, তাহলে ওরা ভূত সাজবে কেন? ধরা পড়ার জন্য ভো আছে থাকবে না! ভূত যেমন আছে, তেমনি আবার ভূতের বাবাও আছে। হো-হো করে এক গাল হেসে বললে—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে না দফারফা একেবারে ঠান্ডা করে দেবে না। ছেলেমেয়েরা তখন হাসিতে গড়াগড়ি বেতে লাগল। আকাশ কাঁপিয়ে নারকেল গাছের পাতায় হাতভালি বাজাতে থাকলো। হি-হি করে উঠলো ধলো বালি। আকাশের চাঁদ-তারা অগস্তি নক্ষত্রবাঁথ। উঠি উঠি করেও তারা থ' হয়ে যায়। সময় গল গল বলে যায়। প্রথমতঃ ভাব, যেন সবাই পাথর। □

গ্রাম বাংলার জীবন সম্পৃক্ত গল্প
এ সময়ের বিশিষ্ট গল্পকার

অনিল ঘড়াই-এর

পরীযান ও অন্যান্য গল্প—১৪০টাকা

সীমা রায়

প্রমুখ সিংভূম সাহিত্য প্রকাশনী

চক্রধরপুর : সিংভূম (পশ্চিম)

বিহার সূচক : ৮৩৫১০২

নির্ভার

সিংশেখবর ঘাইতি

গোধূলির রক্তাক্ত আঁজ কেমন লাগছে, অন্যরকম যেন। এক মহাযুদ্ধের পর রক্তনাত বিশাল প্রান্তর, যোগেশবাবুর মনে কু' ডেকে উঠল। না এ ভাল নয় ভাল নয়। সে সময় রাস্তার কুকুরগুলো আপদকালীন কামার আকর্ষণে জুড়ে দিল; শ্মশানের কেরাঝেঁপের গন্ধ থেকে বেরিয়ে এসে শেরালগুলো দিনের আলোর হুকা হুরা হাঁকাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে এক বকের পাতি শব্দ করে কোন নিরাপদ নীড়ের আশ্রয় উড়ে গেল। পথে ঘাটে পিপড়েদের গ্রন্থ গোড়:যাত্রা এসব দূর্ভোগের লক্ষণগুলো মিলিয়ে নিয়ে যোগেশবাবু বলে উঠলেন, নিঘাৎ একটা বিপদ ঘটেবে, সেই সে উপলক্ষ সাঙ্গের মত।

কানে খাট ভবশ যোগেশের সমকরসী। সে বলল, কী বলছ যোগেশদা, গরমে সিঁধ হিঁচ, ভূমিকম্প হবে ?

তাকে শুনিয়ে যোগেশ আরও জ্বোরে বলে, না ভূমিকম্প নয়, ঝড় ঘূর্ণি, সাইক্লোন হবে।

ভবশ বিস্তের মত মাথা নেড়ে বলে, তাইতো বলি, মাঠ-জম্মা এত সবুজের জল, এঁকি হা-ভাতে চাষীর কপালে আছে ?

যোগেশ কথার পিঠে কথা জুড়ে ভবশকে সমানই গলা তুলে বলে, কথায় বলে না, আশায় মরে চাষা। কি হবে মাঠ জরা শস্যে, তা যদি না ধরে আসে ?

যোগেশ আর ভবশ দুই বর্ষিমান পড়শী। রোজ সন্ধ্যাবেলার গর্তের জীবের মত বেরিয়ে এসে চৌমাথার মোড়ে জড় হয়। ইদানীং মোরাম রাস্তা হয়ে, লোকজনের ষাতারাত খুব বেড়ে গেছে। মওকা বুঝে মাধব এখানে চায়ের দোকান বসিয়ে দিয়েছে চায়ের সঙ্গে আরও রকমারি যা গেরস্তের নিত্য চাহিদার ঘাটতি মেটায় সব রাখে ও।

দোকানের বাইরে বেশ পাভা। বেগে বসে দুই বুড়ো নিসর্গ আকাশের রক্তমুখ রূপ নিয়ে যখন সংশয়ের ঘোরে তখনই মটরের ট্রান্সিষ্টারে বিশেষ সতর্কবার্তা। বেজে উঠল—

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণপূর্বে পাঁচশ কিলোমিটার দূরে বারুচাপ ঘনীভূত হয়েছে, এটি দুশোকিলোমিটার বেগে ঘূর্ণি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার তটরেখায় আছড়ে পড়তে পারে। মৎস্যজীবীদের সতর্কিত করা হচ্ছে যে তারা

যেন নৌযান নিয়ে সমুদ্রে ঘোরাফেরা না করে। উপকূলবর্তী বাঁসিন্দারা সময় থাকতে নিরাপদ স্থানে চলে আসুন। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা আছে।

ভাষণ ফ্যাকাসে মুখে বলে যদি গেলবারের মত হয়, তাহলে আমরা আর কেউ বাঁচব না প্রাণে।

তবুতো আমরা সমুদ্র থেকে পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার তফাতে আছি, হারা কিনারে আছে, ভয়টা তো তাদেরই। যদি কিছ্ হয় আর দেখতে হবে না, যোগেশ বলে। এসব কথা হল কাল সন্ধ্যায়, গাঢ় রক্তমুখ আকাশকে সাক্ষী রেখে। পরের দিন ভোরবেলা মলিন প্যান্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে যোগেশ মনে মনে বলে উঠেন, এসে গেছে, সে এসে গেছে। আর চোখ, কান ইন্দ্রিয়ের সব শক্তিকে জড় করে আশ্ব-সমর্পণের ভঙ্গীতে যেন ঘাড় পেতে রয়, পড়বে, পড়ুক না জ্বলাদের খাঁড়ার ঘা। বাড়ীঘর, পুত্রপরিবার নিয়ে উষাস্রুর মত কোন যমের বাড়ীর ঠিকানায় আর রওনা দেবেন?

সওয়া দুদিনের ঝড়টা অবশ্য প্গাশ বছর আগের সেই দঃবলের অভিক্রতার পুনরাবৃত্তি ঘটাল না। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে মাথায় একটু আদরের চাঁটি মেরে চলে গেল। ঝড়টা থামতেই শান্ত সকালে যোগেশ বোরিরে এসে, তাদের বাড়ীর চৌহিন্দীর ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিতে থাকেন।

কলা ও পেঁপে গাছগুলো কাটা সৈনিকের মত শূন্যে আছে। সজনে, শিরীশের ডালপালাগুলো ভেঙ্গে মচড়ে স্থলে আছে। পুকুরগুলো ঠেটুবুর, আর কয়েক ইঞ্চি বাড়তি জলের স্রোতে মাছগুলো পালাত ভা হরনি। দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে, যোগেশ আশ্বস্ত হন। শাসগর্ভ সব্জ ধান আকণ্ঠে জলে ডুবেও জেগে রয়েছে। আশা আছে।

পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের কিনারে সূর্যদেব উঁকি মারলেনা, এমন প্রসন্ন উজ্জল সোনার মুখ ষাট বছর আগে আর একবার দেখেছিলেন, আর একটা মহাঝড় ও প্রাবনের পরে। সেই সে উনপ্গাশের স্মৃতি এখনও না-নেভা নিওন আলোর মত জ্বলে আছে। প্রত্যহের অভ্যাসের বগে প্রভাত পরিক্রমা করে এসে পৌঁছিলেন, চৌমাথার মোড়ে মাধবের চারের দোকানে। ঝড়ের ঘারে কাং হয় নি দোকানটা। কয়েকজন চা-প্রেমী সাতসকালে বেণে এসে বসেছিল। তাদের ভেতর কথা হাঁছিল, আবহািবদরা কখনও নির্ভুল হিসাব দিতে পারেন না। যখন ঝড়জ্বল হবে বলেন, তখন হয় না। যদিও ঠিক ততটা হয় না। আর যখন হবে না বলেন, তখন পাগলা হাতির মত ঝাঁপরে পড়ে সব ল-ভ-ভ করে দিলে যায়। এই দেখ না, দুশো কিলোমিটার বেগে ঝড়টা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লে, মাধবের দোকানের

সামনে বসে চা খেতে হত না আমাদের কাউকে। অঞ্চ দেখ, ওয়া যেতারে আমাদের ঘুম কাড়া আতঙ্ক ছড়াল।

যোগেশ এসে পড়েন সে সম্বর, বলেন, 'আরে বাপু, তোমাদের রক্ত গরম। কট-পট্ বা হোস, একটা বলে দিলেই হল। সবুজ কর। রেডিরটা কী বলে শোন। কোথাও না কোথাও ওটা বাবের খাবা বসিয়ে গেছে।'

মাথবের রেডিওতে তখন বিজ্ঞাপনের সুরমা। বিজ্ঞাপনের পরই খবর শুরু হল।

খবরের পর, কমবরসী সমালোচকদের মূখ চূণ। 'দাদু,' ঠিক বলেছেন, ঝড়টা উড়িষ্যার ঠপক্লে জোর কাঁপিয়ে পড়েছে। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পারাধীপ বন্দর থেকে কিছু সাংবাদিক খবর দিতে দিতে দেওরা রম্ব করেছেন। তার মানে তুলকালাম কা'ড ঘটে গেছে। আমরা ভাবতে পারছি না কি সম্ব'নাশ ঘটে গেছে ওদিকটার।'

যোগেশ চারের দোকানে আর বেশীক্ষণ থাকেন নি। পরপর খবরগুলি যেন এক ভয়ংকর নীরবতার ফাটল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে আসতে লাগল। জগৎসিহপদ্র, পুরী, কটক ইত্যাদি করে সমুদ্রকণ্ঠলগ্ন আটটি জেলা, ধুরে মূছে সাফ হয়ে গেছে। মৃত্যুর হিসেবে শতক ছাড়িয়ে হাজার হাজার ছাড়িয়ে কয়েক হাজার। সেটা আট, দশ, পঞ্চাশ পৰ্ব্ব উঠে যায়।

এই ভয়ংকর সম্ব'নাশী মহামৃত্যুর ছবির মধ্যে তিনি যেন দেখতে পেলেন একটি বিপন্ন কাভর মানুষের মূখচ্ছবি, যিনি পাহাড় প্রমাণ ডেউয়ের গল্লরে পিপীলিকার মতো হারিয়ে গেলেন। এই ছবিটি আর কারুর নয় মধুভাষী গণক গ্রীক'ঠ মিশ্র জ্যোতিষাণ'বের।

কলিঙ্গের পিঠোঁপিঠি নিম্নবঙ্গের এই অঞ্চল। উৎকল ব্রাহ্মণেরা পূণ্যধাম গ্রীক্বেয়ের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিতেন প্রায়ই। যোগেশবাবুর ছেলেবেলার ও'দের দেখেছেন, পাচন, বাজক, জ্যোতিষীও ভাগবদ্ পাঠকরপে. উত্তর-স্বাধীন পৰ্ব' আলোক প্রাপ্ত উড়িষ্যার প্রগতি ওদের আনাগোনা কমিয়ে প্রায়ই শূন্যে এনে ফেলেছে। তবুও গ্রীক'ঠ ঠাকুর কিসের টানে যেন এদেশে আসতেন। ও'র বিশেষ গুনের জন্য উঠল খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন, তা হ'ল ও'র আশ্চর্য জ্যোতিষ গণনা বাস্তব সম্মত যে দক্ষতা, আর সুললিত কন্ঠের ওড়িয়া ভাগবদ্ পাঠ।

যোগেশ মম্বর্ষ মায়ের ইচ্ছাক্রমে ও'কে আনিরেছিলেন ভাগবদ্ পাঠ শোনাবার জন্য। সেই থেকে ও'র সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা।

কিন্তু তাকে চমৎকৃত করেছিল ও'র কয়েকটি ভবিষ্যবাণী। মাকে মাঝে উনি আসেন, আর এলেই ও'র ঠাকুরসেবার আয়োজন করেন। সেদিন আর আলাদা রান্নাবান্না হত না, ও'র ইন্টারিগ্রহ পেতলের ছোট ঠাকুরটির ভোগ-

সেবা হত। তাঁরই ভোগের অম্বাঞ্জন, সেদিনের তৃপ্তির ভোজ সমাধা হত। এই বিগ্রহটি ছিল তাঁর নিত্যসহচর সঙ্গী।

একবার এসে উনি ষোগেশকে ডাক করে দিলেন, হঠাৎ কিছু সাবধান বাণী উচ্চারণ করে—একি আপনার কপালে কালো ছায়া কেন? এক্ষুনি এর প্রতিকার না করলে আপনি অপবশের শিকার হবেন।

—অপবশ, কিসের অপবশ?

—আপনি এক কুহকিণীর নজরে পড়েছেন। ও আপনাকে গ্রাস করতে চাইছে। আর একটু দেরী হলে আপনার কতি হবে। নিম্নলি চরিত্রে দাগ পড়বে। আর্থিক সর্বনাশ ঠেকাতে পারবেন না। ইত্যাদি...

ও'র কথায় লজ্জা পেলেন ষোগেশ। ষোগেশ সেতার শিল্পী। শান্তি নিকেতনের ছাত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও ডিপ্লোমা পেয়েছেন তিনি বিবাহিত পুরুষ। স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু একটি ছাত্রীকে সেতার শেখাতে গিয়ে তার দিদির প্রেমে পড়ে গেলেন। স্বামীত্যাগিণী এই মহিলার রূপ তাকে যেন চুম্বকের টানে টানছিল, কাঁচপোকা বেমন আরশুলা টানে, তিনিও তেমনি সব প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে, একটু একটু করে জলে-ডোবার মত ডুবে যাচ্ছিলেন। মহিলাটির রূপের মোহজাল, ঠাটঠমক একটা ঘোরের মধ্যে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

কিন্তু গ্রীক'স্ট এ তব জানলেন কি করে। একান্ত গোপন মনের অধঃপতনের এই অশ্ধকার দিকটি ও'র জ্ঞানার কথা নয়। তিনি কখন তা মুখ ফুটে, আকারে ইংগিতে কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি। এই মানসিক ঠানাপোড়েন তাঁর নৈতিক জীবনে ধস নামাতে পারত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠাকুর গ্রীক'স্ট একান্ত বশ্বদুর মত তা সামলে দিলেন।

গ্রীক'স্ট ঠাকুর বললেন, 'আমি এইমাত্র ইন্টের পঞ্জো সেরে এসেছি! এদেশেও তাঁর স্থারা ডেরা ছিল জামতোড় গ্রামে। সেখান থেকে তিনি আজ দেখা করতে এসে এই কথাগুলো আচম্কা শুনালেন। 'আপনার পশ্চাতে দন্টগ্রহের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ওই আপনাকে অনুচিত পথে নিয়ে যেতে চাইছে। তবে ভাববেন না, আমি আপনাকে এ মশ্টিটি লিখে দিচ্ছি। গ্রহদেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে। এই মশ্টিটি জপ করবেন।'

উনি এক চিলতে কাগজে লিখে দিলেন, 'ও নীলাঞ্জনদলশ্যামো জিহ্মাঞ্জনসমদ্যুতিঃ। শনিচন্দ্র গ্রহ পুংসোঃ সদা শান্তিঃ প্রবচ্ছতু।'

মধ্য-যৌবনে গ্রহঘটিত এই দুর্বলতা, এই মশ্টিজপের ফলে আশ্চর্যজনকভাবে কেটে গিয়েছিল। এক দিবা আলোকে ধীরে ধীরে তাঁর মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, এবং তাঁর মনে এক ধরনের আনন্দের সত্তার হয়েছিল।

তার ষষ্ঠীয় ও তৃতীয় এবং চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণীটি ও ফলে গেছে। এটি ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।

সেদিন তার মনটি ছিল মহাদুঃখে কাতর। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার পার্শ্ববর্তী এক শিশুর গর্জনে কঁকরার হারে দেহত্যাগ করলেন। সর্বগ্রাসী শোকে মহামান হারে তিনি সব কাজ ফেলে শূন্যে চেয়েছিলেন। পিছন থেকে শূন্যে পেলে, একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, আর কেউ নয়, শ্রীকৃষ্ণ।

—এই যে ঠাকুর মশায় কবে এলেন দেশ থেকে ?

—গতকাল এসেছি। আজ দেখা দিতে এলাম।

—এ কী হল বলুন তো ? এসব ভাবা যায় ?

—এসব হবে জানতুম আর এও জানি, ওর হেলে রাজীব নেও প্রাণ দেবে আততায়ীর হাতে।

—কী ভয়ানক ? কবে ?

—বছর ছয়েক পরে। মিথিলে নোবেল।

ঠিক ছ' বছরের মাথায় রাজীব নিহত হলেন, ওর সঙ্গে বারেকারে সাক্ষাৎ ও বোঝাযোগ, — ভালমন্দ খবর দেওয়া-নেওয়ার একটি প্রতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এছাড়াও একটি বৈবরিক কারণও ছিল।

রাজীব হত্যার পর দেখা হলে বোগেশ ও'কে বলেছিলেন, মশায় আপনার কথা তো কটাঁর কটাঁর মিলে গেছে। কিন্তু অতর্কিকম্ ? দেশের পরিণাম কি ? —শত্রু আসবে। দেশে একটী মহাজাগরণ হবে। শত্রু কচুকাটা হবে। রাজনীতিতে তখন ক্ষম্য বলে কোনও নয় নীতি থাকবে না।

জ্যোতিষের ভাষা গুট ইংগিতবহ। বোগেশ সাম্প্রতিক ঘটনাক্রমো ব্যস্তবতার দাঁড়িপাল্লার চাঁড়রে দেখলেন ও'র ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক, বিলকুল ঠিক।

পাকিস্তানী তক্ষরদের কাগিল অনুপ্রবেশ ও তার পরবর্তী অধ্যায় সব ঠিকঠাক, একটুও ভুল হয়নি।

তবে উড়িষ্যার এই মহাঘর্নি ও প্রাবন, নিজের রাজ্যে শতাব্দীর এই প্রাকৃতিক মহাতাণ্ডব, ওর সম্বন্ধে উনি চূপ করে থাকলেন কেন, ওর সামান্যতম ইংগিত ও'র কোন কথায় পাননি।

না কি উনি একচক্ষু হরিণ সেজেছিলেন, জলের দিক থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা না করে, কানা চোখটি সোঁদিকে রেখে ডাঙার দিকে ভাল চকুটি পেতে রেখেছিলেন ? তাও মনে হয় না। কারণ জ্যোতিষ তো জল-স্থল-অস্ত্ররীক্ষের গভীর থেকে অজ্ঞ প্রসক্ষ্য কাষ'কারণগুলির রহস্য ছেঁকে জানে। জ্যোতিষ তো 'র্যাডারের' ততোধিক বিকল্প ? এতগুলি সফল

ভবিষ্যৎবাণী শার কৃত্তিকের ঘরে জমা পড়ে আছে, তিনি খ্যাতিমান প্রথম সারির ক্রিকেটারের মত মহাপ্রকৃতির প্রথম বলে বোল্ড হলেন ?

ছ'মাস আগেও, তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, তিনি এই সর্বনাশা বিপর্যয়ের আগাম আভাস দেন নি। উনি এবার এলে, ও'কে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে, কেন তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন ?

আদর্শে তিনি বেঁচে আছেন কি জলে ভেসে গেলেন, সে কথা বুঝতে না পেরে, তিনি একটা অনিশ্চয়তা, ছ'ফটানি অনুভব করলেন। নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্বেগে নাওয়া-খাওয়া শিকের তুললেন।

বোধ হয় তিনি এ ব্যাপারে খড়ি পেতে গণনার হাত লাগান নি। হয়ত অন্য কোন জটিল জ্যোতিষী গণনার ভুবে ছিলেন, তাই এদিকটার মনযোগী হয়ে উঠতে পারেন নি। হয়ত, পারিবারিক গোপমালে মন বিক্ষিপ্ত ছিল। জটিল অসুখে হয়ত শয্যাশায়ী ছিলেন।' এইস সাতপাঁচ ভাবনা তাকে পেরে বসলেও, তিনি তার কত'বা শির করতে আর দেরী করলেন না।

আগে ও'কে চিঠি দিয়ে জানতে হবে, উনি এখন কোথায় কেমন আছেন, এই বিপর্যয়ে ও'র ক্ষয়ক্ষতি কতখানি, আর এখানে এলে, ও'কে সাবামত সাহায্য করা যাবে। ইত্যাদি।

চিঠি হো লিখবেন। কিন্তু ঠিকানা ? সমস্যাটা দেখা গেল সেখানে।

ঠিকানা উনি টুকে রেখেছিলেন ঠিকই কোথাও, কিন্তু তারপর আর খোঁজাল করেন নি। ফি বছর একবার অন্ততঃ খ্রীক'ঠ দেখা দেন। চিঠিপত্র লেখালেখি,—দুই তরফের কোন প্রয়োজন বা ভাগিদাই ছিল না। তাই চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া আর হয়ে ওঠে নি। আর তার আসা মানেই কিছু অর্থসংগ্রহ। বাস্তব'দ ফেলে, গননা ও ভাগবদ'পাঠে যা পেতেন, নগদে ও দান সামগ্রীতে, তার সবটা উনি নিরে যেতেন না, সিংহভাগ এখানে রেখে যেতেন যোগেশের কাছে।

যোগেশ বলতেন, আমার কাছে কেন আর এখানে রাখছেনই বা কেন ? খ্রীক'ঠ ব্যাখ্যা করে বলতেন, দুটো পরিবার করে বড় ঝামেলার পড়ে গেছি বাবু। আমার প্রথম পক্ষের উনি, একটি কন্যা রেখে মারা গেলেন। বেঘোরে পড়ে দ্বিতীয় পক্ষটি আনলুম। আর এনার খাই মেটাতে হিমসিম খাচ্ছি। ও'র হাতে রোজগারের সবটা পড়লে রক্ষে নেই। আমার প্রথম কন্যাটির ভাগ্যে আর কিছুই থাকবে না। ও'কে পায়স্থ করার সময় তবু এ টাকাতা থাকল, কাজে লাগবে।'

—কিন্তু আমার কাছে কেন ? আপনি এখানকার পোস্টাফিসে জমা রেখে দেন। সার্টিফিকেট কিনুন। পাঁচ বছরে ডবল হয়ে যাবে। কিংবা ফাইভ ইয়ার্স টি ডি করুন। ইন্টারেস্ট জমে জমে অনেক হয়ে যাবে।

—বা করবেন আপনি করুন। মোটের উপর টাকাটা আমার এককালীন চাই। আর আপনার নামে পাশবই বা সার্টিফিকেট বা ভাল মনে হয় করে রাখবেন। নিজের নামে করার অনেক স্বামেলা। আপনি বৃদ্ধিমান ব্যক্তি, বৃদ্ধিতে পারছেন কেন আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি ?

—আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করেন ?

—কী বলেন বাবু, স্ফটিকখণ্ডের মত স্বচ্ছ আপনার তুল্য ব্যক্তিকে চিনবে না তো কাকে চিনবে ? আর এও বলছি, জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরও আপনি এক আধ্যাত্ম পুরুষের সংস্পর্শে এসে অন্য মানদুষ হয়ে যাবেন।

যোগেশবাবু আর কী করেন, ওঁর কথা ফেলতে পারেন নি।

আধ্যাত্মপুরুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। দীক্ষাও নিয়েছেন। সন্সারে থেকে নিভেজাল ঝুঁটি হয়ত হতে পারেন নি, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করবার মত কোনও অন্যায় বা অন্যায় কাজ করেছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না।

এইতো মাস ছয়েক আগে গ্রীকস্ট ঠাকুর শেষবারের মত দেখা দিয়ে বললেন, মেরেকে এবার পাশব করব বাবু। মেরে ডাগর হয়েছে, মাধ্যমিক পাশ করেছে। ছেলে ভুবনেশ্বরে সরকারী চাকুরী করে।

—কথাবাস্তা কি পাকা হয়েছে ? দিনান্দ্র হয়েছে ?

—না হয় নি, হয়ে যেতো। হঠাৎ ওদের একটা কালশৌচ পড়ে গেল, মাস কয়েক অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

—এবার টাকাটা লাগবে তো ? দাঁড়ান, দাঁড়ান, সার্টিফিকেট, টাইম ডিপোজিট, সার্ভিস ডিপোজিট মোট কত দাঁড়াল দেখছি।

যোগেশবাবু আলমারি থেকে ফাইল খের করে আনলেন, পাশবই সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র দেখে হিসেব কবে বললেন, আপনি হাজার পঞ্চাশেক টাকা এর থেকে পাবেন। তা এখনি টাকাটা তুলে আনব ?

গ্রীকস্ট বাধ্য দিয়ে বললেন না বাবু, এখন না। মাস ছয়েক পরে আসব, তখন ব্যবস্থা করবেন।

যোগেশ বললেন, দেখুন ঠাকুর মশার আমার বয়স হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন, আমাকে ভারমুক্ত করুন।

—আপনি এখন যাচ্ছেন কোথায় ? একানন্দই বছরের এখানে আপনার মৃত্যু নেই। আমার ভুল হয় না। এখন অনেকটা স্বাক্ষর ?

এসব কথাবাস্তা ছ'মাস আগের। নিজের শরীর নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা যতটা না তার চারগুণ ভাবনা গ্রীকস্ট ঠাকুরকে নিয়ে, এও নগদ পঞ্চাশ হাজার ছাড়াও পেতলের বাসনকোশন বানসামগ্রী বা একটি ঘরে ঠানা হয়ে আছে। তাও হাজার দশেক হবে। এ সবতো এখনি ফিরিয়ে দিতে হয়। স্বপার-সাইক্লোনও হাড

অসহ্য বিপন্ন মানুসটিকে কতখানি অবর্ণনীয় দুঃশার ফেলেছে, তিনি ভেবে
 থে পাচ্ছেন না। এখনি চিঠি দিতে হয়। তাঁর গচ্ছিত অর্থসম্পদ এ দারুণ
 দুঃসময়ে স্বতের মলমের মত সব খোরানর জ্বালা হরত কিছুটা
 জুড়াবে, কিন্তু ঠিকানা? ঠিকানাটা তিনি টুকে রেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু
 কিসে, কোথায় হবে মাথার চুল ছিঁড়েও তা মনে করতে পারছেন না।

ষোড়শরশ্রম রোগাভোগা শরীর নিয়ে উড়িষ্যা যাবেন, পাগলের মত
 বিশাল শ্মশানভূমি প্রায় কলিকতের গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াবেন, সেটা তো
 একটা কষ্ট কম্পনাছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ, তাই করতে তাঁর মন
 চাইছে।

মনের সঙ্গে শরীরের এই দড়ি টানাটানি রণিতার চোখ এড়াল না। রণিতা
 তাঁর অষ্টাদশী তরুণী নাতনী। বড়ো দাদুর উপর তার এক মাতৃ সুলভ
 টান, দাদুর হাতের সেতার তার গানের সঙ্গে বাজে। সংসারে দুজন একই
 ভেলার যাত্রী, এক অপার্থিব সুরলোকে, সময় পেলে নাতনীকে নিয়ে গান-
 বাজনার বসেন যোগেশ। কিন্তু আজ কদিন দাদুর যেন তেমন উৎসাহ নেই
 গানবাজনার।

‘দাদু তোমার কি হয়েছে, অসুস্থ না কি?’—রণিতা বলে।

—না রে দিদু, শরীর ঠিক আছে। একজনকে চিঠি লেখা খুব
 জরুরী। কিন্তু তার ঠিকানাটা কোথায় রেখেছি, কিছুতেই মনে আসছে না।

—কেন তোমার ভায়েরী?

—সে তো অনেক হাতড়ালুম। অনেকের নাম ধাম আছে, তার
 নেই।

—আহলে পাঞ্জিতে। অনেক সময় পাঞ্জির গায় নাম ঠিকানা লিখে রাখো
 তাই না?

—তা তো রাখি? পাঞ্জিগুলো কি আর গুছিরে রাখি? বছর তুরুলে
 কোথায় চলে যায় পাক্সা পাইনে।

—আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখছি, ভেবে না। কি নাম বলতো?

—আরে ওই গ্রীক’স্ট মিশ্র যে আসে মাঝে মাঝে, আগম নিগম আগভূম,
 বাগভূম অনেক কিছুই বলে আর তা মিলেও যায়।

অবশেষে কিছু কাগজপত্র বই ঘাটাঘাটি করে রণিতা ঠিকানাটা উদ্ধার
 করে যোগেশের হাতে দিয়ে বলে, তোমার বিবেকানন্দ সিরিজের ষষ্ঠীয় খণ্ডে
 ইনি আত্ম-গোপন করে ছিলেন। দাও, কি পুরস্কার দেবে?

তা আশাভীত পুরস্কার জুটেছিল তার কপালে। বোধ হয়, অদৃশ্যালোক
 থেকে জুটিয়ে দিলেন স্বয়ং গ্রীক’স্ট ঠাকুর।

গ্রীক’স্টকে পরপর কয়েকটি চিঠি দিলেন যোগেশ। কোনও উত্তর এল না।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ভাগনে দিব্যোন্দুকে । আই. এ. এস অফিসার । উড়িষ্যার গুরুত্বপূর্ণ নরকারী পদে অধিষ্ঠিত । দিব্যোন্দুকে, হতভাগ্য মানদুরটির বেশ একটু জোরদার তল্লাস চালিয়ে পাকা খবর এনে দিতে বললেন ।

দিব্যোন্দুর উত্তর এল । উত্তরটা এইরকম, মামা জগৎসিংহপুর জেলার এর শাখা ব্রকের কিরাদাগ্রামের ওয়াশ্‌ট ব্রাড ভিক্টিমদের মধ্যে মিত্ররা অন্যজন, বারাক্ষেপে বংশ লোপাট হয়েছে । তাদের শাখা-প্রশাখার এমন কাউকে পাচ্ছি না, যাকে তাঁর ভিটেতে সেটল করা যায় ।

এর কিদুদিন পরে রণিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল । নাতনীর বিয়েতে কিছুদান-সামগ্রীসহ বাট-হাজার টাকার অলংকার উপহার দিয়েছিলেন যোগেশ । কিন্তু এতোটা তাঁর নৈতিক সাহস এল কোথেকে ? সব টাকাটা তো তাঁর নয় ? পড়ে-পাওয়া গ্রীক্‌ঠের গচ্ছিত অর্থ সামগ্রীও আছে । রণিতার জন্মকোষ্ঠ বানিয়ে গ্রীক্‌ঠ বলেছিলেন, আপনার নাতনীটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী । কোষ্ঠিতে রবি ও বৃহস্পতির অবস্থান তুঙ্গে । জাতিকার আকস্মিক অর্থ সম্পদলাভের সম্ভাবনাটি প্রবল । আঠার বৎসর বয়সে ওর নামে লটারী কেটে রাখবেন ।

রণিতার এখন আঠারো বৎসর । কপালগুণে সূপাত্রটি হঠাৎই জুটে গেল । ইঞ্জিনিয়ার । চমৎকার দেখতে, আবার স্বকণ্ঠ গায়ক ।

বহু পুরোনো প্রবাদ বাক্যটি যোগেশের মনে এল, কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমান, কিন্তু গ্রীক্‌ঠ তো আগেভাগেই তাঁকে ভারমুখ করার জ্যোতির্বা নিদানটি লিখে রেখে গেছেন রণিতার কোষ্ঠিতে ?

গ্রীক্‌ঠ কি জানতেন, তাঁর এই আশ্চর্য্যবর্তী ভবিষ্যৎ বানী তির্যকভাবে ফলে যাবে ?

বোধ হয় না, বোধ হয় হাঁ ।

জানুক বা না জানুক, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মিশে যায় দুই সজল চোখের ধারায় অনূতাপের নয় কৃতজ্ঞতার, এবং বেদনারও ।

অগ্নিগর্ভ অর্বাচ

সুস্মিত জানা

এই উপন্যাসের সময়কাল ২০১০ থেকে ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সমকাল পর্যবেক্ষণ করে দূর ভবিষ্যকে অঁকার এক প্রচেষ্টা। স্বাভাবিক ভাবে এর সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। কোনোভাবেই সে সব চরিত্রকে বর্তমানের কোনো নারী পুরুষের জীবনের সঙ্গে এক করে দেখা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন তাদের ভবিষ্যতের ছবি দ্রবীকরণে ধরতে চেষ্টা।

তবু এ উপন্যাস জীবন্ত এবং বাস্তব। সমাজেতিহাসের একটি আগামী ইঙ্গিত রচনা করতে এর কোনো জুড়ি নেই। পরিবর্তিত সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্র সমীক্ষার এ এক অমূল্য আগোর ফসল। □

প্রাককথন

নতুন শতাব্দীর শুরুর যুগের বিশ্বব্যবস্থাকে গড়ে পড়ে নতুন করে নেয়। যদি ও ধনুকের গুণ ধরে টান দেওয়ার সময় তার পিছনের হিলার বাকের মতো পিছলে যাওয়া সময়টার শতাব্দীর শেষভাগের অনেক কারুক্রতি থেকে যায়। শুরুরটা অতএব আরো আগে হরোঁছিল, গত শতাব্দীতে। কিন্তু যখন তার ছুঁড়ে দেওয়া হল, তখন আর তার সঙ্গে পিছনে ফেলে আসা ধনুকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ষেরকম এই নতুন শতাব্দী, তার মানবজন, জীব-জাতি প্রণালী, সমগ্র মানবের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; গত শতাব্দীতে যে বিশ্বায়নের শুরুর হরোঁছিল, তার একক ছিল কম্পিউটারের মধ্যে। গ্রামজীবন ভাঙতে ভাঙতে তার তলানীতে এসে ঠেকেছিল। আর এই শতকের শুরুরূপে ইন্টারনেট বেন মূহে দিয়েছে গ্রাম জীবনকে। স্রোতালাইজেশান মস্তটার এক আশ্চর্য জাদু আছে। ধুরে ফেলেছে সমস্ত আধুনিকতার ধনতান্ত্রিক বিশ্বাসের বিশ্বকুবন। এখন উত্তর আধুনিকতার নতুন বিশ্ব। এই শতকের শুরুরূপে এক অস্থির অগ্নিগর্ভ মূহুর্ত। দিগন্তের সৌরশক্তি মানবকে চিনি দিয়েছে নতুন এক শক্তির উৎস। যতদিন পর্যন্ত জেগে থাকবে অনন্ত অক্ষুরন্ত শক্তি নিয়ে আমরা থাকবো প্রাণময়তার।

কালবৈশাখার সন্ধ্যায় ধী করে চিরে ফেলা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো পৃথ থেকে পশ্চিমে এফে'ড় ওফে'ড় করে চলে গেছে নতুন হাইওয়ে। হল্দিয়া শিল্প নগর থেকে কনসোবর্তী পেরিয়ে ময়নার বকের ওপর দিয়ে জামনা হয়ে এই দিকে খড়গপুর—কম্বোড। নতুন রাজপথে নদীটাকে ছুঁয়ে ফেলার দেড় কিলোমিটার আগে এই রাজপথ যেখানে অজগরের পেটের মতো ভরাট হয়ে বাক নিয়েছে, সেই বাকেই বংগাছের নাচে ম'টুরামের সাব্বক কালের চা-এর দোকান। ম'টুরামের বাপের বাপ প্রভুল গে'ড়ে কমলীর মেয়ে অলকারানীর প্রেমে পড়ে বাপের কোপানলে পুড়েছিল নিজের ভাগটাকে, সে ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম গদিতে থসার কালে। সেই সেকালের এই বাস রাস্তার কোলে এখানে একটা দোচালা খড়ের ঘর করে অলকারানীকে নিয়ে নতুন ঘর বেঁধে ছিল। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা বাড়ি ফিরতি দক্ষিণের পথের টংতলা, পুরষাঘাট, হাতিভাঙার পুল, লালদুর্গাগেড়্যা পেরিয়ে আসনান মায় চৌখালীর বাজার পর্যন্ত এসেবা মানব বিশ পঞ্চাশ ক্রোশ রাস্তা হাটার আগে প্রভুনের চা খেয়ে যেত। দশ পরসার এক গ্রাস। দিনে পাঁচ দশ টাকা রোজগার।

তাতেও টান পড়তে লাগল প্রভুল আর অলকারানীর সোহাগের সংসার যখন ঐনিশ শ আঠাতোরে প্রথম বন্যার পর ভরাবহ দুর্মূল্য দেখা দিল। পাঁচ সিকার এক সের চাল রাতারাতি হয়ে দাঁড়াল চার টাকা প্রতি কেজি। মটুর বাপ অনিলের জন্ম সেই অকিঞ্চকর অনটনের দিনে। চারের দোকান টিকিরে রেখে প্রভুলকে সংসারের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে নতুন পথ বাতলাতে হল। সাথে চোলাই মদের কারবার খুলে। কিন্তু অতি সম্বন্ধে থেকে রাখা সেই কারবারের পাঁচ লাগতে দেয়নি অনিলের গারে, তার আবালা থেকে প্রথম যৌবনের পদার্পণে। যদিও নিজের লিভারটা পচে হৃদয় হয়ে যেদিন গে'জিরে উঠল, সেদিন অনিল ধরল উত্তরাধিকারের হাল। সাবেক কালের সেই দোকান অনেক মাটির দেয়াল, ইট কাটার পোঁচ পেরিয়ে এখন চকচকে কাঁচের দেয়াল। এক কোণে এম. টি. ডি. বৃধ। দু' হাজার প'চিশ সালে ঘুচে গেছে প্রভুলের ঐতিহ্য। সেদিনের বটগাছটা ডালপালা বিস্তার করে ঘিরে ফেলেছে সমস্ত সাবেকী অভীতিচারিতাকে। এখন মটুরামের ডা দোকানে চকচকে কাঁচের ভিতর, স্যাণ্ডুইচ, কোকা, চাও, চিকেন পাওয়া যায়। তার পেছনের সারির একটা টেবিলে তিন বড়ো বসে চা খেতে খেতে হালের খবর আলোচনা করছিল।

সপ্তাহ খানেক আগেই ঘটে গেছে ভরস্কর এক ঘটনা। এই অঞ্চলের প্রধানের বাড়িতে পাওয়া গেছে পাণের বাড়ির বিধবা বউ সোহিনীর লাশ। বরের মৃত্যুর পর সোহিনী পঞ্চায়েতের বাড়িতেই কাজকর্ম করে দিন চালাত। তার বর হরেন ছিল পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। হরেনের মৃত্যু নিয়েও অঞ্চলের লোকের মধ্যে ষণ্ঠে সন্দেহ ছিল। কিন্তু দোন্দ'ড প্রতাপশালী পঞ্চায়েত ছিল এ অঞ্চলের পার্টির প্রধান। তাই এক সঙ্গে দুই স্তরের ক্ষমতা ভোগ করে হয়ে উঠেছিল অপ্রতিষ্পত্তী। পার্টি'কে প্রধান জানিয়ে ছিলো হরেনের পরিবারের ব্যবসার দারদারিত্ব তিনিই গ্রহণ করছেন। প্রতিবেশীর প্রতি তাঁরও একটা কর্তব্য ছিল। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী এটাকে ভালো মনে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদ প্রকাশ্যে না এলেও কানান্দুবো ছিল না এমন নয়। আর এখানের ঘটনা সেই সন্দেহকে ভরস্কর সত্যে প্রমাণ করল। সেই রাত থেকেই অনল মাইতি উধাও। অনলের ছেলে হরসিত এবং তাঁর নিকট আত্মীয়রা করেকজন পুঁলিশের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে কেশ করলেও, পুঁলিশ আজও অনলবাবুর কোনো হিঁদিশ পাননি। পুঁলিশের ধারণা অনলবাবু নিজেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন। তা না হলে এরকম একজন ক্ষমতাশালী লোক কিডন্যাপ হলে এতদিনে পুঁলিশ তার হিঁদিশ পেত। যদিও ঐ দিনই মৃত দেহের কয়েক হাত দূরে পুঁলিশ একটা রিভলবার পেয়েছিল। রিভলবারের

লাইসেন্স অনল মাইতির নামে। অনলবাবুর মাসেলম্যান বে'টে গনেগেরও কোনো হাদিশ মেলেনি।

এদিকে আবার অনলের প্রধান প্রতিবন্ধী অশোক ভৌমিকও ভাই-এর বোমা ফেটে মৃত্যুর পর থেকে হাজতে আছেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই এখানকার একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন অর্বা'ক ভেঙে গেছে। তার সদস্যরা অনেকেই অনলের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরে চলে গেছে বাবসা করতে। অরুণের বাবা মারা গেছে রাজনৈতিক প্রতি আক্রমণে। আর তাদের সংগঠনের প্রধান অধ্যাপকের ছেলে অনমিত্র মনের দংশে কলকাতা পাালিয়ে গেছে। একমাত্র অর্ক এখানে আছে। তার কাছ থেকেই অনমিত্রর খবর পাওয়া যায়।

এক বড়ো চাঁদির চশমার ভেতর দিয়ে তার আগুন চোখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'বাই বলো, গোটা অঞ্চলটা এখন অশ্রুত শান্ত হয়ে গেছে। আর ঐ ছোড়াদের কথা বলি, ওরাও একটু বাড়াবাড়ি করছিল।

অশিতিপর বলিরেখার ভরা মুখে আর এক বৃন্দ সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের করে বললে, 'কি বলছি, বিল্ড অর্বা'চনি।' এ'ক শান্ত পরিস্থিতি না'থমথমে ভাব। আর ছোড়া বলছি'স কাদের। অনমিত্র তরুণ অর্ক—অর্বা'কের ছেলেরা! কেন ওরা কবে সাধারণ মানুষের অপকার করেছে?

'ভা' দাদা এই কেশটার নিরু'বাবু মৃত্তি পেল কি করে? অপেকাকৃত কম বরষক একটি প্রোট, পান দোস্তার বহরে দাঁতগুলো সব মিসি কালো। বোকার মতো সে এই প্রশ্ন করে চারের কাপ ঠে'টে ছুইয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম বৃন্দ উত্তর দেয়, 'তাকে এ সবে'র মধ্যে জড়ানো যায় নাকি, এটা রাজ-নৈতিক ব্যাপার নয়। আর তার এ সব করার সাহসও নেই শক্তিও নেই।'

'শক্তি নেই, এমন কথা বলিস না। পদ'লিশ নিরু'কেই প্রথম জড়াত কি'ন্তু সে সেদিন রাত দুটো পর'ন্তু তার স্কুলের ফাংশনে সারাক্ষণ মগে উপস্থিত ছিল। তিন দিনের ফাংশনের ওটাই ছিল লাস্ট দিন। তাই আগের অথবা পরের কোনো দিনই তাকে জড়ানোর মতো পদ'লিশ কোনো রু'খু'জে পার নি।'—বিতর্কিত বৃন্দ উত্তর দিলেন।

'তাছাড়া কেশটাতো আলাদা' প্রথম বৃন্দ আবার বিস্তারিত মতো মন্তব্য করেন।

'কোনো কেশই আলাদা নয় ভাবা, হয়তো ওখানেও কোনো যোগ আছে।' বলে সিগারেটে বেশ মৌজ করে টান দিয়ে খুক খুক করে কেশে উঠল। এমন সময় স্কা'র্ট পরা বক'কাট চুলের একটি বাইশ বছরের মূ'বতী এসে টেবিলের ওপর তার হাতের ছাতা আর পার্শ' রেবে ডায়েরির হাতে নিয়ে কপালের সামনের দিকের চুলের চূর্ণ হাত দিয়ে সারিয়ে এস. টি. ডি. বৃথের ভিতর ঢুকে রিসিভার হাতে নিল।

একটা তেলের ট্যাংকার জোরে কে'১-৬'-৩' হর্ণ দিয়ে খেমে গেল। তার পেছনে পেছনে আরও তিন চারটা মাল ভর্তি ট্রাক, তার পেছনে একটা হলদিয়া ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস বাস—এরকম পরপর প্রায় পনেরো বিপ খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। যত্নে পাট করা লম্বা চুলের গৌরী আর জিনসের প্যান্ট পরা তিনটা ছেলে এসে দোকানে ঢুকল।

এই বিকেল প'চটায় রোদ মরে গেছে। বড় গাছের নীচে এই দোকানে বেশ ঠাণ্ডাই লাগছে। তারমধ্যে খেঁয়া ধুলো মুখ ঢেকে দেয়।

দ্বিতীয় বৃন্দ কাশির কে'ক খামিরে বললে, 'অব'াক আমাদের চারপাশের এই অপ-আধুনিকতাকে একটা আঘাত হানতে চেরাছিল ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু তাদের ব্যর্থতা তাদের চেষ্টাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে না।'

চ'দির চশমা পরা বৃন্দ দ্বিতীয় বৃন্দের যুষ্টির পান্টা উত্তরে বলল, 'ওই ছে'ড়াদের চরিত্র কি খুব ভালো? পণ্ডারের মতো তাদেরও দু'একজন মেয়ের সঙ্গেও তো থাকতে পারে।' বলে চা-এর গ্লাসে চুমুক দিয়ে চ'দির চশমার ওপর দিয়ে বাইরে তাকাল।

দ্বিতীয় বৃন্দ প্রহ্ন করল, 'যেমন—'

'যেমন আমি কি করে বলব?'

তৃতীয় অব'চীন বলল, 'তা আপনি বাবু প্রতিবাদ করছেন কেন। তা ঐ বলসের ছে'ড়ারা একটু আধটু জলাঢ়াল করতেই পারে।'

'কেন, তারা যুবক বল্যা ছাড়, ছি ছি, এখন সমাজ বলে কিছু আছে।' বলে প্রথম বৃন্দ কটমট করে তাকিয়ে থাকে। এবার অশিতিপর দ্বিতীয় বৃন্দ অব'চীন প্রোফর দিকে তাকিয়ে প্রথম বৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার ঐ মেজদা, ষোবনে ক্রাথ টিপে প্রেম করে হ সপাতালের এক নাস'কে তুলে এনেছে সেটা কি জানিস।' বলে সিগারেটটার শেষ সুখটান দিয়ে আবার বললে 'তখন যদি সমাজটা ভালো হয় তবে এখন আর কি দোষ করল?'

এমন সময় সামনের রাস্তার স্তম্ভ হয়ে থাকে সেই গাড়িগুলো তাদের জড়ব কাটিয়ে কে'১-কে'১, কি'ক'-কি'ইক নানারকম সিটি দিতে দিতে প্রথমে ব্রেক করে ধীর গতিতে তারপর দ্রুত ছুটতে শুরুর করল। এইভাবে হর্ণের বিকট শব্দ, ঘন ব্রেক করার গলগল বোরিয়ে আসা ধোঁয়া আর ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল গোটা পরিবেশ। এমন সময় একটা সরকারী লাল বাসের পেছনে পেছনে হলদিয়া-পদুরুলিয়া সুপার এক্সপ্রেস এয়ার কন্ডিসন বাস এসে দাঁড়াল। বাসের দরজার কালো কাচ খুলে যেতে একটি মাত্র যুবক নামল। রুদ্ধবেশ, উসখুস চুল, পরণে জিনসের প্যান্ট গায়ে টি শার্ট। যুবকটি আসার সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটে ছেলে কয়েক দিক থেকে এসে ওকে ঘিরে ধরল। দোকানের ভেতর চ'দির চশমা পরা বৃন্দ বললেন, 'হিরো এসে গেছেন। দ্যাখো, আবার কি

আকস্মিক শব্দ হইল।' দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন 'পরিবেশ আরও শান্ত এবং ভয়
হবে।'

ষড়কটির কানে এসব কথা যাচ্ছিল না। সে তার অনুগামীদের বিশেষ
কিছু নির্দেশ দিয়ে একটি মাত্র ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল সামনের ইঁট
বাধানো পাঁচ ঢালা কালো রাস্তার, যেটো সোজা দক্ষিণে তার বাড়ির দিকে চলে
গেছে। কয়েক দিন মাত্র, অথচ ষড়কটি আপন মনে ভাবল তার মধ্যে কি
অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে। আজ সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। অথচ
একদিন এই গ্রাম-মাটি মানুষকে নিয়ে কি অদ্ভুত স্বপ্ন এঁকে ছিল। সমাজ
সংগঠন, রাজনীতি সব কিছুতেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। কয়েকটা দিন
মাত্র। তারপর যা কিছু ঘটল সে সবই এক ষড়গাভের কাহিনী। তবু আজ
মনে হল সে কত কালের স্বপ্ন যেন! সেই বাল্যকাল, ছেলেবেলা—সে
কতদূরে...

এক

কালের এক শীর্ণ স্রোতঝার দাড়িয়ে অনমিত তাকিয়ে দেখছিল পিছনের ফেলে আসা সময়ের অপসারণমান চলচ্চিত্র। বিচিত্র স্মৃতি থাকে ধরে রেখেছে মানুষের সৃষ্টির চেয়েও দামী ইন্টারনেট—নিজের মস্তিষ্কে। সে কতকাল আগের কথা। তারপর কত দ্রুত, কি বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এই বিশ্ব। অথচ মনে হয় যেন এই সোদিনের কথা। এত স্পষ্ট আর এত স্থির চিত্রের মতো আঁকা সে সব স্মৃতি এক এক সময় এখনকার ঘটনা ও পরিবেশের ওপর দাড়িয়ে ঠিক তখনকার ছবিটাই জীবন্ত হয়ে ওঠে। মূহুর্তে পুরোনো ছবির বিচিত্র জটিল নানা মাত্রিক বুনোপটের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মনে হয়, এ স্মৃতি-না স্বপ্ন! স্বপ্ন হোক আর স্মৃতিই হোক-অশ্রুত। এখনকার সময়ের চাকার ওপর দাড়িয়ে থাকে মনে হয় আজগুবি। অথচ একদিন বাস্তব ছিল। নিজের জীবনের সেই বাস্তবতাকে যদিও আজ আর স্মৃতি অথবা স্বপ্ন ছাড়া জন্য কোথাও ধরা সম্ভব নয়।

দু হাজার সতের সালের এক উজ্জ্বল প্রভাতে, জুলাই-এর শেষের বর্ষা-মুখরিত দিনে ও তখন যাত্রা করেছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে, ঠাকুরমা তাঁর বৃন্দ লোলিত-চর্ম পঙ্ক কেশ, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ, তবু উজ্জ্বল আশাময় মুখে বিদায় দিয়ে বলেছিলেন, দাদুভাই—‘অনেক বড় মানুষ হয়ে ফিরে আসিস, তোর দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশ, নাম-বশ যেন ছেড়ে যায়।’ সেই উৎফুল্ল মুখ ঠাকুরমার অথচ ও কিছুতেই নিজের চোখের জলকে থামাতে পারে নি।

সেই একদম ছেলেবেলার, হাটি হাটি পা পা করে ঠাকুরমার সঙ্গে বড় হয়ে ওঠা। তারপর যখনই জ্ঞান পড়েছে দাদুর কথা আজ আর তেমন মনে নেই। খুব ছেলে বেলার একজন বৃন্দের কথা মনে পড়ত। সামনের বারান্দার নিম্নেটের মেঝেতে পাতা সোফার স্থির হয়ে বসে থাকতেন : নৃসিং প্রথম আলো এসে পড়ত বৃন্দের মুখে। সামনেই পুকুর, পুকুরের ওপাশে রাস্তা। রাস্তা টপকে উজ্জ্বল লাল রঙের সূর্য উঠত। চারদিকে গাছপালার সবুজ আলোছায়া। রাস্তা দিয়ে সারাদিন কত লোকজনের ষাওয়া আসা, কতরকম গাড়ির হর্ণ, চিংকার, চেঁচামেচি। কিন্তু বৃন্দ স্থির হয়ে বসে থাকতেন। ঠাকুরমাই বড়োটাঁকে চান করাতেন। খাওয়াতেন। তেমন কোনো কথা বলতেন বলে মনেই পড়ে না। তারপর কোনো একদিন তেমনই নীরবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কেবল সেই দিনের টুকরো কিছু ছবি মনে পড়ে। প্রহর লোক, অসংখ্য মানুষের ভীড়। এত লোক কেন যে

আসছে। আর হাতে কত ফুল, ফুলের মালা, ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছিল বড়োটাঁকে। তারপর তাকে যে কোথায় নিয়ে চলল—আর সেই অনেক লোক.....

দাদু—ঐ বৃন্দাই, বড় হয়ে জেনেছিল। আর দাদুর মৃত্যুর পর সেই অসংখ্য মানুষের শোভাযাত্রা। ঠাকুরমা, মা, বাবা দিদির কাছ থেকে পরে এ নিয়ে কত গল্প শুনছে। তবু এসব ছাড়িয়ে ঠাকুরমার উপস্থিতি অনেক বেশি জীবন্ত।

প্রথম কলকাতার বাওয়ার দিন, ঠাকুরমার সেই উজ্জ্বল, মলিন মূখের দিকে তাকিয়ে কিছতেই নিজের চোখের জল চাপতে পারেনি অনমিত। কেন যে এত কষ্ট হয়েছিল। সে কি আবাল্য ঠাকুরমার কাছে বড় হয়েছিল, তাই। বাবা-মা দু'জনেই কাজ করতেন অফিসে। দিদি স্কুলে যেত। তাই সারাক্ষণের খেলার সঙ্গী, পড়ার সাথী, পাড়া বেড়ানো সে সবই প্রিয় বৃন্দা সখী ঠাকুরমার হাত ধরে। আর তখনকার সেই দু'হাজার পাঁচ সাত দশ সালের পাড়ারগিকে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের গ্রাম ছিল যাকে বলে অল্প পাড়ারগী তাই। না বিদ্যুতের আলো না পাকার রাস্তা, না টেলিফোনের লাইন। লাল লাল মোরাম ফেলানো রাস্তা গ্রামের পথ চিরে ঢুকে গেছে ভেতরে। সেখানে রাস্তার দু'ধারে গাদাগাদি করে কত বাড়ি, মানুষের গিজগিজের সহবাস। বরোজ, খানখন্দ, ধানকেত এইসব দিয়ে ছাওয়া শান্ত নীরব সুন্দর গ্রাম! তখনও শহুরে মানসিকতা তাকে গ্রাস করেনি। অনেক রাত পর্যন্ত উৎসব বাড়িতে গ্রামের মানুষেরা বসন্তীমঙ্গল আর শীতল্যমঙ্গলের গান শুনত। আর শেষ দিন সারারাত ধরে ভিডিও শো হত। তবু পরের দিন দল বেঁধে লোকে মাটি কাটতে যেত ঝড়া কোদাল মাথার ও কাঁখে করে, কোমরে গামছার পেঁচ এঁটে দু'পাশের মাঠে ভলতলিয়ে উঠত সবুজ ফসলের লাভণ্য, সারা বছর দু'বার। বিশেষত শীতের সময় মাঠে জল তুলে ক্রশ ধানের চাষের হিড়িকটাই ছিল অনেক বেশি। এ ছবিটাও বদলে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

বিত্তীয় প্রজন্মের মানুষ অন্যরকম হয়ে গেল। দেখতে দেখতে গ্রামে বিদ্যুতের আলো ঢুকল। আমাদের মতো দু'চার ঘরে আগেই ঢুকেছিল সৌর আলো, কিন্তু প্রথম ধাক্কায় বিদ্যুতের সঙ্গে তার পাল্লা দেবার ক্ষমতা ছিল না। শব্দ বিদ্যুতের আলো যেমন বদলে দিল গ্রামের চেহারাকে। শহুরে রূপ আস্তে আস্তে কেড়ে নিল গ্রাম্য লাজুক ঘোমটার আড়ালের উজ্জ্বল বহুরূপী সত্যলক্ষ্যী মূখটিকে। তেমনই সে হয়ে উঠল শহুরে নিলম্ব, ঘোমটাহীন, একে কি ব্যস্তজীবী বলব? নাকি মদগর্বিতা-শালীনতাহীন।

গ্রামের দু'প্রান্ত দিয়ে দু'খানা জল নিকাশীর নালা ছিল, দু'প্রান্তশোভিত

থাকত বাশগাছের ছায়াশীতল নীরব অবগুণ্ঠনে, তবে তা যে সব সময় পবিত্র থাকত এমন না। কোনো কোনো সিজিনে মদের ভাটি কসত সেখানে। দেশী মদ, কেবল দূর রাস্তা থেকে তার খাঁকালো গন্ধ পাতলা যেত। এখন সময়টা একটু বদলে গেল। এই প্রজন্মে গ্রামে বাস করা স্বভূমিতে কারিক প্রমজ্জীবা মানুষ কমাতে লাগল। তার জায়গার এল দূর প্রদেশে বিভিন্ন প্রাইভেট কারখানার কাজ করা বাবুদের দল। আর হলদিয়া উপনগরীতে নানান কারখানার ঠিকাকাজের প্রমিকের দল। মাটি কাটার মজদুর রাস্ত হাজার ছেলে লগন, লক্ষ্যণের ছেলে মোহন কিংবা বকিম ওরফে বঁাকা মাজির ছেলে বিশু কাজ করে হয় কোলকাতার ফুল দোকানে, নয় উত্তরপ্রদেশের ফরিদাবাদের গেঞ্জি কারখানায়। হরেন মন্ডল তার তেত্রিশ কাঠা জমি উচ্চ মূল্যে বিক্রি করেছে হাওড়ার এক বিজনেসম্যানকে। তার ছেলে মাধব মন্ডল হলদিয়ার মিতসুবিবিসি কারখানার ঠিকাদারী দালাল। বড় রাস্তার ধারে পুকুর ভরাট করে বিম দিয়ে সন্টলেক প্যাটানের বাড়ি তৈরি করেছে, বাইরে নানারকম বৈদ্যুতিক বাতির ঝলমলানি, সারা দিন রাত উজ্জ্বরগ্রামে বস্ত্র বাজে। সি. পি. এম. থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কমরেড অনল মাইতি এখন ডাকসাইটে ভুগমূল নেভা। মাধব ভাকে মোটা টাকার চাঁদা দেয়। গ্রামে তাই তার পজিসন হাই। আর হলদিয়ার সে সিটু অফিসে রোজ হাজিরা দেয় তার বউ দোনারাণী মন্ডল মহিলা সমিতির সহ নেত্রী

হরেনের তেত্রিশকাঠা জমির লাগোয়া ছিরু নামস্তর দু' বিঘা জমি ডেসিমক আট হাজার টাকা দরে কিনে হাওড়ার সেই বিনোশ ম্যান-এ গ্রামের বড়বাবুর জামাই মিস্টার বাসু ছাপারিয়া কনস্ট্রাক্টরের কারখানা করেছে। আসলে সেখানে তৈরি হয় উন্নতমানের চোলাই মদ। দামাণী বোভলে বিলিতি লেবেল এঁটে রাত বারোটোর সে মাল পাচার হয় গ্রামের বাইরে রোজ রাতে। বাসু ছাপারিয়া এটা বসানোর সময় গ্রামের তিন বারের জেভা বামপন্থী গ্রামপ্রধানকে সে বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিল। পাটির রসিদে চাঁদা নয়, পঞ্চায়েতের নিজস্ব ট্যাকে। তাতেও অস্বাভাবিক সমাধান হয় নি। পরে জনগণের চাপে পাবলিক মিটিং বসেছিল পঞ্চায়েত অফিসে। বাসু ছাপারিয়া সাত গ্রাম জোড়া পঞ্চায়েত অফিসের বিশাল জনসম্মুখে ভদ্রবাঙালী ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি তার কারখানার সামনে দিয়ে যে রাস্তা গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঐ চাধরাখালী পেরিয়ে পুরুদ্বার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত, সে রাস্তা গোটাটাই থাকা করে দেবে। অর্মান জনসম্মুখে কাঁপিয়ে হাততালি মিলে গিয়েছিল বাসু ছাপারিয়া জিন্দাবাদের অটহাসির কলপ্রবাহী অহমিকার।

না, বাসু ছাপারিয়ারকে আর পুরুষাঘাট পৰ্বত পাকারান্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি রাখতে হয় নি। বিপরীত রাজনৈতিক সংঘাত, গ্রাম্য মানুষের দীর্ঘকালার্জিত জটিল সর্পির্ল মন বাসু ছাপারিয়ার স্বপ্নকে সার্থক করেছিল। সে তার কারখানার গেটঅবর্দি বানিয়ে নিয়েছে প্রাইভেটে রোড। বড়বাথুর বাড়িতে নিজস্ব উজ্জ্বল আলোকিত অফিস রোজ গভীর রাত পৰ্বত সেখানে চলে উচ্চ-অভিজ্ঞাত পার্টি। ছাপারিয়া কালচারের দয়ার এ গ্রামের একটা উন্নতি হয়েছে (বেশ কয়েকটি বাড়িতে মাঝ রাত পৰ্বত পার্টি চলে, তরল পানীয়ের মদির উৎসবে। নিবাচিত পুরুষের বাহুল্য মফিরানীদের সান্নিধ্য সহবাসে।) এই আতি কাঙ্ক্ষিত, ধনাঢ্য রাত উৎসবে অভ্যাস নারী পুরুষ শব্দ এ গ্রাম নয়, এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামের অলংকার। সমালের শান্ত শীতল বাতাস যখন এই মস্ত রাত্রির আবেশকে কালি মস্ত করতে গিয়ে দিনের উত্তাপে নিজেদের পুড়িয়ে নেয়, তখন গ্রামের পথ ধরে উজ্জ্বল বাহারী ছাতার নীচে স্কাট পরা উন্নত বন্ধু গেরা পরিহীতা ক্রান্ত, কালিম-লিপ্ত চোখের রমনী নাকি নারীরা ধীর পায়ে এগিয়ে চলে। এ হল এই শতকের প্রথমার্ধের সৌখিন মার্জিত সমাজ অনুমোদিত স্বপ্নিতাবাস্তি।

এমন অমার্জিত চোখে দেখাটা হয়তো অনমিতেরই দোষ। নারী স্বাধীনতা তো নারী পুরুষের সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সে কারণেই আজ এই দু' হাজার সাতাশ সালে পৃথিবী ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ নামের প্রবেশের মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার এক অল্প পাড়াগা ইন্টারনেটের প্রভাবে, স্যাটেলাইট টিভির কল্যাণে অলক সাতরার বোকে স্বাধীনতা দিয়েছে বর ও বাচ্চাকে ত্যাগ করে নির্বিধায় অমিত মাইতির সঙ্গে বিয়ে করে নতুন সংসার পাততে এই গ্রামেই।

মধ্যযুগের বাংলায়ও এমন ছিল না তা নয়। উনিশ শ বিংশ বর্ষ শ বাহাস্তোর বিরানস্বই-এও ছিল, কিন্তু তখন সে ঘটনা ছিল প্রথমে দশ হাজার পরিবারে একজন, পরে এক হাজারে এক, অথবা পাঁচ শ-জনে এক এবং তারা সবাই গ্রাম ছেড়ে যা পালাত আর গ্রামে প্রবেশ করত না। অথবা তাদের বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। কিন্তু এখন সে ঘটনা বিস্তর, সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক।

অনমিত সেবার ক্লাস নাইনের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরল; ওপাড়ার একটা গুন্ডাগোলে গ্রাম তোলপাড়। কোনো রকমে দু'গুঠো মুড়ি, আলু-ভাজা আর ডিমের কারী দিয়ে খেয়েই ছুটোছিল ও পাড়ার। সে এক বিপ্র কেলেকারী, স্বপনের মেজবোটা অর্থাৎ বিয়ে হয়েছে মহাশ্বেতানগরের রবি শাস্তারের বড় মেয়ে অমিয়ার সঙ্গে। তিন ছেলেমেয়ের সাহচর্য স্বখী সংসার। এমন একটি পরিবারের স্বখী পুরুষ হিসেবে অর্থাৎ সম্মান আছে গ্রামে।

অর্থ চিৎকুড়ানো হাইস্কুলের মাস্টার। রবিন ওর কন্ড, সে কাজ করে কলকাতার ব্রজ এন্ডরুফ কম্পানিতে। রবিনের বৌ মন্থিতা ডাকসাইটে সুন্দরী, শিক্ষিতা-মদগবিতা। পাড়ার সবার সঙ্গে মেশার তার আপত্তি আছে, সে তার হাযভাবে বৃদ্ধিয়ে দেয়। রাস অথবা দুর্গোৎসবে রবিনের মোটর বাইকের পিছনে বসে তার কোমর জড়িয়ে ধরে সুগন্ধী পারফিউমের আবেশ মাখিয়ে ঘর চারপাশের বাতাসে। তার অহংকারী চুড়িদারের রঙ, ঠোঁটের পালিশ, আর মাথার বয়েজস্কাট চুলের ওপর স্টাইলে বাধা স্কাফের রঙ থাকে একই কালারে। মোড়ের উঠতি যুবকরা বৃকের মধ্যে কাঁপন আর চোখের কোনে না পাওয়ার বেদনাকে লুকিয়ে রাখে ওদের ধোঁরা উড়িয়ে চলে যাওয়া পথের শূন্যতা জুড়ে।

অর্থের ষাওয়া আসা রবিনের বাড়িতে ছেলেবেলা থেকেই। রবিনের বিয়ে ভাটা ফেলাতে পারেনি সেই স্রোতে। বরং পূর্ণিমা অমাবস্যার বালাই না রেখেই পৃথিবীর আর্থিক গতিকে বৃন্দাদুলী দেখিয়ে যখন তখন ফুলে ওঠে তার বন্ধুতার বেগ। সে বেগে মন্থিতা মথিত হয়েছিল কতখানি তার হিসেব জানা ছিল না একালের স্বার্থকামী মানুষের জীবন চর্চায়।

ইঠাং সেদিন দুপুরে গিরিনের মাসি রবিনের বাড়ি গেছিল কলকাতার কোনো এক কোম্পানী, যেখানে তার ছোটছেলে অল্প কাজ করে—তারই ঠিকানায় কোনো এক জরুরী খবর পাঠাতে। পাশের বাড়িতে চলছে অশোচ জনিত পঞ্চম দিবসের বিপ্রাহরিক পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ—হিম্বসায় রন্ধন। স্বাভাবিক কারণে পাড়াটি ছিল জনাবিরল।

গিরিনের মাসি সেই নীরবতা রক্ষা করে সোজা প্রবেশ করেছিলেন রবিনের ঘরে। একালের বাড়িতে সদর অন্দর গেছে বন্ধে। আধুনিক মধ্যবিত্ত পরিবার স্বামী-স্ত্রীর অতিরিক্ত তৃতীয় ব্যক্তির ঝগড়া থেকে মুক্ত হতে গিয়ে পারিবারিক জনসংখ্যাকে করেছে সংকুচিত। গিরিনের মাসি স্বাভাবিক নির্জনতা জানে কফাক্তরে প্রবেশ করে দেখলেন দুপুরের নির্জনতা সেখানের পরিবেশকে করে তুলেছে রমণীয়। মন্থিতার শরীরের ভাঁজ এত সুন্দর ঘাড় পৃষ্ঠদেশ কোমর জংঘা ও পদযুগল উল্টানো অবস্থায়ও এত সুন্দর যে কোনো দ্বিতীয় রমণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখতে পারে, এবং এই স্থির চিত্র ঈষৎ নড়ে যেতেই মাসি পারিস্কার বুঝলেন, তার উল্টানো ডালিম ফলের মতো স্তন-যুগল চটকে কোনো এক যুবক রস বের করানোর রমণীর ড্রেস্টার মস্ত। এবং জনতিবিলম্বে মাসির এও বোধগম্য হল যে সেই যুবক নিঃসঙ্কোচে সমস্ত পোষাক মুক্ত হয়ে নিজেকে মন্থিতার নীচে মশহন করতে দিয়েছেন। এবং তিনি অর্থের ন্যায় কৃতিপুরুষ যে নিজের স্ত্রীকে তিন পুত্র কন্যার স্থখী মাতা হতে সহায়তা করেছেন।

অর্থ্য মন্থিতার কোনো অপরাধ ছিল না। অপরাধ করেছিলেন মাসি বিনা সংকেতে কোনোরকম জানান না দিয়েই তাদের কক্ষে প্রবেশ করে। তাই অস্বাভাবিক উচ্চাচের চাপান উত্তোরে রবিনের গৃহাঙ্গন মার্শ্বরিত হয়ে উঠল অসংখ্য পাড়া প্রতিবেশীর সম্মিলিত উচ্চশ্রের ফিসফাস ও কানাকানিতে। ফল হল এই যে এবার থেকে অর্থ্য মন্থিতার সম্পর্ক সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে এল। কেবল অনমিত্রই তার কৈশোরক মন নিয়ে অনেক নিজের মার্শ্বতে ও অনেক বিনিময় রাতে ভেবেছে বিষয়টির কুংসিং ও মৌন্দবের সামাজিক অসামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে। ভেবে ভেবে কোনোই সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। বরং দুই বৈপরীত্যের দোলায় মন অস্থির হয়ে উঠেছে ক্রমশ। ঠাকুরমা এই প্রসঙ্গে মা কে বারবার বোঝাতেন, ‘ছি ছি, বাড়ির বৌ হয়ে এরকমভাবে দিনের বেলা পরপদ্রুধের সঙ্গে—’ ঠাকুরমার গলা অনমিত্র উপস্থিতিতে কি রকম ছোট হয়ে মিলিয়ে যেত যেন। ফলে সংকোচে অনমিত্রর অন্যতর চলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকত না। আর মনে মনে ভাবত ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। পরে আর এ নিয়ে দোকে ভেমন উচ্চবাচ্য করেনি, সমাজের ব্যাবহারিক নিয়মে সবকিছু সয়ে যায়। এমন কি রবিনও এর ভেমন কোনো প্রতিবাদ করেছিল কি না জানা নেই, অন্তত প্রকাশ্যে। কিন্তু অনমিত্র অনেক ভেবেও এর অসামাজিকতাকে অস্বীকার করতে পারে নি। কেন না এরকমই একটা ঘটনা, যদিও তা অন্য মাত্রার, তবুও তা আজ গোপন রেখেছে। কাউকে বলতে পারেনি। কেন!

সেবার এক বসন্ত শেষের রাতে হঠাৎ করে বাইরে উদ্দাম বেগে ঝোড়ো হাওয়া বর। মৌসুমী বারু তবে কি ভোর রাতে বইল। ঠাকুরমা, মা ও কাকিম্মা উঠে পড়লেন। বাইরের খোলা আকাশের নীচে বেশ কিছু শূন্য জ্বালানী কাঠ, পাতা মেলা ছিল। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি করে কুড়িয়ে নিলেন। ঝোড়ো বাতাসে উতলা ছিল খড় মেঘ নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়ার আগে কয়েক পললা বৃষ্টি উপহার দিয়ে গেল শূন্য ধরণীকে। আর সে বৃষ্টির স্বল্পতা তবু গাছের পাতার ধূলট মালিগ্যাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল।

ভোরের আলো জাগতে এখনও অনেক বাকি। তবু ঘুম আসেনি অনমিত্রর চোখে। শেষ রাতের আকাশে কি একটা ভাষাভাষী ঔজ্জ্বল্য থাকে। তাতে সহজেই পথ চিনে নেওয়া যায়। বাবা বলতেন, সেই আলো নাকি জ্যোতিষ্ক-লোকের থেকে নেমে আসে। ঋষিরা সেই আগোন্ন তাকিয়ে থাকতেন অমৃত-লোকের পথের সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে এই আলোর দিকে তাকিয়ে বস্তুকে উপলব্ধি করতেন নিজের হৃদয়ের মধ্যে। অনমিত্র বিছানা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এল। আসতে আসতে দু পা দু পা করে এগিয়ে এল দক্ষিণের দিকে। কি অনিন্দ স্বন্দর এই আলো। তাঁরত নেই, দিনের

আলোর মতো স্পষ্ট নয়। তবু এ আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতো মারাবীও নয়। অনেক স্পষ্ট অথচ শান্ত স্থির; সত্যি যেন কোন অমরার থেকে নেমে এসেছে। আধ্যাত্ম জগৎ যে কিরকম জানে না অনমিত তবু তার মনে হল এ যেন কোন অধ্যাত্মলোকের আলো। প্রথম আলোর চরণধ্বনি অনমিতকে কোন অমৃতের সম্বন্ধে নিয়ে চলেছে।

চলতে চলতে কখন ঝংসাবতীর পাড়ে চলে এসেছিল খেরাল নেই। শির্গ মজা নদী দ্রোতহীন। চারদিকে কোথাও লোকজন নেই। বিমূর্ত প্রশস্ত বেল্যভূমি পলিমাটিতে ধপ ধপ করছে। নিজের নতার একটা গা ছমছমে ভাব আছে। ভর পাওয়া মূহুর্তের মতো সব ইন্দ্রিয়গুলো যখন সমান জেগে থাকে। নিজের পারের শব্দে জেগে উঠতে হয়। মাঝে মাঝে শব্দ রাত চরা পাবির শা শা উড়ে চলার শব্দ মৌনতার ধ্যান ভাঙ করে দেয় যেন।

এ প্রাতে ময়নার ঘাটের দিকে অনেকখানি চলে এসেছিল। এবার ঘেরার পালা। ওই ও দিকে নদীর পাড় ধরে সবুজ ঘাসের কার্পেট। যে খুঁজছে চোখ-অত দূরে। কিছু নেই। তবু কেন যেন মন অস্থির। তবে কি চোখ যাকে খুঁজে ছিল তাকে পেল না? কিন্তু কাকে খুঁজে ছিল। বিশেষ কাউকে খুঁজে তো পথে নামে নি অনমিত। তবু এই অন্তর্হানের অব্যবহার অস্থির যন্ত্রণাটাকে বুকের ভেতর নিয়েই ফিরে চলা। তাই কি আঁখিপল্লব এমন পলকহীন। ঐ দূর পরপারে তাকিয়ে আছে অচেনার বিরহে। দিনের আলো ফুটতে আর দেরি নেই।

হঠাৎ ওপারে একটা জায়গায় নদীর সামান্য বাঁকের কাছে প্রান্তের মাঘাতে অনেকটা পলি ধসে গেছে। পাড় খাড়ি হয়ে নেমে গেছে। অত দূর থেকে জল ছুঁয়ে ফেলা নদীর এই অংশটা দেখা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি আসতে এপার থেকে স্পষ্ট দেখা গেল। ওখানে অনেকখানি জল। আর সেই জল থেকে কে উঠে দাঁড়াল এই নিজের নদীতীরে। প্রথমে জল থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল পশ্চিমের দিকে। তারপর ধূপের ধোঁয়ার মতো সাদা পলি মাটির ওপর ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখ তখন পূর্বদিকে ব্রাহ্ম মূহুর্তের সব আলো গিরে পড়েছে ওর মুখে। নাক মুখ চোখ সব বোঝা যায়। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই ধপধপে সাদা সেই মুখমণ্ডল পেরিয়ে চোখ নেমে আসে নিচের দিকে, গ্রাভা, বকদেশ। কি উজ্জ্বল ধবল শাখের মতো দুটি স্তন। স্তনবৃত্ত উঁচু হয়ে উঠে আছে। দুটি স্তনের দুপাশ থেকে শরীর ইষৎ বেঁকে নেমে এসেছে নাভির কাছে। আর তার নীচে সেই মোহন্য। যেখানে কটিদেশের সন্ধি থেকে নেমে এসেছে জঘনদুটি। হাঁটুর ভাঁজও এমন মোহনীয় হয়। আর তার পা দুটো সেকি কোনো পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দেবী মূর্তি। আবার মূহুর্তে গোটা ছবিটা দেখে নিচে চোখ যায়। তবু সে

তখন শাড়ির ভেতর সব লুকিয়ে ফেলেছে। তারপর ওই ওদিকের বন্যভ্রমলে কোথায় যে লুকালো। অথবা তখন নদীর পাড় হুঁরে ঘাসের সবুজ কাঁচি মুখকে চুম্বন করেছে বাল্যকরতুরাগ। চারদিক জেগে উঠেছে। সারি সারি ঘুম জাগা চোখের মানব নদীপাড়ে আসতে শুরু করেছে প্রাতঃভ্য সারতে : তবে কি এ স্বপ্ন, এ মারা ! না কি রাজজাগা চোখের স্বাভাৱ !

তবু এ কথা কাউকে বলতে পারে নি অনিমিত্ত। এমন স্মৃতির অসহ্য ভূপ্তির একটা জ্বালা বুক দিয়ে জেগে থাকা। কোনো অপরাধ নেই। তবু একথা কেন যে কাউকে বলা যায় না।

মিস্ত্রীতা অর্থ্যর ঘটনা ভেমন করে অল্পলি মনে হয় নি সেদিন, যেদিন ঘটেছিল। কিন্তু ঠাকুরমার মস্তব্য আর নিজের জীবনের এই স্মৃতি অনিমিত্তর মনে দুই বৈপরীত্যের স্পষ্ট বেন এক স্থায়ী যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে, যে যন্ত্রণাটা আর অজাটিল নেই, মনের অবচেতনে তারপর তা স্থায়ী আনন করে নিতে কুঠা বোধ করে নি।

সেই ঠাকুরমাকে ছেড়ে আজ কলকাতা যাবার সময় মনে হল পৃথিবীর সমস্ত পবিত্রবোধ যেন ঠাকুরমার চরিত্রে। চারপাশের এই অগ্রসিহ্ল স্বেচ্ছা-চরিত্যর মাঝে ঠাকুরমা যেন গত শতাব্দীর মৃত মর্ত্যপ্রতিনার মতো। কলকাতা শহরে এসে এই পবিত্রতাকে কিসর্জন দিয়েছিল বলেই কি আর গ্রামে ফিরে ঠাকুরমাকে দেখতে পার নি অনিমিত্ত। সে পবিত্র প্রতিনাকে কি সেই ভোরের স্মৃতির প্রতীকে বিসর্জন দিয়ে এসে কনোবতীর শীর্ণ মজা প্রোতহীন জলে ?

দুই.

কলকাতা থেকে কিছুতই ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না কাফেলার। সেই কবে, প্রথম যৌবনে কলকাতার পাড়ি দিয়েছিল। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। এতকাল মায়ের কাছে থেকে গ্রামের শান্ত সুন্দর পরিবেশে বড় হয়ে তারপর হঠাৎ যেদিন কলকাতার আসতে হল সেদিনও যে বৃষ ভালো লাগছিল এমন না। তবু কলেজে পড়ার নেশা আর নতুন এক শহরে জীবনের স্বপ্ন মন্দির করে রেখেছিল যৌবনোন্মত্তকে। আঠারো বছরের সেই তরুণী, যে নিজের অগাধ রূপকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। তারপর এই শহরের কি আজব আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ করে তোলা। পাঁচ বছরে যেন পাঁচ শ বছরের জীবন অভিজ্ঞতায় হয়ে গেছে।

প্রথম যেদিন কলকাতার ট্রেনে চড়া। মা সঙ্গে ছিল, বেতিং আর আজবস্মৃতির এ্যালবাম, যেখানে ফিরে ফিরে আসে ছেলেবেলার নানা ঘটনা।

নানাভাই, নানিবুঝ, ফুফি কত বিচিত্র মানুষের সমারোহ একত্রে জড় করে আসছে মনের সমস্ত অলিঙ্গ ভরে। ট্রেনের গতিবেগের চরেও দ্রুতগামী সে সব স্মৃতির ছবি।

আমাদের সেই মৈনানের গ্রাম। ওপাশের শস্যভরা বিচিত্র সোনালী মাঠ, হু হু বাতাস, আব্দুল আর রেজ্জাক ভাই। সেবার গেলিগ্রামের মেলা থেকে ফিরবার পথে রেজ্জাক ভাই এর হাত ধরে কত হেঁটেছি। সেই কনোবতী কি এখনও তেমনি আছে বালিভর্তি? ট্রেন এক একটা স্টেশনের থামছে তবু বাইরের এত লোকের ওঠা নামা, চিংকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে বার বার কেন যেন মনে হচ্ছে যে ভালোলাগাকে ছেড়ে যাচ্ছি মারের কাছে, তা হয়তো আর কোনো দিনই ফিরে পাব না।

মারের সামনে গোপন করতে চাইল কাফেলা নিজের চোখের পানিকে। মা তবু সবই বুঝতে পারছেন যেন। বললেন, ‘কিরে-মন খারাপ করে যাচ্ছিল নাকি? শিবপুরেই তো তোর বড় মামা আছে। যখন তখন খবর নেবে। আর তা ছাড়া আমার কাছে ও তো চলে আসবি। আমিও সপ্তাহে সপ্তাহে তোর কাছে খবর নিতে আসব।—তবু মারের চোখ কিরকম ছলছলিয়ে উঠল যেন। কোথাও একটা গোপন আগ্রহ চাইছে মা। কাফেলা জানে, ও ছাড়া আর কেউ সঙ্গী নেই মা-র। সারাজীবন যা কণ্টে পেয়েছে।

আশ্বাজ্ঞানের কথাও মনে পড়ে কাফেলার। কণ্ট হয় বুকের ভেতর। আতঙ্কময় আশ্বাস স্মৃতি। মাকে থেমন কণ্ট দিয়েছে। সেই ছেলেবেলার কবে যে মা চলে এসেছিল আশ্বাজ্ঞানের কাছ থেকে। আজ আর তার কিছই মনে নেই। তবু তার পরের যে সব ঘটনা মনে পড়ে, তার সব গুলোই ভুলে যেতে চার কাফেলা।

একবার ও তখন চার বছরের। লোমাদা থেকে ফেরার পথে নদীবাধ ধরে মা হাঁটছিল কোলে নিয়ে। লোকটা পেছনে পেছনে আসছিল। তারপর হঠাৎ কখন সামনে এসে মা-এর পথ আটকে মার কোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে দে ছুট, কত কেঁদেছিল। কেঁদে কেঁদে সারারাত চোখ ফুলিয়েছে কাফেলা, ওই লোকটা সামনে এলেই আঁতকে চিংকার করে কেঁদে উঠত কাফেলা। তবু শয়তান টাইপের লোকটা কিরকম বোকা বোকা চোখ করে বললে, ‘আমি তোর আশ্বা, মাম্মি’ পরের দিন সকালে পুর্লিশের সঙ্গে নানাভাই গিয়ে নিয়ে এসেছিল কাফেলাকে। তারপর থেকে যখনই রাস্তায় দেখে তখনই কিরকম আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। লোকটা একবার মাকে রাস্তায় ফেলে মাথায় মৃগুর দিয়ে মেরেছিল। বদমাইস লোক।

তবু সবাই বলত ঐ নাকি আশ্বাজ্ঞান। মা ও তাই বলে। নানাভাই আর মামাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কেশ চালিয়েছে আশ্বা। আবার আমাদের

দাবী করেও কেশ করেছিল। বাষে মাষে কোর্টে জজসাহেব আমাকে মায়ের সঙ্গে উপস্থিত হতে বাধ্য করাত। উকিলের চেষ্টারের লোকেরা কি সব অদ্রাল ইঙ্গিত করে বলত, 'ঐ লোকটা তোর আশ্বা, আজ তোকে নিয়ে যাবে। তুই তোর আশ্বাকে ছেড়ে ঘাবি নাকি ওর সঙ্গে?' মনে হত পা থেকে চটিখুলে লোকগুলোর গালে চড়িয়ে দিই। তবু এখন বুঝছি, লোকগুলোর কি আর অপরাধ?

শেষের দিকে মা প্রায়ই বলতেন। চল মা, আমরা তোর আশ্বার কাছে ফিরে যাই। যত খারাপই হোক, যত অত্যাচারই করুক তুই তো তোর আশ্বার পরিচয় ফিরে পাবি।' বড় কষ্ট মায়ের, নিজেকে নিয়ে—আমাকে নিয়ে।

আর সেই—দেবাদ্রি মামা। মা-র সঙ্গে কি সম্পর্ক? মা ক্রিকম যেন শান্তি খুঁজে পায় মামার কাছে। মা যখন থেকে সরকারী অফিসে চাকরী পেলেন, আমরা চলে এলাম শান্তিপুর্নে। এখানে এসেই দেবাদ্রি মামার সঙ্গে পরিচয়। ওদের মামি, ওদের মেয়ে শমিতা আর ছেলে অনমিত্ত তারা তো আমার খেলার সাথী, অনমিত্ত ওরফে ছোট্ট অননু, ওকে ছোট্ট ভাই এর মতো কোলে পিঠে নিয়ে কত খেলিয়েছি। অননু এখন কত বড় আর কি ফুটফুটে সুন্দর হয়ে গেছে। আর আমি যেদিন কলকাতা থেকে ফিরে আসব—সেদিন, নৌদিন কি ও আমাকে চিনতে পারবে। মনে রাখবে আমি যে ওকে কোলে পিঠে করে বড় করেছি। অস্তত বশু হিঁসেবে ও কি সেদিন আমাকে মনে রাখবে? এসব ভাবতে ভাবতেই কখন ট্রেন হাওড়ার পেঁছে গেছিল। তারপর একটা সাদা রঙের স্টেট বাসে চড়ে আমরা পেঁছে গেছিলাম বাদবপুর্নের হোস্টেলে। কি বিশাল কির্বাবিদ্যালয় চক্কর। কি করে আমি এখানে নিজেকে ধরে রাখব?

মা যখন হোস্টেলে ভর্তি করে চলে গেলেন, তখন আর কিছুতেই চোখের পানিকে বাগে আনতে পারল না কাফেলা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাম্পাসের ওই ও কোণে মায়ের হারিয়ে যাওয়া পর্বা। মনে হল এতদূর ছুটে পালিয়ে যাই, মায়ের কাছে। আর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলি— 'মা-মাগো, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায়ও যাব না। দরকার নেই আমার পড়ে বড় হয়ে। আমি যে তোমাকে ছাড়া এতদিন কিছুই জানি নি। তুমিই তো আমার বাবা, আমার মা।'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে কাফেলা নিজের রুমে গেল। মন খারাপ করা ভাবটাকে সঙ্গে নিয়ে। রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না। ছেলেবেলার কথা, নানাভাই-নানিবুদু, আশ্বি, খলাম্মা, স্নেজাক, দেবাদ্রি মামা, শমিতা, অননু, স্কুলের একদল বশু এমনকি আশ্বাজানের কথাও আবার ঘুরে ঘুরে মনে হল। তারপর ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা যে কখন বুজে নিদ এসেছিল ঞ্জোরাল নেই। সকালে ঞ্জোরা

চা দিয়ে গেলে ঘুম ভাঙল পাশের বেডের রণিতার ডাকে—‘এই মেয়ে, আর কত ঘুমাবে, ওঠো !’

—‘উ’-হু, আমি উঠব না বাও—বলে কাফেলা পাশ মেডে ঘুরে শূরে ছিল। রোজ সকালে ঘায়ের ডাকে ঘেরকম করে।

—‘ও হে মানিনী, তোমার কোনো বরক্লেড এসে এখানে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে যাবে না। নিজেই কষ্ট করে ওঠ।’

বাঙ্গ মেশানো গলার স্বর শনেই চমকে উঠল কাফেলা। এবার বৃষ্টিতে পারল, ভুল হয়ে গেছে। এটা বাড়ি নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ. জি হোস্টেল।

তাড়াতাড়ি উঠে, মশারি গুটিয়ে, বেসিনে গিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখ ভাল করে রগড়ে ধুল। অনেক রাতে ঘুম ধরেছিল বোধ হয়। এখনও করকর করছে। তারপর খাের কিনার থেকে তোলালে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে টেবিলের দিকে এগিয়ে চায়ের কাপে হাত দিল। নামনের তিনটে মেয়ে কিরকম মুখ টিপে বসেছিল যেন। ও বলল ‘গুড মর্নিং’। কেউ কোনো প্রত্যুত্তর দিল না। কি জানি কিরকম রেংরাজ কলকাতার হোস্টেলের। ভেবে কাপটা ঠোটে তুলে চুমুক দিতেই বৃষ্টিতে সন্ধ্যা লাগল না রেংরাজটা কি কড়া ডোজের। বিষম লাগার চোটে লংকাগুড়ির ঝাঁঝ আর গরম চা-এর কাম্বিনেশনে লম্বা কাশিতে দ্রুতচাষ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। মেয়ে তিনটি প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, ‘আহা, বেচারীর নরম গলা, তুলতুলে বৃক, না জানি কি ধাক্কাটাই না লাগল। একেবারে গভীর স্বদয়ে। সে ছেলে এ আঘাত সহিতে পারবে তো।’

ইয়ারকির থেকে সেদিনের ঘটনার ত্যাঁদড়ানোটাই বেশি করে বেজোঁছিল কাফেলাকে। যদিও এর থেকে অনেক কঠিন এবং অভব্য আচরণ সহ্য করতে হয়েছে এই হোস্টেলেই। সিগারেট টানা, গ্রাণ্ড ফিটে ব্রান্ডি খাওয়া থেকে শূরু করে হাইটেক জেল দিয়ে নিজেদের যোনাঙ্গের ওপর নানারকম ছবি আঁকার এগজিভিসন পর্যন্ত। আর এ সব পেরিয়েই রণিতার হাত ধরে চিনে ছিল নতুন এক নারীবাদী কলকাতাকে। সেই কলকাতাই কি তার পরবর্তী জীবনের আদর্শ গড়ে দিয়েছে?

কিন্তু তবু কলকাতা কলকাতাই। এই পাঁচ বছরের গোটা কলকাতার বিনোদ্যার রিলটাকে যেটে ফেলে যদি ভিসিআরে পদস কলা যায়, তাহলে ভিন্ন স্ক্রীনে কিরকম ছবি আসবে?

হাওড়া টু শিয়ালদা ক্লাই ওভারের কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাঠ লোহা লক্কেড়ের দরুত্বে অশ্বকারে তলিয়ে যাওয়া চিংপূর পেরিয়ে নেশট্রাল এভিনুতে পা দেবার আগেই ডান দিকে গলির ভেতর সেই বাড়িটা। বাইরের থেকে

প্লাস্টারহীন বাড়ি দেখে কলকাতা মহানগরীর বাড়ি ভাবতে কোথায় একটা আঘাত লাগে। অথচ ভেতরটা এত বেশি বিপ্রতীপ—কি বলব, ‘ক্যান আই ইমাজিন ইন্-মাই ড্রিমস্’.....

রনিতা থাকে এ বাড়িতে। ওর বাইরের পোশাকের ডিজাইন, মেকআপ—সবই ওদের ভেতরের ইন্টিরিরের ডেকোরেশনের সঙ্গে মানানসই। ক্রাসে কিছুতেই ওকে ধরা যায় না। সে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশীপ হোক আর হিস্ট্রির কয়েন এন্ড স্ট্রীট-এর মতো আপাত জটিল ক্লাস বাই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদিরেল প্রফেসর ডঃ রাও পৰ্বত ওর হাবভাব দেখে ওর দিকেই তাকিয়ে এমন ভাবে পড়ান, যেন ওই একমাত্র মনোযোগী ছাত্রী। ‘হাউ মাচ ইনোসেন্স’।

‘হাউ মাচ ইনোসেন্স’—ক্লাস থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার চুলের মতো লাল টকটকে একগাদা চুল মাথা হেলিয়ে সামনের কাঁধে এনে চোখ ছানাবড়া করে দু’হাজার সালের বিগতযৌবনা বলিউড স্টার রানী মুখার্জীর মতো ভঙ্গি করে বলত। আর ঠিক প্রফেসর রাও-এর অনুকরণে। রণিতার কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর গেলীর ডলার দু’লে ওঠা বুক। সুদীপ বলত, ‘তুই ডালিম দুটো বদলে ফেল।’ থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই টি. ভি.তে কাজ নিয়োগিত সুদীপ, সঙ্গে থাকত ওর গার্ল ফ্রেন্ড নাতাশা। এমন বেতপ সাইজের—মনে হত সুদীপের মতো ছেলে কি করে এমন দুটো তবড়ানো ডালিম চুষ করল? আর রণিতা—

উজ্জ্বল লাবণ্যের তলদেশে কি শ্বাসরোধকারী সংঘাত—সংঘর্ষ! সমুদ্রের গভীর তলদেশে অক্সোপাস কুমির হাপর নানান ভয়ঙ্কর জলজ প্রাণীর সংঘাত সংগ্রাম, সমুদ্রের চোরাগোপ্তা প্রোভ। আর বাইরের দিকের উজ্জ্বল কি ভেতরের সেই রক্তক্ষরণকে চাপা দেবার জন্য?

ষমুনাস সেবার রণিতাই নিয়ে গিয়ে একটা ফিল্ম দেখিয়েছিল। ভাবা যায় পট-ওয়ান পরীক্ষার মাত্র সাতদিন আগে। মা শুনলে নিখাং হার্টফেল করতেন। অনিবেশ শেলী আমি রণিতা ২৮ আর সুদীপ। ওরাই আগে থেকে ম্যাটিভিনের টিকিট কেটে রেখে ছিল। আমরা রুনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে একত্রে বেরিয়ে যাব এই ঠিক ছিল—সেই মতো, গেলামও। রবীন্দ্র-সম্মেলনে গিয়ে মেট্রোয় নামলাম। কলকাতায় আজকাল টিউবের যা অবস্থা হয়েছে। আবার নাকি সাতরাগাছি থেকে শিয়ালদা পৰ্বত গঙ্গার ভেতর দিয়ে মেট্রো চলবে। কি যে আমড়াগাছি হচ্ছে। পুরোনো মেট্রোর অবস্থা বেহাল, আবার নতুন কসাবে। রবীন্দ্রসদন ছেড়ে আর ময়দানেই আসতে চান না। কোথায় কারেন্ট গেজে ফেঁসে। অনেক কস্টে পাক’স্ট্রীট স্টেশনে এসে

ওপরে উঠে আমরা দেখি সে এক দাবড়ানো কাণ্ড, পুরোনো জাম ধরা ক্যাসেট ডি. সি. তে চড়ালে বেরকম জড়িয়ে যায়, ভেমনই। মহাজোট সরকার মরদানে কি সব সমাবেশ ডেকেছে, যান চলাচলে নাভিশ্বাস। ঘুর্ণিঝড়ে ফেসে যাওয়া গ্রামের মতো সব গাড়ি একই জায়গার মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। পিঁপড়ে গলবার জায়গা নেই, মানুষতো কোন ছার।

আমরা যখন হলে ক্লাম শো শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে, হাওয়ারই না কীট কি সেই ষিপের নাম। সেখানে পাহাড় বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে আছে সমুদ্রের কক্ষ বৃকের ওপর। নীল জল পাইন না ফান' অথবা অচেনা কোনো জঙ্গলের বৃকের ভেতর সূর্য থেকে চলকে পড়া আলোর মনে হল কি যেন নড়ে চড়ে উঠছে। অনেক দূর থেকে ক্যামেরার ফোকাস ক্রমশ সেই জায়গার স্থির হয়ে দাঁড়াল। এবার পরিষ্কার হল, জম্মকালীন পোষাকে নৃতী নারীপুরুষ। আর তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে কাফেলা ঘেমে উঠল। এই এসি হলও। আর দু'পাশে সুদীপ বব। ভাবতে যেতেই কিরকম দ্রুত শ্বাস পড়তে শুরু করেছে। তারপর কোথায় দিলে সেই পুরুষটি কি সব অসুত কারিশমা প্রদর্শন করে, সমুদ্র পাহাড় পেরিয়ে অনেক মরুভূমি ঘোড়ার গাড়ি, উট ট্রেন মেট্রো সব শেষ করে এসি মার্সিডিজের চড়ে একদম একালের কোন আন্টো মর্ডান রুমের মধ্যে চলে এলে। মাঝে কত সংগ্রাম কত রক্তক্ষয়, আর বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়ে ইন্টারনেটের সহায়তায় এ এক আশ্চর্য বৃগে পৌঁছে যাওয়া। সার্কেস সিটির জিনীংগুলোতে তবু একধরনের এল্লাভেড সার্কেস থাকে। এখানে সেলুলয়েড যেন স্যাটেলাইট দিয়ে কোন হাজার বছরের অনাগত আগামীকে মূহুর্তের মানচিত্রে এনে ফেলেছে।

সারারাত ঘুমতে পারে নি কাফেলা। সেই ছবিটাই ঘুরে ফিরে আসছিল। অস্বাভাবিক মনে হল, তবু বার বার গোটা ছবিটাই ভেদে উঠছে। আর কেন যে মনে হচ্ছে এখনও দু'পাশে বসে বব আর সুদীপ। অথচ টিউবের সেই ডিসটার্ব, এমন কি ওপরে উঠে মহাজোট সরকারের পাকনো মহা গণ্ডগোলে ফেসে যাওয়া রাস্তা। সেসব কিছুই মনে আসছে না। সুদীপ বব অথবা শেলী কিংবা রণিতারও ওর মতো মানসিক অবস্থা? রণিতাকে বলতেই ও হো হো করে হেসে উঠেছিল। তার গোটা ব্যাপারটাই ফাঁস করে দিয়েছিল বন্ধুদের কাছে। একমাত্র শেলীই পরে নিজস্ব ভেঙে বলেছিল, 'কাফেলা সবাই তো সমান নয়, তুই কিছু মনে করিস না। যদিও আমি কলকাতারই মেয়ে, তাই ইংলিশ ফিল্ম আমার জীবনে প্রথম না। কিন্তু তবু বলছি—তোকে, আমারও সুদীপ আর ববের সঙ্গে বলে এই ফিল্ম দেখতে খুব একটা ভালো লাগে নি। তোর অবস্থা বুঝতে পারি রে।'

—'আসলে আমি জীবনে প্রথম দেখলাম তো, এখনকার ছবি।'—কাফেলা

নিজের মতো করে নিজের মনের কথা বলতে পেরে এই প্রথম শান্তি পেল যেন।

—কি জানিস এমন লাভালি ফটোগ্রাফি আর একটি? তুই ইংলিশ ফিল্ম ছাড়া আর কোথাও পাবি না। শেলী স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে।

—হ্যাঁ সেটা ঠিকই। সবকিছু বেশ সুন্দর আর এত স্পষ্ট লাগছিল, কি বিউটিফুল কালার। কিন্তু এতবেশি মেয়েদের খোলামেলা শরীর।’— কাফেলা মনের অস্বস্তিটা বগেই ফেলল।

—ওটা ওদেশের কালচারের মধ্যে পড়ে। যে দেশের যেমন সংস্কৃতি। যেমন দেখনা, আমার বাবা বলেন মহাত্মার তের বছরে এদেশের মেয়েরা নাকি উদ্ভাস অনাবৃত রাখত। কেন রম্ম ইমাজিন? শেলী এভাবেই বলে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চায়। কাফেলাও বন্ধুত্বের আবহাওয়ার আরো সহজ হয়ে এসে বললে, ‘হ্যাঁ, আসলে আমি এসব জীবনে প্রথম দেখছি তো।’

—তুই একদিন আমাদের বাড়িতে চল, বানি?

শেলী এই প্রথম কাফেলাকে ডাকল, আর এমন একটা সময়ে যখন ও নিজেও শেলীর অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে।

শেলীর বাবা ভারী মিষ্টি মানুষ। পাতাল রেলের ইঞ্জিনিয়ার। ওর মা বেশ কিছুদিন থেকে আর্থারাইটিসে ভুগছেন। তবু ফর্সা উজ্জ্বল সুন্দর মুখ ঘিরে কোথা থেকে যে পেয়েছেন এত জ্যোতি। মিষ্টি হাসি দিয়ে কাছে টেনে নিলেন। ওদের বনহুগলীর নবীন চাঁদ স্ট্রিটের বিস্তল বাড়ি যেন ছবির মতো সাজানো। এখানে এসে রবীন্দ্র সঙ্গীতের লাইনই মনে আসে বার বার, আমি হাত দিয়ে বার খুলব না গো গান দিয়ে বার খোলাব। পায়ের নীচে হলুদ সবুজের কাজ করা গালিচা বিছানো, মাথার ওপর নকল ঝাড়বাতি। দেওয়ালে সুনীল দাসের ঘোড়া। শেলীর মা দেখালেন আলমারী ভর্তি স্কুল থেকে শেলীর পাওয়া প্রাইজ। আবৃত্তি, গান, নাচ সবেরই। আর একটা আলমারী ওঘরে। শেলী বলল, ‘এটা মা মণির।’ থাকেন স্টেটস স্টেটিস্টিকসে গবেষণারত। আর এত বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িতে ওরা তিনজন। পরস্পর বন্ধুর মতন। ‘জানিস কাফেলা, দামণি এবার দেখে এলে মামণিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ওখানকার ডাক্তারকে দেখিয়ে সারিয়ে আনবেন।’ মায়ের উজ্জ্বল মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুত্র গোরবে।

বন্ধুর ভেতর ধুক করে ওঠে কাফেলার। মা ছাড়া ওর জীবনে কোনো সঙ্গী নেই। মা বলে, ও যখন থি-ফোরে পড়ত, তখন মাকে— জ্বালাত—‘মা আমাকে একটা ভাই দাওনা।’

মা বলতেন, ‘কেন, রম্ম, রেজ্জাক এরা তো আছে?’

—‘না, আমার নিজের ভাই, দাওনা।’ কাফেলা ছোট মেয়ের জিদ ধরত।

—‘আচ্ছা অম্ন, অম্ন তো তোমার নিজের ভাই।’

—‘হুঁ উ’...একদম আমার নিজের ভাই, তোমার পেট থেকে বেরোনো,—এখন নিজের কাছেই কিরকম হাস্যকর লাগে। আম্মা ছাড়া শব্দ মা যে কিছুতেই ভাই দিতে পারবে না। এতটাও বৃষ্টি হয়নি তখন, এখনও কি হয়েছে? তবে এমন করে কণ্ঠ পাচ্ছে কেন সে? আসলে শেলার বাবা মা ভাই বোনের এই স্বর্খা গৃহকোণ; ঠিক এর বিপরীতে রণিতার মা—

নৈভি রু রঙের স্কাট, রু লিপিস্টিকে মাথার ববকাট চুল হেল্লার পিন এবং গলার স্কার্ফ—ও ম্যাচো। এমন একটি পল্লীশোকের মহিলাকে রণিতার মা ভাবতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। আর ‘এমন একটি মহিলা মিস্ শাম্ভবতী ঘোষ হন কি করে?’—এই বোকার মতো প্রশ্ন করে কাফেলা উত্তর পেরেছিল জন্মকালো। মিস্ ঘোষই বলেছিলেন,—‘আমি রক্তত সেনের সঙ্গে ‘লিভ টুগেদার’ করি। কাফেলা এবার চূপ করে গেছিল, কিছু না বলেই। অনেকদিন পরে বুঝেছিল রণিতার বাবা মিঃ সেন শাম্ভবতী ঘোষের বিয়ে করা স্বামী নন। না সোসাল না রেজিস্ট্রি। একদম মর্ডার কালচার অনুযায়। ‘লিভ টুগেদার’—একত্রে সহবাস। কোনো দায় নেই, ঋতি নেই। দু’টি নারী পুরুষের যে কেউ যে কোনো সময় যে কোনো দিকেই চলে যেতে পারে। যার তার কাছেই।

ওর প্রজন্মে লিভ টুগেদারের সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশি। ওর বৃদ্ধরাই তো অনেকেই লিভ টুগেদার করছে। আবার যারা করে তাদের একটি গর্ব করার মতো জায়গাও আছে পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক জী পল সাত্রে, এবং নারীবাদী সিমন্ দা বুভোয়া লিভ টুগেদার করতেন আত্মবিশ্বাস।

কিন্তু তবু, রণিতার জীবন যন্ত্রে গেছিল বাবা মা-এর এই অসামাজিক সম্পর্কের জন্যই। সে এক অন্য রণিতা।

সেবার রবীন্দ্রসদনে চলছিল আকাশবাণীর বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দুখানা টিকিট ওরা পেরেছিল সহপাঠিণী রূপমার কাছ থেকে, রূপমা ছোটদের নাটক প্রযোজনা করে আকাশবাণীতে।

হলে ঢোকার সময় একটা লোককে দেখে উজ্জ্বল উদ্ভম বন্যা নদীর মতো মাতোয়ারা রণিতা কিরকম স্থির শান্ত ওলে বৈশাখের চর পড়া নদী হয়ে গেছিল যেন। কেন এমন মূর্খ অফ? কে এই লোকটা? কিছুই বলতে চায় না রণি। গান শব্দ হল। শব্দভলকমী গাইলেন বাগেচী রাগ। তারপর কামোদী তোড়ী ভেঙে দেখালেন মিশ্র রাগের আলাপ।

ছেলেবেলা মা’র উৎসাহে গান শিখতে শব্দ করেছিল কাফেলা। দেবাদি মামাই ঠিক করে দিগ্গেছিলেন গানের মাস্টার। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নাইন-টেনে

উঠেই অতিরিক্ত পড়ার চাপে শ্বশ্ব হয়ে গেছে চিরতরে। সে একান্তই গ্রাম্য
হুভ্যাস। সেই জ্ঞান নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জ্ঞানতে চাওয়াটা বেরাদপী। কিন্তু
তবুও বেশ ভালো লেগেছিল। শূভলক্ষ্মী যখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘অবনী
বাড়ি আছে’ কবিতাটা নানা রাগ রাগিনীতে গেয়ে উঠেছিলেন।

তবু—সে ভালোলাগাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল রণিতার আত্মকথা। ও
বলে সেই ছেলেটা যে প্রথম কৈশোরের ভালোলাগা থেকে স্পর্শ করেছিল
রণিতার হৃদয়কে। তারপর আকাশের রঙ কবে যে লাল সবুজ নানা বর্ণের
হয়ে গেল। গাছের রঙও লাল মাটির জলের রঙও। রবীন্দ্র সদন,
ভিক্টোরিয়া, রবীন্দ্র সরোবর সব জারগার রঙিন ফুল। আর ক্রমেরে ডানার
রঙও লাল। সে রোজ আসত—সে রোজ। আর আমি, আমি রণিতা নই।
আমি ছিলাম তার সেই সখী, ভালোলাগার আসমান, ঘর বাঁধবার জমিন।
আমরা দুজনে ডানা মেলে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে
পশ্চিম—আরো আরো কোনো আছে নাকি দিক? আমরা সবখানে ডানা
মেলে উড়ে গেছি। বাসা বেঁধেছি। ঠোঁটে ঠোঁট গাঁজে উত্তাপ নিয়েছি—
—তারপর?—কাফেলা অবাক চোখে প্রশ্ন করে। রণিতা তবু দীর্ঘক্ষণ
নীরব। কলকাতার আকাশে একটাও তারা নেই। মাথার ওপরের বড় বড়
স্কাইলাইট ছাড়িয়ে আকাশের নক্ষত্ররা কলকাতার ভূমিকে স্পর্শ করতে পারে
না। রবীন্দ্র সদনের আলোমন্দির চষরে অনেকক্ষণ চুপ থেকে রণিতা
উত্তর দিল—‘তারপর আমার গর্ভে সন্তান এল।’

—তারপর?

—ও জ্ঞানাল আমাকে ওর বাড়ির লোকেরা বলেছে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
আবার কিছুটা সময় থেমে, রণিতা আজ প্রথম বেন নারী হয়ে উঠেছে।
চোখের জল কিছুটা গড়িয়ে নিল। ‘ও বলল, আমার বাবা মা-র সম্পর্কের
কোনো নামাজিক স্বীকৃতি নেই। তাই—’

‘My feet are at Moorgate, and my heart
Under my feet. After the event
He wept. He promised “a new start.”
I made no comment. What should I resent?’

তিন.

দু হাজার দশ সালের আগষ্টের প্রথম শুক্রবার এমন একটা সংবাদ পেল রুদ্দু : যার জন্য তার এই দীর্ঘ বাইশ বছরের প্রতীক্ষা। এই বাইশ বছরে প্রতিটি দিন কতবার যে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। আবার পরক্ষণে অধঃমৃত হলে বেঁচে থাকতে চেয়েছে কেবল সন্তান দুটির দিকে চেয়ে। তবু সে বাচার অসহনীয় ক্রান্তিময় সঙ্গীহীন মূহূর্তগুলিতে সে বার বার দেবতাকে অভিশপ্তাৎ করেছে। মনে হয়েছে বার বার দেবতা বলে কিছু নেই—হাঁদ থাকে তবে সে এমন নিষ্ঠুর কেন। গোটা জীবনের পূজা অর্চনা তবে তাকে এই মূল্য দিল কেন? কেন সে অন্য সব মেয়ের মতো স্থখী হতে পারল না। কি ছিল তার অপরাধ। অথচ বিনা মেঘে বজ্রপাতই ঘটে গেল। আজ থেকে বাইশ বছর আগে এই দিনটিতেই তুষারকান্তি চলে গেলেন। একদর বিনা নোটিশে। হঠাৎ করেই। মস্তিস্ক রক্তক্ষরণ—ব্যাংস সব শেষ। তারপর থেকে এই দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী সেই মানুষটির স্মৃতি বেদনাক্রান্ত বকে ধারণ করেই দুটি সন্তানের কাছে একাধারে ওদের মা ও বাবা হয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। একটি মেয়েকে পুরুষের যাবতীয় কাজের সঙ্গে একত্রে মেয়ের কাজও করতে হয়েছে। অথচ আজ বেঁচে থাকলে মানুষটা কতখানি আনন্দ পেত।

আজ অগ্নিমিত্র ইউ. জি. সি. ফেলোশীপ পাশ করেছে। একই সঙ্গে লেকচারশীপও। ও কলকাতা থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে,

কোলকাতা

১৮-২০১০

দুখিনী মা আমার,

আজ আর তুমি দুখিনী নও। তুমি পৃথিবীর সব থেকে গর্বিতা মা সব স্বপ্ন সাধক হয়েছে। তোমার ছেলে তোমার প্রার্থিত ইউ. জি. সি ফেলোশীপ পাশ করেছে। তোমার দুঃখ জানি মা। সেই কবে কোন সদ্য যৌবনে তুমি বাবাকে হারিয়েছিলেন। তারপর কত কষ্ট, কত দারিদ্রের সংগ্রাম বলে তবু আমাদের একদিনও বৃদ্ধত দাওনি, যে আমাদের কিছু অভাব আছে। তুমিই আমাদের মা ও বাবা। সেই তরুণী বয়সে বাবার মৃত্যুর ফলে জাইংহারনেসে যে চাকরী তোমারই একান্ত প্রাপ্য ছিল, সে চাকরীও তুমি নিজে না নিয়ে দাদার জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। যদিও দাদা তোমারই গভীর সন্তান, তাই তোমার আর দাদার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। তবু নিজের দারিদ্রের সম্পর্কে তুমি এবং এতখানি সহজ আদর্শবতী ছিলে যে আইনের নানা মার প্যাচ জেনে সমস্ত বিষয় নিজের হাতের মৃত্যুর রেখে তুমি

দাদাকে স্কুল ফাইনাল পাশ করিয়ে চাকরী পাইয়ে দিয়েছিলেন। অতঃ সেই দাদাই বিয়ে করে বৌদি মণিকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

না গো মা, আমি তোমাকে কণ্ট দেওয়ার জন্য এসব লিখছি না। আসলে তোমার মহত্ব, তোমার আদর্শ মাতৃমূর্তি—সে যে সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে জাগ্রত রয়েছে। ছারা বর্নের মতো প্রতিনিয়ত আমাকে রক্ষা করে চলেছে।

বেশ মনে পড়ছে। আমার এইচ. এস. পাশ করার পর আমাদের আর্থার স্বজন, মামাবাড়ির সবাই রণিমা—সবাই চেয়েছিলেন আমি যেন আই টি আই পড়ি। কেবলমাত্র তুমি সবার মতকে অস্বীকার করে আমাকে ইংরেজি অনার্স পড়ানোর জন্য কলকাতার এনে আশুতোষ কলেজে ভর্তি করে দিয়ে গেলে। কোন এক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক দেবাদ্রিবাৰু, যার সঙ্গে কবে যে রাস্তায়, কোন বাসে তোমার পরিচয় হয়েছিল, এবং তিনি তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘এমন মেধাবী ছেলেকে আপনি অবশ্যই ইংরেজিতে অনার্স পড়াবেন। আর তা অবশ্যই যেন নরেন্দ্রপুর, অথবা আশুতোষ, প্রিন্স্‌ডেন্সি কলেজে হয়। যদিও তিনি আমাকে কোনোদিনই দেখেন নি। কেবল তোমার মধু থেকে আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, সেই দুহাজার সালে আমার মেধার কথা শুনিয়েছিলেন। আর সেই শুনিয়ে তুমি মনে মনে স্বপ্ন এঁকেছিলেন তোমার ছেলে ইংরেজিতে অনার্স পড়ে এম. এ. পাশ করবে। পি. এইচ. ডি. করবে ফেলোশীপ নিয়ে। সেদিন অনেকেই তোমার কথা কে বাস্তব করেছিলেন। অনেকেই তোমার অবিবেচক কাজকে সমালোচনা করেছে। বলেছিল নিজের কপাল পুড়িয়ে তুমি নাকি আবার ছেলেদেরও ভাগ্য পোড়াতে শুরুর করেছ।

আজ এতদিন পরে সে সব কথা মনে হলে, আর তার পাশাপাশি তোমার তাঁর একাগ্র স্বেচ্ছা আদর্শের কথা মনে হলে বিস্মিত হতে হয়। সেই ভাষাতত্ত্বের গবেষক অধ্যাপক দেবাদ্রি—তাঁর কথা মনে হলেও গ্রন্থায় আমার মাথা সেই অচেনা অধ্যাপকটির উদ্দেশ্য নত হয়ে আসে।

আজ তোমার স্বপ্ন সাধক মা। আমি এখন থেকে প্রতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বারো হাজার টাকা করে ফেলোশীপ পাব। আবার যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজেও অধ্যাপনার উপযুক্ত ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম।

জান মা’ আমার গবেষণার বিষয়ে ভারতবর্ষকে নিয়ে বিদেশী লেখকের লেখা উপন্যাস। রিপলার্ড কিপলিং থেকে শুরুর করে একতালিউ পেজ হয়ে একালের হালের লেখা সলম্যান রুশদির শেষ জীবনের রচনাও আমার গবেষণার অন্তর্গত।

অস্বস্ত এবার তোমার সমস্ত চিন্তা মূছে গিয়ে স্বপ্নের সময় শুরুর হয়েছে। মাগো! তোমার সম্ভান একদিন তোমার স্বপ্ন সফল করে অধ্যাপক হবে। তুমি হবে অধ্যাপকের মা। আজ পথের শেষ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি—

তোমার অগ্নিমিত্র

চিঠি হাতে পেয়ে আর স্থির থাকতে পারল না রুমু, দু'চোখ বেয়ে তার আনন্দাশ্রু গাড়িয়ে পড়ল। এই চোখের জল আরো ঝরুক। ঘরের ভেতর খাটে বসে পড়ছিল চিঠিটা। এবার উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপরের দেওয়ালে আটা তুষারকাস্তির ফটোর দিকে তাকালো। বাইশ বছর আগের সেই যৌবনদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ। রুমুর নিজের শরীরের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। চুরাঙ্গিষ বছরের দেহে লাভণ্য কোথাও অর্জিত হয়েছে যেন। চামড়ার লোল পড়ে গেছে। মাথার সামনের চুলের কয়েকগাছি সাদা। চোখের দৃষ্টি তেমন আর তাঁর নেই। এতগুলো বছর। তবু ওর শরীরের কোনো পরিবর্তন নেই! এই যৌবনের জেদ নিয়েই উনি একদিন বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। এইচ.এস.পাস করে পরীক্ষা দিয়ে আই.আই.টি.তে চান্স পেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা অবলাকান্ত বাবু-বাড়ির বাইরে গিয়ে ছেলে লেখাপড়া শিখে দিগগজ হবে, এতে মত দিলেন না। নিজের জমানো টাকা নিয়ে ব্যবসায় মন দিতে তিনি টাক কিনে কারবার শুরুর করলেন। তুষারকাস্তি বাপের এই কাজের প্রতিবাদ করলেন অতি সূক্ষ্মশীল। বাড়ি থেকে পাালিয়ে যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। সিগন্যালম্যান হিসেবে প্রথম পোর্টিং কাম্মীরে। সেখানে থাকতেই রুমুকে বিয়ে করলেন। সেই যৌবনের উজ্জ্বল দিনে স্বামীকে দেখেছে রুমু। বেড়িয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্বামীর কর্মস্থলে। পর পর বছর তিনেকের ব্যবধানে দু'টি ছেলের জন্ম। যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি দাম্পত্য জীবন। যৌবনের সেই পৌরুষদীপ্ত দিনে হঠাৎ করে চলে গেলেন তিনি। আজ তবু তাঁকে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। বড় আনন্দ পেতেন।

দু'টি ছেলেকে জড়িয়ে বাঁচতে চেরেছিলেন রুমু, সব হারিয়েও। বড় স্মৃতিকণ্ঠ। তার মাথা ততখানি পরিষ্কার নয়। স্মৃতি যখন স্কুল ফাইনাল দেবে অগ্নি ক্লাস এইটের ছাত্র। কিন্তু তখনই তার মেধার ঝলক ঝলসে উঠেছিল। সব মাস্টার মশাইরা তো ছেলের প্রশংসার কত রকম উপমা ব্যবহার করতেন। গোপালপুর হাইস্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্ররাও অগ্নির পরামর্শ নিত।

স্মৃতি ছিল যেমন মোটা মাথার, তেমনই মোটা শরীরের। তার আবার

খুমও একটু বেশি। অলস প্রকৃতির পরিগ্রহ করতে চাইত না বেশি। অগ্নিই ওর দাদাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করত। বিশেষত ইংরেজি।

রুমু তখনই ঠিক করেছিল, ওর বাবার চাকরীটা নিজে না নিয়ে শ্মিতকে দেবে। সেই অনুযায়ী কাগজপত্র ভেঁরি করে রেখেছিল। ছেলে বিতীয় শ্রেণীতে মাধ্যমিক পাশ করার পর ওকে কোর্টের ক্লার্কিয়াল পোন্টে ঢুকিয়ে দিল।

ভূস্বাকান্ত মৃত্যুর আগে সেনাবাহিনী ছেড়ে কোর্ট ইন্সপেক্টর হিসেবে মেদিনীপুর কোর্টে জরেন করেছিলেন, তাই বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার ঘোরাঘুরি করতে হলেও আরকের বাইরে যার্নি কখনও।

রুমুর অহংকার ছিল ছেলেরা ওর আরকের মধ্যে। দেবাদ্রিবাৰু বলেছিলেন, ‘নিজের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশবেন। দেখবেন ওরা কখনও ওদের কোনো কথা গোপন করবে না। এমন কি নিজের অপরাধ, ভালো লাগা মন্দ লাগা। যদি কোনো মেরেকে ভালো লেগে থাকে, তাও যেন অকপটে বলতে পারে আপনাকে।’

—আমার ছেলেরা তাই। একবার পাশের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে একটি ঘেরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছেলেটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মেরেটি একদিন এ বাড়িতে এসে ছেলেটির সম্পর্ক জিজ্ঞেস করছে, বোধহয় তখনও ঠিক জ্ঞান না কোন বাড়িটা ছেলেটির। আমার ছোট ছেলে বোঁররে গিয়ে সরাসরি বলল, ‘সে নেই বাইরে গেছে—ফিরতে দেরি হবে।’ আমি ভেতরে কাজ করছিলাম। শুনতে পেয়ে বললাম, ‘কারণ সঙ্গে কথা বলছিছ রে?’ কাছে এসে ও বলল, ‘জান মা’ সেই মেরেটা এসেছিল, ও বাড়ির মলয়দাকে খুঁজতে। আমি সব জানি। বলে দিইনি নেই, আসতে দেরি হবে।’

—‘হ্যাঁ, এখন অবদি সবই ঠিক আছে, কিন্তু বরসান্ধি ভরসার সময়। যখন ছেলেমেয়েরা বাবা মা-এর কাছে প্রথম গোপন করতে শেখে। নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে নিজস্ব একটি ধারণা গড়ে তোলে।’ বলে অধ্যাপক দেবাদ্রি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন, তারপর আবার বলতে শুরুর করলেন, ‘ঠিক তখনই, তখনই দরকার ওদের কাছে টানার। কাজটা মোটেই সহজ নয়। তবু, মা—মাই প্যারেন প্রথম থেকে এমন একটি বোলামেলা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে, যেখানে কোনো আড়াল থাকে না।’

—‘আমি সেই সম্পর্ক গড়ে তুলব’—রুমু উত্তর দিয়েছিল।

—‘হ্যাঁ, আপনাকে তো হতেই হবে। কারণ আপনি একাধারে ওদের বাবা ও মা।’

তবু পারল না রুমু। শ্মিতের চাকরী পাওয়ার কিছুকাল পরেই জানা

গেল একটি মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। অনেক চেষ্টা করেছিল রুমু। অনেকভাবে বন্ধুরে অনেক লোক লাগিয়েও কোনো কাজ হয়নি। শেষ অবধি সব মেনে নিতে হল। অজুর্নির দামোদর মাইতির মেয়ে অপর্ণার সঙ্গেই স্মৃতিকণ্ঠর বিয়ে হল। ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা গায়ের রঙ, লম্বাটে মূখ, অপর্ণার ধারালো ঠোঁট, গোল গোল চোখ! বিয়ের পরই রুমুর সঙ্গে খিটি-মিটি লাগতে শুরু করল। অনেক চেষ্টা করেও ধরে রাখা গেল না। অগ্নি তখন এইচ. এস. পাশ করেছে। ও নিজেও বললে, 'মা আমাদের সঙ্গে যখন দাদা বৌদিদের মিলছে না, তখন ওদের ছেড়ে দাও। ওরা নিজের মতো থাকুক। নিজের সন্তানের সঙ্গে আলাদা হয়ে থাক। এ যে কি কষ্টের, তবু ছাড়তে হল ওদের। ওরা এখন মদিনাপুরে থাকে।

পরের দিন সকালে উঠে রুমু ওর বাবার বাড়ি গেল। ভাইদের জ্ঞানাল অগ্নি মিত্র যে এত ভালো ফল করেছে। ছোট ভাই চরন চেয়েছিল অগ্নি মিত্র টেকনিক্যাল লাইনে লেখাপড়া করুক, নিজে জেনারেল লাইনে বি. এস. সি. পাশ করে চাকরী পেল না। এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জ লাইন দিয়ে দিয়ে, কত ইন্টারভিউ, কত দরখাস্ত তবু হল না। তাই চরনের কিছুতেই মত ছিল না অগ্নি মিত্র জেনারেল লাইনে লেখাপড়া করুক। এখন অগ্নির ফেলোশীপ পাওয়ার খবর পেয়ে ভেমন কিছু আনন্দ প্রকাশ করল না। তার মনে হল, এখনও তো চাকরী পারিনি।

দুপুরেই বাড়ি ফিরে এল রুমু, মনে হল, যে লোকটি প্রথম এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই অধ্যাপক দেবান্দ্রবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হত। জন্মলোকের ভেমন কোনো ঠিকানাও জানা নেই, যে খবর পাঠানো যায়। ঐ হঠাৎ করে রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে দেখল আজ আবার একটা চিঠি এসেছে। অগ্নিরই মনে হল। হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে ফ্যানের সুইচ অন করে বিছানার ওপর বসে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করল।

কোলকাতা

৪. ৮. ২০১০

মা,

আশা করি তুমি ভালো আছ। আমি গাইডের সঙ্গে কথা বলে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছি, তাই আবার তোমাকে লিখছি। এখন বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, তাই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা আধুনিক পর্ষভিতে গবেষণা করব। আমার আর এখানে থাকার দরকার নেই। সামনের মাসেই প্রথম ফেলোশীপের টাকা পেয়ে আমি বাড়ি চলে যাব। আমার রুমটা পরিষ্কার করে রেখো। ওখানে কম্পিউটার বসাবো।

রুমটাকে সামান্য পরিবর্তন করে নিতে হবে। যে ঘরে কম্পিউটার থাকবে সে রুমটা এয়ার কন্ডিশনড হওয়ার দরকার। ওই রুমের একটা অংশ কাচ দিয়ে ঘিরে নেব। আমার কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেটের যোগ থাকবে, একই সঙ্গে টেলিফোন লাইন, ই-মেল ও স্যাটেলাইট এবং ফ্যাক্সের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ রুমের মধ্যেই গোটা বিশ্ব, ওখানে আমি আমার গবেষণার সমস্ত কাজ চালাতে পারবো।

আমি এখানে দৃষ্টিশীল কার্ডিনাল লাইব্রেরীর সেক্সারশীপ নিয়েছি। ওরাও সরাসরি আমাকে ইন্টারনেটের সুযোগ দেবে। মা গো, আজকের গতিশীল বিশ্ব যে কি বিশাল পরিবর্তিত হয়ে গেছে, ওখানে সব ব্যবস্থা করে তোমাকে দেখাব। আজ আর গবেষণার জন্য আমাকে বিদেশে যেতে হবে না, বরং দেশেই ফিরে যাব। এখন বিশ্ব আমারই ঘরের ভিতর বন্দী।

আজ্ঞা মা, আর একটা কথা, তুমি যে অধ্যাপকের কাজ থেকে প্রথম উৎসাহ পেয়েছিলে আমাকে ইংরেজি পড়ানোর বিষয়ে। তাকে কি আমার পাশের খবর জানিয়েছ। বড়ো ইচ্ছে, একবার তার সঙ্গে পরিচয় করি।

তুমি ভালো থেকে। দাদাবৌদির কোনো খবর পেলে? আমার প্রণাম নিও।

ইতি
অগ্নিমিত্র

চিঠি পড়ে রুম্‌ একটু অস্বস্তি হল। ভাই চন্নন শেষ পর্বন্ত কম্পিউটারের কাজ করত। ও পাঁশকুড়া কলেজ থেকে কম্পিউটারের ট্রেনিং নিয়েছিল। কিন্তু নিজে কম্পিউটার কিনে বাড়িতে বসার নি। একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার দেখাতে যায়। সামান্য হাত খরচের টাকা পায়। কিন্তু অগ্নি এসব কি লিখেছে। বাড়িতেই কম্পিউটার বসাবে। আবার তার সঙ্গেই টেলিফোনের যোগ থাকবে। আর ঐ সব ই-মেল, ইন্টারনেটে এ সব কি? এ শব্দগুলো রুম্‌র কাছে খুব একটা পরিচিত মনে হল না। চন্ননকে একবার টেলিফোন করলে জানা যায়। ও কি এখন বাড়িতে আছে? আজ শনিবার। বিকেলে, ও তো, স্টেশনের ওদিকে কোথায় যেন যায়। কিন্তু সেও তো বিকেল চারটার পর। চোখ ঘড়ির দিকে গেল। চারটে বাজতে এখনও দু'পাচ মিনিট বাকি। একবার করেই দেখা যাক। ওদের নীচে যে ভাড়াটিয়া থাকে। বাড়িও অফিসের হেডক্লার্ক। ওরা ফোন নিয়েছে। শাড়ি না চেঞ্জ করেই নেমে গেল রুম্‌। ওদের ঘরে গিয়ে দরবৌদিকে ডেকে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাল, বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও লাভ হল না। এনগেজম্যান্ট কল আসছে। দরবৌদি বলল, 'একটু পরে না হয় আবার চেষ্টা করবেন।'

—‘তাই দেখব না হয়। এখন যাই।’ বলে ওপরে চলে এল রুম্ম। শাড়ি চেঁজ করতে শুরুর করল। মনে হল একবার যদি অধ্যাপক দেবার্তি আসতেন, ভালো হত। বাড়ির ঠিকানা জানেন তিনি। সেই দশ বছর আগে প্রথম পরিচয়ের পর একবার এসেছিলেন। অর্নিও দোভলার ঘর বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তারপর আর কোনোদিন আসেন নি। যদিও হঠাৎ করে আচ্চকাই নু একবার দেখা হয়েছে বাসে। তবু অর্নি যখন পরিচয় করতে চেয়েছে, একবার এলে পারতেন। নিজেও উচিৎ ছিল ও’র ঠিকানা নিজে রাখা। কিন্তু তা করে নি বলে নিজেকে দিক্কার দিতে দিতে অন্য কাজে মন নিল।

একদিন সকালে টেবিলের ওপর ঝুঁকে রুম্ম খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে। মহাজোট সরকারের প্রধান শরিক অন্যান্য সদস্য দলের ‘কম্মতাকব’ করছে। ওদিকে বামপন্থী শক্তিগুণি বোয়া নেতৃত্বের অভাবে ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। আর সেই অবসরে নকশাল পন্থী সংগঠন আবার এখানে এখানে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। গতকাল ময়না অঞ্চলে তারা একজন অধ্যাপকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে সাধ্যাতীত অর্থ চেয়ে। ঠিক এই সময়েই একজন অপরিচিত লোক একদম রুম্মের মধ্যে চলে এল। রুম্ম তার মূখের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রথমে বললে, ‘কে?’ তারপর অচেনা বিস্ময়ের ঘোর না কাটতে কাটতে লোকটাকে চেনা মনে হল। সেই তরুণ বয়সের কাঁচা লাবন্য আর নেই। মানুষটার অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে। কপাল আরও প্রসারিত হয়ে গেছে। মাথার চুলে অনেক বেশি পাক ধরে গেছে। স্বাস্থ্য ভালো তবু সেই বলশালী শরীরে ফ্লসের ছাপ স্পষ্ট। সেই দিকে তাকিয়ে—‘আপনি কি?’ একটা সন্দেহের দোলায় থেমে গেল রুম্ম।

—‘হ্যা, আমি দেবার্তি। রুম্মদেবী, আপনি চিনতে পেরেন নি হয়তো। না চেনারই কথা।’

—‘না মানে আমি তাই-ই ভেবেছি। তবু—’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে থেমে গেল।

—‘অনেকদিন দেখেন নি। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই, কি করছেন? ছেলেরা কেমন আছে?’ অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।’

—‘বসুন বসুন। ভালোই করেছেন। আপনার কথা ভীষণ মনে হচ্ছিল। আপনি এই চেয়ারটার বসুন। আমি চা করে আনিছি।’—বলে দ্রুত দিচেনে চলে গেলেন।

দেবার্তি চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকালেন। অনেকদিন আগের ফটোগ্রাফ। ছবিটার রঙ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু মানুষটাকে

স্পষ্ট চিনে নেয়া যায়। যৌবনের দীপ্ত আবেগে এখনও জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো, মূখ, ঠোঁটের আদল। উঁচু করে রাখা ষাড়। তবু মানুষটা নেই কতকাল। অথচ এই ভদ্রমহিলায় কাছ থেকে দেবতার মতো পূজো পাচ্ছেন। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কি মস্ত্রে বাঙালি মেয়েরা এমন বস হয়ে থাকে স্বামীর।

এমন সময় রুমু ঘরের মধ্যে এসে চা এঁগিয়ে দিয়ে বললে, ‘কি দেখছেন? আমার স্বামী!’ বলে সামনের খাটে বসল। ‘আপনাকে অনেকদিন পর দেখছি। তাই প্রথমটা চিনতে অস্বীকারে হয়েছিল। আসলে তখনকার সেই তরুণ বয়স, আর আজ আপনার দেহে বায়ু’ক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’

রুমু, আপনাকেও আমি অন্য কোথাও দেখলে চিনতে পারতাম না। প্রথম সৈদিন দেখি, সৈদিন আনার মুখে কাঁচা নোনার মতো লাবণ্য, হলদি চন্দনের গন্ধ। শরীরে মানসিক মস্ত্রণার ছায়া ছিল তবু বয়সের আরম্ভের বড় বেশি হয়ে চোখে পড়ছিল। আর আপনার সেই সহাস্য আন্তরিক ব্যবহার। কত অল্প পরিচয়েও আপনি বাসের মধ্যে বসেই মেচেদা টেশনে আগ্র এনে দিয়েছিলেন।

—‘আপনি এতখানি মনে রেখেছেন। অথচ আজ দশ বছর হয়ে গেল। এখনও আমার সেই প্রথম দিনের ছবি আপনার মনে আছে? আমি তো তখনও স্বামী হারানোর শোক পুরোপুরি কটিয়ে উঠতে পারি নি।’

—আজ আর আপনাকে বলতে কোনো অস্বীকার নেই, সৈদিনের আপনার সেই উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাকে প্রাণিত করেছিল। সেই ছবিটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

—এ কি বলছেন! বলেও কিরকম লজ্জার ঘেন মূখ নামিয়ে নিল রুমু।

—‘না না, আজ তো আমার, আপনার দুঃখের বয়সই অপরাহ্নের হলুদ সূর্যাস্তের দিকে এঁগিয়ে চলেছে। আজ আর কোথাও কামনা নেই। সে জন্যই এত সহজে আপনাকে কথাগুলো বলতে পারছি।’ অধ্যাপক সামান্য কিছু সময় নিয়ে ঘেন রুমুকে একটু স্বাভাবিক হয়ে আসার সময় দিলেন, তারপর আবার তেমনই ধীর স্থির অথচ সুপরিকল্পিতভাবে বলে চললেন—‘তাছাড়া আপনিও তো একনিষ্ঠার সঙ্গে এতদিন আপনার স্বামীর উজ্জ্বল মূর্তির পূজা করে এসেছেন। সত্যি সাধনী মেয়েদের মতো। তাই এখন এই অপরাহ্নে আর তো কোনো পাপবোধ নেই। কামনা বাসনাই ন জীবনে পাপের কোনো প্রশ্ন আসে না। একটু থেমে আবার বলতে শুরুর করলেন, সৈদিন হয়তো মনে মনে ভালোওবেসে ফেলেছিলাম, সে জন্যই আপনার বাড়ির ঠিকানা জানা সত্ত্বেও কোনোদিন আসি নি।

যখন দেখা হয়েছে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। যাতে আপনার তাঁর একাগ্র সূৰ্যমুখী পতিব্রতে বাধা না হয়ে দাঁড়াই।

একটানা বলে যাওয়া কথাগুলো শুনে রুম্মু বাইরে দ্বিগ্ন হয়ে বসে থেকেও ভেতরে একটা আলোড়ন অনুভব করল। মনে হল তার মনুষ্যের রক্ত ক্রিয়াকম্পন লাল হয়ে যাচ্ছে যেন। অধ্যাপক সেই ভাবটি লক্ষ্য এবং উপভোগ করে বলেন, “আপনার ছেলের খবর কি?”

এবার সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রুম্মু অগ্রিমিত্রের চিঠি দট্টো অধ্যাপকের হাতে এনে দিয়ে বললেন, ‘আপনার প্ৰতিভা সত্যি হয়েছে। এই খবরটা দেবার জন্য ক’দিন আপনার দেখা পাওয়ার ইচ্ছে করছিলাম। আজ মনে হচ্ছে ঈশ্বর আছেন, তাই তিনি আপনাকে এখানে এনে দিয়েছেন।’

—‘আমি কিন্তু আপনার ঈশ্বরের ওপর সিকি পরস্রাও বিশ্বাস করি না।’ চিঠি পড়তে পড়তে এই কথা বললেন, ‘তাছাড়া আপনি একদিন, প্রথম যেদিন পরিচয় হয় তখন এই ঈশ্বরের ওপর অনেকখানি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।’

—হ্যাঁ, সে হরতো সাময়িক অভিমানে। কিন্তু তিনি আছেন বলেই তো আজ আমার সব কিছু ফিরে পেলাম।

—‘না, এই চিঠি পড়ে আমি আরও জোর দিয়ে বলছি, এ সবই হয়েছে ঐশ্বরিক অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার জন্য, এর পিছনে ঐশ্বরিক অবদান নয়। মানুষের নিষ্ঠা ও সাধনাই মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে চলে।’

—আর সে সাধনা, অধ্যবসায়—সে সবই তো ঈশ্বরের দান।

—এরকম করে আপনারা ভাবতে পারেন। তাতে আপাতভাবে আপনাদের অনেকখানি মানসিক শ্রম লাঘব হয়। আর নিজের অন্যান্য ও পাপ স্ফালনের জন্য এক শ্রেণীর মানুষেরা দেবতা নামক বস্তু আর গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ নিজের ঐকান্তিক চেষ্টার স্বাধীন সাফল্যের এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে, যেখানে সাধারণ মানুষের নাগাল পৌঁছায় না। মানুষের সেই অসাধারণত্বের জায়গায়ই একজন মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে। এর বাইরে দেবত্ব আর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই।

—‘না থাক দেবান্দিবাবু, তবু, তিনি আছেন। তাই আমি এসব পারছি। এমনকি আপনাকেও আজ পেরেছি তাঁরই জন্য। শুম্মু কেন যে ও’কে হারালাম, আমার কি পাপের ফলে জানি না।’ রুম্মুর গলাটা ভিজে এস।

দেবান্দিবাবু চুপ করে রইলেন। এখানে, মানুষের এই অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আর কোনো যুক্তি চলে না। তাই তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন।

রুম্মুও আজ অনেক কথা বলল। নিজের সন্তানের সাফল্য যেন অন্য কোথাও যোগ্য স্বীকৃতি পাচ্ছিল না। দেবান্দিবাবুই ছেলের সাফল্যের চূড়ান্ত

পরিণতির কথাও জানিয়ে দিলেন। বঙ্গালেন ইন্টারনেট সিস্টেমের স্বারা
 ক্রিভাবে ঘরের মধ্যে বসে আধুনিক বিশ্বকে হাজার মূঠোর আনা যায়। শিক্ষার
 সামগ্রিক বিকাশ, সমাজের সর্বস্তরে তার প্রসার ক্রিভাবে ইন্টারনেটের স্বারা
 সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর স্মরতম প্রান্তের সাফল্য এই ব্যাবস্থার মূহর্তের
 মধ্যে একটা সুইচ টিপেই নিজের ঘরের কম্পিউটারের স্ক্রীনে ফুটিয়ে তোলা
 যায়।

অনেক কথা হল, অনেক গ্রুপ হল। অধ্যাপক চলে যাওয়ার পরও আজ
 প্রথম অনেকটা সময় রুম্ মোহিত হয়ে থাকল অধ্যাপকের উপস্থিতির ঘোরে।
 এতদিন পরে আজ আবার মনে হল জীবনটা কিরকম যেন অর্থপূর্ণ। নিজেকে
 আবার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।

চার.

প্রথম প্রথম কলকাতার থাকতে গিয়ে মনে হয়েছে বিদেশীদের চোখে দেখা
 এই শহরটার ছবিই ঠিক। কলকাতা এক দূষিত নগরী। এখানে থাকলে
 সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে ওঠে। মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে যায়। এত
 এত ধোঁয়া, এত শব্দ, এত যানজট, এমন ঘিঞ্জি, এত অসহ্য অসহ্য আত্ম
 কলরব-এ কি কলকাতা ছাড়া আর কোনো সভ্য নগরীতে আছে? বাবা
 বলতেন কলকাতা তাঁর কাছে স্বর্গের মতো। যে মানুষ বড় হতে চায় তাকে
 কলকাতা মহানগরীর আশ্রয় নিতেই হবে। কিন্তু একোন শহর, বাবা কত
 গল্প করতেন। বাবার গল্প শুনে ছেলেবেলা থেকে ক্রমশ মনের মধ্যে একটা
 রূপকথার রাজ্যের আদলে ছবি গড়ে নিরোঁছিল অনামিত। এখানে সোনার
 সূর্যোদয় হয় সারেস সিটিতে আর রূপোর সূর্যাস্ত ঘটে গঙ্গার বুকে।
 এখানে গড়ের মাঠে, বালীগঞ্জের লেকের সোনার গাছের লাইট এন্ড সাউন্ডের
 হীরের ফুল ফোটে, কলকাতার আকাশে ঢাকা উড়ে বেড়ায়, যে ঠিক মতো জাল
 পাততে পারে সে সেই সব উড়ে চলা ঢাকা ধরে ঢাকার ঐশ্বর্যের পাহাড়
 বানিয়ে ফেলে। এখানের আকাশে সোনার বৃষ্টি হয়। রাজের আকাশ
 থেকে কোনোদিন চাঁদের আলো নিতে যায় না। এখানের রাজপথে অজস্র
 রাজকন্যার দেখা মেলে। কিন্তু বাবার সেই কলকাতা কোথায়? এ কোন
 কলকাতা, যে শহর আগুনে স্যাকা বিশ্বের মতো প্রতিশ্রুত জীবনকে মৃত্যুর
 মুখোমুখি ঠেলে দিচ্ছে।

কলেজে ক্লাসের সময় খুব অল্প। আজকাল অধ্যাপকরা কলেজে থাকেন
 কিন্তু ক্লাস নেন খুব কেম সময়। আবার ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্লাস করতে চায় না।
 যদিও সে করেটা ক্লাস হয়, অধ্যাপকদের পড়ানো এত উঁচু স্তরের বেশ ভালো

লাগে আনমিত্র। কিন্তু এত অল্প সময় ক্রাস নেন। সহপাঠীরাও ক্রাস করার প্রতি তাঁর অনীহা দেখায়। বই—এ সবই আছে তবু অধ্যাপকরা যখন ক্রাসে লেকচার দেন মনে হয় তাঁরা যেন নতুন করে বলছেন। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়। তার বাইরে বিরাট সময় সমুদ্রের তরঙ্গের মতো বিপুল স্রোতের উচ্ছ্বাসে অনমিত্রের আবশ্যককে গ্রাস করতে চায়। ও গোটা বিকেল কলকাতার নানা রাস্তার ঘুরে বেড়ায়।

প্রথম প্রথম ক্রাস শেষ হলেই ও মেসের মধ্যে এসে বসে থাকত। আর ভাষণ মন খারাপ হয়ে যেত। মনে পড়ে যেত এক এক করে বাড়ির সবার কথা মা-ঠাকুরমা, দিদি, বাবা, কাকিমা, পাড়ার লোকজন গ্রামের রাস্তাঘাট তারা যেন অদ্ভুত এক মারার ওকে ডাকত। নিজের কোলের ছেলেকে কোল থেকে নামালে মা' যেমন প্রথম প্রথম অস্থির হয়ে উঠতেন। আবার কোলে তুলে নেবার জন্য। না জানি যদি কোনো অনিষ্ট ঘটে যায়। তেমনই উৎসুক চোখে গ্রাম মেন ডাকছে। সেই লাল মাটির সরু রাস্তা। সেই আম, জাম, অশ্বথের পাতার ম'হর বাতাসের মর্মর শব্দ, রাতজাগা পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ। গ্রামের পরিচিত কুকুরের লোভীও মমতাময় চোখ। মাছরাঙার ফুৎ করে উড়ে যাওয়া, পাররা কবুতর চড়াই-এর ডানার নানা রকম শব্দ— চোখ ব্জলেই এই শব্দ; গ্রাম জীবন অনমিত্রর সমস্ত সন্তার একটা পরিচিত শব্দের অনুরণন বটিলে দিলে বলে যেত অমু' ফিরে চল, ফিরে চল—

কিন্তু যে ব্রত মনে নিয়ে এসেছে। ঠাকুরার যে স্বপ্ন ওর চোখের মধ্যে আঁকা আছে তাকে না স্বার্থক করে কি করে ফিরে যায়। তাই অসহ্য এবং জরাল আশ্রয়িত নিয়েও এই শহরেই ধুলো ও কালির মালিন্যের মধ্যেই থাকার অভ্যাস করতে হয়। কি আর করা যাবে, মনকে সন্তুষ্ট না দেওয়া যায় এমন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাল বিশাল লাইব্রেরী, এতো বিশাল ও বিচিত্র ধরনের নতুন নতুন বই—এ সব তো আর গ্রামে থাকলে কোনোদিনই পাওয়া সম্ভব হতো না।

আবার এক সময় মনে হল, নিশ্চয়ই কোথাও একটা রহস্যের চাবিকাঠি আছে যার সন্ধান আজও পারিনি ও। তাই এই বিশ্ববিখ্যাত শহরকে ভালোবাসতে পারছে না। তবু একদিন ও সেই রহস্যের চাবি খুঁজে পাবেই এই আশার জোর করে মন থেকে গ্রামের স্মৃতিতে আবদ্ধ করে দিতে চাইল। এখনও তাই রোজ বিকেলে ক্রাস ছুটির পর একা একা নানা রাস্তার ঘুরে বেড়ায়। এই শহরের ভিড় বাসে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। আবার পাতালে নেমে গেলে ট্রেনের জানালা দিয়ে কেবল অশ্বকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। চোখের এই বাঁধা মনকেও কিরকম পঙ্গু করে দেয় যেন। হয়তো ওপরের রাস্তার চারদিকের এই আলোও থাকবে না একদিন। যে ভাবে

রাস্তার ওপর রাস্তা বানাতে গিয়ে উড়ালপুল বানাচ্ছে সরকার। তাতে একদিন হয়তো প্রধান প্রধান জারগাগুলোই ওভারব্রীজে ভরে যাবে। বৈদ্যুতিক আলোর আশ্রয় ছাড়া নীচের রাস্তার দু'পাশে আর কিছুই দেখা যাবে না।

তবু ভিক্টোরিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে গড়ের মাঠের ওই দিকটার মহানগরীর ভিড়। পশ্চিমে রেসের মাঠের ওপরে ঝুলন্ত বিতীর্ণ সেতু, উত্তর পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়মের ছায়াঙ্কুরঘনঘটা—এসব যেন রূপকথার রাজ্যে পৌঁছবার রাস্তা কোথায় ঢেকে রেখেছে মনে হয়। নন্দন, রবীন্দ্রসদনে, একাডেমীর সামনে দাঁড়িয়ে বসে এক ধরনের নান্দনিক স্বাদ পাওয়া যায়। মনে হয় এ সবের ভেতর দিয়ে হয়তো কোনোদিন এই শহরকে ভালোবাসার মস্ত খঁজে পাবে।

রবীন্দ্রসদন, নন্দনের সামনে জোড়ায় জোড়ায় ঘুস্ক-ঘুবতী, তরুণ-তরুণীরা বসে প্রেমলাপ করছে। বিচিত্র এই শহরের এ ছবিতে অনিচ্ছুর প্রথমে কিরকম অশ্রীল এবং কদম্ব মনে হত। সব থেকে অশ্রুত লাগত ভিক্টোরিয়ার বাগানে, ভেতরে আশ্চর্য এক সময়ের নীরব স্বাক্ষী-বুটিশ আমলের দু'শব্বরের কলকাতার নানান ঐতিহাসিক বস্তু, বহু মনীষীর ছবি। আর বাইরে শ্বেতপাথরের শ্রুস্তের চারদিকে বাগানে অজস্র ফুল গাছ পাতা আর নেকের জলের ভিতর জলজ মাছ, মাছেদের খেলা। বাগানের এখানে ওখানে ঘাসের কাপেট ভেদ করে ছোট্ট একটা কালো রঙের বোর্ড উঠে এসেছে লিলি ফুলের মতো মাথা তুলে। সাদা কাঁল দিয়ে লেখা Don't pluck the flower. অথচ জোড়ায় জোড়ায় এত নারী পুরুষ, খোলামেলা শরীর বিনিময় চুম্বনের বন্যায় তারা সবাই অজস্র মানুষিক ফুল তুলে চলেছে। এই হল বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ার বাগান।

প্রতিদিন বিকেল চারটার পর একাডেমী অফ ফাইন আর্ট-এর বিভিন্ন গ্যালারিতে হাতে আঁকা ছবির প্রদর্শনী ভালো লাগে। নানা ধরনের কাজ, জল রঙ, তেল রঙ, মিশ্র মাধ্যমের। কত বিচিত্র পরিকল্পনা। শিল্পীর চোখে দেখা বিশ্ব কি অশ্রুত! আর তাদের চোখ দিয়ে সর্বকিছু দেখতে গিয়ে মনে হয় নিজের দেবার দিগন্তটাও কিরকম বেড়ে যাচ্ছে যেন। কোনো কোনো দিন পুরোনো আমলের শিল্পী গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাসের ছবিরও প্রদর্শনী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে একালের বিরাট পরিবর্তন সহজেই বুদ্ধে ওঠা যায়। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে শোনা গণেশ পাইনের ছবির আশ্চর্য রূপকথার জগতের কথা। এখনও কিরকম রহস্যময় মনে হয়। জল রং-এর ঐসব ছবির কাল্পনিক জগৎ কিরকম কিছুত

তবু তাদের এমন জীবন্ত মনে হয়। এর পাশাপাশি একালের তরুণ চিত্র-শিল্পীদের জগৎ বড় বিচিত্র। কেউ একজন শব্দে সবুজের ব্যবহারে বাস্তবিক নগরায়নকে ফুটিয়ে তুলেছে। শহরের বিচিত্র জটিল ঘরবাড়ি, পাথরের রাস্তাঘাট-সব কিরকম মাথা বের করে অদ্ভুত ভূতগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি সব বলতে চাইছে। এসব ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, হায়! সত্যি যদি একদিন এরা এরকম প্রাণ ফিরে পেয়ে প্রতিবাদ করে, যদি বলে আমরা আর মানুষের শাসন মানি না, আমরাই মানুষের পৃথিবীকে শাসন করব।

একদিন হঠাৎ তরুণ এক শিল্পী রোহিতক-এর আঁকা কয়েকটা তেল রঙের কাজ অনমিতকে চমকে দিল। প্রতিটি ক্যানভাসে এক একটা কম্পিউটার। কিন্তু তারা সবাই জীবন্ত। তাদের আর মানুষকে অপারেট করতে হচ্ছে না। তারা নিজেরাই স্বয়ংক্রিয়। এমন অদ্ভুত সব কম্পিউটাররা তাদের স্ট্রীনে যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, তাতে দু'হাজার তিরিশ সােলর মানুষের চারিত্র সব ফাঁস হয়ে গেছে। একটা কম্পিউটার দেখিয়েছে মানুষের মনের নানা প্রকোষ্ঠের ছবি আর এই শতকে সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে সব থেকে ক্রিয়াজীবী মানুষের মনের হিংসা ও স্বার্থপরতার প্রবৃত্তিগুলি। এই অস্থির অনস্বয়ী বিশ্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা কম্পিউটার আগামীর এক আধুনিক বিশ্বের ছবি দেখিয়েছে। যেখানে প্রকৃতি জগতের অদ্ভুত সব গাছেরা, মানবের প্রাণিরা, জলজ সস্পদেরা মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক অপূর্ব শান্তির পৃথিবী গড়তে চেয়েছে। আর একটা ছবিতে কম্পিউটাররা মানুষের পারমাণবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিস্ফোজ প্রদর্শন করছে। অন্য এক ক্যানভাসে মহাকাশ থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন দেশের কম্পিউটাররা একত্রে মিলিত হয়ে পৃথিবীকে দেখাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন দেশের চিত্রাশীল মানুষেরা কিভাবে একে অপরকে খেয়ে ফেলে বড় হতে চাইছে সেই ছবি।

এসব ছবি দেখে অনমিতর মনে হল, আমরা যেন আশ্চর্য ভাবে সৃষ্টির সেই ভয়ঙ্কর জুরাসিক পর্ব চলে এসেছি। সেই যে ভূতাত্ত্বিকেরা চারশ পঞ্চাশ কোটি বছরের পৃথিবীকে চারটি পর্বে ভাগ করেছিলেন প্রোটেরোজোয়িক, প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক ও কেইনোজোয়িক। তার ভূতাত্ত্বিক পর্ব মেসোজোয়িকের ব্যাপ্তিকাল ২২,৫০,০০,০০০ থেকে ৭,০০,০০,০০০ বছর পর্যন্ত। এই বিশাল পর্ব আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত ট্রাসাসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেসাস, আর সেই জুরাসিক পর্বের বিস্তার ১৮,০০,০০,০০০ থেকে ১০.৫০,০০,০০০ বছর পর্যন্ত। এই পর্বে পৃথিবীর বুকে দাঁপিগ্রে বেড়াচ্ছিল প্রবল শরীর, ভয়ঙ্কর দাঁত, ভয়ঙ্কর শক্তির, অসামান্য সর্বনাশা এক জীব ডাইনোসরাস। তবু

বিশাল পর্বের পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো জীবটি অচিরে হারিয়ে গেল যে সব কারণে ; প্রাণি বিজ্ঞানীদের অনুমান তার একটি কারণ হল এই জীবটি এক ভীষণ জীবনকল্পী সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে । এরকমই একটি সম্ভাব্যতার বিষয়কে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দশকে তখনকার বিখ্যাত চিত্রপরিচালক স্টিফেন স্পিলবার্গ, তাঁর জুদাসিক পাক' চলচ্চিত্রে মাইকেল ক্রিকটনের উপন্যাসকে অবলম্বন করে । যদিও ডাইনোসরাসের বিন্দু হওয়ার প্রায় পাঁচ শ' কোটি বছর পরে মানুষের আবির্ভাব এই পৃথিবীতে । তবু মনে হয় পাঁচ শ' কোটি বছরের সেই অশ্রুত সর্বনাশা নাটকের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আজ আবার, মানুষ যেন আজ আবার পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে ফেলতে চাইছে, ফেলবেই ।

এমন ছবি পেরিয়েও যখন একাডেমীর ভেতরের দিকে যাবার চেষ্টা করল পাঁচ টাকার টিকিট কেটে উপরে উঠে গিয়ে চমকে উঠল । এখানে এভাবে এতগুলো জোখা, এগুলো রবাস্ত্রনাথ পরভেন । এখনও সেই বিস্ময়কর মনোহারী গায়ের গন্ধ মম করছে । কাছে এসে অনমিত নাক চুকিয়ে শুকল । বুকের ভেতরটা খড়ান করে উঠল । এরকম অনুভূতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা হয় নি । রবীন্দ্রকুরের বাবস্ত্র এত জিনিস, একদম দাঁকনের কণ্ঠে এসে সামনের দেওয়ালে তাকিয়ে দেখল রবাস্ত্রনাথের আঁকা করেকটা ছবি । একটাতে কেন যেন মনে হল কবির বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীরই ছায়া । রবাস্ত্রনাথের আঁকা রঙিন যে সব ছবি বাবার লাইব্রেরীতে দেখেছে ও, এ ছবি তার থেকে আলাদা । এছবি আগে কোথাও কোনো বইতে দেখেছে বলে মনে হয় না । জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার রবাস্ত্রনাথের আঁকা কিছু ছবিও আছে । আছে সে সময়কার ফটোগ্রাফ, আবার সেই ঘরটা, যেটার সঙ্গে কবির জন্ম থেকে যোগ । সে ঘরটাও অজস্র লোকের পরিদর্শনের জন্য যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে বড়ো বেশি রকমের ডেকোরেটেড মনে হয় । কিন্তু একাডেমীর এই ওপরের ধরে মানুষের জানার বাইরে এমন একটি জর্নাক্রল নির্জন ঘরে রবাস্ত্রনাথের বাবস্ত্র জিনিসপত্র হাতে আঁকা ছবি দেখে চমকে উঠল । আজ মনটা অন্যরকম ভালো লাগল, মনে হল-এ হল কলকাতা মহানগরীর রহস্য । আর আজ যেন ও প্রথম সেই রহস্যের চাবিটাকে ছঁতে পেরেছে । আজ অন্য এক রকমের উত্তেজনা নিয়ে যেসে ফিরল ।

ডেভিড এসব বিস্ময়কে কোনো পাস্তাই দিল না । অথচ এতদিন ও ডেভিডের কাছ থেকে কতো বিচিত্র ধরনের গল্প শুনিয়েছে । ডেভিডের কথা শুনিয়েছে । আর কলকাতা শহরের সব বিস্ময় কেবল ওকে ঘিরে ঘটবার জন্য । পাতাল রেলের মধ্যে হঠাৎ লোডশেডিং হয়েও কি করে ম্যাগনেটিক পাতের দ্বারা এক জর'ন ইঞ্জিনের ট্রেনকে স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে এল । আর একবার তৃতীয়

হুগলী সেতু থেকে একটা ট্যাক্সি কি অসুস্থ ভাবে সেতুর শেষ প্রান্তে গিয়েও সামনে দাঁচাকা ঝুলে দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই ট্যাক্সিতেই ডেভিড ছিল। অথবা শহীদ মিনারে উঠতে গিয়ে ওর বাম্‌থবী দেবদত্তীর সঙ্গে পরিচয়; এসব গল্প যে বলতে পারে সেই এদেশীয় ক্রীটান ছেলেটি, কেন যে অনমিত্র এমন একটা খবরে আনন্দ পেল না, বিস্ময়ও নয়। অনমিত্র আহত হল। রাশ্রে বিজ্ঞানায় শূন্যে শূন্যে বাবাকে চিঠি লিখতে বসে হাজার কাটাকাটি করল। তবু শেষ অব্দি মনে হল ঠিক কথাটা এখনও লেখা হয় নি।

কলেজেও বেশ কয়েকদিন এই গল্প শুনিয়েছে অনেকেই—একমাত্র হ্যান্সি মন দিয়ে শুনলে ওকে মধ্যমগ্রামের ওদিকের ‘আর্ট সেক্সের’ স্থান দিল এই শীতের মরশুমের সেখানে শিকশমেলা শুরু হবে। রবীন্দ্রনাথের ওপর আলোচনার যোগ দেবেন দেশী বিদেশী নানা মনীষীরা।

ডেভিডের বাবা কলকাতায় এসেছিলেন সাতবছর আগে। এখানে একটা প্রাইভেট কনসার্নের কাজে এসে এলিয়ট রোডে যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সে বাড়ির এ মেয়ে রোজালিন। রোজালিনকে দূরন্ত প্রেমে বেঁধে রবার্ট একবছর কলকাতায় তুখোড় আমূদে জীবন কাটিয়ে তারপর আবার উখাও হয়ে যান তাঁর রুরোপীয় জীবনে। পরবর্তী অধ্যায় রোজালিনের কাছে আরাম-দায়ক হওয়ার কিছু নয়। দূরন্ত ডেভিড বাবার রক্ত পেরিয়েছিল সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য সহ। মা হাড়জলদুনী জ্বলে ডেভিডকে সতের বছরের যুবক করে পুরোনো প্রেমিক এলবার্ট-এর হাত ধরে বিদায় নিলেন কলকাতা শহর থেকে। বৃন্দ গ্রান্ডফাদার আব্রাহাম পড়ে রইল রবার্টের গোরার তুখোড় সন্তান ডেভিডকে নিয়ে। আব্রাহামের স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে পাওয়া পেনসনের আর্থিক অকটা বেশ মোটা রকমের। অন্য কোনো উত্তরাধিকার না থাকায় ডেভিডের পক্ষে বেহিসেবী হয়ে ওঠা সহজ হল। আর কলকাতার মেরু জীবন সেই লাগানছাড়া তেজী ঘোড়ার গতিতে করে তুলল হিস্পানী। ডেভিডের দুর্বীর জীবন অনমিত্র গ্রাম্য লাজুক শান্ত স্বভাবের বিপরীত হওয়ার ওর কাছে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। যদিও অনুকরণের অভ্যাস এ জীবনকে ঠিক শ্রম্ধাও করে না অনমিত্র। বরং ওর বাম্‌থবী দেবদত্তীকে ভালোলাগে। এই বাঙালী মেয়েটির সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল স্বভাবের সঙ্গে মানানসই নামটি। এত মিস্টি নাম বইএর পাতার বাইরে কোনো মেয়ের হয় জানা ছিল না। ডেভিডের দুর্বীর জীবনের স্বেচ্ছাচারের পাশাপাশি দেবদত্তী আপন শান্ত স্বভাবেও কি করে যে ডেভিডের বাহু জড়িয়ে ধরে-হুগোড়ে মেতে ওঠে-এ বিস্ময়কর। তবু দেবদত্তী ওর সঙ্গে কথা বলার সময় সৌজন্যের সমদ্রব্ধ কজার রাখে।

মেসের মালিক অমলিনা দেবী তবু কিছুতেই সহ্য করতে পারে না

দেবদত্তীকে। এমন কি একজন বাঙালী হিন্দু মেয়ে হয়ে খ্রীষ্টান ডেভিডের সঙ্গে মিশে যে ঘোর অন্যায় করেছে, এবং তাদের স্ব-বতীকালে এধরনের ঘটনা ঘটলে ঢি-ঢি পড়ে যেত গোটা কলকাতা শহরে এমন কথা অনমিত্রদের অনেকবার শুনিয়েছে। তবু আশ্চর্য এক রকমের দুর্বলতা ছিল। অমলিনাদেবীর ডেভিডের প্রতি এবং ডেভিডের জীবনের স্বেচ্ছাচারী স্বভাবে কোনো অন্যায় নেই কারন খ্রীষ্টানেরা এরকম হয়। তবু ডেভিডের মধ্যে একধরনের পৌরুষ আছে যা আজকের ছেলেদের মধ্যে সাধারণত মেলে না। যদিও এই পৌরুষ ব্যাপারটা কি জিনিস এ বরসেও অনমিত্র ঠিক রকম বুঝে উঠতে পারে নি। তবে হয় তো অনমিত্র ধীর স্থির স্বভাব পৌরুষ বিরোধী। আচ্ছা বাবা যে বলতেন বেদ অপৌরুষের, যার পৌরুষ নেই সে তবে অপৌরুষ! যদিও সেটাও একধরনের একশটাই আইডিয়া অনমিত্র কাছে। কিন্তু এসবের বাইরে দাঁড়িয়ে অমলিনা দেবীর মেয়ে মাজু ওকে কিরকম পছন্দের চোখে দেখে যেন। অনমিত্র মনে হয় মাজু নামটাও যেমন ব্যাকরণ বহির্ভূত, তার রোগাপানা চেহারার কালো বুরুজের মতো ছিপছিপে শরীরটাও তেমনই কিরকম নিরুৎসাহ নিরুৎসাহী মনে হয়। অমলিনা দেবীর সমস্ত মলিন-স্বভাব মেয়েটি বোলোআনাই পেয়েছে।

মেয়ের অন্য যে করাটি শরিক, তারা প্রত্যেকেই মেদিনীপুরের ছেলে। কিরকম বইএর মধ্যে মূখ গুঞ্জে পড়ে থাকে। তাদের পৃথিবীতে পড়ার বাইরে ভালোলাগা মন্দলাগার আর কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই। এমন বই-এর পোকা ছেলেদের দেখলে অনমিত্র বার বার সেই লাইনটাই মনে পড়ে—যে জীবন ফিউং-এর দোরেলের মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা। এদের তুলনার ডেভিডের জীবনকে মনে হয়েছে অনেক বেশি ডাইনামিক। পৃথিবীর কিম্বাকার ডাইনামোর ওপর দাঁড়িয়ে বহুস্তরিক ও বহুপার্শ্বিক যে মানুষ প্রতিদিনের জীবনকে মৃত্যুর মূখোমূখি দাঁড় করাতে জানে, জানে রাবলের দর্শনের মতো ক্ষুদ্রীভূত বাচতে। কিন্তু এ জীবন অনমিত্র পক্ষে অনুকরণ অথবা অনুন্নয়ন করা অসম্ভব। বরং ঐ মূখ গুঞ্জে বইয়ের পাতার ভেতর পড়ে থাকে মানুষগুলো-পড়ে থাকে ছেলেগুলোর সঙ্গেই ওর ঘনিষ্ঠতা! তাদের মতোই ও যে গ্রাম জীবন থেকে উঠে এসেছে সে জীবনে কোথাও যেন ভোরের অলস রোসে শূন্য থেকে জীবনের কুঁড়েমির একরৈখিক স্থিরতা আছে। তবু এ জীবন অনমিত্র না। সে যদি এই দৈনন্দিনতাকে মেনে নেবে তবে কলকাতা মহানগরীর মতো অজস্র বৈচিত্রময় বহুমাত্রিক শহরে এসেছিল কেন। এখানে সব মানুষ আশ্চর্য গতিশীল। জীবনের কি এক অনাস্বাদিত সফলতাকে ধরবার জন্য এখানে সবাই উন্মত্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। কেউ

একটু দাঁড়িয়ে গেলেই মৃদু খুবড়ে পড়ে যাবে তার পেছনের অসংখ্য ধাক্কা মানবদেহের পায়ের তলায় পিণ্ট হয়ে যাবে তার দেহ ।

এই গতির মধ্যে দাঁড়িয়েই জীবনের আসল সত্যের সম্মান পাওয়া যায় । নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা প্রেরণা পাওয়া যায় । অনেক কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায় । ওর কখনও মনে হয়েছে, ডেভিডের জীবনের গতিশীল যাত্রার সঙ্গে যদি মেসের অন্যান্য ছেলেদের পঠন পাঠনের ভীর্ণ অভ্যাসকে একত্রে টুইস্ট করা যায়, তবে তার মিথস্ক্রিয়ার যে মানব তৈরি হবে তার সাফল্য অনেক উঁচু দরের ।

সেবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের বহুতা সভায় ড. ভৌমিক 'গড়পড়তা বাঙালীর সাফল্য এবং ব্যর্থতা' বিষয়ে বহুতা দিতে গিয়ে এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট তুলে ধরলেন । প্রথমত যে যার বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের অধিকারী হবেন । অর্থাৎ বিষয়ের ধারণা পরিষ্কার হওয়া চাই । বিস্তারিত পৃথিবীজ্ঞান জ্ঞানের পাশাপাশি সমাজে সেই বিষয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । সমস্ত বিষয়েরই একটা এ্যাপ্লায়েড ওয়ে বা প্রায়োগিক দিক আছে । সে বিষয় যতোই অবজ্ঞেকটিভ হোক, সমাজে তার উপযোগিতার সূত্রটি আমাদের খঁজে বের করতেই হবে । তৃতীয়ত একজন ব্যক্তি কেবল তাঁর নিজস্ব বিষয়ে নয় বাইরের আর সব বিষয়েও প্রাথমিক ধারণার অধিকারী হবেন, আজকের পৃথিবীর জটিল জীবনযাপন প্রণালীতে এভাবেই তার স্থান নির্ণীত হতে পারে । চতুর্থ অবলম্বন হল, কঠোর প্রম ও অধ্যবসায় । এই সমস্ত গুণগুলির যে কোনো একটির অভাবে যে কেউ ব্যর্থ হতে পারে । আর যে ব্যর্থ সে ক্রমশ জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একদিন এতো পেছনে পড়ে যায় যে, এ জীবন থেকে তার বিদায় নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না । ব্যর্থ মানবকে এ পৃথিবী প্রত্যাখ্যান করে ।

কলেজের ক্লাসের পড়ার সঙ্গে এ জাতীয় বহুতার পার্থক্য আছে । দুটো বেন দু'মাত্রার । অথচ এর কোনোটাই বাদ দেওয়ার নয় । বরং এ দুটোকে একত্রে মিলিয়ে জীবনের সঙ্গে অশ্বিত করতে পারলে তবেই প্রার্থিত ফল লাভ করা যায় । তবু এমন জীবন স্নোতহীন হয়ে যায় । জীবনকে একঘেয়েমী পেয়ে বসে । আর তখনই ডেভিডের মতো উদ্দাম উজ্জ্বল হতে ইচ্ছে করে । তবু অনমিত্রর পক্ষে তা অসম্ভব । বাইরের প্রকৃতিতে পরিবর্তন এলে তখন জীবন একটু দুলে ওঠে বেন । গ্রামে ঋতু পরিবর্তনগুলো বেশ ধরা পড়ত । মাঠ প্রান্তর ও নদীনালা ঘেরা ছায়া স্রুশীতল প্রকৃতি যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপ চিহ্নিত করে । সেখানে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বসন্ত, শরৎ বেন বলে, আমাকে চেনে দেখ, আমি অন্য একজন—কিন্তু কলকাতা শহর সব ঋতুকেই গড়ে পিটে একই রকম করে নিয়েছে । ব্যস্ততা ছাড়ে গড়া সময় এখানে কেবল

ঘড়ির কাঁটা দেখে চলে। তবু এমন সূচত্বর কৃপণ শহরকেও একমাত্র কাবু করে ফেলে বর্ষণ। এই একটা ঝড় নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ে এমন অহংকারী অভিজাত শহরকে।

দু' হাজার বাইশ সালের এপ্রিলের শেষ শুক্রবার। বামবিরোধী দলগুলি একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ তেকেছিল রিগ্জেডে। কলেজ বন্ধ করেছে তাদেরই লেজুড় ধরা ছাত্র নেতারা। শিরালদা থেকে রবীন্দ্রসদন, হাওড়া থেকে শ্যানবাজার পর্যন্ত যানজটে শহর বেহাল। নাজেহাল মানুষজন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বাধ্য। প্যাচপেচে ঘামে ভেজা গরমের ধমধমে দুপুর। অনমিত এসপ্লানেডে কটোজ ইন্ডাসট্রিজের শো-কেশে দেখাছিল আমেরিকা থেকে আনা ইনকার অস্ত্রাত ইতিহাসকে অবলম্বন করে বানানো কিছুর হাতের কাজ। আর তার আকাশ ছোঁয়া দাম। ওর পেছন দিকে গল গল করে গলে যাচ্ছে বিক্ষোভ ফেরৎ মানুষের ভিড়। হঠাৎ দেখতে দেখতে রোদকে কেউ চাদর দিয়ে ঢেকে দিল মনে হয়। পশ্চিম আকাশের একখণ্ড মেঘ মূহূর্তের মধ্যে সমস্ত সৌর তেজকে ক্লিরকম আচ্ছন্ন এবং স্তম্ভ করে দিয়েছে। এখনও ঝড় উঠে নি। তবু মানুষের ঝড় হঠাৎ কলকাতা শহরকে নাকাল করে দিয়েছে। একটাও বাসে ওঠার উপায় নেই। অনমিত লেনিন সরণীর মুখে একটু সময় দাঁড়িয়ে বাস ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সোজা বিবাদি বাগে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে হাটতে শুরু করল। ওখানে বরং মিনি বাস পাওয়া যেতে পারে। রিগেড থেকে অনেকটা দূর। তাই ওখানে এখনও তেমন ভিড় নাও জমতে পারে।

বিবাদি বাগে এসে দেখে মিনিতে ওঠার জন্য সাপের মতো আঁকা বাঁকা বিশাল লাইন। পাশাপাশি লাইনগুলো কারপেটের ভেতর কে ঢুকে গেছে। আর কে যে কোন বাসে উঠবে বোঝা কঠিন। কয়েক প্রস্ত বাতাসও বয়ে গেছে। মানুষ তাই আরও অস্থির।

হঠাৎ একটা লাইন থেকে মেরেলি কন্ঠ ও নিজের নাম শুনতে পেয়ে অবাক হ'ল। মেরে কন্ঠ কে ডাকে। দুটো লাইন ক্রশ করে সামনে এসে চমকে দেখে দেবদত্তী। নিটোল গোল মিস্তি মুখে টল টল করছে হাসি। 'তাড়াতাড়ি আমার পাশে চলে এসো, প্রায় কোনো অবকাশ না দিয়ে একরকম জোর করেই ওকে লাইনের মধ্যে টেনে নিল। একটা মেরে টানছে বলেই কি কোনো প্রতিবাদ নেই। দেবদত্তার ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। আর সব চেয়ে ভালো লাগে, অন্য মেরের মতো ও এখনও বব নয়, মাথাভর্তি চুল। সামনের কপালের কাছে ফুলে ওঠা চুলে ও যেন কালো পটভূমির ওপর নিজের মুখশ্রীকে কেটে বসিয়েছে। গের্জ আর জিনসের প্যাণ্টে ওর স্মার্টনেস সব

দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে। কলকাতার মেয়েরা যেন কিরকম ঈর্ষাকাতর ফর্সা। কোন এডভান্স্ ফরম্‌লার তৈরি শ্রীম ব্যবহারের ফল কে জানে।

‘আজ তুমি আমার সঙ্গেই চল, তোমার কোনো আপত্তি শুনব না।’ দেবদত্তী কোনো প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়ে অনর্গল বলে চলে, ‘তুমি এতো মিষ্টি রকমের শান্ত আর ধীর স্থির। ডেভিডের পাশাপাশি তোমাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।’ আর এমন নির্বিধায় কথাগুলো বলে চলে, যেন মেয়েটি তার কোনো অন্তরঙ্গ বাস্তবীর সঙ্গেই কথা বলছে। ‘জ্ঞান আজকের এমন ঝোড়ো হাওয়ার উথালপাতাল স্রোতে তোমাকে নিয়ে ভাসতে পারব আমি স্বপ্নেও ভাবিন। উঃ এখন যদি আকাশ আধার করে বৃষ্টি নামত’— বলে এক ভিড় জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়েই যেন এক চক্র নেচে নিল দেবদত্তী। আর কথা বলার ভঙ্গিটি এত স্বন্দর হরণ করে নেয়। যেন ওর আনন্দের বন্যার বৃকের রক্ত চলে উঠতে চাইছে। ‘—আমরা ভেসে চলতাম কোন নিরুদ্দেশের সাগরপারে’ দেবদত্তীর চোখ দুটো কিরকম মায়া কুহকে রহস্যাতুর যেন। আর অনমিত, সদ্য প্রেমে ফেঁসে যাওয়া কোনো আনাড়ী প্রেমিকের মতো লজ্জারূপ।

কিন্তু না। প্রকৃতি আজ বৃষ্টি দেবদত্তীর জাদুতে বন্দী। অথবা ওয়ে দেবদত্তী তাই কি এমন আকাশ আধার করে মূল্য ধারার বৃষ্টি নামল। যদিও ততক্ষণে ওরা কর্ণাময়ীগামী মিনিতে উঠে পড়েছে। পেছন দিকের সিটে গায়ে গা ঘেঁসে বসতে হল, আর বাসটার কি দম বন্ধ করা ভিড়। ড্রাইভার অনেক কসরৎ করে বৃষ্টিতে ভিজে এতোলবেতোল পথে লেনিন সরণী পেরিয়ে যখন জে সি বোস রোডে নামল, তখন বৃষ্টির প্রকোপ আরও বেড়ে চলেছে। আকাশে আজ আর কোথাও বাঁধন নেই। এটুকু আসতেই রাত আট বেজে গেছিল। কিন্তু এবার আর বাসটা এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে একটুও এগুলা না। অনমিত একা থাকলে নেমে এই অগাধ জল ভেঙে চলতে কুঠা করত না। কিন্তু দেবদত্তী যে দেবলোকের, সে কেন সইবে মতভূমির যন্ত্রণা। কলকাতা শহরকে এত রকমের মেগাসিটি বানাল, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করল দূ’পাশের অজন্ত বাড়ি এবং দোকানের সারি। তাই জল বের করানোর কোনো জাপানী পদ্ধতিই কার্যকরী হয়নি এ শহরে।

বৃষ্টির ছাট পাতলা হয়ে এল রাত দশটায়। আরো রাতে অনমিত যখন দেবদত্তীকে নিয়ে বাস থেকে নেমে ওদের গলিতে ঢুকল তখন ঘাড়িতে বারোটো। ও থাকে ওর কাকার বাড়িতে। একমাত্র কাকু জেগে ছিল। তিনি এসে দরজা খুলে দিলেন। এমন দূর্বোগের রাতে কোনো কৈফিয়তের প্রশ্ন থাকে না। অনমিতকে নিয়ে দেবদত্তী সোজা নিজের ঘরে গেল। সপসপে ভেজা পোষাক

বদলাল ওর সামনেই। অনমিত লাজুক চোখেও না দেখে পারে নি। কিন্তু ও কি কোনো পাপ করে ফেলেছে। তাই শূন্যে পোশাকে লম্বা হুল কাড়তে কাড়তে দেবদত্তী যখন ওর দিকে এগিয়ে আসছিল, ও তখন আর বসতে পারে নি। আরও মুখে উঠে দাঁড়িয়ে—‘আমি আসছি আসছি’ বলে কোনো কিছুই অবকাশ না রেখেই চলে এসেছিল সোজা দরজার বাইরে। আজ সারারাত কলকাতা শহর বানবাহনে ভর্তি। কিন্তু এই গভীর রাতে আর ভিড় নেই তেমন, কোথাও যানজটও না। শিয়ালদা স্টেশনে আসতেই মাত্র পনেরো মিনিট সময় লাগল। মাথার ওপর ‘কলকাতা’ লেখা স্টেশনের নেমপ্লেটে নিরনের আলো জ্বলছে। ও আবার একটা বেনরকারী বাসে উঠে ফাঁকা সিটে বসল। বাস ছুটে চলেছে হেদুয়ার দিকে। এতপরে মেসে ফেরার নিশ্চিত আগ্রহে পৌঁছে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ডেজা পোষাকের দেবদত্তীর ছবি। আশ্চর্য! মনে হল আরো কিছুটা সময় থাকিলে থাকা উচিত ছিল ভীরু চোখে। যদি লজ্জার না উঠে আসত কি হত। দেবদত্তী কি ওর আরো কাছে এসে—আরো কাছে...

বেশ কয়েকটা দিন কিছুতেই মন থেকে মূছে ফেলতে পারল না এই কয়েক ঘণ্টার স্মৃতি। স্মৃতিতে যন্ত্রণাময় আনন্দ আছেই বলে কি স্মৃতি রোমন্থনে এত তৃপ্ত। তবু এমন লুকিয়ে দেবা পাপ তো। ও তবে নিজের থেকে এমন করে ডাকল কেন? অথবা ও ডাকে নি। যা কিছু বন্ধুত্বের কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক ও তো শূন্য তাই করেছে। অনমিত নিজেরই হরতো এসব ভাবছে। ডেভিডকে কি বলা যায় এসব কথা? অথবা অন্য কাউকে। তবু শেষ পর্যন্ত কাউকেই বলা গেল না। কেন যে বার বার মনে হল দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে...একটু চোখের পাতা এক করতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় যেন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। আবার চোখ বোজালেও একই ছবি ভেসে ওঠে।

পাঁচ দিনের দিন আর থাকতে না পেরে একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত নিল। দুপুরে সোজা আবার দেবদত্তীর বাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নিল। এখন সামনে পরীক্ষা তাই কলেজে ক্লাস স্টপ। ডেভিড কয়েকদিন কোথাও উমাও হরে গেছে যেন। কিন্তু এ শহরে থাকলে ডেভিড মেনে ফিরবেই।

তাই সোজা দেবদত্তীর দরজার এসে আঘাত করতে গিয়ে ও থেমে গেল। মনে হল, যদি ওর কাবু থাকে? যদি দেবদত্তী না থাকে। কি উত্তর দেবে অনমিত। না, থাক তার থেকে ফিরে যাওয়াই ভালো। এই ভেবে ফিরেই দাঁড়াল। এবং বেশ কয়েক পা এগিয়েও গেল। আর তারপরও তবু কিছুতেই পা উঠতে চায় না যেন। সামনে না এগিয়েই। যেন মস্ত চালিতের মতো। প্রায় একশ আশি ডিগ্রি কোনে ঘুরে ও আবার এগিয়ে এল। আর সামান্য

টোকা নেওয়ার আগেই মস্তের মতো দরজা খুলে গেল। আর দুয়ার পরে যে দাড়িয়ে আছে, সে যে দেবদত্তী।

ভেতরে সোজা নিজের রুমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেবদত্তী অনমিত্রকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। পাতলা নাইটি পরা শরীরের কোথাও অভাবাস নেই। আরও গভীর জনের পদকুরের মতো স্থির শরীর। বৃকের স্পর্শ বেশ উত্তেজিত করল অনমিত্রকে ও থরথর করে কাঁপছিল। কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। আর ওর এই লাজুক ভাব দেখেই যেন দেবদত্তী ওর কোলের ওপর এক হাঁটু ভেঙে বসে গলার কাছ দিয়ে বৃকের ভেতর ওর মুখ ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। অনমিত্রও শিকারীর হাতের মুঠোর সদ্য ধরা পড়া কবুতরের মত থর থর করতে করতেই তাকিয়ে দেখাছিল কি ধপধপে সাদা স্তন। তবু ঠিক তখনই যেন ঝড়ের হাতন নিয়ে রুমের মধ্যে প্রবেশ করল ডেভিড। এবং ডেভিডের গলা শুনেনই দেবদত্তী নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অনমিত্রকে দেখে ডেভিড একটুও বিস্মিত হল না কেন। যদিও ও নিজে হঠাৎ ভয়ে কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। আর স্তম্ভস্পন্দনটা এত দ্রুত গতি, যেন এককূনি বৃকের ভেতর থেকে চলকে পড়বে রক্ত। অথচ দেবদত্তীর কোনো ভাবান্তর নেই। ঠিক তেমনই আগ্রহে জড়িয়ে ধরল ডেভিডকে। ডেভিড তার করেকাঁদনের জমানো ক্ষুধা নিয়ে জড়িয়ে ধরল দেবদত্তীকে। হাত দিয়ে হিঁড়ো নামিয়ে দিল নাইটিটা পায়ের কাছে। ডেভিডের সামনে খোলা সার্ভের বৃকের ঘন লোমে লেপটে গেল দেবদত্তীর স্তন। হিঁচড়ে টেনে নিয়ে ডেভিড দেবদত্তীকে শূইয়ে ছিল বিছানার। অনমিত্র ধীরে ধীরে দরজার বাইরে বেরিয়ে এল।

এ ধরনের উত্তেজনার মধ্যেই করেকাঁদন ধরে শেষ হল কলেজের পরীক্ষা। এই কদিন একটুও ফাঁকি দেয়নি অনমিত্র। বাধ্য ছেলের মতো পড়েছে, পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট মোটেই খারাপ হবে না। এ বিষয়ে নিশ্চিত ও। সারা বছরের ফাঁকিহীন পঠন পাঠনের মূল্য ও পাবেই। তবু এক ধরনের গ্রানি বোধ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মনে হল ও পাপ করে ফেলেছে। একদম কৈশোরে সেই ভোরের আলোর কসোবতীর পাড়ে দেখা মর্তি'র সঙ্গে এ নারীর কোনো মিল নেই। না পবিত্রতায়, না পরিবেশে, না স্বাভাবিকতায়। বরং একটা বশ্ৰণা বোধ কাজ করছিল, আর বার বার মনে হল—‘আমি নষ্ট হয়ে গেছি।’ আর একটা চিন্তা, ও নিজে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল, অথচ দেবদত্তী এমন স্বাভাবিক ছিল কি করে? তবে কি ও বহুভোগ্য্য তাই। ইস্। ঠোঁটে এখনও সেই অশ্লীল পাপ লেগে আছে যেন। গোটা শরীরে। কি করে যে ধুর্গে মূছে সাফ করা যার।

তবু এই পাপ নিয়েই কোলকাতা শহর ছেড়ে ওকে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে হল।

পাচ.

বাড়ি ফিরে এসে কাফেলা কিছুতেই মন থেকে কলকাতা শহরকে মুছে ফেলতে পারছিল না। সারাক্ষণ চेतন অবচেতনে ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত ফেলে আসা পাঁচ বছরের কলকাতা। কত স্মৃতি, কত ঘটনার বেদনাময় সৌন্দর্যের নিৰ্বাস! এখানে এসে প্রথম প্রথম চারপাশের সব কিছুকে কিরকম নিঃসাড় উৎসাহহীন গ্রামীণ মনে হত। এখানে কোনো জীবন নেই। জীবনের স্ফূর্তি নেই। কি করে যে গ্রামের মানুষগুলো বেঁচে আছে।

বেশ কয়েকদিন বাগনানে খালাম্মার বাড়িতে কাটাল। কিন্তু ওখানের দিদিভাইদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। মেনোমশাইও অনেক বয়সে বাধ'কোর ভারে নৃশ্চা্য প্রায়। খালাম্মাও কিরকম বুড়িয়ে গেছে যেন। আর ওর এই শরীরের দিকে সবাই কিরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এদের বাড়িতে যারা আসে তারাই নানান সাদির সম্বন্ধ নিয়ে আসে। ওর ভালো লাগে না। বাড়ি চলে এল।

এবার এসে বেশ কয়েকদিন দেবাদ্রি মামাকে দেখতে পার নি। একদিন দেবাদ্রি মামার বাড়ি গিয়েও দেখা পেল না। তিনি কলেজে চলে গেছেন। মামিমার মাথার চুলে কিরকম সাদা হয়ে পাক ধরে গেছে। যদিও তিনি খুব আদর করে কাছে বসালেন। অনেক কিছু খেতে দিলে বললেন, 'কি সুন্দর হয়ে গেল, কত ছোটো ছিলে মা আমার'। এখন যেন তোমার রূপ ফেটে পড়েছে।' তবু শমিতা যেন কিরকম সহ্য করতে পারছে না মনে হয়। নিজের রুমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা বলল, কলকাতার হোস্টেল লাইফের কত গল্প হল। তবু সেই সমস্ত কথাগুলোও কিরকম ভদ্রতা রক্ষার বানানো সব মনে হল। বিকেলেই ফিরে চলে এল বাড়ি।

মা রোজ অফিসে চলে গেলে একা একা নিঃসঙ্গ লাগে। দু' একবার ফোন করেছে শেলী, ববু, রণিতাকে। তবু এই শান্তিপুন্ডরেই যেহেতু থাকতে হবে ওকে। অথচ এখনও এবনে কিছু ভালোলাগার নেই। বরং ঐ ওদিকটায় তুলনুক শহরেও যদি মা জারগা নিত। এখানে বাড়ি কেন যে করলে।

মা ও মেয়ের নিঃসঙ্গ অবস্থাটার আঁচ পেরেছিল। তাই কয়েকজন কলিগের সঙ্গে কথা বলে স্টেশনের কাছে একটা কি'ডারগার্ডেন স্কুলে আপাতত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। যত দিন না চাকরী পায়, ততদিন এখানেই থাক। ওরা যা দেবে তাতে হাত খরচটাও চলে যাবে।

স্টেশনের দক্ষিণে বাস স্ট্যান্ড, তার আরও দক্ষিণে বাজার ছাড়িয়ে যে

বড় মাঠ, তারই লাগোয়া বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা সদন। বাড়ি থেকে হেঁটে দশ মিনিটের রাস্তা। কয়েকদিনের মধ্যে কাফেলারও ভালো লেগে গেল স্কুলটাকে। বেশ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ওদের সঙ্গে অনেকটা অবসর কেটে যায়। যদিও মহানগরীর সেই অসংখ্য রেষারেষী, কাফে সিনেমা হল, কনসার্ট, মাঠে ময়দানে লাইট এন্ড সাউন্ডের রঙিন রামধনু, সঙ্গীতের মূহুর্তি। মাঝে মাঝে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

কলকাতার মৃগতৃষিকার মতো টানকে উপেক্ষা করতে না পেরে সেবার চৈত্র সংক্রান্তির সময় টানা ছুটিতে কাফেলা কলকাতা গিয়েছিল। প্রথমে শেলী, তারপর রণিতা না, শেষ পর্ব শু কারুরই দেখা পেল না। রাতে হোস্টেলে আগ্রহ নিতেই হল। তবু সব কিরকম ছেঁড়া ছেঁড়া মনে হল। যে তানপুরার তলার ফেঁসে গিয়েছে, এ যেন তারই তারে মিথ্যা স্বর ঝরানোর চেষ্টা।

পরের দিন খুব সকালে উঠেই হাওড়ায় ফিরে এল। বরং অনেকদিন পর মা-এর সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল। মহরমের উৎসবে বাড়িতে সবাই মিলিত হয়েছে। রেজ্জাকও এসেছে। শুনাই ছুটে যেতে ইচ্ছে করল। ছেলেবেলার কত ছুটে বেড়িয়েছে দু'জনে। কত মারামারি, দু'জনে মিলে গোলগ্রামে মেলা দেখতে গিয়েছে কতবার। আজ কত বছর পরে আবার রেজ্জাকের সঙ্গে দেখা। এখনও কি ও তেমনই উজ্জল আছে। আর সেই সেবার, দু'জনে ছুটেতে গিয়ে কংসাবতীর পাড় বেঁচে গাড়ির পড়ে গিয়েছিল কাফেলা। একদম নীচের ধান জমিতে। ছুটে এসে রেজ্জাক হাত ধরে টেনে তুলেছিল। 'তোরা লাগে নি তো, মাস্পি?' এখনও যেন ছোট্ট রেজ্জাকের সেই কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কাফেলা।

তবু, আজ আর ঠিক তেমন করে সেই ছেলেবেলার মতো ছুটে যেতে পারল না। ও ঘরে, বড় মামিমার সঙ্গে কথা বলছে, তার গলার স্বর কত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিরকম গম্ভীর শোনাচ্ছে। তবু যেতে পারল না কাফেলা।

শুধু খেতে বসার সময় টেবিলে মদুখোমুখি দু'জনের চোখ এক হল। এই সেই ছোট্ট রেজ্জাক। এত বড় হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ শব্দক। চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ রাখতে পারল না কাফেলা। মৃদু নানিয়ে নিল।

রেজ্জাক ও খেতে খেতে বলল, এত বড় হয়ে গেছ তুমি। দু'জনের আর কোনো কথা হল না। বিকেলে সবাই মিলে মখন বেড়াতে বেরুল গ্রামের পথে, ওই ওদিকটায় যেখানে কংসাবতীটা বেঁকে পাটনার দিকে চলে গেছে। তার বাঁকের কাছে দোকানের রোয়াক থেকে একটা বৃদ্ধ লোক ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখাছিল। কাফেলার লোকটাকে ভীষণ চেনা মনে হল। তবু দীর্ঘদিন আসেনি গ্রামে। তাই কিছুতেই চিনতে পারছে না। অথচ

লোকটার চোখে কিরকম করুণা জড়ানো। লোকটা কে—জানতে চাওয়ার উৎসুক নিয়ে কাফেলা ওর সঙ্গীদের দিকে তাকাতেই বৃষ্টিতে পারল, ওর সঙ্গে অন্যান্যরাও বৃষ্টিতে পেরেছে যে বরষক লোকটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। আর ব্যাপারটা নিয়ে সবাই কিরকম অস্বাভাবিক অনুভব করেছে বলেই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এল। রেজকাকও কিরকম ওর পাশে সরে এসে লোকটার দৃষ্টি থেকে ওকে আড়াল করতে চাইছে। কাফেলা এমন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। ওকেও কেউ কিছু বলল না।

পরের দিন সকালেই মা-এর সঙ্গে বাড়ি চলে এসেছিল কাফেলা। শুলও খুলে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য এমন কিছু পরিশ্রমও করতে হয় না। কয়েক ঘাসের মধ্যেই মনটা এখানে উপযোগী হয়ে গেল। আশে আশে কলকাতার স্মৃতিও মলিন হতে শুরুর করেছে।

একদিন বিকেলে শুল থেকে ফিরবার পথে স্টেশনের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করল। হাতেও সময় ছিল কাফেলার। স্টেশনের বাস স্ট্যান্ডে গিয়েই চমকে উঠল। সেই লোকটা। সেই যে মহরমের সময় গ্রামে গিয়ে দেখেছিল। তখনই মমতা মাখানো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বরষের ভারে এখনও বেঁকে যায় নি শরীর। তবু ঘাটের গোড়ার বরষ হবে। মাথার প্রায় সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। ধপধপে সাদা গালের রঙ। বেশ লম্বা। আর চোখ দুটো কিরকম ওরই মতো ঘেন।

লোকটার চোখে চোখ পড়ার পরই স্বাভাবিক ভাবে দ্রুতগতিতে বাড়ির দিকে ফিরতে শুরুর করেছে কাফেলা। তবু কৌতূহল মূছে যায় নি মন থেকে তাই বার বার ফিরে তাকাল। লোকটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ওকেই ফলো করে আসছে ঘেন। এবার ভয় পেতেও শুরুর করল। কি আশ্চর্য! লোকটা কে? ওকেই বা ফলো করে আসছে কেন? এসব ভাবতে ভাবতে সামনের খামারি গেট পেরিয়ে মোড় নিয়ে ভাবতে শুরুর করল কাফেলা, ঐ চোখ—বড় গোল গোল, অথচ সুন্দর। ঐ রকম আকর্ষণীয় বিরাট দেহ! লোকটা আজও মনে হচ্ছে ঘেন কিরকম চেনা। ভীষণ চেনা। আর ওভাবে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এরকম আতঁ পীড়িত চোখ-এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে ঘেন। কিন্তু একবার—নাকি অনেকবার দেখেছে? অনেক বারই দেখেছে মনে হল, কিন্তু বিশেষ কোথায়—সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না কাফেলা। বাড়ি গিয়ে মাকে সব বলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির গেটের কাছে এসে গেছিল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে শেষ বারের মতো পিছন ফিরে দেখতে চাইল। আর তখনই দেখল, লোকটা ওকে গেটের মধ্যে ঢুকতে দেখে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। তার সেই

পিছন ফিরে চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি দেখেই চমকে উঠল কাফেলা। এবার ওর স্পষ্ট মনে পড়ল। গেটের সামনে বেড়া ধরে ও অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, ওই দূরপানে। যতক্ষণ না লোকটা ওর দৃষ্টি শক্তির বাইরে অজ্ঞপ্ত ঘানবাহনের শব্দে হারিয়ে যায়।

বাড়িতে এখনও মা ফেরে নি। অস্ফুট একটা বিষমতা গ্রাস করল ওকে। নির্জনতার স্বপ্তগা। এক একবার মনে হল, আবার স্টেশনের দিকে ফিরে যাই। তবু কেন যে যেতে পারল না।

রাত্রে খাবার টেবিলে মা-এর মূখোমুখি বসে কাফেলা প্রসঙ্গটা তুলবে ভাবছে আর ঠিক তখনই মা বললে, জানিস মাস্পি, আজ অফিসে তোর দেবান্নি মামা এসেছিল। তুই এসেছিস, তবু এতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি তাই খুব দুঃখ করছে। বলছে সামনের রবিবার দুপুরে এসে আমাদের সঙ্গে খাবে।

মায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল কাফেলা,

—‘জান মা, আজ আশ্বার সঙ্গে দেখা হয়ে ছিল।’

নার্গিস ভাত মেখে মূখে তুলতে গিয়েও থেমে গেল। হাতটা একটু পরে মূখের মধ্যে ঢুকাতে গিয়েও, না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথার?’

—‘স্টেশনে।’ খেতে খেতেই সংকিপ্ত উত্তর দিল কাফেলা। আর মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হল, দেবান্নি মামার প্রসঙ্গ তোলার পরই এই সংবাদটা দেওয়ার না যেন আহত হয়েছে। যদিও কাফেলা আঘাত দিতে চায় নি মাকে।

—‘তোর সঙ্গে কথা বলল?’ নার্গিস জিজ্ঞেস করল, খেতে খেতে, যদিও একটু অব্যাহত। যেন তার দেওয়া সংবাদে মেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বাবার প্রসঙ্গ তুলেছে। খবরটা যদি সত্যি হয়—তাহলে—সেই উৎস্রুত্যাও ভাড়া করাছিল নার্গিসকে। তাই ভয় জড়ানো প্রশ্ন চাখে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে।

—‘না’ বলে মেয়ে স্তম্ভ হয়ে রইল।

—‘তবে?’ এবার আর চোখ না তুলেই খেতে খেতে প্রশ্ন করলে। কাফেলাও মা’র দিকে না চলে খেতে খেতেই বললে, স্কুল শেষে এমনিই স্টেশনের দিকে গেছিলাম। হঠাৎ বাস স্ট্যান্ড দেখি একটা লোক আমাকেই যেন করুনামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। যদিও আমি তাকে কিছুতেই চিনতে পারি নি...এভাবেই পুরো ঘটনাটা বললে কাফেলা।

সব শোনায় পরও নার্গিস মেয়েকে বললে, ‘বাড়িতে ভেঁকে আনালিনা কেন?’

—‘বারে, তুমি কি শুনলে, আমি চিনতেই পারি নি, ভয় পাচ্ছিলাম তাই।’

—যখন চিনতে পারলি, তখনও তো ডাকতে পারতিস ?’

—‘তখন তো পিছন ফিরে অনেকদূর চলে গেছে।—বলে কাফেলা নীরব হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর নাগিস আবার বললে, ‘এতবার কোটে’ দেখেছিস আর গত পাঁচ বছরের অদেখায় ভুলে গেলি।’ আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যেবার নিঃশব্দে থেয়ে চলল। তারপর আবার নাগিসই স্তব্ধতা ভেঙে বললে, ‘যত হলেও তিনি তো তোরাই বাবা, বাড়িতে ডেকে আনতে পারতিস।’ বলে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে আবার চূপচাপ থেয়ে যে বার মতো উঠে গেল টেবিল থেকে।

বিহানায় শূন্যে অনেককণ স্তব্ধ হয়ে রইল নাগিস। অনেক কথা মনে এল। সে জীবনের কোন উষ্মালয়। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবন কি তার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে সবে দেখা দিয়েছিল একটি গ্রাম্য মেয়ের জীবনে। তার সামনের সেই উজ্জ্বল আলোকিত আগামী ছবি—আর আজকের এই জীবন। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কত ফারাক। সেই কম্পনার জীবন, আর এই বাস্তবের জীবন। আবার যে মানুষকে ভালোবেসে সেদিন তার হাত ধরে অজানার দিকে পাড়ি দেওয়া, সেই আসরাফ আর তার জীবন, বিপর্যয়ে নিজের জীবন। দুটো ছবি, দুটো জীবন যেন দুই নক্ষত্রলোকের। কোনো মতেই একত্রে মেলে না। অথচ নাগিস এগুলোকেই মেলাবার জন্য একদিন আসরাফের সঙ্গে জীবনের ঝগড়া করেছিল। তারপর কতো সাধনা কতো স্বার্থত্যাগ—তবুও টিকলনা। একদিন সব ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কার দোষ ছিল ? কে উত্তর দেবে আজ আর। আসরাফকেও তো আজ আর দোষ দেওয়া যায় না। কোঁচা সারা জীবন একা একা কাটালো। দ্বিতীয় কোনো মেয়ের প্রতি আসক্তির কথাও তো শোনা যায় নি। একরকম সারা জীবন নিঃসঙ্গ কাটালো।

নিজেরও কি বা দোষ ছিল তা-ই আজ আবার ভাবতে শুরু করল নাগিস। এরকম হাজার বার ভেবেছে। ভেবে ভেবে কোনো কূল কিনারা পারনি। একদিন দু’দিন অসংখ্য দিন মাস বছর...ভাবতে ভাবতে এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। সব চিন্তার শেষ। কী বা করার ছিল, সেই অকথ্য নির্যাতন। একজন শিক্ষিত মানুষ যে কি করে এরকম নির্যাতন করে ? তবু সে স্মৃতিও আজ কিরকম স্নান হয়ে গেছে।

তারপর স্বামীর কাছ থেকে অনেক দূরে ছোট্ট মেরেকে সঙ্গে নিয়ে থেকেছে। এই সমাজে একজন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার বেঁচে থাকা যে কি অসহনীয় ! তবু থাকতে হয়েছে। একটি মানুষ এসেছিল সঙ্গী হয়ে, আছে এখনও। তবু তাকে ঘিরে এই সমাজে কত ঘটনা, কত বিতর্ক-বিবাদ। একজন পুরুষ যত ইচ্ছা মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে। এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে এই সংসারে। কিন্তু একটি মেয়ের পারে অদৃশ্য এক শৃঙ্খল বেঁধে

রেখেছে এই পুরুষ শাসিত সমাজ। সে কোনো পুরুষের সঙ্গে নিজের ইচ্ছে মতো সম্পর্ক রাখতে পারে না। তার কোনো সঙ্গী থাকতে নেই। আবার একাকী নিজের নিজের মতো করেও একটি মহিলা বাস করতে পারে না। তাতে নাকি পুরুষদের ক্ষতি হতে পারে। একাকী নারীকে বাস করতে দেখলে পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার কাম জেগে উঠতে পারে। অতএব নারী, এই সমাজে তোমার কোনো স্বাধীনতা নেই। তোমার কোনো কাম নেই—কামনা থাকতে নেই।

তবু দেবান্নি সব অপমান-রটনা সহ্য করেও অনেক সময়ই কাছে এসেছে। হয়তো উসার মনের অধ্যাপক বলেই ওর পক্ষে এত কিছু সম্ভব হয়েছে। আজ দেখে মনে হ'ল মানুষটা কতখানি বড়িয়ে গেছে যেন। সামনের প্রার সব চুলে পাক ধরে গেছে। চোখের চারপাশে, গালের চামড়ায় ভাঁজ। তবু চোখে এখনও সেই প্রেমিকের দৃষ্টি। আসরায় কি ওর মতোই বয়সের ভারে ধনু হয়ে গেছে? কোটো শেষ মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর কতকাল দেখিনি। সেও প্রায় আজ ছ'বছর হয়ে গেল। বরস বাড়ার সময় এক বছরেই মানুষের কতো পরিবর্তন হয়ে যায়। আর ছ'বছর তো কাতো দীর্ঘ সময়। এক সময় মনে হয়েছিল, যা হবার হয়ে ছিল। যা হবার হয়ে গেছে, অন্তত মেয়ের কথা চিন্তা করে, মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ওর কাছে চলে যাই। কিন্তু জীবন এত নির্মম, যে জীবনকে একবার ছেড়ে আসা যায়, শত চেষ্টা করলেও আর সেই জীবনের কক্ষপথে ফিরে যাবার কোনো রাস্তা থাকে না। অশরাফের কাছে ফিরে না যেতে পারার ব্যঙ্গনা যে কি ভীষণ মর্মভেনা, তা এই পৃথিবীতে কাউকেই বোকানো যাবে না। এমন কি নিজের মেয়ে কাফেলাও হয়তো বুঝবে না কোনো দিন। স্বামী বিজ্ঞানী একটি মেয়ে বাইশ বছর বরস থেকে সঙ্গে একটা ছোটো বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কি ভাবে ঘরে বাইরে সংগ্রাম করে নিঃসঙ্গ নৈশান্ত্যে বেঁচে আছে? হয়তো দেবান্নিকেও ভুল বুঝবে। অথচ মানুষটা স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সংসার থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি কন্ঠের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, উৎসাহ প্রেরণা দিয়ে আজ এত বড় হতে সহায়তা করেছে।

এসব ভাবতে ভাবতেই আজ প্রথম মনে হল নাগিসের সে যেন দৃষ্টি পুরুষকেই সমান ভালোবেসে ফেলেছে। একজন তার স্বামী সৈরদ আসরায় হোসাইন, যাকে প্রথম বৌবনে ভালোবেসে একদিন সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তারপর সেই বন্ধন ছিল হয়ে গৈলেও সেদিনের সেই প্রথম বৌবনের ভালোবাসার ফসল তাদের প্রথম সন্তান কাফেলাকে আজও সঙ্গে নিয়ে বেঁচে আছে। আর সেই স্বামীর পরিচয় আজও সে বহন করে বেড়াচ্ছে। আর ঐতীয়জন অধ্যাপক দেবান্নি দাস। যে মানুষটি জীবনের একটি সংকটময়

শুধুতে' যখন জড়ের মতো শূন্যে মন নিয়ে বেঁচে ছিল এই সমাজে, তখন সব দিয়ে, সহবাস দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে আজ এত দূর আসতে সহায়তা করেছে। কে বড়, কার প্রেম বেশি খাটি জানে না সে। শুধু মনে হচ্ছে এ অসম্ভব হলেও সত্যি যে কখন মনের অবচেতন থেকে দু'জনকেই সমান ভালোবেসে ফেলেছে। নাগিস দুটি পুরুষকে সমান ভালোবাসে।

ও ঘরের বিহানার শুরুর কাফেলারও ঘুম আসছিল না কিছুতেই। আজ বিকেলের ঘটনা কিছুতেই মনে থেকে মুছতে পারছিল না ও। এই লোকটাই ওর রাবা, সৈয়দ আসরাফ হোসাইন। আশ্বার বরভারাক্তান্ত করণ চোখ দুটো যেন এখনও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে আগ্রয় চাইছে। অথচ ছেলেবেলা থেকে এই লোকটাকেই কিছুতেই সহ্য করতে পারত না কাফেলা। মনে হত বদমাস, শরতান লোকটা। সেই ছেলেবেলার, যেবার জোর করে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছিল, সেদিন থেকেই লোকটাকে বদমাস মনে হয়েছে এককাল। তবু, আজ কেন যেন বুদ্ধের ভেতরের আর একটা সত্তা বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর সেই সত্তার কাছে পিঙ্কেনহে উথলে উঠছে কোন অন্তঃসালিনা নদীর হঠাৎ জেগে ওঠা স্রোতোধারার মতো। সেই চার বছর বয়সের সেদিনের ঘটনা। সেদিন যখন লোকটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই বোকা বোকা চোখে ফেলোছিল, 'আমি তোর আশ্বা মাম্পি—' সেই চোখ দুটোই যেন আজও একই কথা বলে গেল, আমি তোর আশ্বা মাম্পি—এই কথাগুলোই বার বার কিরকম স্পষ্ট আর আরও তীব্র হয়ে কানে বাজছে যেন। বড় কষ্ট হচ্ছে, চোখ ফেটে জল বোঁরিয়ে আসছে। আবার মনে হল আশ্বাকে যদি আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যেত।

তবু ঠিক তারপরই মনে হল, আশ্বা, মাকে বেভাবে কষ্ট দিয়েছে, নানিবুদু, নানাভাই, মামা প্রত্যেকেই বলেছে আশ্বার অত্যাচারের কথা। কি করে ক্ষমা করবে সে আজ।

দেবাঙ্গি মামার কথাও মনে পড়ল। যা কি এই নিয়ে আজ ভুল বুঝল, আমি কিন্তু মাকে আঘাত দিতে চাই নি। কিন্তু এমন একটা সময় মা দেবাঙ্গি মামার কথা বললে, যখন আমিও প্রায় বলেই ফেলোছি। কিন্তু দেবাঙ্গি মামাকে কোনোভাবে অপমান করার ইচ্ছে নেই। উনি যে ভাবে সারাজীবন আমাদের নানারকম সহযোগিতা করেছেন, সেরকম তো একমাত্র আশ্বারই করা উচিত ছিল। কাফেলার মনে হল ও নিজেও দেবাঙ্গি মামাকে ভালোবেসে ফেলেছে যেন। আর সে ভালোবাসা অনেকটা পিঙ্কেনহের সহগামী। তবু, আজ এই রাতে, আশ্বার জন্যই যেন তার বেশি কষ্ট হচ্ছে মনে হল।

অবশ শরীরের ক্লান্তি মুছে ঘুম আসতে অনেকটা রাত হয়ে গেল।

তারপর থেকে কাফেলা রোজই দেখতে পেত লোকটাকে। তবু প্রথম

প্রথম কয়েকদিন কিছুই বলতে পারে নি। বাইরের সংকোচের আড়ালটুকু ধুঁকে গেলে, একদিন আসরাফও কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মেয়ের মুখের দিকে। মেয়েও প্রায় তেমনই তাকাতে তাকাতে বলে উঠল, প্রায় অশ্রুতেই, ‘আম্বা—’।

অর্মান আর থাকতে না পেরে থর থর করে কে’পে উঠলেন আসরাফ হোসাইন। তারপর প্রায় দু’ঘ হুয়ে আসা গলার উচ্চারণ করলেন, মামণি— তুই আমাকে চিনতে পেরেছিন? কিন্তু এটুকু উচ্চারণ করেই তারপর প্রায় সংজ্ঞা হারানোর মতো হয়ে গেলেন। প্রায় ছুঁতে এগিয়ে গিয়ে আম্বাকে জড়িয়ে ধরল কাফেলা। তেইশ বছরের দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম। তবু, মনে হল, সমগ্র শরীরে অদ্ভুত একটা আলোড়ন। হঠাৎ গ্রহবৈগুণ্যের কোন্ দুর্বিপাকে সমগ্র যেন অকালে ফুলে উঠেছে। উত্তাল জলোচ্ছ্বাস। তেইশ বছরের অপূর্ণতা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পিতৃস্নেহে উচ্ছ্বাসিত আঘাতে।

আসরাফ হোসাইন আজ প্রথম মেয়ের হাত ধরে মেয়ে ও শ্যার বাড়িতে এসে উঠল। নাগি’সও এই প্রথম সব সংকোচ সব বিবাদ ভুলে গিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। কাফেলা ওঘরে বাবার জন্য একটু জলখাবার বানাচ্ছিল। নাগি’স এগিয়ে এসে আসরাফকে বললে, ‘ভালো আছে?’ কিন্তু তার কম্বল বেদনাময় চোখ যেন আরও অল্প প্রয় নিয়ে অনেক দিনের অনেক উত্তর চেয়ে তাকিয়ে আছে।

আর আসরাফের দৃষ্টি কিরকম অনিষিদ্ধ, কিরকম অজ্ঞানাহত। না তাকিয়েই নোহু হয়ে উত্তর দিলে, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর—‘হ্যাঁ’।

সেদিন বেশি সময় বসেননি আসরাফ। এক কাপ চা খেয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে চলে যান। তবু অপভ্রান্ত মনেই কঠিন, দুর্গতিক্রম্য—দু’একদিন পর পরই আসতে লাগলেন মেয়ের টানে। নাগি’সও স্বাভাবিক হয়ে এল আসরাফের কাছে। মা ও মেয়ে এককাল একত্রে বসবাস করলেও যে সামান্য ফাঁক ছিল দু’জনের মধ্যে, সেটা হঠাৎ করে অদৃশ্য জাদুর প্রভাবে দূর হয়ে গেল কাফেলার বাপের বাতায়নের পর। ছেলেবেলা থেকেই কিরকম একটা রাগ আর জিদ ছিল কাফেলার মধ্যে। মা ও মেয়ের অন্তরের ভালোবাসা অকৃত্রিম হলেও বাইরে কোথাও যেন একটা ক্ষমাতার কপটতা ছিল। অনেক কথা চাইলেও মা ও মেয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারত না। একটা অদৃশ্য দেওয়াল দু’জনের মধ্যে বাড়ি হয়ে থাকত। সেই দেওয়ালটাই আজ ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। তাই দু’জনের ব্যবহারে আজ সহজ ক্ষমাতার স্রোত বয়ে গেল। এই ব্যস্মান্যরূপে সব চেয়ে বেশি খুশি হল নাগি’স।

নাগি’সও তো জীবনের প্রথম ভালোবাসাই উজাড় করে দিয়েছিল আসরাফকে। তবু আত্মনির্ভরতা অবিচ্ছিন্ন ভাবে পেল না মোটা জীবন।

যৌবনের নিঃসঙ্গকে ঢাকতে পারল না প্রার্থিত প্রিয়জনের ভালোবাসা দিয়ে। তবু আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সে কোভ-বশুণা তার ভার ও ধার হারিয়ে ফেলেছে। এ বয়স আর কামনা তাড়িতও নয়। আসরাফের উপস্থিতি তাই সমস্ত অভিমান; কোভ মূছে দিয়ে এক ধরনের শান্তি দিয়ে যায়। মানুষটা অন্তত শেষ জীবনেও ফিরে এসেছে। আর নিজের বাপকে কাছে ফিরে পেয়ে মেয়ের যে শান্তি কথায়-বাতায়, আচার-আচরণে স্মৃতিত হয় তাই দেখে সব চেয়ে বেশি তৃপ্তি পায় নার্গিস। অন্তত শেষ পর্বন্ত মেয়ের কাছে বাপকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে, যদিও কোনোদিনই রাতে থাকেন না আসরাফ—তবু।

উইক এন্ডে কখনও কখনও সকাল থেকে এসে সারাদিন থেকে যান আসরাফ। দুপুরে এখানেই খেয়ে নেন। তখন সারাদিন মেয়ের সঙ্গে হাণাহারিস। কতরকম কথা। কাফেলাও তার নিজের যৌবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। ওর কথা-বাতায়, চলাফেরার অভিজ্ঞতা লেডি স্থলভ ভাব। আসরাফেরও বয়স কমে গেছে যেন।

একদিন রেজ্জাক এসে দেখে গেল। আসরাফের সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ব্যবহার তার যে খুব ভালো লাগল এমন মনে হয় না। কাফেলা কিন্তু সোঁদিন নিজের বাবার থেকে অনেক বেশি সময় দিল রেজ্জাককে। তবু রেজ্জাকের উপস্থিতিতেও কিরকম লাজুক হয়ে যায় যেন। সব ব্যবহার কিরকম এক কুহক দিয়ে ঢাকা যেন। রেজ্জাকও যৌবনাগমে আর অজাঁটল নেই। বয়ঃসম্পর্ক প্রভাবে ছেলে-মেয়েরা কিরকম রহস্যময় হয়ে ওঠে যেন। তবু রেজ্জাক আসরাফের উপস্থিতি এ বাড়িতে ভালো চোখে দেখে নি। আসরাফও রেজ্জাককে পরিষ্কার মনে মনে নেবে বলে মনে হয় না।

নভেম্বরের শেষের দিকেই এ বছর জাঁকিয়ে শীত পড়ে গেছে। মেচাদা স্টেশন থেকে দাঘাগামা ট্রেনে শাতের শুরুর্তেই ভ্রমণার্থীর ভীড় হ্র হ্র করে বাড়তে শুরু করল। শাতের মরশুমে ভুটিয়ারা স্টেশনের পাশের এই কোঁজ স্কুলের সামনের ঘাটে উলের পোষাক এনে ভাড় জমিয়ে দেয়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ট্রেনে করে এসে নানান জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কাফেলা স্কুল থেকে ফিরবার পথে এই সব দোকানের সামনের সারি সারি চাদর, শোরেটার, কার্ডিগান, মাফলার, টুপি নানান জিনিস দেখে যায়।

একদিন রাতে কলকাতা থেকে ফেরার পথে দেবান্দিবাবু, ও'র স্ত্রী শতরূপা এলো। ঘরে ঢুকেই শতরূপা কাফেলাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে আদর করতে করতে বললে, 'বাঃ কত সুন্দর দেখতে হয়েছে তুমি। এই কয় বছরে আরও বেশি সুন্দরী হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে প্রথম যখন ফিরে এলে, তখনও এমন ছিলো না।' কাফেলা সেই ছোট্ট মেয়ের মতো রানিমার বৃকের মধ্যে ঢুকে আদর খাচ্ছিল। নার্গিস রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে এদের

দেখে বললে, 'বাস্য্য! এতদিন পর তোর মামিমার আমাদেরকে মনে পড়ল ? নাকি—আমরা বে'চে আছি কিনা দেখতে এসেছে।'

এবার শতরূপা এগিয়ে এসে নাগি'সের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। মাথা নীচু করে এনে গালে গাল লাগিয়ে ভালোলাগার তীব্রতাকে চারিয়ে দিল নাগি'সের শরীরে। নাগি'সও অনেকদিন পর শতরূপাকে কাছে পেয়ে, ওর শরীরের ছোঁরা থেকে দেবদ্বির অদৃশ্য দাম্পত্য উত্তাপকে স্পর্শ করতে চাইল। দেবদ্বি সোফায় বসে একবার আড় চোখে ওদের দু'জনের পারস্পরিক উত্তাপ বিনিময় লক্ষ্য করে নিজেই তার আঁচ উপভোগ করতে করতে পুরোনো স্মৃতিস্মরণীয় মগ্ন হল।

এই দু'টি নারী শরীর তার কাছে সমানভাবে পরিচিত। একত্রে দু'টি মেয়েকে ভালোবাসার তথ্য সে প্রথম জীবনে বিশ্বাস করত না। কতবার এই নিয়ে বিখ্যাত বাঙালী লেখক অরুণেশ সেনের সঙ্গে তর্ক করেছে শেষ অবদি একদিন এই বিশ্বাস স্থিত হয়েছিল যে, একটি পুরুষ পর পর, স্তরে স্তরে এক একটি মেয়েকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষ একই সময়ে একই সঙ্গে দু'টি মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না। কারণ কোনো মানুষের ভালোবাসার মধ্যে ঋচারিতা থাকতে পারে না। তবু সেই তথ্য নিজের জীবনের পরিশ্রম বছর বয়সে নিজেই ভেঙে ফেলেছিল দেবদ্বি। শতরূপা ওরফে স্বরূপাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তারও তিন বছর আগে। আর স্বরূপার সঙ্গে প্রেম আরও সাত বছর আগে। এবং সেই ভালোবাসার ঘাটতি পড়ার মতো কোনো কারণই ছিল না। আর সে ভালোবাসা এতখানি তীব্র ছিল, যা বাপ-মায়ের দেওয়া পৈত্রিক উত্তরাধিকারে পাওয়া নাম সত্যী অধ্যাপকের ভালোবাসার মডারেশন হয়ে গেল সত্যী—শতরূপা—স্বরূপা। অধ্যাপকের ব্যাখ্যার সত্যী হল পৌরাণিক নাম এবং একমাত্রিক ও স্তরহীন। এমন নামে কোনো রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখা যায় না। তাই তাকে বহুস্তরিত ও বহুমাত্রিক করে নিলে শতরূপা নাম দিয়ে, আর সেই শতরূপা দেবদ্বির ভালোবাসার স্পর্শ হয়ে উঠল স্বরূপা।—সে তার নিজের হৃদয়ের শুদ্ধ মানবতার গুণে হয়ে উঠুক স্বদ্যোতিণী এই ছিল তার কামনা। আজও সেই ভালোবাসাকে সমান আন্তরিক ও হার্দিক বহন করছে আপন হৃদয়ে। তবু নাগি'সের উপস্থিতিতে অস্বীকার করার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল দেবদ্বির ওকে দেখেই। তারপর থেকে মনের অনেক চেতন অবচেতন বাড়িয়ে, আনন্দ-কনসাস থেকে অজ্ঞান কুমারী ও হাঙরের কিস্তৃত প্রতিরূপ পুনরুদ্ধার করে সাপ নাচিয়ে স্বরেড থেকে ইলুং এ অবাধ ঘোরা ফেরা করে ও আপনা থেকেই আবিষ্কার করলে নাগি'স ও স্বরূপাকে একত্রে একই সঙ্গে একই সময়ে

ভালোবাসে বলে আছে। মানুষের মন মানুষের নির্ণীত কোনো সূত্রই মেনে চলে না।

বর্ষাও একদিন নাগিসের প্রতি সেই ভালোবাসাকে মোড় খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে অকৃত্রিম বশুন্দের গহণ পথে। নাগিসের জীবনের নৈসঙ্গকে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে সঙ্গদানের তীব্র পরকাশে। তবু সে বশুন্দের রবীন্দ্রনাথের বশুন্দেরকে অনুসরণ করে শূন্য তোমার বাণী নয়গো হে বশু হে প্রিয়। মাঝে মাঝে ছললে মোর পরশ তব দিরো...র আবেদনে নাগিসের শরীরী স্পর্শে অনেক বারই উদ্ভাস হয়ে উঠেছে। এমন রাত্রিও তো নিপাতনে সিদ্ধ নয়, যে যামিনী না যেতে দুই নারীর শরীরই মাখিত হয়েছে দেবান্নির অঙ্গের শরীরী উদ্ভাসে। তবু আজ আর সে বয়স নেই, যখন প্যাসান, তবু থেকে বড় হয়ে ধ্রুপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কংসাবতীর বানভাসি স্রোতে। সব সূর্যাস্তেই পৃথিবীকে ধীরে ধীরে দিনের উদ্ভাস হারিয়ে ফেলতে হয়। দেবান্নিও বয়সের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আর ওর জীবনের প্রেম গোয়ালার জীবনের মতো অফুরন্ত নয়। অধ্যাপক দেবান্নি ড. ফাউন্টস নয়। তাই আসরায়ের সঙ্গে এবাড়ির স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ধরন শূন্যে আজ আর ওর মনের কোনো কোনো কোণে বা ঈর্ষার ক্ষুধিঙ্গ বিচ্ছুরিত হল না। বরং অশ্রুত একটা নিরুদ্ভাস ও নিস্তেজ শান্তি ছাড়িয়ে গেল দেবান্নির মৃদুশব্দলের অনুপ্রাসে। একটা শান্তিও ছিল, নাগিসকে যে প্রার্থিত শান্তির সঙ্গ ও নিজে কোনোদিন ফিরিয়ে দিতে পারেনি। জীবনের শেষবেলায় নাগিস প্রকৃত তা লাভ করল।

দেবান্নি মামাকে নিয়ে কাফেলার মনও যে বিধামুগ্ধ ছিল এমন নয়। সেই প্রাথমিক ক্ষুধে ভূতীর প্রণীতে পড়ার সময় থেকে দেবান্নি মামার আলা ঘাওয়া ও দেখে আসছে। এত ছোটো, তখনও দেবান্নি মামার প্রতি মায়ের ঠিক কি জাতীয় টান ছিল তা বোঝার বয়স হয়নি। তবু অধ্যাপক মামার যখন মায়ের বনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াত, ওর কিরকম ঈর্ষা হত। প্রতিবাদ করত নানারকম আচরণ দিয়ে। তারপর বড় হতে হতে জেনেছে মা ও দেবান্নি মামাকে নিয়ে চারপাশের লোকজন অনেক কিছুই বলাবলি করে। ওরা প্রথমে যে বাড়িতে থাকত, সেখানে তো এই নিয়ে বেশ গভগোল হয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল মামা আর ও বাড়িতে যাননি। ফলে মা কষ্টও পেতেন। কাফেলা নিজেও যে কষ্ট পেত। তাই প্রায়ই হেঁটে চলে যেত মামাদের বাড়িতে। সেখানে মামামীর ভালোবাসা, শমিতার সঙ্গে বশুন্দের মারামারি। আর এসবের থেকেও অনেক বেশি ভালো লাগত ছোট অমুকে। জড়িয়ে ধরে আদর করে সারাক্ষণ তাকে নিয়েই ঘুরতে ইচ্ছে করত। সেই অমু এখন কতবড় হয়ে গেছে। সে এখন অনামিত।

মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে শুল্কের মেরেবাও অনেক কথা বলেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে কাফেলা মায়ের সঙ্গে দেবাঙ্গি আমার সম্পর্কের স্বরূপটা কি! তবু মায়ের হৃদয়ের নিঃসঙ্গতাও একই সঙ্গে তাঁর হয়ে ধরা পড়েছে ওর কাছে। এক সময় হৃদয়ের এই দিকটা জেগে ওঠেনি তখন পর্যন্ত মা-এর প্রতি মামাকে নিয়ে একটা ঈর্ষা ছিল। মা ঠিক যতটা ভালোবাসা কাড়াত, কাফেলাও ততখানি ভালোবাসা দাবি করত। মামাকে জড়িয়ে ধরে বলত, ‘আমাকেও আদর কর মাকে ঘেরকম করেছে।’ এখন সে কথা মনে হলে নিজের সেই ছেলেমানুষি নিয়ে হাসি পায়। কিন্তু মা এর নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি আঘাত করে হৃদয়ের গভীরে। দেবাঙ্গি মামাও তো মা’র সারাক্ষণের সঙ্গী নয়। তাই যতটা সময় অন্তত মায়ের কাছে আসে, মাকে কিরকম সুখী মনে হয়। মা তো অনেক কিছুই করতে পারত আমার ছোটো থাকা অবস্থার অন্য কাউকে বিয়েও তো করতে পারত—দেবাঙ্গি-মামাকেও। তবু আমার জন্যই একা থেকেছে। আমার জন্মদাতা পিতার পরিচয়ই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ আমার আশ্বা আমার মাকে গোটা জীবন কি দিয়েছে? তাই মা-এর সব কিছুই মনে নিয়েছে কাফেলা। যদিও কোনো বন্ধ ছিল না এমন নয়। বরং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধটা আরও তাঁর হয়ে মনকে বন্ধ করে রাখত। এখন আশ্বাকে ফিরে পেয়ে সব কিছুতেই মৃত্তির স্বাদ পেয়েছে ও। আবার সবকিছু সুন্দর ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কাফেলার এখন মনে হচ্ছে খুব দূরে নয় সেই দিন, যেদিন ও শেলীর মতো বলতে পারবে আমাদের পরিবারের আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু।

ছয়.

আজীবন বন্ধুত্বের সম্পর্কে নাগি’সকে মেনে নিয়েও মানসিক স্থিরতা পাবনি স্বরূপা। এই পঞ্চাশোদশ ও শ্রাম’ দেবাঙ্গির প্রতি ওর অভিমান আরও তাঁর হয়ে উঠেছে। ওর এই দীর্ঘ আঠাশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে ও বার বার তৃতীয় এমন একজনের অস্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করেছে, যে মেরে ঠিক প্রণয়ের তৃতীয় বিন্দুতে চিরকাল অবস্থান করে আছে যেন। সেই যৌবনের প্রথম উদ্দামে দেবাঙ্গির কামনা কল্পিত মরুত্বে নিজেই উড়িয়ে দিয়েছিল কোনো কুঠা না রেখে। একবারও মনে হয়নি বাঙালি মেয়ের সত্যিকার সংস্কার যদিও হিন্দু সমাজের সংস্কারে বন্দী বাবা মা ওর নাম রেখেছিল সত্যী। নিজের উদ্দাম রোম্যান্টিক আবেগের সঙ্গে এমন সেকেন্দ্রে নাম খাপ খাননা বলেই

অধ্যাপক দেবাঙ্গি সে নামকে পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলে শতরূপা। সত্যি থেকে নিজের নামের শতরূপার রূপান্তর সহজে গ্রহণযোগ্য হয়নি, তবু অধ্যাপক স্বামী এমন সব বিখ্যাত জ্ঞানগা ঘেঁটে উদাহরণ উপস্থিত করলেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিষ্মনাথ ঠাকুর বিয়ে করলেন কার্দাম্বিনীদেবীকে কিন্তু সে নাম ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে মানার না বলে, তাকে বদলে করা হল কানন্দরী। আর রবি ঠাকুরের বউ এর আগের নাম ছিল ভবতারিণী—এমন নাম ঠাকুর বাড়ির অভিজ্ঞাত্যে আঘাত হানবেই তাই তার খোল নলচে বদলে সে মেয়েকেও সম্পূর্ণ নতুন ভাষে নাম করা হল মৃণালিনী। এমন যোগ্য অভিজ্ঞাত উদাহরণের পাশে দাঁড়িয়ে শতরূপাও যখন সংক্ষেপকরণের ঝোঁকে হয়ে দাঁড়াল স্বরূপা তখন তাকে মডার্নিজমের উত্তর আধুনিক গদ্যের অধ্যাপকের বউ হয়ে স্বানন্দেই মেনে নিলে।

শুধু নামকরণের ক্ষেত্রেই নয়, সব ক্ষেত্রেই কলিত তখন দেবাঙ্গি ছিলেন স্বার্থই আবেগ ও রোমাসের ষেত সস্তার তৈরি। স্বরূপাকে সর্বাধিক থেকে আধুনিক করে তোলার ঝোঁক তখন তাকে পেয়ে বসেছিল। অবিবাহিত তরুণ বৌবনের রামধন রঙে উজ্জ্বল দেবাঙ্গিকে ঘিরে তখন অসংখ্য ক্লাসিকানীদের খেলা। তবু সেইসব এনামেল করা স্বকের শিথিলতা রুচিশীলা এবং ডাকসাইটে আধুনিকাদের হারিয়ে এরকম একজন অধ্যাপকের মন কি করে যে হরণ করলে, তা নিয়ে স্বরূপার নিজের মনেই দ্বন্দ্ব রয়েছে আজও। তবে কি সেদিন অসংখ্য মেয়ের মূখের গ্রাসকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বলেই আজ নিজের কাছে সবচেয়ে গুঁহিরে রাখতে পারছে না!

তবু কেন যে বার বার রবীন্দ্রনাথের ‘রবিবার’ গল্পের অভীকের কথা মনে হয়। আর নিজেকে বিভার আসনে বসিয়ে তাই ওর মনে হয়, মেয়েদের সঙ্গে দেবাঙ্গির মেলা চাই কারণ, লাস্যময়ী রমণীদের মধ্যে আছে যে ডেনজার সিগন্যাল তার ওপর দিয়েই দেবাঙ্গির জীবনযান তরতরিয়ে এগিয়ে চলে তার সর্বাধিক গতিতে। তবে সে যে সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে খেলা শেষ করে ভালোবাসে স্বরূপাকেই। নিজ স্বরূপের বিশ্ব করে তাই ভো সে ওকে গড়েছে। কিন্তু এমন রমণীবিহার তিরিশোথেই এসে ঠেকে গেল হঠাৎ নার্গিস সমীপে। ওর কথার অভিজ্ঞাত মসলমান রমণীর বানদানী প্রেমে আছে ব্যারনিক প্রেমের চরমতম সার্থকতা। যে প্রেম কাবোর মতো সুন্দর আর মরীচিকার মতো রহস্যময়, ফ্যানটাসির মতো জাদুকরী আকর্ষণে ভরা। স্বামীর এই স্বভাবকে মানিয়ে নিয়েই সমাজে স্বরূপা স্বরূপেই ব্যক্তিগত। তবু কখনও কখনও যে স্বামীর সঙ্গে ঠোঁটের লাগেনা এমন নয়। সংসারে দ্বন্দ্বহীন দাম্পত্যের সুখই বা কি আছে?

সেদিন সকালে সামান্য কারণেই দুজনের মধ্যে আবার কথা কাটাকাটি

চরম আকার নিল। স্বরূপা বলছিল, ও বাড়িতে, মানে নার্সিসের ওখানে এতদিন পরে তার স্বামী যখন ফিরে এসেছে, আর কাফেলাও বড় হয়েছে ওর বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গেছে—এসময় তুমি একটু হিসেব করে ও বাড়িতে যেও।

‘তোমার কি ধারণা আমি নার্সিসের কাছে শাই শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য?’ দেবাপ্রিয় প্রশ্নে ছিল এক ধরনের অসহিষ্ণু স্বাক্ষর।

‘তোমার বরষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শৃঙ্খল বোধগম্য হারিয়ে যাচ্ছে বলেই তুমি এরকম অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছ।’ শান্ত অথচ তেজী গলার উত্তর দিল স্বরূপা।

‘কিন্তু আমার মানসিক শক্তি কমে গেছে এমন ভাবলে তুমি ভুল করবে প্রিয়তমা।’ বলে এই বরষেও নিজের ব্যক্তিত্বের অসামান্য আকর্ষণের প্রমাণ জাহির করতে স্বরূপার সামনে একটি ফটোগ্রাফ তুলে ধরে বলল, ‘এই ভদ্রমহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ পঁচিশ বছর অপেক্ষা করেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্বের উপযোগী পুরুষের সম্মানে।’

‘আর সে নিশ্চয়ই এতদিন বাদে খুঁজে পেয়েছে তোমার মতো পুরুষকে’ বলে পিছন ঘুরে চলে যেতে যেতে বলে চললে, ষাটোমারি এমন মেয়েদের মূখে।’

‘আ হা হাঃ ভদ্রমহিলার প্রতি একটু সম্মানজনক সম্ভাষণ আশা করেছিলাম অধ্যাপকের স্ত্রী হিসেবে তোমার মূখে।’

‘আর এই কলসে অধ্যাপক হিসেবে তোমার জীবনব্যাপার যে সংঘের একান্ত প্রয়োজন সেটা বুঝি তোমার ভদ্রতার লেখা নেই?’

তোমাদের সমাজের গড়া ভদ্রতা ও সংঘম আমার জন্য নয়। যারা ভীড়, যারা হাজার বছরের সংস্কারাঙ্কন মানুষের কার্বনকপি তারা ভয় পায় সংস্কার ভাঙতে। তাই তারা হারিয়ে ফেলে জীবন উপভোগের সৌন্দর্যকে। আমি চাই সৌন্দর্যের চড়াও বিন্দুকে স্পর্শ করতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই সৌন্দর্যের মতিমত্তা বিগ্রহ নারীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তার সৌন্দর্যের সম্মান করি। আমার এই এক্সপেরিমেন্টে তোমাদের তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ভয় পায়। কারণ তারা সমাজের অসংখ্য সাধারণ মানুষের কার্বন কপি। যে মানুষ অসাধারণ, তার জীবনের কাজকর্মের বিচার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আমার সভ্যতাকে বর্তদিন তুমি সবার সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে ততদিন তোমার আমাকে মনে হবে অসভ্য। কিন্তু তোমার দেখার বাইরেও আরও কোনো সভ্য থাকতে পারে। পৃথিবীতে যারা কিছু সৃষ্টি করার বশ্তনা নিয়ে আসে তাদেরকে তুমি একই সারিতে ফেলোনা স্বরূপা। নারী পুরুষের প্রেমের সম্পর্কে যদি না কোনো মানসিক গ্লানি ও

অন্যায় থাকে, তবে তাকে পাপ বল কি করে। যে প্রেম মানুষকে নতুন করে সৃষ্টি করে, তা চিরকালই মহৎ। মহৎ মানুষের জীবনে সবার অধিকার নেই।’

এরকম দীর্ঘ যুক্তি দিয়ে দেবাদ্রি যখন খামলে, তখন তার বৃংসই উত্তর যোগানো স্বরূপার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ও কেবল নীরব হয়ে ভাবতে লাগল আসল সত্য কোনটা।

অধ্যাপক দেবাদ্রির চরিত্রের অসংখ্য সদগুণের পাশাপাশি তার এই নারী আসক্তির দিকটিকে মেলাতে পারে না স্বরূপা ভালো অধ্যাপক হিসেবে এই মানুষটি সবগুলি গুণ আরও করেছেন। অসাধারণ সাহসিক্য অর্জন করেছেন ডব্লিউ বিয়েটসের কবিতায় মডার্নিজম বিষয়ে তৎকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. করে। পরবর্তীকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কলোন্যাল রাইটাস'দের ওপর ইউ. জি. সি. র প্রোজেক্ট নিয়ে গবেষণা করে সফল। ছাত্রদরদী অধ্যাপক হিগেবেও ও'র নাম শোনা যায় কলেজের সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। নানান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় এখনও সভাপতি বা অতিথি হয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান। নানান পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা করেন। আবার ঘোষণা সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দীর্ঘকাল প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে ছিলেন। এমন কৃতিপুরুষ যে স্ত্রী হিসেবে স্বরূপাকে পেয়ে তৃপ্ত নন এমন প্রমাণও স্বরূপা পারেনি। অথচ অসংখ্য নারী সাক্ষিরা ও'র ব্যসন হয়ে আছে আজও। তার এখানেই স্বরূপার মাঝে মাঝে মনে হয় ও এখনও নিজের স্বামীকে চিনতে পারেনি যেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বড় বড় ছেলেমেয়ে, তাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারেন স্বরূপা, একমাত্র ছেলে অনমিত বিশ্বস্রটিকে যে একটুও ভালো চোখে দেখে না, সে তার ব্যবহারেই স্পষ্ট। কলকাতা থেকে প্রায় চিঠিতে মাঝে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মা কেবল চোখের জলে কিছুটা বুক হাল্কা করে আর ছেলেকে চিঠিতে জানায়, 'তোমার বড় হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি।’

ঠিক এরকম সময়েই একটি ছেলে এসে উপস্থিত হল। দেবাদ্রি এবং স্বরূপা দুজনেই একসঙ্গে বাইরের বারান্দায় এসে দেখলে। আগন্তুক ছেলোটো নবীন স্বাপনরূষ। বয়স তিরিশের নীচে, উন্নত বলশালী দেহ, প্রশস্ত ললাট। চোখে কোন জনাগতের সংকল্প। দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ছেলোটো অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার নাম অর্জুনিমিত্র।' তারপর অধ্যাপকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে স্বরূপার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আপনি নিশ্চয়ই অধ্যাপক দেবাদ্রিবাবু, মায়ের

কাছে আপনার সম্পর্কে অনেক শুনছি।' বলে স্বর্পার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—'থাক থাক বাবা।' বলে স্বর্পা ছেলেটিকে ধরে সোফার বসিয়ে দিলে।

—'আপনি যে কলবার বাড়িতে গিয়েছেন, একবারও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে প্রতিবারই আমি কলকাতার বসে চিঠিতে আপনার সম্পর্কে জেনেছি।' বলে অধ্যাপকের দিকে সগ্রহ দৃষ্টিতে তাকালেন।

দেবাদ্রি সংকেতভরা ভয় চোখে স্বর্পার দিকে তাকাল, আর স্বর্পা তবাক প্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকেই। এই আগন্তুক ছেলেটি এবং তার কথাবার্তা, যা এতকাল অজ্ঞাত ছিল; স্বর্পাকে ভেতরে ভেতরে বিস্মিত করে তুলল। তবু বাইরে কিছু প্রকাশ না করে ছেলেটিকে স্বভাবত আন্তরিকতার সঙ্গে দেবাদ্রির পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। ছেলেটিও ঘরের মধ্যে ঢেকে বিশ্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে গড়ে তোলা প্রত্যন্ত গ্রামের লাইব্রেরীতে অসংখ্য বই। এক একটি তাকের বইগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতেই বৃষ্ণতে পারল, সাধারণ লাইব্রেরীর সঙ্গে এ-ঘরের বই-এর কতকগুলো পাথর্য আছে। এক পাশের কয়েকটি মাত্র শেলফে উপন্যাস ও গল্পের অতি দুর্বল সংগ্রহ। বাকি সমস্ত ঘর জুড়ে প্রবন্ধগ্ধের বিপুল সংগ্রহ। একদিকের শেলফে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের নানা ইতিহাসের সংগ্রহ। সেই সংগ্রহের মধ্যে কয়েকটি বই মেদিনীপুর সংক্রান্ত। এক একটি বই-এর শিরোনাম পড়ে চলল : বোগেশ চন্দ্র বসু'র 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', ষ্ণুধিষ্ঠির জ্ঞানার 'বৃহস্পতির তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' 'তাম্রলিপ্তের ময়ুর রাজবংশ', তরুণদেব ভট্টাচার্য'র 'মেদিনীপুর দর্শন' মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিপদ মাইতি, ষ্ণুম রক্ষ-চারীর লেখার পাশাপাশি তাম্রলিপ্তের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইতিহাস কমিটির প্রকাশিত ষ্ণুলীকুমার ধাড়ার বিপ্লবী জীবনের আত্মকথা 'প্রবাহের দুখণ্ড', 'বিপ্লবী', 'তাম্রলিপ্ত জাতীর সরকারের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ। ডান দিকের একটি বিশাল শেলফের সমস্ত তাক ভরে আছে মেদিনীপুরের লেখকদের লেখা নানা রকম বই-এ। একটি সিরিজে মালীবুড়োর লেখা ত্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমি, উপেক্ষিতা বিক্ষুপ্রয়া, নির্মল মালের দিনরাত, বঙ্গ সাহিত্যের অজানা কাহিনী, গোড়ে ষাচ্ছ স্কন্ধ থেকে প্রভৃতি বই। অন্যান্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখল এই জেলার কবিদের কবিতার বই। বাীতশোক ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্ত দাস, তপনকুমার মাইতি, সন্তোষকুমার মাজি, প্রভাত মিত্র থেকে শূরু করে হরপ্রসাদ সায়, দেবাশিস প্রধান,

মানসকুমার চিনি প্রভৃতি অসংখ্য কবিদের কবিতার বই সব বই-ই প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে তিরিশ চত্ব্বিশ বছর আগে। অথচ এদের কারুর সম্পর্কেই এতদিন কিছুই জানেনি অগ্নিমিত্র। কলকাতার বাইরে কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার এত প্রচুর প্রবন্ধের বই থাকতে পারে এ ধারণাই ছিল না ওর। এ সব দেখে অধ্যাপক দেবাদ্রিবাধুর প্রতি আরও প্রশ্য়া বেড়ে গেল।

আবার নিজের সম্পর্কে এক ধরনের হীনমন্যতার দোখও কাজ করল। ই. জি. সি. ফেলোশীপ পেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকের অভিনন্দন পেয়ে ওর মধ্যে যে গর্বটুকু দানা বেঁধেছিল, অধ্যাপকের বাড়ির এই বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার দেখে তা এক লহমায় কপটের মতো উড়ে গেল। মনে হল এখনও অনেক পথ বাকি। এখনও অনেক লেখা পড়া করতে হবে। আবার একভাবে মনে হল, ভালোই হয়েছে। এখানে না এলে জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতার ঝড়িটা শূণ্য থেকে যেত। বাড়ি ফিরবার পথে অগ্নি এই শপথই গ্রহণ করল নিজের বাড়িতে ও একটা ভালো সংগ্রহশালা গড়ে তুলবে নানারকম বই এর। একই সঙ্গে পঠন পাঠনে আরও বেশি সময় দেবে।

নতুন উদ্যোগে যখন ও বাড়িতে একটা আদর্শ সংগ্রহশালা গড়তে শুরু করল। বিশেষত সেইসব ইংরেজি বই এর যা ওর গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন একদিন ও কম্পিউটারের মাউস টিপে স্ক্রীনের ওপর একদিকে এক একজন লেখকের নাম আর অন্যদিকে তাদের প্রধান প্রধান বই এর তালিকা সাজাচ্ছিল :

রুবিয়ার্ড কিপলিং—

ই এম ফসটার—এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া

ভি. এস. নইপল—

দামিনিক ল্যাপোরের—দ্য সিটি অব জয়

মিচা এলিয়াদ—দ্য নুই বেঙ্গলী

অমিত চৌধুরী—আ স্কটেকেশ বয়

বিক্রম সেট—গোল্ডেন গেট

উপমন্য চট্টোপাধ্যায়—

অমিতাভ ঘোষ—ইন্ এন এ্যান্টিক ল্যান্ড

গুস্তার গ্রাস—জিত কাটো লজ্জার

সালমন রুশদি—দ্য মরুস্ লাস্ট সাই

এবার বইগুলোর বিষয়টা শব্দট ওয়ারে ঢুকিয়ে রাখার প্রয়োজন। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে এধরনের কোনো প্যাকেজ পাওয়া যায় কিনা জানার

দরকার ছিল। আচ্ছা দেবার্ত্তি বাবুর কাজও তো ইংরেজি সাহিত্যের ওপর। কিন্তু পাটি'কুলার স্টাডির এরিরাটা কি? কিভাবে জানা যেতে পারে। কম্পিউটারের নামনে বসে স্ত্রীনে চোখ রেখেও কিরকম অনামনস্ক হয়ে গেল অগ্নিমিত্র। অথবা মাঝে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যেতে পারে। মা কি জানে? এতটা একাডেমির বিষয় মা নাও জানতে পারে। কিন্তু জানতেও তো পারে ইংরেজি সাহিত্যের কৃতি সন্তানের মা নিশ্চয়ই প্রতিভাধারী। তা না হলে এমন সন্তানের জন্ম দেন কি করে। তবু...

দশ প্রশ্নের সমাধান হবে মাঝে একবার জিজ্ঞেস করলেই। এরকম ভেবেই কম্পিউটারের স্ত্রীনটা কালো করে চেরার গুঁড়িয়ে উঠতে গিয়েও কিন্তু বোধকে পরিপূর্ণ স্মরণে দেওয়া গেল না বলেই আবার বসতে হল। কিছুটা সময়ে মাথার চুলগুণোর ভেতর দু হাত ভরে আসলুল চালনা করতে গিয়ে মনে হল একবার আনানোভার সঙ্গে কথা বললে হয়। আর একবার চোখ হাত দিয়ে ঢেকে আবার কিছুটা সময় চিন্তার প্রোতে খেলা ভাসিয়ে দিয়ে তবু উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ সেরে একসময় একাগ্র হয়ে বসে সামনের কালো স্ত্রীনে একটা ছবি টুটিয়ে তোলার জন্য মাউস টিপল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নীল নরনা সবুজ চুলের অসামান্য সুন্দরী আনানোভা হেসে উঠলে। মিণ্ট চোখের হাসি ছুঁয়ে ঠোঁট নাড়িয়ে নোভা বললে—‘হ্যালো, ক্যান আই হ্যান্ড রু?’ কিন্তু আবায়ো ঠিক কি কাজের জন্য নোভাকে ডেকেছে নিজেই স্থির করতে না পেরে স্ত্রীন তাবার মূছে ফেলল। তবু শব্দ কল্লিট মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল অন্তর্হীনভাবেই, এক নাগাড়ে, ক্যান আই হ্যান্ড রু?

ঠিক এরকম সময়ে মা ব্যস্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। হাতে বেশ কয়েকটা আলোকচিত্র। ব্যস্ত চোখ সেদিকেই নির্বিশ্রু রেখে ছেলের সামনে তুলে ধরে বললে, ‘অগ্নি, দেখতো ঠিক কোনটা তোর ভালো লাগে?’

অগ্নি দেখল নানা ভঙ্গির বেশ কয়েকটি মেয়ের ছবি। এদের নিয়ে মায়ের ব্যস্ততার কারণ ঠিক বুঝতে না পেরে সেদিক থেকে চোখ একদম মায়ের চোখে স্থির রেখে, পাজাবীর হাতা গুঁটাতে গুঁটাতে জিজ্ঞেস করলে, ‘মা মণি, এসব মেয়েদের নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন? এরা কারা?’

—আ হাঃ, আমার বোকা ছেলে, তোর বিয়ের জন্য মেয়ে দেখছি, রহিম আলি, ঐ যে বাসুদেবপুরের ঘটক, ওই তো নিয়ে এসেছে। এরা প্রত্যেকোই এম এ. পাশ করেছে।’ খেন ঘোণাতার মাপকাঠিতে এমন মানানসই মেয়ে আর কোথাকাও নেই, একমাত্র রুম্মুর হাত ছাড়া।

—ও মা—, বলে একটা লম্বা টান দিয়ে কিছুক্ষণ নিজের ভেতর তলিয়ে থেকে তারপর বললে, তোমার আর রহিম আলির এমন ক্রুটা সম্পূর্ণ মাটি হয়ে গেল।

—কেন ?

—আমার বিয়ে ত হয়েই গেছে ।

—মানে ?

-- মানে তোমার বোমা হয়েই গেছে ।

—কি রকম ? ভ্যাবাচ্যেতা খাওয়া বড় বড় চোখে হেলের দিকে তাকিয়ে রইলে রুম্ । যেন কিছুই বুঝতে পারছে না । আবার স্মৃতির কথা ভেবে এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবে তেমন মনের নাহস নেই । তাই সহজ করে বললে, 'কেন আমার সঙ্গে ফাজলামো করছিছ, তুই আমার তেমন ছেলে নয় । আমাকে না মেয়ে দেখিয়ে তুই বিয়েই করতে পারিস না ।'

—এই রে, আমি ভুলেই গেছি এতদিন, তুমি দেখতে চাও । মেয়ে দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে তো ?'

একরকম ছন্দ অতিমান এনে গরগর করতে করতে মা বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখনই দেখাতে হবে ।'

— 'বেশ, তাই দ্যাখো ।' বলে কম্পিউটারের মাউস টিপলে, অমনি অবাচ চোখে তাকিয়ে দেখলেন রুম্ গোটা স্ক্রীন ভরে একটি নীলা নরনা সুবুজ চুলের সুন্দরীর মুখ হেসে উঠল, হ্যালো..., ক্যান আই হ্যাণ্ড থা ?

মায়ের মুখ এক ধরনের বিস্ময়, ভয় ও অসম্ভবতার ভরে উঠল । তবু নিজের মধ্যে জেগে ওঠা ঋণ্যকে কিছুতেই মুছতে পারলনা রুম্ । চোখের সামনে যে ছবিটি দেখল তাকে অবিশ্বাস করে কি করে । অথচ মেয়েটির যা রূপ তাতে বিদেশিনী বলেই মনে হল । মুখখানা কিরকম পড়ুল পড়ুল যেন । আর অমন নাস চোখ তো জীবনে কোনো মেয়ের দেখেনি চুলের রঙ সুবুজ হয় কি করে । অথচ মেয়েটি অমন হেসে কথা বলল । তবে কি অগ্নি দিনরাত ঐ মেয়ের সঙ্গেই কথা বলে । পড়ার নাম করে তাই অমন সারাক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে । কিন্তু এ মেয়ের পাল্লা থেকে ছেলে উদ্ধার করা যার কি করে । এতো রাক্ষসী ।

ছেলে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিষাদল বাজারে গেল বিকেলে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে, রুম্ আর স্থির থাকতে না পেরে কম্পিউটারের সামনে এল । জীবনে কোনোদিন এই যন্ত্রটাকে চালিয়ে দেখেনি টিভির মতোই সব কিছু । তবু টিভিতে যেমন নানা ছাঁব ফুটে ওঠে । সিনেমা, সিরিয়াল, খবর হয় । কিন্তু এটাতে যখনই রুম্ লক্ষ্য করেছে অসংখ্য লেখা ফুটে ওঠে । আর এর সামনে টাইপ রাইটার মেশিনের মতো একটা কি বোর্ড দেখেছে । বেথানে আঙ্গুল দিয়ে টিপেটোপি করে । ঐ একটা জিনিস যেটাতে হাত দিয়ে কম্পিউটারে মেয়েটার মুখ ফুটিয়েছিল অগ্নি । ঘরে আর কেউ নেই । তবু একটা অসুগত আশঙ্কায় রুম্ এদিক ওদিক চুম্বাঙ্কিত তাকিয়ে দেখল । না

কেউ কোথাও নেই। এবার সাহসের ওপর ভর করে ঐ ধূসর রঙের চাবিটার চাপ দিল। কিন্তু কম্পিউটারের স্ক্রীনে নানা রঙের ছড়ির মতন গোল গোল কতকগুলো বৃত্ত জেগে উঠল। আর সেই সব রঙিন বৃত্তেরা এপাশ ওপাশ এপিঠ ও পিঠ ঘুরে ঘুরে বেশ হৃদয়ের আলোর নক্সা তৈরি করল। এমন নক্সা দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ঐ ধূসর হুইচটা টেপা, সেই অবাক মেরেটের ছবি বা তার কঠম্বর কোনোটাই শুনতে পেল না রুম্ম। টাইপ রাইটারের কি বোর্ডের মতো বোর্ডটার চাবিগুলো এটা ওটা এলোপাখাড়ি টিপে তবু স্ক্রীনের ওপর কয়েক ধরনের চৌকশ, বৃত্তাকার, নানাবর্ণের সমাবেশ কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আর দু'একটি ইংরেজি লেখার লাইন ছাড়া আর কোনো কিছুই সম্প্রদান পেল না রুম্ম।

এবার একরকম বিরক্ত হয়ে সব কিছু বন্ধ করে দিতে চাইল কিন্তু কিছুতেই বৃষ্টিতে পারল না ঠিক কোন চাবিটা টিপলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাবে।

রুম্ম যখন ভীষণভাবে ব্যস্ত ও শঙ্কিত হয়ে কি করবে কি না করবে ঠিক করতে পারছে না, ঠিক তখনই অধ্যাপক দেবান্নি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। রুম্ম অমনি হঠাৎ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে এমন একটা আশ্বাস নিয়ে অধ্যাপকের কাছে এগিয়ে গেল। এবং এই সংকেতের মূহুর্তে ছেলে হাতে না ধরা পড়ার ইচ্ছার প্রাবল্যতাকে এমন ভানিয়ে নিয়ে গেছিল, পরিচয়ের দরখ ভুলে একরকম হাত ধরেই নিয়ে চলল কম্পিউটারের কাছে। তারপর আগে তাকে কম্পিউটারটা বন্ধ করতে বললে। অধ্যাপক রুম্মর এই শঙ্কিত ব্যক্তিত্বের কিছুটা বিস্মিত হয়ে প্রথমে কম্পিউটার বন্ধ করলেন, তারপর দ্বিধা হয়ে সোফার বঁসে প্রথমে চোখে রুম্মর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। রুম্ম যেন এক অদৃশ্য প্রেরণায়, ভেতরের বিপুল তাড়নাকে মুক্তি দিতে হুঁহু করে বলে চললে, অগ্নির কম্পিউটারে দেখানো মেনে থেকে শূন্য করে নিজের বেশ কয়েকটি দিন রাত্রি দুপুর ও সন্ধ্যার প্রতীক্ষা। এবং তারপর এই এককণি পম্বুত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা।

দেবান্নি এক মূহুর্তেই সব বৃষ্টিতে পারলেন। অগ্নির মায়ের সঙ্গে ঘটানো রসিকতা, তারফলে রুম্মর দৃষ্টিভ্রান্ত মূহুর্তগুলি। রুম্মকে শান্ত করে বসিয়ে অধ্যাপক সর্বকিছু বোঝালেন। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কল্লেকজন শকটওয়ার বিজ্ঞানীর অজ্ঞাত ছোট্টার কিভাবে সম্ভব হয়েছিল কম্পিউটারে নারায়ণ গড়ে তোলা। তখনও সে তরুণী কেবল চোখ মুখ ও মাথা নেড়ে কথা বলতে পারত এই যা। তারও অনেক পরে কল্লেকজন বিজ্ঞানীর বিনিময় গবেষণার সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার হৃদয়ের পূর্ণাবয়ব গড়ে তোলা। মেরেটের ব্যস্তবে কোনো রক্তমাংসের অস্তিত্ব নেই। কম্পিউটারের স্ক্রীন ছাড়া ব্যস্তকের মাটিতে কোনো দিনই নামানো সম্ভব হবে না এই নীল

নয়না সবুজ চুলের মার্কিন মহিলাকে। আর ওর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে কেবল ইন্টারনেটের স্ত্রীনে। তবে অসাধারণ মেধাবী এই হুন্দরী বিশ্বের তাৎৎ বিষয়ে জ্ঞানী। যে কোনো প্রান্তের যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান এবং প্রশ্ন করা মাত্রই তার উত্তর দিতে পারার দঃসাহসী ক্ষমতা রাখে এ মহিলা। যেহেতু ইন্টারনেটের মধ্যে ছাড়া বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই, তাই একে নিয়ে এত ভ্রম পাওয়ারও কিছুই নেই। অগ্রি আসলে বিগ্ধ রসিকতা করেছে মায়ের সঙ্গে।

অধ্যাপক দেবাঙ্গির সমস্ত কথা শুনতে স্বস্তি পেল রুমু, এমন মনে হল না। ওর মনে হল, টি ভিতে যে সমস্ত মেরেরা নাটক, সিরিয়াল অথবা সিনেমায় অভিনয় করে। তাদের প্রত্যেকেরই বাস্তবে অস্তিত্ব আছে। সত্যি-কারের মেরে তারা। অপর্ণা সেন, মণাষা বা মাধুরী দাঁকিতের মতো অনেকেই তারা অধ্যাপক বেছে বিয়ে করেন। এই মেরেটিকে যেটুকু দেখেছে কিরম পুতুল পুতুল টং। বিদেশী মেরে তেমন দেখেছে বলে মনে পড়েছে না রুমুর। কিন্তু এ মেরে যদি মার্কিনী হয়। এবং সে যদি তার মেধাবী ছেলেকে পছন্দ করে, তাহলে তো বিপদই।

দেবাঙ্গি বোঝালেন, 'মার্কিন বিজ্ঞানী কম্পিউটারের স্ত্রীনে একে জন্ম দিয়েছিলেন, তাই মার্কিনী বলছি।' আসলে কোনো মায়ের ছুণে এর জন্ম হয়নি। এ কখনও রক্ত মাংসের তরুণী নয়।

তাহলে ও এমন গড়গড় করে মানুধের মতো কথা বলছে কি করে?

আসলে যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই মেল এসব এখনও বুঝতে শেখেনি। এই সমস্ত অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের দান সম্পর্কে অনবাহিত তাদেরকে কি করে বোঝাবেন অধ্যাপক। দেবাঙ্গির কথায় কিছুটা ভ্রমা পেলেও মেরেটির অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারলে না রুমু। বরং এ ব্যাপারে অগ্নিকে বুঝিয়ে বিয়েতে রাজি করানোর দারিত্ব অধ্যাপকের ওপরই চাপিয়ে দিলে। ওদের কথাবাতা যখন এই সব নিয়ে চলছে, তখনই অগ্নি মিত্র এসে প্রবেশ করলে। ঘরে ঢুকে অধ্যাপক দেবাঙ্গিকে দেখেই সাগ্রহে এগিয়ে এল। এবং তারপরই দেবাঙ্গির তোলা প্রসঙ্গ ধরে আনানোভার বিষয়ে গভীর আলোচনার মগ্ন হল। যে আলোচনার কোনো খেই খুঁজে না পেয়ে রুমু ব্যর্থ বকের মতো ডানা ঝাড়তে ঝাড়তে হাঁটু মল থেকে উঠে গিয়ে শূকনো ডাঙার উপর দাঁড়ালে। যদিও তার ক্লান্ত চোখ একাগ্র হলে অধ্যাপক দেবাঙ্গির কথাগুলোকে গিলাছিল।

চা-এর কাপটা ফাঁকা করে টেবিলে প্লেটসহ রাখতে গিয়ে দেবাঙ্গি আবার রুমুকে বোঝালেন, 'তুমি আর এখন ছেলেকে চাপ দিয়েনা, বিয়ে বিয়ে করে ও আগে ফেলোশীপটা কমপ্লিট করুক। তারপর কোনো একটা কলেজ অথবা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাপাকি অধ্যাপক হয়ে বসে তবে তোমার মনের মতো বো আনবে।’

‘কেন, ও কি এখন বো-কে খাওয়ানোর মতো রোজগার করে না?’

‘দ্যাখো রুম্ম, ওকে ফেলোশীপের টাকা দেওয়া হয় বিয়ে করে বউ পালার জন্য নয়। রীতিমতো দিনরাত লেখাপড়া করে সাহিত্যের নতুন কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্য। তবেই ও হবে ডক্টরেট, পি. এইচ. ডি.। এসব তুমি এখন থেকে বুঝতে শেখ. কারণ তুমি সাধারণ মা নও, একজন ডক্টরেট অধ্যাপকের মা। তোমার সাথ আল্লাদ, ভালোলাগা, মন্দলাগা সব কিছুরকে একটু উন্নত মানের করে তোল।’

অগ্নিও মা-এর দিকে তাকিয়ে তার উদ্দীপ্ত চোখ নিয়ে কোন দুরাগতের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকে বললে, ‘মা, তুমি এতগুলো বছর অপেক্ষা করে আছো। আমাকে বড় করার স্বপ্ন তোমার মতো। সেই বড় যে কত বড় তার পরিধিটা না দেখেই তুমি পিছন হটেবে।’

—‘না রে অগ্নি, আমি আর চারপাশের লোকের কথায় ভুল বুঝবনা, আনলে ওরাই আমাকে স্থির থাকতে দেয় না। তোর তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে তুই নাকি অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে করে চলে যেতে পারিস। এত টাকা পাচ্ছিস, কেন বিয়ে করবি না, এই সব বলে।’

—‘তুমি আমার ফেলোশীপের কথা সব লোককে বল কেন?’

—‘বারে, তুই এত গর্বের পাণ করোছিস আমি বলবনা ওদের, বারা আমাকে কত কথা শুনিয়েছে একদিন।’

—‘না, বলবে না মা, ওটাও এক ধরনের অহংকার তোমার, মানুষের অহংকার থাকতে নেই।’ দেবাদ্রি তাকিয়ে দেখছিল অগ্নির দিকে এমন নিরহংকার সৌম্য ছেলেটির সুন্দর কথাবার্তা শুনে। রুম্ম অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে ছেলের কথার ওপর বললে, ‘তা নয় নাই করলাম, কিন্তু আপনি ওকে বলে দিন, ওই সব আনা না কি—ওর সঙ্গে যেন আর কথা না বলে।’

মা-এর কথা শুনে ছেলে এবং অধ্যাপক দু’জনেই হো হো করে হেসে উঠল। এবং দেবাদ্রি দাঁড়িয়ে দু’জনের উদ্দেশ্যেই বললেন, ‘এবার আমি চলি।’

—‘না না, আজ থাকুন, কাল ফিরবেন।’ এই প্রথম রুম্ম থাকবার কথা বললে। মায়ের কথায় তাল মিলিয়ে অগ্নিও বললে, ‘না না, আজ কোনোভাবেই আপনার যাওয়া চলবে না।’

দেবাদ্রি কিন্তু এমন আশ্বাস আশা করেন নি, বললেন, ‘তা কি করে হয়, আমি তো জাস্ট তোমার লেখাপড়া দেখতে এসেছিলাম, থাকব বলে তো

আনি নি। তাছাড়া বাড়িতে না বলে থাকাও সম্ভব না কি। কোনোভাবেই সম্ভব নয়, আমি বরং চলি।’

রুমুর চোখ কিরকম করুণ হয়ে এল। ‘একটা দিন থাকলে হয় না।’ বলে এমন তাকিয়ে রইল ওর চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া কণ্টকর।

—‘আপনি থাকলে আমারও খুব ভালো লাগবে। বাবা কোন ছেলে-বেলায় গেছিলেন খেলা নেই। তারপর আর কোনোদিন এই পৃথিবীতে কাউকে বাবা বলে ডাবতে পারি নি। কিন্তু আপনাকে যেদিন প্রথম আপনার বাড়িতে দেখি সেদিনই কিরকম অতিভাবক ভাবে ভালো লাগছিল। আজ অনেকখানি বুক ভরে গেল আমার স্টাডি রুমে আপনাকে অতিভাবক হিসেবে পেয়ে। জ্ঞানেন তো গাইডের সঙ্গে বতই ঘনিষ্ঠ হই না কেন, একটা কোথাও যেন অধ্যাপক ছাত্রের ফারাকটা থেকেই যায়। কিন্তু আপনি সরাসরি আমার অধ্যাপক নন বলেই হয়তো আপনার কাছে এত সহজ হতে পারি। আজকের দিনটা আপনি থেকে যান। একধরনের শান্তি পাবো, আপনার সান্নিধ্যে।’

তখনকার মতো থাকার আশ্বাস পেয়ে রুমু রাস্তাঘরে চলে গেল। অগ্নিমিত্র দেবদ্বির সঙ্গে নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যাপ্ত হল। দেবদ্বির অগ্নিকে বোঝাতে লাগলেন কিভাবে কিপলিং-এর লেখার ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষই বড় হয়ে ধরা পড়েছে। আবার ফস্টারের এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়ায় ভারতের প্রতি কতখানি স্থিতির করা হয়েছে তাও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। লাপিয়ারের দীর্ঘ দিন হাওড়ার পিলখানার অবস্থান করে এই শহরের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছিলেন। কিন্তু এখানের সমস্ত রিক্সাওয়ালা পানের পিক দিয়ে যক্ষার রক্ত লুকিয়ে রাখে। এখানকার বিশেষ সেবা প্রতিষ্ঠান ধর্মের আড়ালে রাজনীতি করে। আসলে ভিতরে ভিতরে মুম্বু এই নগরী এ ধরনের মস্তব্যের মধ্যে দিয়ে এদেশ সম্পর্কে তাদের গ্রন্থার অভাব লক্ষ্যে আসে। তুলনামূলকভাবে উত্তর কালের বিদেশীরা এদেশকে অনেক বেশি সহমর্মিতার দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন। গুস্তারগ্রাস এই শহরকে দেখেছেন সহাবস্থানের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হিসেবে। এখানে ধনী-নিধন, অভিজাত-অনভিজাত, জাতপাতের বাহুবিচারহীন জীবন সংগ্রাম দেখে বিস্মিত হয়েছেন গ্রাস। আবার উপমন্য চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরীর লেখার অনেক বেশি মাইক্রো-অবজারভেন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্যি এই লেখকরা এদেশের হওয়ার জন্য দেশকাল মানুষ ও দেশায় আচার-আচরণের সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম অনুভবের ডিটেলিং রয়েছে এদের লেখার। এদের মাঝামাঝি অবস্থান সলমান রুশদির। এদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার মধ্যরাত্রে। পরবর্তী সমগ্র জীবন গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ আবহাওয়ায়। কেমব্রিজ-এর ইতিহাসের ছাত্র তার উপন্যাসে ভারতের অন্তরঙ্গ অথচ নিষ্ঠুর দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

মিডনাইট চিলড্রেন, সাটানিক ভার্জেস বা দ্য মূর লাম্ট সাই প্রভৃতি উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের নানা রূপ ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার ফাঁকি, ধর্ম, ধর্মধর্মের মন্থোশে ও কারিশমার অন্তরালে এ দেশকে নিয়ে ব্যবস্থা, অথচ এ সবই ফুটে উঠেছে অশ্লুত এক বাদুক্রী বাস্তবতার ভাষার।

আধুনিক পৃথিবীর উপন্যাসের প্রধান ভাষা হয়ে দাঁড়াবে এই বাদুক্রী বাস্তবতা বা বাস্তবতার কৃৎসক। একদিন মন্থোশুর পৃথিবীর উপন্যাসের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল ফর্মাল রিয়ারলিজম, প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার প্রধান লক্ষণগুলি ছিল। ১. ব্যক্তিগতবাস্তব, ২. বাক্যপ্রসঙ্গে বা সূত্রে ৩. সময় ৪. পশ্চিমাণিটি এবং প্রজিবাণিটির ওপর—সম্ভবতায়। কিন্তু গার্বি'রেল গারি'য়া মার্কেজ, সলমান রুশদি, কেলভিনো বা মিলান কুন্দেরা প্রভৃতি লেখকেরা আধুনিক উপন্যাসের যে নতুন মাধ্যম গড়ে তুললেন ম্যাজিক রিয়ারলিজম এর মাধ্যমে, যেখানে ১. সম্ভাব্য বাস্তবতার নৈকট্যে রয়েছে বাস্তবধর্মী সাংবাদিকতার পাশাপাশি ফ্যান্টাসীর অমিতচারীতা। ২. লেখকের স্বাধীনতা প্রভাবিত করে মতাদর্শকে, উপন্যাসের সত্যাসত্য হয়ে পড়ে আপেক্ষিক। ৩. হাস্যকর রঙ্গ, রাজনৈতিক বাস্তব হর লেখকদের চরিত্রপ্রকাশের অবলম্বন। কুন্দেরা-কেলভিনো-রুশদির লেখার যে ধরণের ট্রিটম্যান্ট লক্ষ্য করা যায় ৪. সর্বোপরি রূপনার স্বাধীনতা imaginative freedom. লেখকের বলার কারনার জীবনের সত্যাসত্য আর এক ভাবে ধরা পড়ে। অশ্লুত অপৃথিবী আমাদের সামনে তার সমকালীন মানব সভ্যতার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়।

অগ্নি অবাক হয়ে শুনছিল এসব কথা, যেন নতুনভাবে তার সাহিত্য পাঠের দাঁকা হল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে একাডেমিক লেখাপড়ায় এ রকম আলোচনা ও শুনানি অধ্যাপকদের কাছ থেকে। আধুনিক সাহিত্যের তেমন বেশি আলোচনাও ছিল না ওদের সিলেবাসের বাধাধরা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে। আজ ওর সাহিত্যপাঠের চোখ নতুন ভাবে খুলে গেল।

ঠিক এরকম সময়ে রুম্ম ঘরে এসে অধ্যাপকের কাছাকাছি দাঁড়াল। তার পরনে ছিল বাসন্তী রঙের শাড়ি। মেদুর চোখের তারার কোন এক অধরা স্বপ্ন। এইটুকু সময়ের মধ্যে জলখাবার পরিবেশনের ফাঁকে নিজেকে একটু যেন গুঁছিয়ে নিয়েছে। এই প্রৌঢ় মধ্যবৃদ্ধ অপরিসরমান বয়সভার তার রূপ যেন শেষবারের মতো ফিরে দাঁড়াতে চাইছে। আসন্ন সম্মুখের শেষ আলোর দেবদ্রি সেই রূপকে অবাক হয়ে দেখছেন। অগ্নির চোখেও তার ছটা লেগেছিল। সে একবার মা-এর দিকে তাকিলে, লাজুক চোখ করে, আবার অধ্যাপককে বললে, 'আপনি ওঘরে গিয়ে একটু খেয়ে নিন। আমি এই সময়

কুন্দেয়ার এই বইটা পড়ি।' বলে 'দি আবাবিক্সাবেল লাইটনেস অব বিইং' উপন্যাসের পাতা উন্টাল।

দেবাঙ্গি রুম্মুর পিছন পিছন পাশের ঘরে চলে এলেন। মনে হবে যেন সম্মোহিতের মতো সেই চলা। এই প্রথম এ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন। রুম্মু একদম তার শোবার ঘরে নিয়ে এল। অতি সাধারণ, তবু এখনি কেউ তার পরিপাটির হাত ছুঁইয়ে দিলে গেছে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। দেওয়ালে ডানদিকে রবী ঠাকুরের পরিণত বয়সের একটা ছবি। আর ঐ বামদিকে মাথার ওপর রুম্মু ও তার স্বামী তুষারকান্তির কম বয়সের ছবি। দেবাঙ্গি খাটের ওপর বসে সেই দিকে চোখ তুলতে রুম্মু বললে, 'ও হল এক অতীত জীবনের প্রতীক।' বলে খাবারের প্লেট সামনে তুলে ধরে বললে, 'থেরে নিন, সামান্য একটু জলখাবার।' দেবাঙ্গি দেখলে লুচি ও আলুর তরকারী, আলুভাজা, পটলভাজা, আর ডিমের ওমলেট। 'এত সন্দের কি দরকার ছিল।'

'এখন তো কিছুই করতে পারি নি। রাতে রান্না করে খাওয়াবো তখন।'

দেবাঙ্গি লুচি একপিন আলুভাজার সঙ্গে মুরখের ভেতর ঢোকাতে ঢোকাতে বললে, আজ কিন্তু সত্যি থাকতে পারব না। আরো কিছুটা সময় নয় বসলাম। কিন্তু তারপর, যেতেই হবে।'

'আটকে রাখতে হরতো পারব না, কিন্তু আজ কেন ভীষণ ইচ্ছে করছিল।' বলে রুম্মু একটা বিস্ময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে। সেই নিঃশ্বাস দেবাঙ্গিকে স্পর্শ করে গেল যেন বা। দেবাঙ্গি প্লেট শেষ করে এক গ্রাস জল খেয়ে রুম্মুর উদ্দেশ্য দৃষ্টির দিকে তাকাতেই রুম্মু সম্মোহ ভেঙে চমকে উঠে বললে, 'আর একটু খাবার দিই' বলে রান্না ঘরের দিকে পা এগোতে চাইলে দেবাঙ্গি বললে, 'না আগে জল দাও।'

★ রুম্মু জলের জাগ নিয়ে গ্রাসে ঢালবার জন্য এগিয়ে এলে দেবাঙ্গি ওর হাতে ধরে টানলে। মূহুর্তে কে'পে উঠল রুম্মুর সমগ্র সত্তা। তবু একটু অবসর নিয়ে হাত থেকে জলের জাগটা পাশের টেবিলে রাখল। অধ্যাপক কাছে না টেনেও হাত ধরা অবস্থায় রুম্মুকে বললে, 'তুমি কেন এমন করে আজ ধরে রাখতে চাইছ? কোনো দিন তো থাকতে বলো নি?'

এরকম প্রশ্নে অস্বস্তির বদলে কিছুটা যেন আরাম বোধ করলে। দেবাঙ্গির অন্তর্ভবে সেটুকুও এড়িয়ে যায় নি। এবার কাছের দিকে টেনে আনলে। রুম্মু অধ্যাপকের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। যদিও ভেতরে ভেতরে তখনও কাঁপছে যেন। তবু কেন যে দেবাঙ্গি আজ চট্টল খেলার মাতল না। ডান হাত দিয়ে পেছনে কেটন করে রুম্মুকে জড়িয়ে ধরলে। রুম্মু তখন স্বগতভাবে যেন বলে চলেছে আসলে অগ্নিও এই প্রথম কাউকে পেলে তার বাবার অনুপস্থিতিতে ভুলে যেতে

চাইছে—' তবু তার বলা কথা না বলা থেকে গেল যেন। দেবাদ্রি তখন ওর কোমরের ওপর খালি পেটের শিথিল মাংসল চামড়ায় হাত দিয়ে বয়সের ভার অনুভব করছিল। বরফের নদী যেন। জলস্রোতের দুনিবার উদ্দাম উচ্ছ্বলতা কোথাও নেই। এ নদীতে এখন আর কূল ভানানো বন্যার নৃত্য আনা শালিন হবে কি? পঙ্কশোস্তর নেহে শাশ্বতীর নৃত্যপরা চাপল্য নেই আর। না থাকাই ভালো। তাই নতুন করে জেগে ওঠার আগে এ ঘূর্ণিয়ে পড়ুক আবার।

'রুম্‌, আলোটা জ্বালিয়ে দাও স্বাভাবিক গলায় বললে দেবাদ্রি।

—'ও আমি ভুলে গেছিলাম। বলে দ্রুত দেওয়ানের দিকে সরে গিয়ে হাতড়ে হুইজ অন করলে। রুম্‌হতে অশ্বকারকে চুরমার করে ভগ্ন আলোর হঠকারিতা রুমের মধ্যে প্রবেশ করল। রুম্‌ একটু লজ্জিত হয়ে শাড়ি ঠিক করে শালিনী হতে চাইল। দেবাদ্রি ওকে স্বাভাবিক করতে কাছে ডাকলে। ধীর পায়ে রুম্‌ এগিয়ে এল। এবার আর অধ্যাপকের গায়ের কাছে নয়, তবু অধ্যাপক ওর হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, তোমার এতদিনের স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে। তোমার ছেলে ইংরেজি সাহিত্যের গবেষক। ইউ.জি. সি. স্কলার। এতটা দীর্ঘ জীবন তুমি কাটিয়ে এসেছ। তোমার স্বামী এমন এক প্রতিজ্ঞা তোমার মধ্যে দৃঢ় করে বেঁধে দিয়ে গৌঁছিলেন যে পরবর্তী সমগ্র জীবনে তুমি সেই প্রতিজ্ঞাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পেরেছ। এই প্রোড়া বয়সেও তোমার শরীর ঘিরে সেই সৌন্দর্যের দাঁপ্তর খলসে উঠছে যেন।' রুম্‌ লাজুক চোখে অনেকক্ষণ স্থব্ধ হয়ে রইল। দেবাদ্রি এবার ওকে কাদম্বরীর গল্প শোনালে। কথাসরিৎ সাগরের সে সংকীর্ণ সামান্য গল্পকে বানভট্ট তার অসামান্য লেখনীতে অপরূপের রূপ দিয়েছিলেন, শোনালেন মহাশ্বেতার কথা, চন্দ্রাপাঁড়ের জীবনী বলে চললেন। সেই অতিলৌকিক কাহিনী রুম্‌কে কখনও করে তুলল সচাঁকিত, কখনও করুণ, কখনও বিমর্ষ, কখনও নিচল, কখনও সে মরালীর মতো নীল দিগন্তে ডানা মেলে উড়তে চাইল, কখনও পাহাড়ী ঝর্ণার উচ্ছল স্রোতধারা তার বৃকের তেতর গর্জন করে মৃষ্টির পথ খুঁজছে। কখনও সেই প্রাচীন শমীবৃক্ষের পাদস্থ স্থির নিচল সরোবরের মতো স্ফটিক স্বচ্ছ জলে রুম্‌র সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠল যেন। তবু, অধ্যাপক যখন সেই অমর উপাখ্যান কথা শেষ করলেন, তখন রুম্‌র অন্তরঙ্গ থেকে তার সব উষাও হস্বে গেল। কেবল মহাশ্বেতার ধ্যানস্থ রূপটি জাগ্রত হয়ে রইল।

কখন সন্ধ্যা গাড়িয়ে রাত ঘন হয়ে জেগে গেছে খেরাল নেই। অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে যেন মহাশ্বেতার ধ্যান ভঙ্গ করে বললেন, 'এবার চল। আমাদের বাবার অনুমতি দাও।' যেন সে কণ্ঠস্বর মহাকাশের কোন অদৃশ্য নক্ষত্রলোক

থেকে ভেসে এসে মহাশেষতার কানে প্রতিধ্বনিত হ'ল। তবু সেই সম্মোহন যখন কাটল, রুমু কে'পে উঠল যেন। আর অধ্যাপক দেবাদ্রিকে নতুন করে শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে দেখল, সে চোখে কোনো মোহ নেই।

‘আজ আপনাকে বাধা দেব না। কিন্তু আর একদিন বৌদি ও ছেলেকে নিয়ে আসবেন।’ বলে রুমু এগিয়ে এসে অধ্যাপকের পারে হাত ছোঁরাল। অধ্যাপক আজ প্রথম কোনো বাধা না দিয়ে অস্বাভাবিক না করে কারুর প্রণাম নিলেন। তারপর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন।

শেষ বাসে দেবাদ্রি যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন রাত্রি এগারোটো। গ্রামের চারদিক নিস্তম্ভ। স্বরূপা উঠে এসে দরজা খুলল। ভেতরে প্রবেশ করে দরজা লাগাতে লাগাতে অধ্যাপক বললেন, ‘কি ব্যাপার, তুমি কোনো কথা বলছ না?’

‘তোমার কি কোনো সময় জ্ঞান থাকতে নেই। আজ অম্ আসবে তুমি জেনেও এত রাত পহ'ন্ত এই বয়সে কোথায় ঘুরে বেড়াও? ছেলে এতোদিন পরে বাড়ি এসে তোমার সঙ্গে থাকে বলে বসে বসে এই মাত্র খেলে ঘুমুল। মলিকা ওর ছোট ছেলে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করে, আর তুমি—তোমার কোনো বোধ নেই।’

দেবাদ্রি এবার সব কথা হজম করল চুপ করে থেকে। সত্যি অপরাধ হয়ে গেছে। অনিমিত্ত যে আজ বাড়ি ফিরবে কলকাতার শিকার পাট চুকিয়ে সেটা জানত, তবু রুমুর ওখানে সেকথা ভুলে গেছিল। স্বরূপার রোগে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই আমতা আমতা করে বললেন, না মানে বেরি হয়ে গেল।’

এবার কাঁকিয়ে উঠল স্বরূপা, ‘কোথায় ছিলে সত্যি কথা বলবে?’

‘আহা: ওরা উঠে পড়বে একটু আস্তে বল না,’ দেবাদ্রির গলায় অনুনয়।

‘সে বোধ তোমার আছে? কোথায় ছিলে।’

‘আমি একটু অগ্নি মিত্রের বাড়ি গেছিলাম।’ খাবার টেবিলে বসে স্বরূপার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন অধ্যাপক। ‘ওরা অনেকদিন থেকে ডাকছিল।’

অগ্নিমিত্রের কথা বলার ছেলোটির অবয়ব ফুটে উঠল স্বরূপার চোখে কিছটো মনও ভরে এল। অমর মতোই ছেলোটির বয়স। বদ্বন্দ্বীপ্ত চোখ। অধ্যাপককে খাবারের থালা বাড়িয়ে নিজের খাবার নিয়ে বসতে বসতে বললে, ‘ওরা মানে ও বাড়িতে আর কে আছে?’

অধ্যাপক ভাত মেখে মূখে তুলতে তুলতে বললে, ওদের বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। অগ্নির বয়স তখন মাত্র দু বছর, যখন ওর বাবা মারা গেলেন মিলিটারী ম্যান তাঁর স্ত্রী কে দিয়ে গেছিলেন দীপ্তভেজ। অগ্নির মা স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে স্মৃতিকণ্ঠ ও অগ্নিমিত্রকে বড় করতে

লাগলেন। স্বামীর আদর্শে নিজের শপথ রাখলেন সদা জাগ্রত করে। পরে বড় ছেলে যখন উপযুক্ত হল বাবার চাকরী পেল, তখনই নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে চলে গেল ওদের ছেড়ে চাকরী স্থলে। সেই থেকে ছোট ছেলে অগ্নি ও ওর মা থাকে।

‘ওর মায়ের নাম কি?’ স্বরূপা বললে।

‘রম্ভা।’ অধ্যাপক উত্তর দিলেন মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘ দিনে মাছের কাটা ছাড়াতে ছাড়াতে তারপর আবার বললে, ‘হঠাৎ ওর মায়ের নাম জিজ্ঞেস করছ?’

‘কত বয়স?’ না তাকিয়েই পাণ্টো প্রশ্ন করলে স্বরূপা।

‘তোমার মতোই।’ বলে নিজের শ্রীর দিকে তাকাতে তাকাতে দেবাঙ্গি বলে চললে, ‘তবে ওর শরীরে বয়সের ছাপ তোমার থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট।’

‘এত নিখুঁত করে তাকিয়ে দেখেছ তুমি?’ স্বরূপা প্রশ্ন করলে।

‘বারে—সে তো দেখলেই বোঝা যায়।’

‘কিরকম?’

‘চুল পেকে গেছে, চামড়ার লোল পড়ে গেছে। গালে চোখের কোণে, হাতের কব্জিতে ভাঁজ...’

‘এত নিখুঁত করে তুমি এই বয়সেও অন্য মেয়ের দিকে দেখ? আমি তো ভাবতাম আমার বাইরে নাগিস ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তুমি দেখতে পাও না?’

এ প্রসঙ্গটা আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় বুঝে দেবাঙ্গি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললে, ‘অম্ কখন বাড়ি ফিরল?’

‘সন্ধ্যা সাতটায়’—স্বরূপাও আর কথা না বাড়িয়ে উত্তর দিল।

‘কত রোগা হয়ে গেছে নাকি? ওর ফিরতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছিল?’ দেবাঙ্গি এবার সত্যিই স্নেহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন। স্বরূপা এ বিষয়ে এখনও অভিমান করে আছে বুঝতে পারল। অধ্যাপক বললে, ‘সত্যি ও বাড়িতে গিয়ে আমি ভুলে গেছিলাম আজ অম্ বাড়ি ফিরবে। আসলে ওদের বাড়ির দুটি মানুষ মা ও ছেলের নিজস্ব আপাত নিস্তরঙ্গ অথচ বেদনা মলিন পরিবেশ...’ বলে দেবাঙ্গি ধেমে গেল। স্বরূপাও কিছু বলল না। থেরে উঠে মূখ্য ধুরে দেবাঙ্গি অম্‌র ঘর থেকে ঘুরে এল।

শোবার ঘরে যখন ফিরে এল, স্বরূপা তখন সব কিছু ঠিকঠাক করে বিছানা সাজাচ্ছিল। দেবাঙ্গি ওর কাছে ঘন হয়ে এল, ‘তুমি রেগে গেছ?’ কোনো উত্তর দিল না স্বরূপা। হাত দিয়ে বেড সুইচটা অফ করে শুরুর পড়ল। দেবাঙ্গি পাশ হয়ে শুরুর স্বরূপার বুকের ওপর বুক পড়ে বললে, ‘কোনো কথা বলবে না?’

‘কি বলব, তোমার চোখে তো এখনও কে রুম্‌দ না ঝুম্‌দর রূপ জেগে আছে, যে স্বামীকে হারিয়ে তোমার জন্য পঁচিশ বছর অপেক্ষা করে আছে। আমার কি আর সেই রূপ অথবা শরীর আছে।’ বলে আরও অভিমানী হয়ে উঠল। দেবাদ্রি বৃক্কে এ বরফ গলাতে হলে অন্য উত্তাপের দরকার। অকাল বনন্তের আগমনে কনস্থলী মূক প্রাণীদের প্রণয় নিবেদনের মতো করে দেবাদ্রি এবার স্বরূপাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করল। শীতলতার মতো দেহ চিরকাল গৌরবর্ণ মেনে হীন শরীর। তাই মেদ বহুল শরীরে বরষ যত সহজে ছাপ ফেলতে পারে স্বরূপার দেহ ভাঙ্গি তার বিপ্রতীপ। আর এত বছরের খেলার দেবাদ্রিও জানে দেহের ঠিক কোন কোন জায়গার স্বরূপা এখনও উত্তেজনাকে ধরে রেখেছে।

মধ্যরাত হুঁতে আর সাত মাইল বাকি। কোনো রাত জাগা পাখি অশ্বকারকে সন্নিবেশ দিয়ে প্রিয়তমার স্পর্শে উত্তাপ মেখে নিচ্ছিল। তাদের ডানার আঘাত প্রত্যাহাতের ছন্দ শব্দহীন বাতাসকে বাধামুক্ত করে তুলেছে। দেবাদ্রির স্রুচকুর হস্তাবলোপে স্বরূপার আবরণমুগ্ধ শরীর আবার রোমাঞ্চিত হতে হতে জেগে উঠল। জ্ঞানদী তার আবেগের প্রতিনিধি। তবু সমুদ্র সঙ্গমের দুরত্ব বেশি নয়। তাই কি এমন পলির আবির্ভাব। এমন হেমন্তের শীতল বাতাসেও ঘেমে উঠল উভয়েই। তবু দু’জনেই জানে কোথার দাঁড়িয়ে আছে তৃপ্তির চরম বিন্দু। তাকে স্পর্শ করে উভয়েই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এটাই ওদের দাম্পত্য সখ্যের মূল রহস্য। এত বরষেও স্বরূপা নিজের শীথিল শরীর দেবাদ্রির বৃকের ওপর শুইয়ে দিয়ে অশ্বকার রাতকে উপভোগ করছে। বাইরে গাছের পাতার হিম করে পড়ার টুপটাপ শব্দ। দেবাদ্রি বৃকের ওপর তৃপ্ত স্বরূপাকে জড়িয়ে ধরে জানালায় ফাঁক দিয়ে দেখছে বাইরে হিমাল মেঘের আড়ালে আবছা চাঁদের লুকোচুরি খেলার অপার রহস্য।

সাত.

সকালে ঘুম ভাঙতেই বিছানার জেগে, চোখ মেলে টের পেল এটা কলকাতা শহর নয়। রাত্রে পরিভ্রমে বেশ টানা ঘুম দিয়েছিল। স্বপ্নে ট্রেন-বাস-অজস্র মানুষের ভাঁড়—সমস্ত ভাঁড়িয়ে গেছিল। সকালটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন বোধ হল। বাইরে এসে দেখল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি মারছে তার মিশ্রিত হলুদ আলোয়। সামনের রাস্তা দিয়ে সাইকেলে, মোটর বাইকে অসংখ্য মানুষ এদিক ওদিক করছে। হাতে বাশ নিয়ে বেরিয়ে এসে অনায়াসে রাস্তার দিকে পাল্লাচাষী করতে করতে এগিয়ে চলল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাবা টেবিলে বসে পড়ছেন। বাবার মুখে বরষের ছাপ সকালের আলোর

এতদূর থেকেও চিনে নেওয়া যায়। ওদিকে তাকিয়ে দেখলে কে একটা লোক এগিয়ে যাচ্ছে। চিনতে চেষ্টা করল, হয়েন না। সেই যে বাসু ছাপারিরা কে যে তার জায়গা লিঙ্গ দিয়েছিল। মৃদুভেঁ কত কথা মনে হল। পারে পারে এগিয়ে চলল গ্রামের পাশে।

কত পরিবর্তন ঘটে গেছে গোটা গ্রামের। এই সকালে কই আর তেমন মাথায় বিঁড়া বাঁধা মাটি কাটা মানুষের দল দেখতে পাচ্ছে না। সবাই বেশ খনী হয়ে গেছে নাকি? এ রাস্তা থেকে ভাইনে বেঁকে যাওয়া সেই পাঁচ ঢালা রাস্তা—বেখান দিয়ে এক সময় টাটা রুমো হাঁকিয়ে বাসু ছাপারিরা তার কারখানায় যেত, সে রাস্তাটা কিরকম মজে গেছে যেন। মিলন দাদার ব্যাটা পশু, যে সেবার স্কুল ফাইনাল দেবার পরই ঢুকে গেছিল ওর কারখানায়, সে এখনও কি ওই কারখানায় কাজ করে? আচ্ছা সেই অর্ঘ্য মাস্তুরতার খবর, রবিনই বা কি করছে? এসব ভাবতেই কেন যেন দেবদত্তীর কথা মনে হল। আর একটা কষ্ট বোধ হল। এ সবকে এড়িয়ে কনোবতীর ওই দিকটার যেতে ইচ্ছে করল। কেমন আছে নদী, তেমনই শীর্ণ-মৃত স্রোতহীন! আর তার তাঁরের সেই দেবী!

রাস্তার ধারে মাধব মন্ডলের বাড়িকে আর সেই ছেলেবেলার দেখা সল্টলেক প্যাটার্নের বাড়ি বলে মনে হল না। কিরকম রঙ চটা জোলুসহীন মনে হল যেন। বরং তারই লাগোয়া দু একটা বাড়িকে ছোট্ট অথচ সুন্দর ছিমছাম দেখে ভালো লাগল।

এসব পেরিয়ে সামনে ডানদিকে নামতেই কে একটা মেয়ে ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মৃথের দিকে তাকিয়ে, ‘লোতন ঠাকুরপো, কবে আসা হল?’ বলে ফিক্ করে হেসে উত্তরের প্রত্যাশা না করেই পাশ দিয়ে চলে গেল। অনমিত সন্ধ্যাহতের মতো যদিও উত্তর দিল, ‘কাল রাত্রে’। ভদ্র নিষ্কর কাছে তার কিরকম লজ্জাবোধ এল। সে তবে ঠাকুরপো হয়ে গেছে। কিন্তু বউটা কে?

উত্তরটা পেল পরের দিন ভোরে। তখনও ঠিক ঠিক ফাঁকা হয়নি। বাইরের দিকের জানালা খোলাই ছিল। ভোরে এখনও তেমন ঠান্ডা লাগে না। বরং বাইরের বাতাসে আরাম বোধ হয়। সেই ভোরের বাতাসে ঘুমটাও বোধহয় বেশ জমে গিয়েছিল। হঠাৎ কার ডাক শুনে যেন ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখে, দক্ষিণের জানালায় গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে সেই কালকের বোটা মৃথ বাড়িয়ে বলছে, ‘লোতন ঠাকুরপো, এখনও উঠনি?’ বলে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল বিস্তর। আজ আর মাথায় কাপড় নেই। অধিন্যাস চুল। কিন্তু মাথা ভর্তি বোঝা যায়। দু হাত উঁচু করে গ্রিলে ধরা। বুক ঠেকিয়ে

দিয়েছে জ্ঞানালার মাঝের কাছে। ঘরের দিকে মুখ, বাইরের আলো তাই বউটার মুখে পড়নি।

বউটা কিন্তু ভালোভাবেই নিরীক্ষণ করছে অনমিতর ঘরের সব কিছু। তারপর বললে, ‘কোলকাতার বাবুর ঘুম ভাঙল।’ আলমোড়ে বিছানায় উঠে হাই ভেঙে, তাকিয়ে বোটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘হায় বৌদি তুমি এঁক করছে?’

‘কেন, আমি তোমার কি কল্‌জি?’ বলে একইরকম ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে।

‘আমার অত দামের ব্যাকপ্রিস্ট রোজ, তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে?’ বলে অনমিত জ্ঞানালার কাছে এগিয়ে বাইরের বোটার পায়ের দিকে তাকাল। বৌ কিছু না বুঝে বললে, ‘রোজ রোজ কথায় আঁস, আজ পথন আঁসি।’ বলে সেই প্রথম দেখা চোখে অনমিতকে দ্যাখে।

‘না না, রোজ নয়। রোজ মানে গোলাপ। কাল সকালে লাগিয়েছিলাম। অনেক দাম ও গাছেয়।’ একটু বিরস্তির সঙ্গেই কথাটা বলল।

‘ও— বলে এবার নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গলাব গাছ। ভাউ মোর পায় কাটা লাগছিল।’ বলে ভালো করে পা নাড়াতে গিয়ে গাছটাকে আরও বেশি মাটির সঙ্গে লেপটে দিল।

‘ওঃ বৌদি, তুমি কি করছ।’ বলে এবার অস্বস্ততা মুখে প্রকাশ করল।

‘কেন, মনুইত তোমার ভাল করছি। ছাপারারির কারখানার গায় এরকম কত গাছ বন হস্সাছে। গরুও খায়নি।’ বলে আবার হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। তারপর গ্রাল ছেড়ে যেতে যেতে বললে, ‘লোতন ঠাকুরপো তোমার সঙ্গে মোর কথা আছে।’ তার কোমর বাকিয়ে পা ফেলার তালে তালে রোদ খেলে গেল।

‘অমু উঠেছিস।’ বলতে বলতে মা ঘরে প্রবেশ করে জ্ঞানালার দিকে তাকিয়ে ছেলের দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললে, ‘ও পশুর বৌ। পশু আগে বাসু জামাই-এর কারখানায় কজ করত, এখন কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে করেক বছর। পশু এখন পরের বাড়িতে মুনিস খাটে। বউটা এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করে দিন চালার খুব ভালো মেয়ে।

‘কিন্তু মা, ও যে আমার ব্যাকপ্রিস্ট রোজ এর চারাটাকে একদম কাদায় লেপটে দিয়ে গেল।’ বলে বউটার প্রতি সমস্ত অসন্তোষ ছেড়ে মার দিকে তাকালে।

‘ওরা কি অতসব বুঝে। তা তুমি আর একটা এনে লাগিয়ে। কিন্তু তোমার বাবা বলেন ব্যাকপ্রিস্ট রোজ নাকি মানুষের দুঃখ ডেকে আনে।’

‘নবাবী আমলের ফুল ।’

‘তা জানি, তাই তো সমস্ত নবাবের জীবন যুদ্ধ-রক্তক্ষর, ভাই হত্যার কালিমায় কলঙ্কিত । হারেমের বেগমদের কালিমালিপ্ত রক্তের মতন ও ফুলের রঙ কালচে লাল ।’ বলতে বলতে মা ঘর গোছাতে লাগল ।

অনিমিত্ত ভাবল মা এতসব জানে । ব্রাহ্ম হাতে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে ও ঘরে দেখল কেউ নেই । কাকিমা সামনের বাগানের ফুলগাছগুলোর গোড়ার জল দিচ্ছে । ও জিজ্ঞাসা করলে, ‘বাবা কোথায় ?’

‘উনি তো ভোরেই কলেজ চলে গেছেন ।’ জল দিতে দিতেই উত্তর দিল মণিকা ।

‘এত ভোরে ?’

‘হ্যাঁ দশটার ভ্রাস । এত ভোরেই তো বেরুতে হয় ।’ বলে ডান হাতে খালি বালতিটা তুলে ঘাটের দিকে যেতে যেতে বললে, ‘তুমি কি জানতে না ।’

‘না—মানে অনেকদিন বাড়িতে ছিলাম না তো, ফুলে গোছ ।’ বলে বাগানে পারাচারী করতে লাগল । ওই পশ্চিম দিকটার, সেই ছোট সোনাঝুঁড়ি গাছ । এত বড় হয়ে গেছে । তার ওদিকটার বড়বাবুদের কলা বাড়ি, এক সময় কত ফসল হত । আজ সব জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে । আর ওই পাশে, মাঠের ওপর দিয়ে একটু হাঁটলেই বাসু ছাপারিয়ার কারখানা । দেখতে ইচ্ছে করল । পা চালিয়ে অনেকদিনের অনভ্যাস কাটিয়ে আল ধরে কারখানার এসে স্পীছিল । সব ভেঙে গেছে । ধ্বংস স্তুপের মতো । বড় বড় গাছ । প্রাচীরের গারে ফাটল দিয়ে বট খেজুরের চারা বড় হয়ে শিকড় চালিয়েছে । হাত দিয়ে সামনের জং ধরা লোহার দরজা ঠেলতেই কে-এ-চ করে বিকট শব্দ হল । ভেতরে একটা কুকুর ঘেউ-উ-উ করে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল । তার শান্তির আহ্বানে নতুন আগন্তুককে মেনে নিতে পারেনি । মনে পড়ে, ছেলেবেলার দেখেছে বিশাল লে-হাউন্ড দুটো কুকুর কারখানা পাহারা দিত । এখনও অনিমিত্তর বৃকের ভিতর কিরকম হাউ-হাউ শব্দ জেগে উঠল যেন । এই ভাঙাচোরার মধ্যে দাঁড়িয়ে ধ্বংসস্তুপের ভেতর সেই টাটা স্ত্রীমো আর বাসু ছাপারিয়ার মূখটা ভেসে উঠল । তার হাত বেষ্টন করে ধরা একটা মেয়ে যেন । কিন্তু মেয়েটা কে ? কিছুতেই ঠিক ঠিক মূখটা চিনতে পারছে না । সমস্ত ছবিগুলোই কিরকম হারিয়ে যাচ্ছে যেন । কি রকম স্বপ্ন নাকি বাস্তব ।

এমন সময় বাইরে একটা গাভগোল শুনতে পেল । কারা বেশ জোরে কগড়া করছে, কোন গলাটাই ঠিক চেনা নয় । বাইরে বেরিয়ে এল । কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে গেট পৰ্যন্ত এল । কিন্তু বাইরে আর বেরুল না ।

অনিমিত্ত বাইরে বেরিয়ে, সামনের চটাওঠা পুরোনো রাস্তার এগিয়ে এসে দেখল, বড় রাস্তার সংযোগস্থলে হরেন আর তার ছেলে-অমলের সঙ্গে বাস ছাপারিয়ার শালা বৃন্দ নিখিলের জোর ঝগড়া লেগে গেছে। হরেনের ছেলে অমল রাস্তার সঙ্গে যাওয়া মাটির গা থেকে ইঁট তুলে তার ঘরের উঠানে জমা করছিল। বৃন্দ নিখিল প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার দাবী এরাস্তা তৈরি করেছিল তার দাদাবাবু। তাই রাস্তার ইঁট-পাথর সবই তাদের। আর অমলরা বলছে রাস্তা তারা লিঙ্গ দিরেছিল কারখানা বন্ধ চানু ছিল তখন। এখন দশ পনেরো বছর কারখানা বন্ধ। তার আবার টাকাও বাকি পনের কুড়ি বছরের। তাই এরাস্তার সমস্ত জিনিসের অধিকার তাদের। এই নিয়ে সামান্য তর্কাতর্কি হতে হতে ব্যাপারটা পার্টি কালারে চলে এল। হরেন আর অমল বামপন্থী, চিরকালই। আর নিখিল ভূগমল করে। রাজনৈতিক বিষয় চলে আসতেই ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করল। রাস্তার দ্বারা দাঁড়িয়ে ঝগড়া শুনছিল, তারাও এক একটি দলের পক্ষ নিয়ে দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে একটা ছোটখাটো হাতাহাতি রূপ নিল। অনিমিত্ত এই গ্রামা দলাদলির রূপ দেখে অবাক হয়ে গেল। বিশেষত এত তাড়াতাড়ি তা এরকম রাজনৈতিক চেহারা নেওয়ার সেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলল এদের মধ্যে একটা মিমামসা করতে গিয়ে। দেখল, যদিও লোকে মিমামসার চেয়ে গ'জগোলই ভালোবাসে।

সমস্যার মিটিং বসল পন্ডারের অফিসে। গোটা গ্রাম কাঁপিয়ে লোক এল। যে প্রধান একদিন বাস ছাপারিয়াকে কারখানা তৈরি করার অনুমতি দিরেছিলেন তিনি আজ আর নেই। এখন বিনি প্রধান তিনি ভেতরে ভেতরে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন কিনেছেন টাকা দিয়ে। অনেক লোকের মহিমায় একটুও হুঁশির পরিবেশ নেই। এক একটি পার্টির চাপান উত্তোর। কোনো শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাধান সূত্র নেই। যে দ্বার নিজের মতো মন্তব্য করে চলেছে। অনেকেই অনুপস্থিত বাস ছাপারিয়ার শ্রাস্ত সারলেন। অনেকে হেতুকে হরিবোল ধনি দিতে লাগল। জীবিত মানুষের অপমৃত্যু কামনা করে দেওয়া এই হরিবোলির থেকে অপমানজনক শব্দ আর কিছু নেই।

অনিমিত্ত এখানে এসে গ্রামা জীবনের রূপটাকে পরিপূর্ণভাবে চিনল। এই ক বছরে রাজনীতির একটা ভরসার মেরুকরণ ঘটে গেছে। সবথেকে পিংলা ডেকরা মেচাদা তমলুক নন্দকুমারজুড়ে একটা রাজনৈতিক মৃত্তাকল গড়ে উঠেছে। পুর্লিশ এদিকের কোনো বিষয়েই আর নাক গলায় না। একটা ক্রিট মন্তানবাহিনী এই অঞ্চলকে শাসন করে। তাদের মধ্যে যদিও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংখ্যাই বেশি। তবু অনেকেই বামপন্থী। আসলে এখনকার রাজনীতিতে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী নয়। নতুন যে মেরুকরণ

গড়ে উঠেছে তা হল, সনাতন পন্থী আর নব্যপন্থী, সনাতন পন্থী বলতে অবশ্য বাম সনাতন পন্থীরাই বেশি। যারা এক সময় সি. পি. এম. বা সি. পি. আই করতেন, বরভারাতান্ত্র সেইসব বন্ধুরা শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেন কুম্ভ সাদ্ভাজ্যকে রক্ষা করার এক ব্যর্থ প্রয়াস। আর সমস্ত মানুষ ভূগম্ভ কংগ্রেস-বিজ্ঞেপ-নব্য বামপন্থীদের সম্মুখে গড়ে ওঠা যে নতুন বুদ্ধকৃতান্ত-তাকেই মেনে নিয়েছে। সাধারণ জনগণ, যারা বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার যুগ, তাদের কাছ থেকে নানা হারে মোটা টাকার চাঁদা নেয় এরাই। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষেরা এদের হুকুমেই ওঠে বসে।

নিখিলবাবু ভূগম্ভেরই সমর্থক। অন্ততঃ সকালের ঝগড়া থেকে তাই বুঝেছিল অনমিত। অথচ কেন যে পাটি নিখিলবাবুকে সমর্থন করলে না, ও ঠিক বুঝতে পারল না। একটা বিরাট সংখ্যক লোকের আক্ৰোশ যেন জেগে ছিল বাহুবাবু আর নিখিলবাবুদের বিরুদ্ধে। এই জনসভায় সেই আক্ৰোশটাই ফেটে পড়ল। অনমিত সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেলে খোল থেকে আঠার বছরের উঠতি বরসা তরুণদের কটু মন্তব্য শুনেন। এরাই আগামী দিনের বুদবুদ। কোন ভয়ঙ্কর কালো আগুনের ফুলকি এদের চোখে মূখে।

অনমিত একরকম হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরল। আর এই হতাশার পাশাপাশি একটা আশ্চর্য জিদ, যা ও বাল্যকাল থেকেই নিজের মধ্যে লালন করেছিল তাই পেয়ে বসল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিল। এই সমাজের মধ্যে থেকে এদেরকে পরিবর্তিত করতেই হবে। ঠিক এই কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য এক ধরনের উত্তেজনা ওর রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করল।

বাড়িতে খাবার টেবিলে আজ বাবার মুখোমুখি হল। বাবাই প্রথম শুরু করলেন, 'তা অমদ, তোমাদের সালিশ কিরকম হল।' বলে মূখে ভাত তুলতে তুলতে আবার বললেন বাবা, 'কি করলেন নেতারা বাহু ছাপারিয়ার শালা নিখিলবাবু। এই গ্রামের এককালের দোদ-উপ্রতাপ বড়বাবুর আদরের ছেলে নিখিলবাবু।' বলে না তাকিয়েই আবার খেতে শুরু করলেন তিনি।

অনমিত বাবার প্রশ্নের মধ্যে বাবার জ্ঞানায় ইচ্ছের থেকে একটা ব্যঙ্গ এক ধরনের স্নেহের আভাস যেন বেশি করে পেল। তাই খেতে খেতে অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'কিছুই হল না। এমন কি বিচারটাও ঠিক ঠিক জমল না। মাঝের থেকে হয়েনবাবু আর নিখিলবাবুদের নিজস্বের মধ্যে বসে সমাধান করে নিতে বললে।' আরো কিছু ভাত খোল দিলে মাঝে

মাখতে অনমিত বললে, 'তবে নিখিগবাবুকে, এও জানিরে দিল হরেনবাবুদের পনেরো বছরের লিঙ্কের টাকাও প্রাপ্য।'

বাবা খেতে খেতে উত্তর দিলেন, 'জানতাম কিছু হবে না। আর ওই যে টাকা মেটানোর কথা বলেছে, গুটী ফালতু কথা।' বলে আবার খাবারে মনোযোগ দিলেন। অনমিত প্রসন্ন চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে ছিল। ছেলের উৎসাহ লক্ষ্য করে বাবা আবার বললেন, 'এক সময় ঐ পড়ালেখাই তো বিশাল টাকা ঘুষ খেয়ে বাবুবাবুকে এই নিষিদ্ধ কারখানাটি তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিল। গ্রামের রাস্তাঘাট স্বন্দর হবে, বিজলী বাতি জ্বলবে। কিছু লোক চাকরী পাবে—কত সব প্রচার করা হয়েছিল। কি হল সে সব?' খাওয়া শেষ হয়ে আসছিল। টেবিল থেকে উঠতে উঠতে দেবাঙ্গি ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এ গ্রামের কিছু হবে না। এখানকার মানুষ এখানের উন্নতি চায় না। তুমি এ সবে মধ্যম বয়সেও না।' বাবা অত্যন্ত ধীর ভাবে এই সব কথা বলতে বলতে উঠে গেলে, মা খেতে খেতে বললেন—

'বাবা অমর, তোর বাবা এই ভাবে তোর গ্রাম্য রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করছেন না।'

'কেন?'—একটু অসন্তোষের স্বাদ ছিল অনমিতের উচ্চারণে। দেশকে, নিজের গ্রামকে ভালোবাসা কি অন্যায়? বাবা এত শিক্ষিত হয়ে এ গ্রামের জন্য কি করেছেন? কোনোদিন ভেবেছেন, পরিবেশ, চারপাশের মানুষের কথা, প্রতিবেশীর কথা।' আশ্বে বললেও ওর কথার একটা ঘোবনের উচ্ছ্বাস ছিল।

মণিকা ভাতের থালায় বসতে বসতে স্বরূপার উদ্দেশ্যে বললে, 'ধাক না দিদি, অমরকে এসব নিয়ে তোমরাই বা এমন করে খঁচাচ্ছে কেন?'

'কিন্তু ছোটো, অমরও তো জানা উচিত ওর বাবা একদিন ওর মতোই কিংবা বলা চলে ওর থেকে অনেক বেশি আবেগ নিয়েই এ গ্রামের জন্য কাঁপিয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি পাঁচ দশটা গ্রামের সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের একমাত্র মধ্যমণি ছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে কি পেয়েছেন?'

'বাবারও কি কোথাও গুটি ছিল না। উনি কি নিঃস্বার্থ ভাবে জড়িয়ে পড়তে পেরেছিলেন এ গ্রামের মানুষের সঙ্গে। তুমি কি সমর্থন করো বাবার চরিত্রের সব গুণ?'

স্বরূপা আর কোনো কথা বললেন না। মণিকাও চুপ করে রইল। অনমিত বুঝতে পারলে ওর শেষ কথাটা ঠিক উপযুক্ত হল না। এভাবে ও না বললেই পারতো। আশ্বে আশ্বে খাবার টেবিল থেকে উঠে এল।

বিদ্বানার এসে আজকের সমস্ত বিষয়টা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। এক এক করে সব। সকালে পশুদার বৌ এর আসা থেকে ভাঙা কারখানার ডেউর গাউগোল মায় রাস্তার বিচার পর্যন্ত। আর শেষমেশ খেতে বসে বাবার উপদেশ

ও মা-এর কাছে বাবার সম্পর্কে করা মন্তব্য। এভাবে মা ও কাকিমার সামনে বলা কি ঠিক হয়েছে। সত্যিই তো, ও নিজেকে কতটুকুই জানে বাবার বোঝনের কাজ কর্মের বিষয়ে। হঠাৎ করে মন কণ্টে ভারাক্রান্ত হল।

বিদ্যানার শুরুর ঘুম আসার আগে এসব কথা ভাবতে ভাবতে কলকাতার কথা মনে পড়ল। দূরন্ত দামাল ছেলে ডেভিড। ডেভিডের স্বেচ্ছাচারী জীবন। ও তবুও সেই ডেভিডকেই ভালো না বেসে পারে নি। রবার্ট, রোজালিন-এলবার্ট, আর দেবদত্তী,—সেই বিষ মেশানো অমৃতের স্পর্শ। আচ্ছা, কখন হয়। ও যদি আবার চলে যায় কলকাতায়। ওদের সঙ্গে, ওদের মতো করে গড়ে উঠবে এই গ্রাম, এখানকার মানুষ, বাবা মা সবাই থাকনা এখানে ওদের মতো করে। ঠাকুরমা তো নেই। যিনি একদিন সমস্ত স্নেহের পরশ পাথর দিয়ে ওকে গড়েছিলেন। তার সেই পবিত্র আদর্শ তাই আজ আর এ মাটিতে খুঁজে ফিরে লাভ কি।

আবার এক সময় মনে হল, না না এসব কি ভাবছে। ঠাকুরমার শব্দ অনমিত্র এ গ্রামকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। সে শব্দ সার্থক হবে কি করে শুরুরতেই ও যদি এদের ছেড়ে চলে যায়। এত ছোটখাটো বিষয়ে এমন সেন্টিমেন্টাল হলে চলে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠে অনমিত্র একদম পাড়ার মধ্যে চলে গেল। পশুর বাবা এখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে। নিজেই এক সময় যে ইঁটের বাড়ি তৈরি করেছিল, ছেলের অস্বস্তি তার পলেস্তারা খসে পড়তে শুরু করেছে। পশুর বাপ তারই দাওয়ার বসে খুক খুক কাশ ছিল। অনমিত্র কাছাকাছি যেতেই সেই কাশির চোট সামলে বললে, 'কে—বাবা অম্ম, বস বস, এই দাওয়ার বস।' বলে হাঁপাতে হাঁপাতে এ-এ-করে বললে, 'বৌমা, নতুন লোক আসবে। এ'—অম্ম পদ্মরাকে বসতে দও।'

পশু বউকে মুখ ব্যাজার করে কি একটা গালি দিতে দিতে সামনের দাওয়া দিয়ে বাইরে চলে গেল। বোটা বেরিয়ে এসে ছেঁড়া কাপড় মাথায় টানার চেষ্টা করে বললে, 'বস ঠাকুরপো,' বলে একটা ভালপাতার চাটাই এগিয়ে দিয়ে অন্যত দূরে বসলে।

'কি নাম তোমার?' অনমিত্র উৎসুক চোখে জিজ্ঞেস করলে।

'লাজবান্ড' উত্তর দিয়ে আবার হাসল।'

'লাজবান্ড? বা বেশ সুন্দর নাম তো' বলে মিষ্টি করে তাকিয়ে রইল।

'লাজু বলে ডাকে আমাকে সবাই।'

'সত্যি তুমি মিষ্টি লাজু বৌদি।' চলি, পরে আবার আসব,' বলে পিছন ঘুরতেই সেই নেড়ী কুকুরটাকে দেখতে পেল। বোটা বাসু ছাপারিয়ার ভাঙা কারখানা পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু এ নিরে কোনো প্রহর করার আগেই লাজু

বলে চলল, 'এ হল বাবু ছাপারান্নির বুল ভগের কবস। তুমার দাদার কাছে কাছে থাকত। এখনও তাই এউখানে মাঝে মাঝে আসে। আর বাকিটা কারখানায় থাকে।'

'ও, কুকুরটা তাহলে তোমাকেও পাহারা দেয় বল।' বলে ওখান থেকে বেরিয়ে এল। বড় রাস্তার উঠেই এ অঞ্চলের প্রাচীন পদ্ধতের সদস্যর সঙ্গে দেখা হল। অনমিত্র তাকে ঠিক চিনত না। রমেশ মন্ডল নিজেই নিজের লম্বা একটা পরিচয় দিয়ে জানাল কালই প্রথম অনামিত্রকে দেখেছে সম্মুখের মিটিং-এ। সবার খুব ভালো লেগেছে। রমেশরা ওকে তাদের সমাজবাদী পার্টির যুবনেতা করতে চায়। অনামিত্র এসব শুনে সাফ উত্তর দিলে, এত সস্তায় ও নেতা হতে চায় না। আগে দেশের জন্য শ্রম দিক। তারপর যদি আসে তখন নেতা-টোতা হওয়া যাবে। অনামিত্রর এধরনের কথা রমেশের ভালো লাগল না। লোকটা গাইগুঁই করে চলে যেতে যেতে সেটা যেন জানিয়ে গেল।

এভাবে সস্তা দরের নেতা হতে না চাইলেও ওকে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়তে হল ওদের সঙ্গেই। গ্রামের একমাত্র স্কুল পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এই নিয়ে উৎসব ও স্কুলের উন্নয়নের জন্য যে কমিটি গড়া হল, সেখানে অনামিত্রকেও বেশ বড় ভূমিকায় রাখা হল। ও যদিও এ স্কুলে পড়েনি। তবু গ্রামের উদীয়মান শিক্ষিত যুবক হিসেবে ওকে মনোনয়ন করা হল। এক সময় ওর দাদা এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওর বাবাও কিছুকাল গ্রামের স্কুলে পাঠ গ্রহণ করেছে। সেই টান ভেতরে ভেতরে ওর রক্তে সংক্রমিত হয়েছিল হয়তো বা। আর ঐতিহ্য ও যখন নিজে এই কাজে আত্মনিয়োগ করল, তখন অন্য সবার থেকে অনামিত্র অনেক বেশি অপরিহার্য। এ কথা প্রমাণ করার নেশায় ও গোটা সহযোগী কমিটির অন্যতম প্রধান হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বাবার উপদেশটা শ্রুত্বে যে ভীষণ সত্যি ছিল। এ গ্রামকে নিয়ে এই প্রথম কাজেই তার টের পেল ও খুব ভাল রকমের।

রমেশের মতো সব রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও ছিলেন এই স্কুল উন্নয়ন কমিটির মধ্যে। প্রায় চার মাস ধরে বিপুল উদ্যমে চলল টাকা সংগ্রহ। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্যাশ ও মোটা টাকা পাবার আশ্বাস পাওয়া গেল গ্রামের ও পাশাপাশি অন্য গ্রামের বিশিষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষজনের কাছ থেকে। তিন দিনের মূল অনুষ্ঠানও চলল ভালোভাবেই। দু'একটা ছোট ঘটনা। এর ওর মান ভাঙানো। হেড মাস্টারের মেয়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার না পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের পরিবারের অসন্তোষ—এসব ঘটেই থাকে প্রায় সব বড় অনুষ্ঠানে। কিন্তু এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম যেভাবে মেতে উঠেছিল একত্রিত হবে, তা অনামিত্রকে গ্রাম সম্পর্কে অনেক-

খানি জরসা জুগিরেছে। আবার এক ধরনের আশা ফিরে পেল অনমিত ঠাকুরমার স্বপ্ন সার্থক হবে। এ গ্রামকে ও গড়ে তুলবেই। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে ছুরমার হস্রে গেল অনুষ্ঠান শেষে হিসাব মেটানোর দিন।

এ সভায়ও উপস্থিত ছিল নিখিল আর হরেনের দালিশের জনসমাবেশের মতো। কিন্তু অনমিতরা ভেবেছিল অনুষ্ঠান শেষের বাড়তি টাকার বিশাল একটা অঙ্ক ওরা শুল উন্নয়ন ফাণ্ডে দান করবে হিসাব সার্বমিট করতে গিয়ে দেখা গেল মোটা অঙ্কের টাকা গুবলেট হয়ে বসে আছে। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। আবার খিচি-খেউড়, চেঁচামেচি, অশ্লীল গালিগালাজ। অনমিত কিছতেই বুঝে উঠতে পারল না, এত টাকা গেল কোথায়! এমন কি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খাতে যেসব খরচ দেখানো হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য রকমের বানানো অথচ কমিটির দু' একজন ছাড়া প্রায় সবাই ব্যাপারটা নিয়ে আশ্চর্য নীরব।

অনমিত বড় রকমের মানসিক আঘাত পেল। বাবাকে সব জানিয়ে নিজের মনকে বাতাসের মতো হাল্কা করবার চেষ্টা করল। কিছুদিন না যেতেই কয়েক জন হিতৈষির কাছ থেকে খবর মিলল যেসব টাকা রসিদে বক্সেরা ছিল তাও আশ্চর্যভাবে উঠে গেছে। কারা তুলেছে সে টাকা সে সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন হল না। কয়েকদিন ও গুম হয়ে রইল। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক বাতাস গরম হয়ে উঠল। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। যেসব লোকেরা সেদিন শুল উন্নয়ন ফাণ্ডের টাকা সরাসরি অথবা ডান হাত ঘুরিয়ে অন্যের সহায়তার আশ্রয় করেছিল, তারাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী।

এনব থেকে সরে এসে অনমিত আজ সারাদিন বাবার লাইব্রেরী ঘরে বসে রইল। ছেলেবেলা থেকে এই ঘরটার প্রতিটি বই বেঁটেছে। তবু অনেক বই আজও পড়া হয়নি। আবার নতুন করে সেই সব বই নাড়াচাড়া করতে শুরু করল। এইসব বই-এর মধ্যে একটা বিশেষ সিরিজের বই, শ্রীলকুমার খড়ার 'প্রবাহ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, 'বিপ্লবী' পত্রিকা, গোপীনাথন গোস্বামীর 'বাংলার হলদিঘাট ভ্রমলুক', 'ভার্যলিপ্ত জাতির সরকারের ইতিহাস—প্রভৃতি বইগুলি নতুন করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এগুলো ঘটিতে ঘটিতে হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, বইগুলোর র্যাঞ্জে এক জায়গায় বাবার একখানা ডায়েরি। ও সেটাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করে বাইরে আনল। আর বইগুলোকেও নিজের পড়ার টেবিলে নিয়ে চলল। তবু বইগুলোর আগে বাবার ডায়েরিটা কি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ওকে টানছে। কিছুতেই দূরে রাখা যায় না।

অনমিত সম্মোহিতের মতো পাতা উল্টে চলল। নানা ধরনের লেখা।

একটা পৃষ্ঠার কতকগুলো নাম লেখা ; বেন ওকেরি, সরো কেন বেওয়া, সল বেলো, ফেলিডিনো । তারপর একটু ফাঁক দিয়ে লেখা আফ্রিকান রাইটার্স । এদের দ্বারা এক জনের কিছু উপন্যাস, নাটকেরও নাম লেখা ।

আর একটা জায়গায় দেখে তিনটি নাম অশ্রুত রকমের লেখা । একটা রেখাচিহ্নের মতো করে :

স্বরূপা
||
নার্গিস) রুম্না

স্বরূপা আর নার্গিসের পারস্পরিক বিপ্রতীপ আরো চিহ্নের অর্থ বুঝতে পারল, কিন্তু এদের দুজনের থেকে বেরিয়ে যাওয়া পরাস্থের বাইরে লেখা রুম্নাকে ঠিক চিনতে পারল না । আবার কয়েকটা পৃষ্ঠা উঠে দেখল এক জায়গায় একটা কবিতা লেখা । কবিতাটিও পড়ল :

অবাক

সেইখানে গতিশীল ঘোড়ার খুরের ধান
বেগের আবর্ত্তরে বার বার তরঙ্গের ঘাত
সে কি ঝড়, নাকি নিঃশ্বাস ঘাড়ের পরে
আমাকে আঘাত করে নাচে ফেল, আমি
চিং হয়ে শূন্যে থাকি । আর তুমি শশিধনীর
নৃত করো । আমার সমস্ত মন্থ ডেকে যার
ঘোড়ার ঘাড়ের মতো চলে । চুমো খাও
মুচড়ে ফেলো তুমি । বন্যার নদীর স্রোত বেন
তারপর বয়ে চলো দুবার দুর্মার তেজে
অসহায় আত্ম আমি বিশ্ব হয়ে পড়ে থাকি ।

বেশ কয়েকবার পড়ল ও । কিন্তু সঠিক মানে কিছুতেই মাথায় ঢুকল না । অবাক মানেই বা কি ? আবার ঐ কবিতারই নীচের দিকে একটা জায়গায় দেখল, বেশ ছোট করে লেখা ‘নার্গিস—তোমাকে প্রথম পাবার স্মৃতি মনে রেখে ।’ আবার সেটাকে কেটে দিয়ে একই রকম ছোট ছোট অক্ষরে লেখা ‘স্বরূপা তোমাকে নিয়েও একই অনুভূতি ।’ এসব পড়তে পড়তে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও । এমন সময় ওর কারিকমা মণিকা এসে ঘর দিল কে একজন লোক দেখা করতে এসেছে ।

‘হ্যাঁ যাচ্ছি, বসতে বলো ।’ বলে অনামিত তাড়াতাড়ি করে ডায়েরিটা লাইব্রেরীতে তাকে যেখানে ছিল সেখানে রেখে এল । বাইরে বসার ঘরে এসে দেখে একটা লোক বসে আছে । লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আমার নাম অশোক ভৌমিক । আমি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করি । এই

অঙলেরই বাসিন্দা। লোকটার দিকে ভালো করে তাকাতে মনে পড়ল, শুলের অনুষ্ঠানের সময় যেন পরিচর হয়েছিল। অনমিত সরাসরি প্রশ্ন করল, ‘কি দরকারে এসেছেন? তবে শুল সজ্জাত বিষয়ে আমি আর কিছু শুনতে চাই না।’

‘না না, আমি শুল নিয়ে কোনো কথা বলতে চাইনি। বলে জল্পলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমার সঙ্গে আরো কয়েকটি ছেলে আছে তারা বাইরে অপেক্ষা করছে।’

‘সে কি, ওদের আসতে বলুন।’

অশোকবাবু একটু এগিয়ে দরজার বাইরে থেকে ডাক দিতেই তারা চলে এল। তিনটি ছেলে। তাদের কেউই অনমিতর পরিচিত নয়। অশোকবাবু বললেন, ‘এরা এই অঙলেরই ছেলে, আমাদের এই গ্রাম ও পাশের গ্রামে বাড়ি। এক এক করে পরিচর করালেন, তরুণ, রবীন এবং অর্কর সঙ্গে। বললেন—‘আমাদের দলে আরো কয়েকটি ছেলে আছে। তাদের সঙ্গে আপনার আস্তে আস্তে পরিচর হবে। আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।’

কিছুই মাথা মুরু না বুঝতে পেরে হতভম্বর মতো তাকিয়ে থেকে অনমিত ওদের উদ্দেশ্যে বললে, ‘কি উদ্দেশ্য বলুন।’

অশোকবাবুই বলতে শুরু করলেন, ‘অনমিতবাবু, বলসে আপনি তরুণ। এতদিন কলকাতার থেকে লেখাপড়া করে গ্রামে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসেই গ্রামের শুলের ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিয়ে লেগেছিলেন, তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে সমস্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে আপনি এ কাজে নেমেছিলেন, তাদের সম্পর্কে আপনার সবিশেষ অজ্ঞতাই এই বাধতার জন্য দায়ী। কিন্তু নতের জন্য আপনার সংগ্রাম এবং তার পরিণতি আমাদের আপনার কাছে আসতে বাধ্য করেছে। আমরা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আদর্শ একটি আন্দোলনে নামতে চাই।’

‘কিন্তু এই অশ্বকার গ্রামে এ কাজে আপনি ক’জনকে সঙ্গে পাবেন।’ একদম হতাশ এবং বিরক্ত মানুষের মতো অনমিত মস্তব্য করল।

‘দেখুন অনমিত, এ কাজে আমরা সব থেকে কম লোককে সঙ্গে পাব। হয়তো যে কয়জন আমরা একত্র হতে পেরেছি, তারাই। তবে কাজে নেমে পড়লে আমাদের কাজকে অনেকেই সমর্থন করবেন।’

‘অনমিতবাবু, সভ্য আছে বলেই এখনও মানুষ টিকে আছে।’ তরুণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল।

‘আর তা ছাড়া, আমরা এ কাজ যদি না করি তবে কে করবে।’ অর্ক কথা বলতেই অনমিত চমকে ছেলোটর দিকে তাকাল। শত্রুসামর্থ বলিষ্ঠ শরীর।

পারজামা পাঞ্জাবী পরা ছেলেরি কঠিনবরে এমন এক ধরনের বস্ত্র কঠোর
নিষেধ, যে ওর দিকে না তাকিয়ে থাকে যার না। অনমিত্র নিজের বন্ধুর
মধ্যে কিসের একটা গুরু গুরু আওয়াজ শুনতে পেল যেন। ওর রক্তের
তারুণ্য ঘোড়ার খুঁরের মতো মাটির বন্ধে লাগি মেয়ে ধুলোর খুঁড়ের ভেতর
কোন দূর অনাগতে বন্দী নতুন দিনকে আনতে চাইল বন্ধিবা। অকস্মাৎ ওর
গানের লোম ফুলে উঠল কেন যে ও নিজেই বন্ধিতে পারছে না। এমন
সময় অশোকবাবু বলে উঠলেন, ‘অনমিত্র, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।
আজ রাত্রি জাটটার পর আমার বাড়িতে ছোট মিটিং আছে। আপনি যদি
যেতে রাজি থাকেন, ভুবনেশ্বরীর হাটের ওপর সাড়ে সাতটার পর থাকবেন।
আমাদের লোক আপনাকে ওখান থেকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।’ বলে
তারা ধীরে ধীরে চলে গেল।

সম্মুখীন একটা ঘোরের মধ্যে কাটল অনমিত্র। আজ সারাদিন ও বাড়ির
বাইরে যার নি। কয়েক ঘণ্টা প্রবাহের পৃষ্ঠা উল্টেছে। আবার দুপুরের
দিকে বাবার ডায়েরির পাতা উল্টে দেখেছে। কোথাও নতুন উপন্যাস পড়ার
অভিজ্ঞতার বর্ণনা, কোথাও বা নাগিসের সঙ্গে কাটানো দিনের অনুপ্রাণ
বর্ণনা আবার কোথাও এমন দু’একটা কথা লেখা আছে, যেগুলো অস্বস্ত
একধরনের উপদ্রব ও প্রেরণা যোগায়। যেমন, ‘পুরষেরা যেখানে অসাধারণ,
সেখানে সে একক ও নির্জন—নিঃসঙ্গ পথের যাত্রী। ডায়েরির আর একটা
পাতায় কোণাকুণি ভাবে লেখা ‘প্রকৃত তীক্ষ্ণদৃষ্টির তীর কখনও ব্যর্থ হয় না’
ঠিক তার পরের পৃষ্ঠাতেই লেখা আছে ‘আমাদের ব্যর্থতার ভেতর থেকেই
আমাদের সফলতাগুলো বেরিয়ে আসে।’ আর এক জারগায় নাগিসকে
নিয়ে একান্ত ব্যস্তগত কিছু কথা লেখা আছে। চারপাশের মানুষ, সমাজ
এমন কি স্বর্ণপা নাগিসকে কিভাবে দেখে। এসব কথার পরই হঠাৎ কালো
কালি দিয়ে লেখা আছে, ‘বিপ্লবের পথ অত্যন্ত জটিল। এপথে এক পা
এগিয়ে গেলে দু’পা পিছিয়ে আসতে হয়। বিপ্লবের কাজে প্রথমে ব্যর্থতা
আসা ভাল। তবেই সফলতাকে সঠিকভাবে লাভ করা যায়।’ আর এক
জারগায় কয়েকটা প্রেমের কবিতা লেখা আছে তার মাঝে কয়েকটা লাইনে লেখা,
‘লেনিন খুব দুর্বল নাভের ছিলেন, জেলের মধ্যে বার বার হতাশায় ভেঙে
পড়তেন। এ বিষয়ে ষ্ট্রটস্কি ভীষণ আশাবাদী ছিলেন, লেনিনকে সারাক্ষণ
অনুপ্রেরণা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ছিলেন। ভোদকার বোতলের মধ্যে দিয়ে চিঠি
পাঠাতেন।’ তারপর দু’তিন পৃষ্ঠায় কতকগুলো সনেট, সবই স্বরচিত
মনে হল। তারপর আবার একটা জারগায় মনে হল যেন এই গ্রাম এবং
চারপাশের মানুষের সম্পর্কে লেখা :

‘আমার মনে হয় এই সব লোকেরা জানে না যে এদের স্বার্থপরতা বংশ

পরপরার উত্তর পদ্রুঘের মধ্যে প্রবাহিত হবে। এক বন্দ্য সমাজ বহন করবে সেই সব মানুষ। সৃষ্টিহীন উষর সেই যুগের দিকে তাকিয়ে আমার কণ্ঠ হয়। কিন্তু আমি অসহায় এক মানুষ। অধ্যাপক কেবল ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। অথচ এখনকার ছাত্রসমাজ অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা স্বাধঃস্বঃ সরকার কেউই আজ আর অধ্যাপককে এ রকম ভূমিকার চায় না। যে কাজ দেশনায়কের তা অধ্যাপক করতে পারে না। আমি দেশনায়ক নই। তবু এই চারপাশের মানুষ, আমার প্রতিবেশী—এদের জন্য আমার কণ্ঠ হয়। বকের ভেতর এক অসহ্য ক্ষণালা। এজন্য অন্যভাবে প্রশমিত হয় নাগি'সের কাছে গেলে 'তবু আজ নাগি'স অন্যের।'

অনামিত বাবার ডায়েরিটা পড়ে আজ অশ্রুত এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়ল। সব কিছু ঠিক ঠিক বুঝতে পারল না। তবু বাবার চিন্তা স্তরের নানা মূখিতা ওকে অবাক করল। যদিও নাগি'সের ব্যাপারটা ও মনে নিতে পারল না। খুব ছেলে বেলা থেকেই ও নাগি'সকে দেখে আসছে। ওরা দিদিভাই দ'জনেই পিসিমণি বলে ডাকে। ছোট অবস্থায় কতবার পিসিমণির কাছে সারাদিন কাটিয়েছে। আর মনে পড়ছে, নাগি'সের মেয়ে কাফেলাকে। ওর থেকে কয়েক বছরের বড়। চোখের দৃষ্টিতে অশ্রুত একটা মারা আছে। কাফেলা এখন কোথায়। কত বড় হয়েছে। ছেলেবেলার তার চুল ধরে হিঁচড়ে টেনে কত মেয়েছে। অথচ দিদির মতো ভালোবাসতো। না কি দিদির থেকেও বেশি ভালোবাসত। আচ্ছা 'ভালোবাসতো' এই শব্দটাই মনে এল কেন। স্নেহ করতো একথাটা ভাবছে না কেন। এখন নাগি'সকে ঘূণা করতে ইচ্ছে করছে অথচ মনে হচ্ছে কাফেলার সঙ্গে যদি একবার দেখা হত। এরকম সময়ে বাইরের জানালার এসে লাজু ডার্কদিল, 'লেতুন ঠাকুরপো?'

ইঠাৎ সেই ডাকে চমকে উঠল অনামিত। এত সময় যেন সম্প্রাহিতের মতো ছিল সে। দেখল বিকেল গড়িয়ে বাইরের রোদের রঙ স্নান হয়ে এসেছে। অশোকবাবুর বাড়ি যাবার জন্য একটা অর্কাথত টান অনুভব করল। পায়জামার ওপর পাজ্যাবীটা চড়িয়ে বাইরে এসে দ্যাখে লাজু ওর দিকে তাকিয়ে মুখে আচল গুঞ্জে হিঁ হিঁ করে হাসছে। 'কি ব্যাপার, হাসছ কেন?'

'তুমি মোরে ডাকে চমকে উঠল যে।'

'হা, কে বললে।' বলে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বলল, 'তা খামোখা ডাকলে কেন বল।'

'আজ তুমি ভাঙা কারখানার যাব নি।'

'সে কি কথা, আমি কি ওখানে রোজ যাই নাকি?' অনামিত অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

না, যেদিন ঘরে থাক সেদিন সম্ভ্যার সময় ওখানে যাও।' বলে লাজু

মাটির দিকে মূখে করে বায় পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি অঁচড়াতে লাগল। মূখ নিচু কর্তেই অনমিত লক্ষ্য করল ওর মাথার ওপর কাপড় ছিঁড়ে গেছে। অনমিত সহজভাবে বললে, 'ভূমি এতখানি নজরে রাখ আমার। কিন্তু আজ আমি অন্য জায়গায় যাব। সময় হবে না গো।'

'কথা যাব?' বলে আবার বললে, 'মোদের ভুলে যাবনিত সেখানে যেয়া?' হঠাৎ এই প্রশ্নে অনমিত চমকে উঠল ভিতরে ভিতরে। বাইরে বললে, 'না গো, তোমাদের আরো ভালো করে জানবার জন্যই তো আমি যাচ্ছি সেখানে।' আর না দাঁড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চললে। লাজু কিছুটা সময় নেই দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর ওদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

অশোক ভৌমিকের বাড়িতে গিয়ে অনমিত আজ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করল। সেখানকার তরুণ ছেলেগুলি অনেকেই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে একরকম অসহায় বোধ করছে। আজ আর ভারতবর্ষের কোথাও চাকুরীর সুযোগ নেই। সরকারী সংস্থাগুলি রুগ্ন। বছরের পর বছর অর্থিক লোকসান মাথায় নিয়ে ধিক ধিক করে বেঁচে আছে। বেসরকারি সংস্থার মধ্যে দেশের সংস্থাগুলি পঁজি ও পরিকল্পনার অভাবে লোকসানের চূড়ান্ত বিপদে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর আছে একই মানের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে বিরাট প্রতিযোগিতা। অথচ বিদেশী সংস্থাগুলি নিজেদের পঁজি, বিজ্ঞাপন এবং উন্নত কারিগরী ব্যবস্থা ও বাজারকে কৃৎসিত রাখার জোরে সাফল্যের চূড়ান্ত পথেরে রয়েছে। এসবের বাইরে দাঁড়িয়ে একমাত্র যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেশ নিজেকে স্বনির্ভর করতে পারত। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ভোগশক্তি এবং বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল দেশের আই. এম. এফ. ও অন্যান্য বিদেশী ঋণের ফলে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাদের দেওয়া শর্ত বেনে বিদেশ থেকে আমদানী করা বীজ, রাসায়নিক সার ও ঔষধপত্রের ওপর দেশীয় চাষিদের নির্ভরশীল হতেই হচ্ছে। ফলে চাষ করেও কারিকরম ঋণেরে চাষি সাফল্যের মুখ দেখছে না। সরকার ফাঁকা জনদরদীর নামাবলী গায়ে দিয়ে ভূগম্লে পত্তায়েরে পথ নিজে পার্থীদের নানারকম অসৎ পথ অবলম্বনে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে দেখাচ্ছে। আর এই খেলায় তাদের প্রধান হাতিয়ার এক প্রেণীর গুঁড়া বাহিনী।

উপস্থিত সদস্যরা দেশের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আলোচনা করে মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য নতুন এক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ার শপথ নিল। যদিও সবাই জানা রইল যে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের পুঁঠ-পোষকতার এ অঞ্চলেও অনেক ক্লাব বা সমাজসেবা সংগঠন রয়েছে। তবু এই নতুন প্রয়াসের প্রথম কাজ হিসেবে ওরা ঘোষণা করল এবারে পত্তায়েরে নির্বাচনে অশোক ভৌমিক গ্রাম পত্তায়েরে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে এই

অঞ্চলের শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনল মাইতির বিরুদ্ধে। অনলবাবু একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘকাল বামপন্থী আন্দোলনে কক্সটার ছাড়াও বিস্মৃতে অবস্থান করেছিলেন। এখন আবার স্বযোগ বুঝে রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছেন। চারপাশের মানুষের একটা বড়ো অংশ তার কুণ্ডলিত যদিও দুর্বল স্বরী কাল, রাজনৈতিক কুট কৌশল, কোমল সৃষ্টিতে তার কোনো দোষ নেই। তবে এই কঠিন প্রতিপক্ষীর সঙ্গে লড়তে একটা অশুভ চাক্ষু্য বোধ করল অনমিত। বিশেষত স্কুলের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে লোকটার প্রতি একটা আকোশ জমিয়েছিল ওর মধ্যে।

অশোক ভৌমিকের ওখানে যাবার আগে আজই সম্মান্য ভুবনেশ্বরীর হাটে অপেক্ষা করতে গিয়ে ও হাটটাকে চিনল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের সম্মান্য অবসর বিনোদন ও আলাপ আলোচনার কেন্দ্র এই হাট। এটাও একটা জনসংযোগের বিরাট ক্ষেত্র।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের প্রচার একটা চূড়ান্ত রূপ নিল। ভুবনেশ্বরীর হাটে এক শব্দবারের সভার অনমিত বক্তৃতা দিল ওদের প্রার্থীকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে। ছাটিল কিছু রাজনৈতিক জ্ঞানগর্ভ বিষয় নয়। বরং ও ওর বক্তব্য স্কুলের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ওর অভিজ্ঞতার কথা মানুষজনের কাছে তুলে ধরল। আর ওরা যা পারেনি তার ব্যর্থতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে না না করেও কয়েকটি মানুষের দিকে ইঙ্গিত করল। যাদেরকে চিনে নিতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হল না। এখনকার রাজনৈতিক বক্তৃতার যে ধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কাদা ছোড়াছাড়ি থাকে—তা নেই ওর ভাষায়। তবে তার ধার কোনো অংশেই কম ছিল না। তাই একদল লোক, বলশালী, কঠিন চোয়ালের, মিটিং শেষে ওর সামনে এসে বলে গেল, নতুন নেতা দাদা নমস্কার।

‘এত সস্তার নেতা হওয়া যায় নাকি?’ ও তাদের পাচটা প্রশ্ন করেছিল।

‘নেতা হলেই তবে মঞ্চে দাঁড়ায়।’ একটা লোক জান কাঁধ হেসে এককম কথা বলে চলে গেল। অশোকবাবু কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, ওরা সব অনলবাবুর মাসেলম্যান। ‘মাসেলম্যান’ শব্দটা অনমিতর কানে লেগে রইল।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইলেকশনের টেম্প্‌ সর্বাধিক চূড়া স্পর্শ করল। চারদিকে টানটান উত্তেজনা। আরো কয়েকটা গ্রামের নিরপেক্ষ নির্দল প্রার্থীরা ওদের সঙ্গে যোগ দিল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজন প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা এবং পুরষাষাটের একজন প্রাক্তন সি.পি.এম. নেতা অনমিতদের সমর্থনে প্রচারে নামলেন। ফলে চারদিকে অশুভ একটা আশার আলো দেখা গেল। অনলবাবুর লোকেরা নানা জারগার উত্থান দিতে শুরু করল।

এমনিতে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখন ভয়ঙ্কর মৃত্যুশব্দ গড়ে উঠেছে। যে রাজনৈতিক দল যেখানে যে গ্রামে ক্ষমতার বেশি। সেখানেই তারা মৃত্যুশব্দ গড়ে তুলেছে। পুলিশ এসময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট গুন্ডাভক্ত এইসব মৃত্যুশব্দ-গুলিকে এমন ভাবে ক্রায়স্থ করেছে, খুন, জখম, রাহাজানি, ধর্ষণ, পাড়ার পর পাড়ায় ঘর পুড়ানো এইসব অঞ্চলের নিত্যকার ঘটনা। কেশপুরের মাহুদ, সবং-এর রহমান ও সমীর, গোপীবল্লভপুরের বীর মাহাতো, এগরার দারা মন্ডল শূরু মাসেলের জোরে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগ্নমূল নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বার্ষিকের চূড়ান্ত সম্মিলন এসে দাঁড়িয়েছেন। সত্তর উর্ধ্ব এই নেতা আজ এই দু'হাজার পঁচিশ সালে আর দলকে নিরস্ত্রণে রাখতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর অহমিকাবোধ কিছ্রুমান কমেনি। ওঁদিকে বাম আন্দোলনে সনাতন ও উগ্রপন্থী এই দু'দলের মতবিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অনিল-বিমান-গোতম-মানবরা নিজেদের মধ্যে এখনও সমঝোতার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারছেন না। আর এখনকার যুবক যারা এপথে এসেছেন, তারা এখনও একক নেতৃত্ব দেবার মতো অবস্থায় নেই। এই সুযোগে বিজ্ঞেপ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলিকে এক করেছে। মৌলবাদীরাও দিকে দিকে এগিয়ে চলেছে।

টান টান উত্তেজনার মধ্যে নির্বাচন হল। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল আধা সামরিক বাহিনী ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু অনলবাবুর কেন্দ্রে তেমন কোনো গোলমাল হয়নি। কাজটা তিনি করেছিলেন আগের রাত জেগেই। চূড়ান্ত সাফল্যের স্বপ্ন দেখতে শুরুর করেছিল অনমিতরা। অনলবাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাইরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আনল কাজ করেছেন আগের দিন রাতেই। অটেল টাকা ছাড়িয়ে আর ভয় দেখিয়ে একরাতেই দলিত পঞ্জীর অংশীদারিত্ব জেলে, বাগদি আর কুস্তকারদের ভোট কিনে নিয়েছেন। ইলেকট্রনিক্স ভোটকেন্দ্রে ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতে সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। প্রায় পঞ্চাশ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেন অশোক ভৌমিক। কিন্তু পরের দিন রাত থেকেই যে কয়টা পাড়া অনলবাবুর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছিল, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিল। বাদ যারনি বিভিন্ন গ্রামের সেই প্রাক্তন নেতাদের বাড়ি ঘরও, যারা অনমিতাদের সমর্থনে নেমেছিল।

অনমিত ভোটের ফলাফলে যতখানি না হতাশ হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি বেদনাক্লান্ত হল পরবর্তী ঘটনায়। কিন্তু পুলিশ আর এখন পরাজিত পঞ্চায়েত প্রার্থীর পক্ষ নিতে চায় না। এমন কি অনেক মানুষ যারা তখন সমর্থন করতে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, ভোটের পর তাঁরা ভয়ে হোক জনীহার

হোক চুপচাপ থাকলেন। তবু এসময় পাশে না থাকাটা চরম অমানবিক বলে অনুমিত তরুণ রবীন অকস্মেৎ নিরে দিনের বেলায় আক্রান্ত মানুষদের ঘরে ঘরে ঘুরল। অনেকেই অশ্রীল ভাষার ওদের গালিগালাজ করল।

বাবাও এসময় রিটার্ড করে বাড়িতে এসে বসলেন। সব শুনে, দেখে তিনি কিছুই বললেন না, শুধু বললেন, ‘রাজনীতি নারীর থেকেও বেশি নোংরা, মানুষ মদ একদিন ছেড়ে দেয়, মেয়ে মানুষের সঙ্গও বরসের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু রাজনীতির নেশা মানুষ কোনোদিন ছাড়তে পারে না।’

‘আমি ছাড়তে পারব।’ মুখ ফুটে এই কথা বলেও অনুমিত মনে মনে বললে, ‘কিন্তু মানুষের ভালো করার ইচ্ছা কোনোদিন ছাড়তে পারব না। আর অনলবাবুর কাছে আমি কোনোদিন হারব না।’

‘পারলে ভাল।’ বাবা বললেন, ‘তবে তোর এখন মনের অবস্থা ভালো নয়। তুই কয়েকদিন কলকাতা ঘুরে আর।’

প্রস্তাবটা অনুমিতর পছন্দ হল। ও তখনই স্থির করল কিছুদিন বাইরে থাকা দরকার। বিকেলেই ও যখন বেরিয়ে পড়ল, তখন ওর বাবা বললে, ‘ফিরবার সময় একবার মেচাদার নার্গিসের বাড়ি হয়ে আসিস। ওরা তোকে দেখতে চেয়েছে।’

অনুমিত কোনো উত্তর দিল না, বেরিয়ে পড়ল।

মেচাদা স্টেশনে বাস থেকে নেমেই ও শুনতে পেল, কে ডাকছে—‘এই অম্—’

মুখ তুলে দেখল বরস্কা, চশমা পরা মাথা ভর্তি পাকা চুল, বেশ মোটা একজন জুম্মাহিলা ওর কাছে এগিয়ে এলেন।

‘কি রে অম্, চিনতে পারছিঁস না। চল আমাদের বাড়ি চল।’ বলে জোর করে ওর হাত ধরে টানতে শুরুর করলে। ও একরকম টানা হয়ে যেতে যেতে বললে, ‘আমি এখন কলকাতা যাব।’

‘আজ না কাল যাবি। চল তোকে দেখলে কাফেলা কত আনন্দ পাবে।’

এত সময় সন্দেহ হচ্ছিল। এবার ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, নার্গিস পিসি। কিন্তু ওর কোনো কথা না শুনাই পিসি হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কতদিন আগে একসঙ্গে কাটিয়েছে। তবু সেই চোখ এবার মনে পড়ল। কত বার পিসির চোখের ঐ চশমা ধরে টেনেছে। পিসি মূখের দিকে তাকিয়ে বলত, ‘কি রে কি দেখছিঁস, আমাকে ভালো লাগছে তোর?’ আজ আর সে রূপ নেই। বার্ষিক সব গ্রাস করে নেয়। আর এখন কিরকম মর্দুটিয়ে গেছে। মদসলমান মদসলমান মনে হয়। তখন কিন্তু একদম চেনা যেত না হিন্দু না মদসলমান। বাবার ডায়েরি পড়া পৰ্ব্বস্তও যে রাগটা ছিল মনের মধ্যে, এখন মদখোঁমর্দুখি দেখে কেন যে একটুকুও রাগ হচ্ছে না। বরং এতদিন পরে এখন কলকাতা না গিয়ে নার্গিস পিসির সঙ্গে যেতেই ইচ্ছে করছে।

বাড়িতে ঢুকতে গিরে দেখল, কে একজন বড়ো বাইরে বেরিয়ে আসছে।
 ষপথপে সাদা গায়ের রঙ। লম্বা চওড়া শরীর। মাথার সব চুল সাদা শনের
 মতো। লোকটার টোল পড়া চামড়ার ভেতর চোখ দুটো কি অদ্ভুত ধারালো।
 যেন কোন ষপথ ভেতরে দৃঢ় করে রেখেছে।

‘তোমার পিসেমশাই!’ বলে নাগি’স ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দিল,
 ‘দেবারিবাবুর ছেলে অনিমিত্র।’ স্বাভাবিকভাবেই অনিমিত্র পারে হাত দিয়ে
 প্রণাম করতে যেতে ভদ্রলোক ‘ধাক ধাক’ বলে পাশ কাটিয়ে ধীরে পারে বাইরের
 দিকে পারচারী করতে চলে গেলেন। অনিমিত্র ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল।

‘কাফেলা, মা সোনা, দেখ, কে এসেছে’—বলে নাগি’স অন্য ঘরে চলে
 গেল।

‘কে এসেছে মা’ কাফেলা প্রশ্ন করে শোবার ঘর থেকে এগিরে এল।
 গলার স্বর শুনাই ভেতরে ভেতরে কে’পে উঠেছিল অনিমিত্র। সামনে ষখন
 এল মূখোমুখি ওকে দেখে ‘কে—’ বলে অচেনার বিস্ময়ে থেমে গেল কাফেলা।

‘আমি অনিমিত্র।’ মূখ তুলে চোখে চোখ রেখে একটু সময়ের জন্য স্থির
 হয়ে গেল। কি অদ্ভুত মায়াবী চোখ। একদম ভিতর পর্যন্ত তোলপাড়
 করে দেয় এ দৃষ্টির আগুন। আর গোটা দেহে বোঝন যেন তার সমস্ত লালিত্য
 নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। পরনে আটপোরে শাড়ি। তবু তার বানন যেন মানতে
 চায় না শরীর।

কাফেলার চোখও আটকে গেছিল অনিমিত্রের চোখে। সে কি এই প্রথম
 কোনো যুবককে দেখল। প্রশস্ত ললাট। মাথা ভর্তি কৃচ্ছুক কালো কৌকড়া
 চুল। বলিষ্ঠ শরীর। চোখে মূখে যেন কোন আলোর ষপথ। তবু একটু
 পরেই সম্ভিত ফিরে পেয়ে বললে, ‘অম্?’ ছোট উচ্চারণ, তবু কি গভীর।

কয়েক মুহূর্ত। তবু মনে হল যেন কয়েক যুগ। সম্মোহিতের মতো
 তাকিয়েছিল অনিমিত্র। মূখ ষখন নামাল, কি এক অজ্ঞাত লজ্জা তাকে
 পেয়ে কসল যেন।

সব সংকোচ ভেঙে কাফেলাই হাত ধরে সহজভাবে ওকে নিয়ে চলল
 নিম্নের শোবার ঘরে।

ও ষখন ছোট ছিল। কাফেলা তখন ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়। এক
 ধরনের স্নেহ মিশ্রিত ভালোবাসা ছিল ওর প্রতি। যা সাধারণত ছোট ভাই-এর
 প্রতি দিদির থাকে। তারপর কত বছরের অবসর কেটে গেছে। উভয়েই
 পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। আর দীর্ঘ অদেখার অন্তরাল পেরিয়ে
 আজ ষখন দুজনেই কাছাকাছি এল, এ এক অন্য আকর্ষণ—কেউই যার ব্যাখ্যা
 করতে পারল না নিম্নের কাছে।

অনেক কথা বলল অনমিত্র। ওর কলকাতাবাসের নানা কথা। গ্রামে ফিরে বদলে যাওয়া দেশ-শ্রাটি ও মানুষের কথা। আর শেষমেশ নতুন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন।

কাফেলাও বলল ওর এতদিনের জন্মে থাকা কথা, এখন ও যে বেসরকারী স্কুলে কাজ করে তারই পরিচালক সমিতির কয়েকজনকে বেছে নিয়ে ওরা গড়েছে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন। তনুজা, সৌবর্ণা, মোহিণী এরা হল ওর সহকর্মী। দু'জনের সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা ও ভাবনার বিনিময় হল। কাফেলার বাবা ফিরে এসে একবার দরজার বাইরে থেকে আড়চোখে দেখে গেছিলেন। অনেক রাত হল মা এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

পরেরদিন সকালে কাফেলা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের মোচাদা কৃষ্টি পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে। ব্যস্ততম এই স্টেশন সংলগ্ন শহরে ওদের অফিস ঘন আধুনিক বিজ্ঞানের দান, ই-মেল, ইন্টারনেটে ওরা যোগ রেখেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারীবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে। মডেল ও ডেকো-রেশনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাফেলা নিজে ভালো নাচতে জানে। নানা ভঙ্গিতে নাচের পোজের ছবি এনলার্জ ও ল্যামিনেশন করে টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। অনমিত্রর তবু মনে হল এদের সংগঠনের দুটো বিষয়ের অভাব। প্রথমত ওরা কোনো সাহিত্য প্রয়াসকে এই সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে নি। দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া আর কোনো রকমের পত্রপত্রিকার আয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস সরাসরি সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অনমিত্রর এই আলোচনা মেয়েদের ভালো লাগল। ওদের মধ্যে সৌবর্ণা সরাসরি প্রস্তাব দিল এ বিষয়ে অনমিত্রর সহ-বোগিতা করার জন্য। দু'জন ছাড়া প্রত্যেকেই রাজি হলেন এই প্রস্তাবে। অনমিত্র এদের সঙ্গে বসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চালিয়ে গেল। আমাদের বর্তমান সময়ের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয়ে। রাজনৈতিক স্বার্থস্বত্বতা ও গুণ্ডাভক্তের হাতে রাজনৈতিকদের আত্মসমর্পণের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেই নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। এ রাজ্যে বাম জমানার যে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল, তা আজ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। অসংখ্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইচ্ছা মতো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা শেষে চাকরীর কোনো সুব্যবস্থা না থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের অধ্যবসারও নষ্ট হয়ে গেছে। সমাজের এই সার্বিক অবস্থার বিরুদ্ধেই সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনমিত্রর কথা এবং যুক্তি সবাই যে সমর্থন করে সর্বাঙ্গিকরনেই, এমন নয়। তবু ওর কথাবলার ভঙ্গিতে এমন একটা আকর্ষণীয় প্রভাব আছে যা ওর মতের বিরোধীদেরকেও ভাবিয়ে তুলে। এই যে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে

সমাজের সার্বিক অবস্থার দূর করতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হবে। অথবা আজকের সমাজ ও আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাশ্য নেমে এসেছে—একথা কাফেলাই মানতে পারল না। তবু এ নিয়ে আপোচনা চালিয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই তা সবাই মানল। কাফেলা জানল আজকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের যুগেও আদর্শ গ্রাম আছে, ও নিজের গ্রামকে তার উদাহরণ হিসেবে ভুলে ধরতে অনমিত খুব বিস্মিত হল। এমন গ্রাম দেখবার ইচ্ছা প্রকাশও করল।

সেই দিন বিকেলেই অনমিত কাফেলার সঙ্গে তাদের গ্রামে গেল। সে এক অজ পাড়াগাঁ। শহর সেখান থেকে অনেক দূরে। ছ'নম্বর জাতীয় সড়কে বারে রেখে সবুজ ফসলের মাঠ চিরে ঐ অনেক দূরে একটা ছোট বাস রাস্তা গিয়ে ঠেকেছে কংসাবতীর তীরে। সেখানে মজে যাওয়া কংসাবতী ভাদ্রের পরই তার স্রোত হারিয়ে ফেলে। বালির উপর দিয়ে অবহেলার বাস যায় ওপারে আরো কতো দূরে উত্তরে গোলগ্রাম, এখানের মানুষেরা যেমন সহজ সরল, তাদের ভালোলাগা মন্দ লাগার বোধও তেমনই স্বাভাবিক। আদিবাসী, চাষা কুমার নাপিত কর্মকার হিন্দু এবং মুসলমান সবাই একত্রে বাস করে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধু। এমন কোনো ফরাক নেই যা থেকে সহজে চিনে নেওয়া যাবে কোনটা হিন্দুদের বাড়ি আর কোনটা মুসলমান অথবা কে আদিবাসী। কৃষি ফসলের সঙ্গে ফুল চাষ এখানকার বড় রকমের অর্থনৈতিক অবলম্বন। ফুলের সঙ্গে থেকে কি এদের মনের মধ্যে এত স্বাভাবিকতা। অনমিত অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ক্ষেতের পর ক্ষেত রজনীগন্ধা, গাঁদা, জুই আরো কতো নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। গন্ধে ম'...

কাফেলার বাড়ির সবাই কি সহজে আপন করে নিল নিজের বাড়ির ছেলের মতো। এর আগে কোনো মুসলমান বাড়িতে অনমিত অতিথি হয়ে রাত কাটার নি। এক প্রকার বিস্ময়, কৌতূহল আর খানিকটা ভয় নিয়ে ও সৈয়দ আর মাতুল্লা তাহমেনের বাড়িতে প্রথম রাত কাটাল। নানারকম দর্শন, বিপর্ষয়। একদল লোক। তাদের মাথায় পাগড়ী, মুখভর্তি দাড়ি গোঁড়। কি বিশাল চেহারা। তারা যেন ওকে ধরে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে ও কিছুই জানে না। মাঠ চিরে রাস্তা, রাস্তার ওপাশে নদী। ওরা যখন নদীপাড়ে এসে ওকে জোর করে নৌকার তুলল, তখন সেই নৌকার কে যে একটা মেরে। তার মুখ কিছুতেই দেখা যায় না। তাকেও কি বেঁধে রেখেছে? অথবা সব বাটীরা একই রকম বন্দী। নৌকা মাঝ নদীতে বালির ভেতর অর্ধেক ভুবে গেল। কোথাও জল নেই। শুকনো নদী। অনমিত অনেক চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলে ছুটে পালাতে গিয়ে আবার সেই লোকদুলোর হাতে বন্দী হল। তারপর চারদিক অশ্বকার। সেই লোকদুলো ওকে কোনো একটা ঘরে

রেখে পালাল। তারপর আর কিছ্‌ মনে নেই। আবার কি করে যে জ্ঞান এল। ও দেখে গোটা ঘরে আলো। একটা মেয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তার মুখ ও কিছ্‌তেই দেখতে পাচ্ছে না। এ কি সেই মেয়েটা, যে নৌকার ছিল! এসব ভালো করে বুঝবার আগে ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানার পাশে টাটকা রজনীগন্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাফেলা। কি সুন্দর সুবুজ আর সাদা রঙের কাজ করা সােলারার কামিজ তার পরনে। কাফেলা ওর সদ্য ঘুম জাগা চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। অনমিত্ত বিছানার উঠে বসল। কাফেলা বললে, ‘কি ঘুম ভাঙল?’

‘হ্যাঁ, আর ঘুম থেকে উঠেই তোমার সুন্দর মুখ—’ বলে ধেম্‌ গেল। সামনের দরজা দিয়ে তখন কাফেলার মামিমা প্রবেশ করল চা-এর কাপ হাতে।

সকালেই রেজ্জাক এল। আর তার বোন সালমা। ওর সঙ্গে পরিচয় হল। তারা ওর এবাড়িতে আসা খুব যে সহজ ভাবে নিল, এমনটা মনে হল না অনমিত্তর। রেজ্জাকের কথাবার্তার মধ্যেও একটা মুসলমানি ঢং ও অহংকার আছে। সালমা ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও একটা ফারাক রেখে চলেছে বার বার। তবে কাফেলা এমন সহজ পরিবেশ গড়ে তুলেছে প্রতিটি মুহূর্তে যে এসব ঠুনকো ব্যাপারগুলো কিরকম গোণ হয়ে গেল যেন। ওর মামিমাদের ব্যবহারেও সৌজন্যের অভাব ঘটল না। বিকেলেই ও কাফেলার সঙ্গে মেচাদার ফিরল। কিন্তু একটা নতুন উদ্যম ওকে যেন আবার নিজের আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলল। নিজের গ্রামে পড়ারত নিবচিনকে ঘিরে যে নোংরা পরিস্থিতির আঘাত বুকে নিয়ে ও চলে এসেছিল, তার সমস্ত গ্রানি যেন মুছে গেল। মেচাদা স্টেশন থেকেই কাফেলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও সোজা গ্রামে ফিরে এল।

আট.

অনেক কালের পুরোনো একটা পোড়ো জমি। চারদিকে ইঁটের স্তুপের ভিতর বিশাল জঙ্গল হয়ে গেছে। পূর্বে ইঁট পোড়ানোর ছাই এ উঁচু পাহাড় জন্মে আছে। দক্ষিণে কালো জলের দিঘি। উত্তরে শরকাঠির জঙ্গল। আর পশ্চিমে গভীর নদী। একটু পেছনে কেলোঘাই-কসোবতী একত্রে মিলিত হয়েছে। এখান থেকে এ নদীর নাম হলদি। ওই পারে দক্ষিণ পশ্চিম কোনে চৌখালীর বাজার। এই রকম জায়গার এই পোড়ো জমিতে বছর তিরিশ আগে একটা ইঁট তৈরির ছোট পগমিল ছিল। তারই অফিসঘর হলদির পাড় ধরে। নদীর ওপারের মঠ চণ্ডীপুরের একটি লোক এখানে

কারখানা গড়ে ছিল। আর তার ব্যবসা ছিল করলা ই'ট টালি এবং এ সুবের
 ভেতর লরির গভীর ভলদেশে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের সান্নাই-এর। একদিন
 গভীর রাতে হঠাৎ দূর থেকে লোকেরা এই অফিস ঘরটাকে দাউ দাউ জ্বলে
 যেতে দেখে। পরদিন সকালে এসে দেখে সব কিছু আগুনে জ্বলন্ত হয়ে
 গেছে। পুলিশ এসে তিনখানা পোড়া লাশ ছাড়া আর কিছুই পায় নি।
 কিন্তু ঠিকানাহীন সেই মালিক পক্ষের কেউ কোনো তদন্ত করেনি। লোকটার
 বাড়িগার্ড হিসেবে দু'জন বিশাল দেহের বিহারী লোক থাকত সঙ্গে।
 এখানকার লোকের ধারণা কোনো বড় গ্যাং বদলা নিজেছে। গ্রামের শান্তিপ্রিয়
 মানুষ সোঁদিন থেকে এই অঞ্চলে আসা বন্দ করে দিয়েছে। একরকম অবস্থাতেই
 পড়ে ছিল দশ পনোরো বছর। তারপর একটা এক চোখওলা মুসলমান, মুখে
 তার খোঁচা খোঁচা দাগ। সে এসে এখানে মাঝে মাঝে থাকতে শুরু করে।
 যেমন তার ভয়ঙ্কর মুখ, তেমনই রহস্যজনক তার চালচলন। এখানকার স্থানীয়
 লোকজনের সঙ্গে সেও কখনও মিশে না। আর লোকজনও তার কাছ থেকে
 আড়ালে থাকে। কেউ বলে ও নদীর ওপারে ভগবানপুরের বাজারে পাঁচ বছর
 আগে খুনীর আসামি ছিল। এখনও ফেরার। কেউ বলে ঐ লোকটাই সেই
 কাল রাতে আগুন দিয়ে ছিল ওই ঘরে। আবার অনেকে বলে ও বেশ বড় একটা
 ভাণ্ডার দলের সর্দার। এখানকার নদীর গভীরতার মতোই লোকটা রহস্যময়
 হয়ে থাকে।

সেখানেই একদিন রাতে বৃন্দ মকসেদ আলি অনিমিত্ত, অর্ক, তরুণ আর
 রবানকে নিয়ে এল। চারনিকে পোড়ো নির্জনতা খাঁ খাঁ করছে। শুধু
 অন্ধকারের গভীর থেকে হলদি নদীর অগাধ জল পাড়ে লেগে বাতাসের
 আঘাতে ছলাংছল করে চলেছে। সেই রমণীয় শব্দেও ভয় ধরে যায় এমন
 পরিবেশে। লোকটা কেরোসিন ল্যাম্পের আলো জ্বালিয়ে বসে ছিল। ওরা
 তার দিকে তাকাতেই কিরকম ভয় পেয়ে গেল যেন। মকসেদ আলি সেই
 লোকটার মূখ্যমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'মাজিদ ভাই, এই সেই ছেলেরা। তোমার
 কাছে শিখতে চায়। সব কিছু।'

অনিমিত্ত মনে হল, মকসেদের কাটা কাটা কথা যেন কিরকম শব্দহীন।
 অশ্রুত নিশ্চিন্ততাই কেবল জেগে আছে। লোকটা এবার তার ভীক্ষু চোখে
 ওদের দিকে তাকল। সে চোখের পাতা অথবা তারা কোনো কিছু নড়ছে কিনা
 কেরোসিনের আলোর ৭ছুই বোঝা যায় না। লোকটা কিরকম নিশব্দ ইঙ্গিতে
 ওদের নির্দেশ করে সেই পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ল্যাম্প হাতে নিয়ে
 অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলল। ওরা মকসেদ আলির সঙ্গে তাকে অনুসরণ
 করল। অন্ধকারে ভাঙা ই'ট আর স্বামার এবড়ো খেবড়ো রাস্তার প্রতি
 পদক্ষেপে ঠোঙ্কর লাগে। কখনও মূখ থুথুড়ে পড়ে যেতে হয় যেন। সেই

দৃশ্যের উঁচু ইঁটের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কোন দিকে যে নিয়ে চলেছে, ডাইনে না বাঁয়ে, উত্তরে না পূর্বে ঠাহর করা যায় না। মনে হয় যেন বন্য স্বাপদ কোথাও ছুটে পালাচ্ছে। একদু'টি ডান দিকে কেউ যেন ঝপ করে করে জলে পড়ে গেল। বেশ খানিকটা স্নাতসে'তে জলা জ্বরগা পৌঁরয়ে যেতে হল। খরকাঠির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শরপাতার তীক্ষ্ণ ধারে জামার ওপর দিয়েও গা হাত চিরে যাচ্ছে মনে হল। অশ্বকারের অতল গজ্ঞের মধ্যে কতটা যে হাটল খেরাল নেই। মনে হল কোন আদিম হিংস্র জিহাংনা যেন ওদের গ্রাস করে নেবে এই রাগ্রেই। কারুর মূখে একটাও শব্দ নেই কেবল পাঁচ জোড়া পায়ের ছপাং ছপাং শব্দ পিলে চমকে দেয়। লোকটা কোথায় উঠাও হল যেন!

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা আর একটা ভাঙা বাড়িতে এল মনে হয়। তার ভাঙা দরজার লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ভেতরটা এসে ওরা কিছুটা স্বস্তি পেল। ল্যাম্পের আলোয় যেটুকু দেখা গেল। ভেতরটা বেশ প্রসারিত। চারদিকে ভাঙা দেওয়াল। কোথাও কোথাও ইঁট অনেকখানি খসে পড়েছে। তবু মাঝখানটা অনেক জারগা বেশ পরিষ্কার। একটা বড় গোল বৃন্তের মতো উঁচু জারগার সামনে এসে সেই মাজিদ লোকটা দাঁড়াল। একটা আখখানা ভাঙা থামের ওপর ল্যাম্পটা রেখে মাজিদ পশ্চিমের দেওয়ালের দিকে গেলে ওদের চোখ পড়ল, দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা লোহার তলোয়ার এবং লাঠি ঠেঁলানো রয়েছে। তার দু'টা লাঠি ও একটা তলোয়ার নিয়ে মাজিদ আবার ফিরে এল। লাঠি দু'টো আর তলোয়ার ওদের মধ্যে তিন জনের হাতে দিয়ে, নিজেকে সেই বৃন্তের মাঝের লাল রঙ করা সেন্টারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার শব্দ চোয়াল নেড়ে এত দীর্ঘ সময় পরে এই প্রথম লোকটা বলতে শব্দ করল, 'এখানেই তোদের শিবতে হবে।' তারপর তার সেই ভয়ঙ্কর কক'শ চোখ সোজা ওদের দিকে রেখে বললে, 'তোরা ওই লাঠি ছোরা দিয়ে যে বেরকম পারিস আক্রমণ কর।' বলে সে তার চোখ থেকে আগুন বের করতে লাগল। ওরা তিনজন তিন দিক থেকে নানাভাবে আক্রমণ করেও লোকটার গায়ে কিছুতেই ছোরা অথবা লাঠি ছোঁরাতে পারল না। লোকটা সেই বৃন্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কি আশ্চর্য কৌশলে ম্যাজিকের মতো শরীরকে নানা জ্যামিতিক বিন্যাসে এত দ্রুত পরিবর্তিত করছে যে তার নাগাল পলকের মধ্যে পাওয়া কষ্টকর। একটা সময় ওরা ক্লান্ত হয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে হাঁপাতে লাগল। অনিমিত্ত মনে হল ওর হাতের ছোরাটা যেন ওর থেকে অনেকদূর বেশি ভারি। তখনও মাজিদের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তার একটুও কষ্ট হয় নি।

এতক্ষণ পরে লোকটা কিরকম হা-হা করে উদাস হেসে উঠল যেন, আর সে হাসি এই প্রথম একজন মানুষের হাসি বলে মনে হল। একটু বসে

লোকটা হাসির তোড় সামলে ঐ বৃক্ষ থেকে বোঝরে এসে বললে, 'ইচ্ছা, তাকত আর চেণ্টা থাকলে তোরাও এককম একপার্ট হরে উঠাব। তবে একদিনে হবে না।'

কেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা এই গোপন শিক্ষা লাভের পর্ব। গুরু হিসেবে মজিদ ভাই-এর কোনো তুলনা হয় না। বেশ আন্তরিকতাই ছিল উত্তর পক্ষের কার্যকলাপে। হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে মজিদ ভাই কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তার কোনো হিসসা মকসেদও দিতে পারল না। ফলে এই গরাকানিরা মানুষটির ফিরে আসার আত্ম আশার দিকে তাকিয়ে অনামিতরা হতাশ হয়ে গেল। হলদি নদীর জল এখানে পাগল বাতাসে পাড়ে এসে কেবল নিশ্ফল আক্রোশে ফেটে পড়তে চায়। উনার আকাশের সন্নিম্বল পটের নীচে এই ডাঙা দেউল কিরকম মৃক ও বোবা হয়ে থাকে। মকসেদই ওদের এবার মজিদ ভাই-এর আশা ত্যাগ করার পরামর্শ দিল।

অনামিত নিজেদের এ কদিনের শিক্ষাকে অবলম্বন করে, তরুণ, রবীন ও অর্কের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সমাজ সংগঠনমূলক সংস্থা তৈরি করল। অনামিত এই নতুন সংগঠনের নাম দিল অবাকি। ও ওর বাবার ডায়েরিতে কয়েকটি অপরিচিত শব্দ ও তার মানে দেখেছিল পাশাপাশি লেখা। তারমধ্যে এই শব্দটা ওর মনে ধরেছিল। এর বেশ কতকগুলো সমার্থক শব্দ লেখাছিল পরপর। ভবিষ্যৎ, ভাবাকাল, ভাবীষ্মুগ, ভবিষ্যৎকাল, উত্তরকাল, অনাগত-ষ্মুগ, অগ্রবর্তীকাল, আসন্নকাল, অদূর ভবিষ্যৎ। ওদের এই নতুন সংগঠনে ওরা রোজ বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও যোগাসন শেখানো শুরু করল। আর রাগে এখানেই শুরু হল আলোচনা সভা। বিতর্ক ও বক্তৃতার আসর। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি অর্থ-নীতির নানা বিষয় নিয়ে ওদের এই আলোচনার সোমশীর্ষ, দেবাংগু ও প্রেম নামের নতুন তিনটি ছেলে এসে যোগ দিল।

তরুণ ছিল অত্যন্ত সাধারণ বাড়ির ছেলে। ওর পূর্বপুরুষ বাবা, কাকা, দাদু কিংবা তার বাপ-দাদা কারুরই অক্ষর জ্ঞান ছিল না। অনেক কষ্ট করে তরুণের বাবা ছেলেকে বি. এ. পাশ করিয়ে তুললেন এমন সময়, যখন এ পোড়া দেশে গ্র্যাজুয়েটদের জন্য চাকুরীর বাজার গেছে চিরতরে শুষ্ক হয়ে। রূপ কথার গল্পের দুরোরোগীর হঠাৎ ফিরে পাওয়া সৌভাগ্যের মতো যে কটা হাতে গোনা চাকরী এমন স্তরের শিক্ষালাভে পাওয়া যায়। তারজন্য উঁচুদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সামিধ্য এবং মামা অথবা মশরুর তেঁতামোদা হয়ে পড়ে অতিরিক্ত যোগ্যতার মতো। তরুণ তার কোনোটাই জোগাড় করতে সমর্থ হল না। উপরন্তু ওর বাব-জ্যাঠাদের মাঠে মজুর খাটোর যে অভ্যাস সেটাও

হারিয়েছে অনভ্যাসের ফলে। এই চরম অব্যোধ্যতা ওকে বেকার করে রেখে ছিল। কিন্তু মনের কোন এক অশঙ্কার কোণে নিজেকে প্রমাণ করবার যোগ্য স্থানের সম্ভান গোপন ছিল, অনমিত্র সাহচর্য ওকে সেই সুযোগ এনে দিল।

রবীনের বাপ রেলওয়ে সার্ভিস নিয়ে থাকেন মোগলসরাই-এ সেখানেই বড়দাদা সিমেন্টের কোম্পানীর কাজে মেশকে ভুলে গেছে। তাই ওর দাদা ঠাকুরদার একান্ত অনুরোধে ওর বাবা রবীনকে ছেড়ে গেছিল গ্রামে। ঠাকুরদা আর ঠাকুরদিদির অতিরিক্ত আদরের ফলে প্রথমজীবনের শিকালোভের গোড়া বাধুনী গেল ঢিলেঢালা হয়ে। কোনো রকমে স্কুল ফাইন্যালের গাভী পেরিয়ে রামভলা থেকে আই. টি. আই ট্রেনিং নিয়ে ফিটারে শিকালোভ শেষ করে শিক্ষানবিশীর পর্ব চলল হলদিয়া ডক-কমপ্লেক্সে। এমন সময় দূরন্ত গতিতে সেখানে শূরু হল বামপন্থীর সঙ্গে দক্ষিণপন্থীর রাজনৈতিক সংঘর্ষ। মাঝ পথেই শিক্ষানবিশীর হিসেবনিকেশ শেষ করতে হল রবীনকে। অনমিত্র সেই টাটকা নিষাণী ছাগ্রকে দিল নতুন সমাজ যন্ত্র চালনা করবার ভার।

বয়সে অর্ধ ছিল এদের তুলনার অনেক বড়। তার বাপের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। দাদা থাকতেন ওড়িশার কাঠের কারবারে। বাপের অটল টাকার বড় হওয়া অর্ধর বাবা শম্ভুনাথ ছেলেবেলা কাটিয়েছে আনসেমির মধ্যে। প্রথম যৌবনে বাবার মৃত্যুর পর শম্ভুনাথের কাঁধে যখন পড়ল সংসারের জোয়ারল, তখন তাকে টানবার মতো তার ক্ষমতা ছিল না। চালের ব্যবসা শূরু করে বলাইপাড়ার বাজার থেকে সাইকেলে দু-আড়াই কুইন্টাল বয়ে রোজ কুড়ি পঁচিশ কি. মি-র পথে হাটে হাটে ঘুরে যখন বয়সকে পাকিয়ে ফেলেছিল, এমন সময়ে মিলিটারীর চাকরা যোগানোর চোরাপথে দালালির সুযোগ মিলল। দেখে অন্যান্য চাকরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উত্তীর্ণ বয়সের সব ছেলেরা আবেগে ছুটে চলেছিল একই নৌকার হুটোপুটি করে উঠার জন্য। ফলে সেনাবাহিনীর চাকরা জোটাতে মোটা টাকার খেলা চলছিল। শম্ভুনাথ এই নতুন কারবারে রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠল। নিজের ছেলে অর্ধকে প্রথমে ভর্তি করল স্বল্পপানন্দের বালক আশ্রমে। সেখানে কয়েক বছর শিকালোভের ব্যর্থ চেষ্টা আর শিশু মনকে ব্রহ্মচর্যের বিকৃত্তর চাপে পিষ্ট করে অর্ধ যখন কাহিল, তখন তাকে শম্ভুনাথ আবার ভর্তি করে দিল জগদীশের টোলে। এখানে আবার ছেলেমেয়েদের অবাধ গতিবিধি আলস্য এনে দিল ওর শরীরে ও মনে। অনেক কষ্টে একরকম বাপের আর্থিক স্বচ্ছলতার ঠেলায় ওর শিক্ষার ভারীটা বয়ে চলল জোয়ারের তোড়ের ওপর দিয়ে সামনে পেছনে ওঠা নামা করে। তারপর এক সময় বাপের দালালিতে লাগল ধনস। এক সময় যেমন দ্রুততার সঙ্গে হয়েছিল তার উত্থান, আশ্চর্য ভেমনই স্বরিত গতিতে হল তার পতন। বাপের এই উত্থান পতনের সমস্ত ঝড় ঝাপটা

হেলেকে করে দিল দিশাহীন। এককক্ষ নিষ্কীর্বে মতো বেঁচে ছিল অর্ক।
তাই আজকের এই নতুন সান্নিধ্য ওকে দেখাতে শুরুর করেছে একটা স্বপ্নের
আলো বলয়।

অবাক-এর নতুন শিল্পীদের মধ্যে প্রেম-এর চেহারা, পোষাক-আধাকে ছিল
এক ধরনের নতুন অভিনেতা সুলভ ভাব। প্রথম যৌবনে পাড়ার কালীপূজার
কখনো সখনো দু'একটা ছোট খাটো রোলে অভিনয় করে নিজের সেই ভাবটিকে
পাকা করে ফেলেছিল। সোমশীর্ষ আর দেবাংশু এদের তুলনার উচ্চশিক্ষিত
বাড়ি থেকে এসেছে। উভয়ের পারিবারিক ঐতিহ্য শিক্ষকতার উঁচু তারে
বাঁধা। ওদের শিক্ষা ও আচার আচরণে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। অবাক-
এর আলোচনা-বিতর্ক ওদেরকে টেনে এনেছে এখানে। যদিও অন্য সভ্যদের
সঙ্গে ওদের অর্গাথিত দ্বন্দ্ব একটা থেকেই গেছে স্পষ্ট রেখায়।

এই সব সভ্যদের সমঝারে অবাক যখন অভিনয় সাজসজ্জার ভাবিকালের
তরীকে সাজিয়ে অপেক্ষা করছে জোয়ারের জলের আশায়, তখন হঠাৎ করে
আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পারিপার্শ্ব, যার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল এতাবৎ-
কালের সমস্ত সম্ভাব্য রেকর্ডকে।

কাঁথি, খেজুরী, রামনগর, নন্দীগ্রাম, পটাশপুর, ময়না, বাগনান, আমতা,
খানাকুল, ভাতার, বারাসাত, কোমর, কসবা—সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ উত্তাল হয়ে
উঠেছে। সমাজ বিরোধীরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে কিনে নিয়েছে।
এক একটা এলাকায় এক একজন মন্ত্রানের দমতা দখলের খেলা তাঁর আকার
ধারণ করেছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। বয়সের ভারে নতুন মমতা
আরও অভ্যর্থনাবাহিত বলতে শুরুর করেছেন। কিন্তু সমগ্র বঙ্গে কোথাও
আর তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই তাঁর দল। রাজনৈতিক প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রতিটি
বিধানসভা কেন্দ্রে সমাজ বিরোধীরা নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।
তাঁর পাশাপাশি এবারের ভোটে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলি অত্যন্ত
সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এতকাল তাদের পারের তলার মাটি ভেদন শক্ত ছিল
না এই বন্ধে। কিন্তু এবার তারা এই নতুন অরাজকতাকে ধর্মের মোড়কে
এঁটে বর্তমান অধমচারণ থেকে নতুন ধর্মরাজ্যের উত্থানের ইঙ্গিত ছাড়িয়ে দিতে
নতুন কৌশল নিয়েছে। তারা চাইছে বাইরের এই সমাজ বিরোধীদের অত্যাচার
আরও তীব্র হয়ে উঠুক। অত্যাচারীত মানুষকে রক্তচোষ দেখিয়ে ভয় পাইয়ে
সহজে ধর্মধর্মের নীচে সমবেত করা যাবে।

মমতার জ্বলন্ত কংগ্রেসের সংগঠন এ রাজ্যের জ্বলন্ত পর্বত পৌঁছাতে
পারেনি কোনোদিনই। বামপন্থার গ্রাস রুট সংগঠন আজ প্রায় দু'দশক
আগের ইতিহাস। দীর্ঘকাল শাসনে থাকা বাম সরকার যখন জ্যোতি বসুর
অবসর গ্রহণের পর এক ধরনের অস্থির তমসার আচ্ছন্ন তখন মানুষের আবেগ

মমতাকে ধরে এত দ্রুত মৃত্তি ঝুঁজে ছিল যে তার তলার মূলের বিস্তার ঘটেনি।
করং তার আবেগী বোনাজলে এদেশে কারেম হয়েছিল এক গদ্যদারাজ ও
মস্তানতন্ত। সমস্ত সুবিখ্যাতলাভী রাজনৈতিক দস্যুরা ঢুকে পড়ে ছিল ক্ষমতার
অম্বর মহলে। আজ তার লাগাম ছেঁড়া রূপ নয় হয়ে পড়েছে। ভারতের
নির্বাচন কমিশন হিমসিম খাচ্ছেন বাংলার এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে।
সাধারণ মানুষ স্পষ্ট নির্বাচন থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপছে।

সেদিন সকালে উঠে অনমিত্ত ব্রাহ্ম হাতে বেরিয়ে পড়েছিল। পশ্চিমের
সেই পোড়ো কারখানাটার কাছে এসে দেখে কুকুরটা অশ্রুত স্বরে কিরকম
কুউ—উ, কে'উ-উ'-উ', কুউ-উ করে ডাকছে। এই অশ্রুত কাণ্ডা সকালেই
অনমিত্তর মনকে বিধিরে তুলল। অনেককাল আগের একদিন এখানে কিরকম
উজ্জ্বল ছিল হস্তোত্ত। আজ ধ্বংস স্তূপ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বড়
বিচিত্র। পূর্ব দিকে আকাশ জাল হয়ে আছে। অনেকটা সময় ধরে দাঁতন
করে সামনের বড় রাস্তাটার দিকে এগিয়ে আসতেই অর্ককে দেখতে পেল।
অর্ক ওর কাছেই আসছে। তার চোখে মূখে কিরকম বিষমতার ছাপ। কাছে
এগিয়ে এসে বললে, 'অশোক ভৌমিকের বাড়ির পেছনে আজ ভোরে তার ভাই
বিবেকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে পদলিখ এসে অশোককে গ্রেপ্তার
করে নিয়ে গেছে।' খবর শুনে অনমিত্ত চমকে উঠল। কিছূক্ষণ স্থম্ব হয়ে
থেকে অনমিত্ত কেবল হতভম্বের মতো বললে, 'অশোকবাবুকে পদলিখ
ধরল কেন?'

'তার বাড়ির পেছনের বারান্দা থেকে বোমা পাওয়া গেছে। ঘূটের বস্তার
ভেতরে ছিল।' অর্ক সন্মোহিতের মতো উত্তর দিল।

'পদলিখ তার হৃদিস পেল কি করে!' অনমিত্ত প্রশ্ন করে।

পদলিখ এসে সোজা ওদের পেছনের ঘরের ঘূটের বস্তাগুলোয় ঝুঁজে
দেখাছিল। কেসটা যে সুচতুর ভাবে মাজানো হয়েছে। তাতে কোনো সন্দেহ
নেই অশোকের ভাই বিবেক একসময় রাজনীতি করতে গিয়েই অনলের ঘনিষ্ঠ
হয়েছিল। অনল মাইতি পড়িয়েতে দাঁড়াবার সময় থেকে নানা কৌশলে
অশোকের বিরুদ্ধে তার ভাইকে কাজে লাগাচ্ছিল। অশিক্ষিত বিবেক অনলকে
গুরুর মতো অশ্ব প্রেমে ডক্তনা করত। পড়িয়েতের বীজ ধান, খরার মরসুমে
সরকারী আর্থিক সাহায্য, ডি. আর. ডি. পির টাকা প্রভৃতি পাইয়ে দেবার
দালালীর ভায় অনল বিবেকের ঝারাই সম্পন্ন করত। বিবেক যেমন অনলের
সব গোপন কাজের খবর রাখত, তেমনই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের সঙ্গে
তার একটা গভীর বোগও ছিল। এই জারগাটাই ছিল বিবেকের একটু শক্ত
আগ্রহ স্থল। সম্প্রতি কোনো এক গোপন অপত্য স্নেহের পথ বেয়ে বিবেক

অশোকের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সমকালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এই অঞ্চলে অন্য একটা রূপ পেতে শুরু করেছিল।

নিরু কুন্ড এক সময়ের পোড় খাওয়া কমিউনিষ্ট নেতা। ছাত্রাবস্থা থেকেই নিজের সমাজের অনুন্নত মানুষদের অভাব অনটনে সঙ্গে থাকার অভ্যাস করেছিল। তারপর ১৯৭৮ এর জরুরি বন্সার সময় থেকে এ রাজ্যে যে নতুন বামপন্থী আন্দোলন শুরু হল, তার প্রধান অংশে চলে আসে। গ্রাম গঞ্জের অগণিত অল্প মানুষের বক্তনাকে রূপান্তর করেছে আন্দোলনে। অবহেলিত স্বজাতি একটা শক্ত আশ্রয় পেয়েছিল নিরুবাণ্ডকে আশ্রয় করে। নব্বই-এর দশকের পঞ্চাশে নির্বাচনে এই অঞ্চলেই প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ালেন নিরুবাণ্ড। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টিতে সেই সময় ঐ অঞ্চলে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ঘনি, তিনি তখন লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। পঞ্চাশে মনোনয়নের সময় কলকাতা নেড়ে সেই নেতা নিরুবাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পশ্চিম গ্রামসভার নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে এক রাতের গোপন অপারেশনে হারিয়ে দিলেন। পরবর্তী পার্টি মিটিং-এ ক্রমশ কোণ ঠাসা করতে লাগলেন। নিরুবাণ্ড লজ্জায়, কোডে, অপমানে এক সময় হতাশ হয়ে পার্টি ত্যাগ করে শিক্ষকতার কাজে মন দিতে চাইলেন। কিন্তু অসহায় মানুষ, যারা রাজনীতির কুটিল আবর্ত চেনে না। তারা কংসাবতীর খোঁজলে খড়কুটার আগ্রের মতো নিরুবাণ্ডকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। তাঁর সাক্ষর কথা 'যে পথ থেকে আমি একবার ফিরে এসেছি, সে পথে আর যাব না।' যদিও আপন সাধার মধ্যে জনগণের সেবা তিনি করে চলেছেন আজীবন। তারপর দু'দশক কেটে গেছে। রাজনীতিতে আমল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র-কামী কিছু মানুষের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবার নিরুবাণ্ড নিদল প্রার্থী হয়ে বিধানসভার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ১ নম্বর অঞ্চলে তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ছিলেন অশোক ভৌমিক। অনল মাইতি ভোটে জিতলেও বিবেক ওর হাত থেকে সরে যাচ্ছিল। আর অশোকের নিষ্কল চরিত্র মানুষের আগ্রের মতো ছিল। অবর্ষকের সদস্যরা অশোকবাণ্ডর পাশে। সমাজ সংগঠনের কাজে কয়েক মাসের মধ্যে অবর্ষক একটা উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছিল এই অঞ্চলে। অনলবাণ্ড তাই অত্যন্ত সূচকুর ভাবে বিবেককে খুন করে অশোককে হাজতে পাঠালেন নিজের এরিয়ার দখলদারীকে নিষ্কটক করতে। অনমিত আশঙ্কিত হয়ে উঠল এমন নিপাপ ও নিরহংকার পরোপকারী অশোকবাণ্ডকে পদলিখে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার। এরপর যে কোনো জারগা থেকে আঘাত আসতে পারে ওদের অবর্ষকের ওপর।

অর্ধেক রাত্তার ছেড়ে অনমিত চলে আসছিল পুরোনো পল্লীতে। কয়েকটা ছেলে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ, তাদের

বাপ মা-রা বই সংগ্রহ করে দিতে পারেনি। নিজে একটা ব্যবস্থা করেছে ওদের বই সংগ্রহ করে দেবার। আর একটা গোপন টান উ'কি দাঁড়াল মনের ভেতর। বেশ করেকর্দান লাঞ্ছন বোদির সঙ্গে দেখা হয়নি।

পাড়ার ঢুকে দেখল সবাই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদিও আজ সকালের ও পাড়ার ঘটনা কারুর অজ্ঞাত নয়। পাড়ার বড়োকাকা জেঠারা ওকে সাবধানে বোরাফেরা করতে বলল। এই হালকা শীতের সকালে পশুর বাপ দাওয়ার বসে ছেঁড়া কাঁধের গোটা মুখ ঢেকে হাঁপাচ্ছে। বড়ো এই কয় মাসে দৃষ্টি শক্তিও প্রায় হারিয়েছে। কেউ কোথাও নেই দেখে। দাওয়ার উঠে ঘরের ভিতর খাটের খটখাট শব্দ শুনতে পেল। অথচ দরজা লাগানো। এত বেলার ঘরে কারুর থাকার কথা নয়। শব্দ তবে কিসের। অনমিত জানালার দিকে এগিয়ে খোলা পাল্লাটার মুখ বাড়িয়ে দেখে ভেতরে খাটের ওপর পশু তার বউ-এর নাভির ওপর উপড় হয়ে মুখ ঘষে গো-গো শব্দ করছে। লাঞ্ছন খোলা বুক পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কয়েকমুহূর্তে তবু লাঞ্ছন চোখ জানালার অনমিতর চোখে আটকে গেল। অনমিত প্রুত ওখান থেকে সরে চলে এল।

সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রাতে গোপন মিটিং-এর ব্যবস্থা করল। দুপুরে ভাত খেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। তরুণ আর রবীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে নিরুদ্বাবুর সঙ্গে দেখা করল। অনেক আলোচনা হল। কিন্তু অশোক ভৌমিকের কেসটা যে অনল মাইতির সাক্ষানো, তার প্রমাণ তুলে ধরবার কোনো রাস্তাই ওরা খুঁজে পেল না। অনল এখন এই অঞ্চলের প্রধান। সে তার পাতের পাড়ার এক সময়ের প্রধান সহকারী হরেনকেও সরিয়েছিল এইভাবে নিঃশব্দ সংকেতে। আজও তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। হরেনের স্ত্রী সাহিনী এখন অনলবাবুর বাড়ির ঝি-এর কাজ করে। লোকে জানে আরো একটা চাহিদা অনল মেটার সাহিনীকে দিয়ে। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রায়ই অঞ্চলের লোকেদের বলে, 'হরেনটা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। বোটা'কে বড় অসহায় করে চলে গেল। তা কোথায় আর যাবে। গরীব বাড়ির মেয়ে, আমাদের সমাজের বা অবস্থা। এ বাড়িতেই থাকে। নিজের মতো কাজ করে, খায়দায়।' ভাষটা এই তাঁর মতো মহান নেতা এদের উদ্দ্যারের ভার মাথায় নিয়ে এদের ধন্য করেছেন।

নিরু কুস্তুর বাড়ি থেকে তরুণ-রবীন আর অনমিত যখন ফিরছিল, তখন বেশ অশুকার নেমে গেছে। আজ শীত একটু বেশি হবে মনে হয়। এরি মধ্যে বেশ হিম পড়তে শুরু করেছে। ওরা যখন চাখরাখালির পুলের কাছে এল, তখন পুলের পশ্চিম পাশে দীর্ঘকালের পুরোনো ভাটার বাঁশবন আর বড় বড় গাছের জঙ্গল জমে গেছে। সেখানেই কয়েকটা লোক বসে মদ খেতে খেতে

কি সব বলছে। হঠাৎ অণোকের নাম কানে আসতে চমকে উঠল। অনমিত্র হাত দিয়ে বন্ধুত্বের গতি রোধ করল। তরুণ সেই লোকগুলোর গলা শূনে ফিসফিস করে বলল, 'রবীন এরা অনল মাইতির দলের লোক।'

'দলের লোক মানে?' অনমিত্র প্রশ্ন করল।

'পাশে নেমে আর।' বলে একরকম টেনে ওর দুজনকে রাস্তার পাড় দিয়ে নামিয়ে এনে তরুণ আরও নীচু গলায় বলল, 'এরাই হল অনল-এর মাসেল ম্যান বে'টে গণেশ, আর রাসু সাউ, মদনার দল।' একটা উত্তেজনার মধ্যে ওরা পা টিপে টিপে অশ্বকারে যতটা সম্ভব লোকগুলোর কাছাকাছি এসে একটা মোটা সিরিশ গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে কাটা বাঁশ কোপের পেছনে দাঁড়াল। এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল। দু'চারজন নয় একটা বিরাট দল এখানে রাতের মদের আভ্যাস জমেছে। কাছে পিঠে কংসাবর্তীর পাড়ে কোথাও অনলের আজ সেকালের অপারেশন সফলতার ফিফ্ট হবে হয়তো। বে'টে গণেশ-এর মধ্যেই মদে চুর হুরে গেছে তার গলা শূনে বোঝা গেল। বোতল থেকে গলার র মালা ঢালতে ঢালতে বলছে, 'মাইরি, গুরুদর পরামশ্য। এত নিখুঁত কাজ আগে কখন হয়নি।'

'এই যদি বোমটা রাখার সময় তোর হাত ফসকে পড়ে যেত।' আর একটা গলা বলে উঠল। 'এই চাপ, চাপ, বাতাসও শূন্যতে পায়।' টাল খাওয়া গলায় বে'টে গণেশ আবার বলে চললে, শালা গলশার হাত ফসকাবে।' বলে আবার চূপ করে গেল। কেবল মালের বোতল আর কাঁচের গ্লাসের ঢুং ঢাং শব্দ কানে এল। একটু দূরে আরও অনেক লোক আছে স্পষ্ট তাদের ফিসফিস কথা শোনা গেল। যদিও কি বলছে কিছুই বোঝা যায় না। বেশ কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে ওরা আশ্বে আশ্বে বড় রাস্তার উঠে ভুবনেশ্বরীর হাটের দিকে এগিয়ে চলল। উত্তেজনার প্রত্যেকেই ধরধর কাঁপছে। অনমিত্র বলল, 'প্রমাণ তো পাওয়াই গেল। কিন্তু প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।'

'আমরা এখনি ওদের আক্ৰমণ করতে পারি, আরো কিছু লোকজন ডেকে।' থেমে থেমে রবীন বলল কথাগুলো।

'তাতে কিছু লাভ হবে না, বরং এ সময় নিজেরাই বিপদে পড়ব।' তরুণ থেমে গেল। অনমিত্র নীরবে পথ হাটতে লাগল। সে আর কোনো কথা বলেনি।

অধ্যাপক দেবাশ্রি রিটার্ড করার পর বাড়িতে নিজের লাইব্রেরীতে বসে 'তরুণ প্রজন্মের মনে সমাজ পরিবেশের ছাপ' বিষয়ে একটা পেপার রেডি করবেন—এই ছিল তার দীর্ঘকালের মনোবাসনা। কিন্তু ইদানিং তাঁর সব চেষ্টে বড় মনোবেদনা হল নিজের ছেলেকে নিয়ে। ছেলে যখন কলকাতার পড়তে ছিল, তখন একরকম করে তার ভবিষ্যৎ ভেবে ছিলেন। আর সেই

ছেলে যখন বাড়ি ফিরে এসে ক্রমশ গ্রাম্য রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করল, তখন অধ্যাপক দেখলেন তার স্বপ্নগুলো স্বপ্ন হলেই সুন্দর আকাশে মৃত নক্ষত্রের মতো কোন মহাবিশ্বলোকে হারিয়ে গেল। আর তার পরিবর্তে দিলে গেল একরশা বস্ত্রগামর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

রিটার্ড সরকারী কর্মীদেরই আর প্রতি মাসে পেনসন দিতে পারছে না। অধ্যাপকরা তো সরকারীও নন আবার বেসরকারীও নন। তাই তাঁদের পেনসন নামক উপসর্গটি বিশবীও জলে। এমনকি পি. এফ. গ্রাহুয়িটির টাকাও একসঙ্গে দিতে পারবে না। কয়েক কিস্তিতে মেটাবে বলে সরকার জ্ঞানিয়ে দিয়েছে। ফলে সেই সমস্ত টাকা পেয়েও যে একটা স্থায়ী কিছু ছেলের নামে জমিরে বাবেন, তারও উপায় নেই।

আর একটা বিষয়ে অধ্যাপক ভীষণ আহত হয়েছেন। অনমিত এখন প্রায়ই মেচাদার কাফেলার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনে গিয়ে সমস্ত কাটিয়ে আসে। ও গ্রামে এখানকার তরুণদের নিয়ে যখন, ‘অবাক’ নাম দিয়ে সংগঠন গড়েছিল তার প্রতি সরব এবং নীরব সব দিক থেকেই পূর্ণ সমর্থন ছিল। অধ্যাপক নিজের ভবিষ্যের ভাবনার অবাক শব্দটি নানা অর্থে ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। অবাক একদিন বাস্তবে নিজের আশঙ্কের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পাবে মনের অবচেতনে লুকানো স্বপ্নের এমন সফলতা দেখে কে না আনন্দ পায়। কিন্তু তার ত্রিভাঙ্গলাপ এমনভাবে গ্রামের রাজনীতির প্রতিস্পর্ধা হরে দাঁড়াল, তা দেবাদির কাছে চিন্তার কারণ। সম্প্রতি অবাকের সঙ্গে কাফেলার মহিলা সংগঠনের যোগ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বিশেষত কাফেলার সঙ্গে অমর মেশামেশ। ছেলের সঙ্গে এই নিয়ে একদিন তর্কও হল একটু অনুর স্বরে।

খাবার টেবিলে বসে সেদিন দেবাদি ছেলেকে বললেন, ‘অম্ তুমি অবাক নিয়ে যা করছ সবই ঠিক আছে। কিন্তু এরজন্য এত মেচাদা ছোটোছোটো করছ—বলে তিনি সুপের বাটি মুখে তুললেন।

‘না বাবা, আমি অবাকের জন্য নয়। ওখানে কাফেলাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনে যাই।’ স্বাভাবিক উচ্চারণে ভাত খেতে শুরু করল।

‘ওদের তো মহিলা সংগঠন।’ বাবা বললেন,

‘হ্যাঁ, আমাদের কো-সংগঠন।’

‘আশেপাশে আরও অনেক মহিলা সংগঠন আছে, কই সে সবার সঙ্গে তো তোমার যোগ দেখি না।’ দেবাদি প্রথিত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

‘না তারা তো তাদের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাছাড়া কাফেলার সামিথ্য আমার কাছে অনেক বেশি প্রাতিদায়ক।’ অনমিত

স্পষ্ট উচ্চারণ করে। কিন্তু এই জ্ঞানগায় দেবাদ্বিত্যের আপত্তি। তিনি অস্বাস্থ্যে না চেপে রেখেই বলে ফেলেন, ‘দ্যাখো বাবা, ঐ কাফেলার সঙ্গে এত মেলামেশা কি ভালো, মানে—বলতে গিয়েও নিজের অস্পষ্টতায় খেমে যান।

‘সে কি বাবা তুমি তো একদিন নাগিস পিসি আর কাফেলাদের ওখানে যাবার জন্য বলেছিলে। আর তাছাড়া আমি তো ওদের ব্যবহারে কোনোদিন খারাপ কিছু দেখিনি।’

‘না ওরা অবশ্যি খারাপ ব্যবহার করে না।’ বলে কিছুটা খেমে গেলেন। আসলে নিজেরই যৌবনের বেগ একদিন যা করেছিল আজ অপ্রমত্ত বয়স তা অনুমোদন করেছে না, অথচ সেই যুগেরই আত্মজ্ঞান অদৃশ্য পথে সেই দিকে ঘেঁষে চলছে এটা আজ আর সহ্য করছে না হৃদয়। নিজেকে এই দিক থেকে অনেক-খানি গুঁটিয়ে এনেছেন দেবাদ্বিত্য। এখন আর নাগিসের বাড়ি অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া যান না। কিন্তু হৃদয়ের এই কুটিল স্বাক্ষর অভিজ্ঞতাকে কি করে নিবেদন করবেন সম্ভাবনের কাছে। তবু অন্যভাবে ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলেন, ‘কিন্তু কাফেলার বাবা আসরফ সাহেব, কিংবা ও’র মামারা তোমার মেলামেশা পছন্দ করছেন না।

বাবা যে কাফেলার সান্নিধ্যের প্রতি অনমিত হৃদয়ের দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছেন সেটা পরিষ্কার বুদ্ধিতে পেরেই অন্য পথে বেঁকে ও বলে উঠল, ‘বাবা আমি যাই আমাদের সাংগঠনিক কাজে। তাতে বাইরের কারুর ভালো লাগা মন্দ লাগার বিশেষ কিছু যায় আসে না। তাছাড়া কাফেলা ছাড়াও ঐ সংগঠনে আরো অনেক মেয়েরা আছেন।’

‘কিন্তু কাফেলাই তো তাদের প্রধান চালিকা শক্তি—তুমিই বলেছিলে।’

‘বাবা তুমি কাফেলাকে কড় করে দেখছ কেন। একদিন তুমিও নাগিস পিসির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলে সমস্ত সমাজ সংসারের সব রকম প্রতি-বন্ধকতাকে বৈপরীত্যভাবে উপেক্ষা করে।’ খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার টেবিল থেকে উঠে চলে গেল।

দেবাদ্বিত্য সমস্যাটা এখানেই। নাগিসের সঙ্গে নিজের যৌবনের সেই অদমিত অধ্যায়। সেখানে হঠাৎ অম্ল হাত দেওয়ার জল ঘোলা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর বেশি গভীরে না নেমে সামান্য হাঁটু জল থেকেই উঠে আসতে হল দেবাদ্বিত্যকে। একটি বিষয় নিয়েই ছেলের সঙ্গে ক্লিরকম একটা আড়াল গড়ে উঠছে যেন, ঠিক যে শক্তি প্রয়োগ করলে এই অদৃশ্য দেওয়ালটা ভেঙে ফেলা যেত, সে শক্তি প্রয়োগের প্রধান বাধা নিজের অতীত জীবন, যার সব কিছুই অম্লর জ্ঞান।

দেবাদ্বিত্য ভাত খেয়ে উঠতে না উঠতেই একটা গোলামালের আওরাজ ভেসে আসতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে। আওরাজটা পরিষ্কার

হল, একদল মানুষের চিংকার চেঁচামেচির শব্দ, অধ্যাপকের হাত না ধুতে ধুতেই অনমিত্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে গেল। ছেলের পিছনে ছুটেই গেলেন এক রকম। রাস্তার আরও অনেক উৎসুক লোক জমে গোলেন। বেশ কিছুটা পরে একজন লোক খবর আনল ও পাড়ার লুটপাট শুরু হলে গেছে। তরুণদের বাড়ির দিকেই গড়গোল শুরু হয়েছে। আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখা গেছে। অনমিত্ত ছুটে ঘরে ফিরে গারে স্যাঁতড়া গেল চাড়ির সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল ওখানে ষাবার জন্য। এমন সময় ওপাশের বস্তি থেকে রওসন আলি এসে উপস্থিত। সে বললে, 'ওদিকে যেও না দাদাবাবু, খবর খুব খারাপ।' বলে রওসন হাঁপাতে শুরু করল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। অধ্যাপক এগিয়ে গিয়ে বললেন, রওসন, ব্যাপার কি?

'কাকাবাবু, অনল মাইতির লোক একটু আগে ও পাড়ার আক্রমণ করে তিরিশ চারশ খানা ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। বেশ কিছু লোক বস্ত্রম আর কাটারীর কোপে মারা পড়েছে। গোটা পাড়া পুড়ুখ ছাড়া। মেরেয়াও নিস্তার পায় নি।' সে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল।

'কিন্তু কেন? ওরা কি এমনি এমনি আক্রমণ করল?'

উপস্থিত নানা লোক সাহস পেয়ে নানারকম কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, 'না না, একজন পণ্ডাৎ ক্ষমতার থাকতে এসব করতে পারে নাকি।' কেউ বা বিজ্ঞের মতো রায় দিল, 'ও সব সমাজ বিরোধীদের কারবার। ডালো লোকের নামে চাপাচ্ছে। কেউ আরো একটু এগিয়ে মন্তব্য করলে। 'ওরা নিজেরাই এসব করে ভোটের সময় ফারদা লুটবার চেষ্টা করছে।' কিন্তু রওসন বা বলল, তা অতি ভয়ঙ্কর।

গতকাল রাতে বেঁটে গণেশ, রাসু ও মদনা সহ দলের আরও কিছু সামর্থ্যকে নিয়ে অনল মাইতি ওপাড়ার গোলেন। সব বাড়িতে বলে এসেছে, 'আগামী নির্বাচনে কেউ যেন ভোট দিতে না যায়। এ অঞ্চলের ভোট পঞ্জায় অন্যাভাবে পুড়িয়ে দেবে। আর অর্ধকের সদস্য তরুণ আর প্রেম-এর বাড়িতে গিয়ে জোর করে বাড়ির সমস্ত সদস্যদের ভোটের পরিচর পত্র আর রেন কাড' কাড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছে। তখন তরুণ প্রেম এবং ও পাড়ার গোবিন্দ, জমির ও অন্যান্য যুবকরা লাইসেন্সের সামনের মাঠে আলোচনায় বসেছিল। বাড়ি ফিরে রাতে তারা এই সব শুনে সকালে দল বেঁধে অনল মাইতির বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে গেল। অনলবাবুর ছেলে হরসিত পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে বেঁটে গণেশের দলে খবর দেয় যে তার বাবাকে ও পাড়ার অর্ধকের ছেলেরা ঘেরাও করেছে।

তরুণদের ফিরে আসতে না আসতেই এই অঞ্চলের পশ্চিম পাড়া থেকে

কয়েক শ সমর্থক বস্ত্রম, গাড়ি, কুরুল, কাটারী, হান্দুয়া, দা নিয়ে দুপুরে বারোটায় হঠাৎ আক্রমণ করে। তখন বেশিরভাগ লোকেরাই কাজে বেরিয়ে গেছে। যে কয়টি বাড়িতে পুরুষেরা ছিল তারা ভীষণভাবে জখম হয়েছে। কয়েকটা বাড়ি পুড়ে ধূলিস্থাৎ হয়ে গেছে। অসংখ্য বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে। গোটা পাড়া এখন পুরুষ ছাড়া। ভয়ে ওঁদিকে কেউ এগিয়ে যেতে পারছে না।

অন্যমিত্র সব শব্দে নিম্মল আকোশে খরখর করে ভেতরে কাঁপছিল। সন্ধ্যার সময় পুলিশ এল। পুলিশ পঞ্চায়ত অফিস থেকে পঞ্চায়ত অনল মাইতিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত এলাকা পরিদর্শনে গেল। পুলিশ আত্মবাহী কলহের অপরাধে পাড়ার দু'জন প্রোড়কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। সেই তদন্তকারী দলের সঙ্গে নির্ভয়ে বেঁচে গণেশ ও রানুদের দেখা গেছে।

রাতে খবর পাওয়া গেল ভরণের বাবা মহেশ মন্ডলকে বস্ত্রম খুঁচে মারা হয়েছে। আর প্রেমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যমিত্র ব্যথিতে পারল অনল মাইতির পরিষ্কার লজ্জা হল অর্ধাকের সদস্যরা। অনেকদিন থেকেই শাসাচ্ছিল অর্ধাকের সদস্যদের দেখে নেবে। এ হল তার প্রথম চোট।

পরের দিন সকালে অন্যমিত্র নিরু কুঁড়ুর বাড়ি গিয়ে জানতে পারল প্রেমকে কিডনাপ করে খুন করা হয়েছে। বিকেলেই দেবাখরুর বাবা তাকে খানবাসে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্যমিত্রকে নিরুবাঝ সাবধান হতে বললেন, অন্যলের দল যে কোনো সময় ওকে আক্রমণ করতে পারে।

‘পুলিশ অথবা প্রশাসনিক কিছুই করতে পারে না।’ অন্যমিত্র রাগী প্রহ্ন করল নিরুবাঝকে।

‘পারে হয়তো, কিন্তু ততদিন অনল মাইতি বেঁচে আছে ততদিন কিছু করবে না।’

‘কেন?’

কারণ প্রশাসনের সরকার পক্ষের লোক অনলবাবু। এই গোটা অঞ্চলকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চাচ্ছেন তিনি। এসব কাজে তিনি দীর্ঘকাল থেকে সিদ্ধ হস্ত। গত দশ বছরে যতগুলো জাতিকলহ হয়েছে এ অঞ্চলে জামি অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে যতগুলো মামলা হয়েছে তার সবকটা অনলবাবুর ইশ্বনে। পঞ্চায়ত থেকে যত লোক অনুদান পেয়েছে তার মোটা কমিশন ওঁকে দিতে হয়েছে। যত রাস্তা, ইলেকট্রিক লাইন, বাধকা ভাতা বৈধব্যভাতা, কৃষক ঋণ এসেছে তার বড় সেরার ঢুকেছে ওনার পকেটে।

‘অন্য কোনো সদস্যরা প্রতিবাদ করে না কেন?’ অন্যমিত্র রাগে গরগর করতে করতে প্রশ্ন করে।

অনুগবাবু হেসে উত্তর দেন ‘কে প্রতিবাদ করবে? কোন সদস্যের

ঘাড়ে এমন মাথা আছে। তারা তো সবাই অনলমাইতির টাকার ভোটে জেতে। আর যদি কেউ প্রতিবাদ জুল করে ফ্যালে, তবে তার পরিণতি হবে অশোক ভৌমিক আর তার ভাই বিবেকের মতো।’

‘তা হলে কি এর থেকে কোনো পরিণাম নেই?’ অনমিত তাকিয়ে থাকে নিরুদাব্দর দিকে।

স্বভাবে শান্ত নিরুদাব্দ উঠে সিগারেটে টান দিয়ে দক্ষিণের জানালার রুড ধরে কোন অন্তহীন মহাভবিষ্যের দিকে তাকিয়ে আপন মনে স্বগতোক্তি মতো বলে চলেন, ‘যদি কোনোদিন সমস্ত জনগণ জাগত যদি প্রকাশ্যে অনলমাইতিকে গত কালকের ঘটনার মতো পুড়িয়ে মারত।’ আরও কিছুক্ষণ স্থব্ধ থেকে আবার থেমে থেমে বলে চললেন, ‘অথবা যদি কেউ গোপন আক্রমণে ওই লোকটাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারত। তবে গোটা অঙ্গলটা শান্তি ফিরে পেল।’

অনমিত কেবল সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ভান হাত মূঠো করে মূখের ভেতর ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল।

একটু পরে দ্ব’জনেই বেরিয়ে এল। সামনের বাস স্ট্যান্ড এসে নিরুদাব্দ একটা চা দোকানে এসে অনমিতকে নিয়ে বসে চা পান করতে লাগলেন। কয়েকটা লোক এসে নিরুদাব্দকে খবর দিল। অনলমাইতি ও পাড়ার যে সমস্ত বর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের নিজে উপস্থিত হয়ে লিফট করে এনেছেন। তারা প্রত্যেকেই পঙ্কায়ত থেকে কুড়ি হাজার টাকা করে সাহায্য পাবে।

আর একটা লোক বাড়িতে টান দিয়ে এক মূখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘আর যাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে তাদের কেস তুলে নেবার ব্যবস্থা হবে। বাড়ির লোকদের আজ সম্প্রদায় পার্টি’ অফিসে গিয়ে অনলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

নিরুদাব্দ সব খবর শুনে চূপ করে থাকলেন। বৃষ্টিতে পায়লেন অনলমাইতির চাল। গোটা পাড়া এবার ওর পোষা কুকুরে পরিণত হয়ে গেল, শব্দ ভরে এবং আতঙ্কে।

অনমিত সহ কয়েক জন লোক নিয়ে নিরুদাব্দ একটু পরে ঐ পাড়ার ঢুকলেন। কিন্তু কি এক আশ্চর্য জাদু স্পর্শে যেন গোটা পাড়া ঘুমিয়ে গেছে। একটিও লোক অথবা মহিলা বেরিয়ে এসে নিরুদাব্দের মুখোমুখি হল না। বরং যারা রাস্তার আসিছিল তারা দূর থেকেই নিরুদাব্দ ও অনমিতদের দেখে অন্য দিকে মূখ ফিরিয়ে চলে গেল। অনমিতর মনে পড়ল, অথচ গত পঙ্কায়তে নির্বাচনে ঐই পাড়া থেকেই ওদের প্রার্থী অশোক ভৌমিক সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল।

ওখান থেকে ফেরার পথে অনমিতর বার বার মনে হল নিরুদাব্দের কথা

করটা—‘হাঁদ কেউ গোপন আক্রমণে ঐ লোকটাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারত। তবে গোটা অঞ্চলটা শান্তি ফিরে পেল।’ লাইনশুন্স সমস্ত কথাগুলো ওর মাথার ভেতর অসহ্য ব্যস্ততার মতো দপদপিয়ে উঠল।

বাড়ি ফিরে যেতে বলে মায়ের মুখ থেকে খবর পেল কাফেলার বিয়ে হবে। নার্গিস এসেছিল। স্বরেক সপ্তাহ পরে বিয়ে।

রাতে কিছুতেই ঘুম এল না। সব কিরকম ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অনেক কণ্ঠে বিজ্ঞানার এপাশ ওপাশ করতে করতে যখনই ঘুম আসে তখনই হয় নিরুদ্বাবুর কথাগুলো মনে জ্বলে ওঠে, নয় কাফেলার বিয়ের কথা মনে হয়। গোটা মাথা দপদপিয়ে ওঠে।

দু’ তিনদিন পর একদল লোক ওদের বাড়িতে হামলা করল। পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করল ওর বাবার কাছে। ও সোঁদিন বাড়িতে ছিল না। অবাক ভেঙে গেছে। সোমশীর্ষকে তার বাবা গোপীবল্লবপুরে ব্যাবসা করতে পাঠিয়েছে। অনামিতর স্বপ্ন ভেঙে দিতে পেরেছে অনল মাইতির।

করেক সপ্তাহ পরের ঘটনা। বিকেলের রোদ গড়াতে আরো করেক-মুহুর্ত বাকি আছে। আজ সারাদিন ঘর থেকে বের হয়নি অনামিত। ভেতরের অকথিত উত্তেজনাকে আরও তীব্র একাগ্র করার নেশার ও বাইরে যারনি। লাইব্রেরীতে বই খেঁটে, বাবার ডায়েরির পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করছিল যেন।

রিটার্ড বাপের ওপর সমাজবিরোধীরা একবার হামলা করে গেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করে গেছে চাঁদা হিসেবে। বাবা দুদিন আগে কলকাতার গেছেন, মনের মধ্যে এক ব্যস্ততা নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বার্ষিক মিটিং-এ। এই অঞ্চল অন্য সব জায়গার থেকে শান্ত ছিল। অনল মাইতি বৃষ্টি গেছেন এই কেন্দ্র ফ্রেস ভোট হলে নিরুদ্বাবুর জিতে যাবেন। তখন পরের ইলেকসনে অশোক ভৌমিকের ক্ষমতার চলে আসা মোটেই কঠিন কাজ হবে না। তাই অতি সচতুরভাবে পঞ্চায়েতী ক্ষমতার অপব্যবহার করে গোটা অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস কার্যে করতে চাইছে। যাতে ভর পেয়ে কেউ ভোট দিতে না যায়। ইতিমধ্যে অর্কর বাবা শম্ভুনাথকে পাশের বাড়ির সঙ্গে জমি নিয়ে মারামারির মিথ্যা মামলার হাজতে পাঠিয়েছে। প্যাড়ার পারিবারিক বিষয়কেও অনল রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। জালপাই অঞ্চলে দলিত রাজবংশী ও তিরর পত্রীর বেশ কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে তাদের অঞ্চল ছাড়া করেছে। অথচ এসব ব্যাপার করেছে সেই বেঁটে গণেশ, মদনা, রাস্ত্র প্রকৃতির দল বুক ফুলিয়ে এ অঞ্চলের শান্তিবাহিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম ব্যাপা ভীতু শান্তিপ্রিয় ও নিরাহ লোক তাদের রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়িয়ে নিচ্ছে। তারা কেউ ভোট দিতে বাবে না। এসব ঘটনা অবাককে ছিমছিম করে দিচ্ছে। অর্ক করেকদিন নিশ্ফল আক্রমণে

ফুসছিল। অবশেষে অনেক দ্বন্দ্বময় দিন আর অসহ্য বিনীত রাত কাটিয়ে অনমিত্র আজ এই সিংহাস্ত নিরেছে। অনেকখানি বৃষ্টি যুগিয়েছে স্থলীল খাড়ার বিদ্যুৎ বাহিনীর ইতিহাস।

বিকেলের রৌদ্র ফিকে হয়ে এলে, অনমিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজ তার পরনে জিনসের অটসীট প্যান্ট, গারে স্যাণ্ডে গোল্ড। মা রাগা ঘরে ছিল। ও শব্দ বলল, ‘মা আজ ফিরতে রাত হবে, তোমরা খেয়ে নিও।’ মায়ের কথা শোনার অবসর না রেখেই বেরিয়ে এল। দরজার কাকিমা করুণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে। ও একবার তাকাল। তারপর পেছনের দিকে মুখ করে পশ্চিমে চলে গেল। আজ দ্রুত পায়ে রাশ ছাপারিয়ার ভাঙা কারখানায় এসে ঢুকল। ওর শব্দ পেয়েই চামড়া ওঠা কুকুরটা গা ঝেড়ে উঠে ওর আগে ভাগে এগিয়ে চলল। কোনো কিছু না ভেবেই মনকে আরও দৃঢ় করার জন্য ও কুকুরটার পিছনে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। এদিকে পশ্চিম অংশের ভাঙা প্রাচীর বাঁশ বনের ভেতর ঢুকে গেছে। ও সামনে এসে দ্যাখে কুকুর পাশে শব্দে পড়ল। ওদিকে বনের মধ্যে একটা মেয়ে শব্দকনো জ্বালন ভাঙছিল। ওর পায়ের শব্দে মেয়েটা ফিরে দাঁড়াল। অনমিত্র দেখে লাজু। লাজুও এ সময় ওকে দেখে অবাক হল। সেই সকালের ঘটনার পর দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ কেউ কারুর মনোমুখি হয়নি। আজ লাজু কাছে এগিয়ে এল। একদম মনোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু তার মুখে আগের সেই পরিচিত হাসি নেই। কিরকম করুণ চোখ। কি যে চাইছে। অনমিত্র দেখল লাজুর গারে একটা কালো রঙের পাঁচি কাপড় জড়ানো। ওর দেহের তুলনায় এত ছোট, কোনো রকমে কোমর আর বুক ঢাকা। অনমিত্র বলল, ‘কিছু বলবে?’ লাজুর মুখে কোনো কথা নেই। ও তবু কিরকম আকাঙ্ক্ষার অনমিত্রর চোখের দিকে তাকিয়ে। অনমিত্র ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোদিন সকালের কথা মনে এল।

এবার কয়েক পা এগিয়ে একদম ওর কাছে এল। লাজু তেমনই তাকিয়ে ডান হাত দিয়ে একটা বুনো জামের ছাল ছিঁড়ছে। অনমিত্র ওর চোখে চোখ রাখল। দু হাত দিয়ে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পোচ দেওয়া শাড়িটা নামিয়ে ফেলে দিল। কোমর থেকে নিচে শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে। লাজু তেমনই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কেবল বাম হাত দিয়ে খোঁপা ঝুলে দিল। পেছনে পিঠ ভরে চুল লুটিয়ে পড়েছে। ওদিক থেকে ভবে মাওয়া সূর্যের শেষ আভা। সামনে বৃকের ওপর স্তন দুটো ঝুলে রয়েছে। অনমিত্র নিজের স্বপ্নপন্দন শুনতে পেল। দু হাত দিয়ে ওর স্তন দুটো মৃদু করে ধরল। আশ্বে আশ্বে হালকা চাপ দিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটা মাটিতে পেছন গেড়ে সামনের পায়ে ভর দিয়ে উপর দিকে মুখ তুলে কেঁউ-উঁ-উঁ করে কেঁদে উঠল

যেন। অনমিত্র হাত দুটো ছেড়ে সোজা একশ আশি ডিগ্রি মোড় নিয়ে হন
হন করে সামনের রাস্তার এগিয়ে চলল।

রাতি নটার ভুবনেশ্বরীর হাটের ওপর দিয়ে ওরা যখন এল, তখন হাট
নিশ্চন্দ্র। একটাও লোকজন নেই। ওরা সেখান থেকে পুকের পথ ধরে হাড়ি
পাড়া হয়ে নির্জন আলপথ ধরল। তানমিত্র-অর্ক-রবীন আর তরুণ। ওরা
চারজন। আজ কুন্ডু পাড়ার কালীপুজো উপলক্ষে কলকাতার বড় পাটি'র
যাত্রা খোলা পায়েভেলে হবে। এই অঞ্চলের সব ঘর থেকেই লোকেরা ঝাঁপিয়ে
চলে গেছে। এখান থেকে পরিস্কার যাত্রার এ্যাকটিং শোনা যাচ্ছে। ওরা
সামনের কালভার্টটা পেরুবার আগে একটু সচেতন হল। না, যারে কাছে
আজ আর কোনো লোকজনের গন্ধ নেই। ক্যালভার্ট পেরিয়ে মোড় ঘুরে
পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করল। ওদের লক্ষ্য অনল মাইতির বাড়ি। আজ
অনলের বউ ছেলে মেরেকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে সকালেই। সে বাড়িতে
উৎসব। অনল পণ্ডারেরতের কান্নের ছুতোয় থেকে গেছে। এ সংবাদ ওদের
জানা তবু বাড়ির সামনে এসে, সদরের পথ দিয়ে না ঢ়েক পেছনের দিকে ঘুরে
চলে এল। ঘরের ভেতরের আলোয় দেখা যাচ্ছিল জানালার ফাঁক দিয়ে অনলের
কোমরের ওপর বসে সোহিণী তেল মালিশ করার মতো টিপে চলেছে। অনল-
বাবু মোজ করে বালিশে মৃদু তুলে চোখ বুজে রয়েছেন। আর কোথাও
কেউ নেই।

অর্ক ডান দিক দিয়ে ঘুরে এসে সামনের দরজার চোট করে টোকা দিল।
'কে?' বলে সোহিণী উঠে দাঁড়ান। অনল তাড়াতাড়ি উঠে লুংগটা ঠিক
করে কোমরে বাঁধতে বাঁধতে সোহিণীকে ইঙ্গিতে দরজা খুলতে বলল। তরুণ
আর অনমিত্র এর মধ্যেই ঘুরে এসে অর্কের দৃ পাশে পজিসন নিল। রবীন
সামনের রাস্তার লক্ষ্য রাখছিল। সোহিণী দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনে
দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করল। অনল ব্যাপারটা গাভলোলের বুঝেই কে—রে বলে
ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই অনমিত্র সোহিণী যাতে বোঁরিয়ে যেতে না পারে তার
ডান হাতটা মৃদু ধরল। অর্ক আর তরুণের অনলবাবুর সামনে আসতে
ষটটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই বাইরে কারুর ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।
সেদিকে তাকিয়ে অনল মার মার বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনমিত্র পিছন ফিরে
দরজার বাইরে তাকিয়েছে। অমব্যসার অশ্বকার রাত। সোহিণীর বাম
হাতের হারিকেনের আলো বাইরে কারুর চোখে প্রতিফলিত হতে দেখল।
অজ্ঞাত আগন্তুক মূহুর্তে রিভলবার তুলে স্ট্রট করল। ব্যাপারটা আঁচ করতে
পেরে সেকেন্ডের মধ্যে অনমিত্র পাশে সরে সোহিনীকে সামনে টানল। সোজা-
গুদাল এসে লাগল সোহিণীর বুকে। লোকটা সোহিণীর চিংকার শুনে যা—
বলে কয়েক সেকেন্ড স্থব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অনমিত্রদের প্রত্যেকের মূখে

কালো কাপড়ের টুপি পরা ছিল। কেবল চোখ আর নাকের কাছে ছাঁদা। বাইরের লোকটাও ওদের চিনতে পারবে না। লোকটার হাত থেকে রিডলবার খসে পড়ল। তারপরই লোকটা ছুটে পালাল। কিন্তু বাইরের থেকে রবীন চিনতে পারল ও বেঁটে গণেশ।

এদিকে তখন অর্ক আর তরুণ, অনলকে কোনো কিছু বুঝবার সময় না দিয়ে একজন ওর হাতদুটোকে পিছনে মূড়ে ধরল। একজন সামনের দিকে খাড়া হয়ে ধরল। অনমিত সোহিনীর দেহটাকে মাটিতে ফেলে হারকিন নিভিয়ে চুত অনলের পিছনে এসে রেশমী রুমালের পোঁচ দিয়ে ওর শ্বাস রোধ করল। মূহুর্তে পেছনের দরজা খুলে ওরা অনলের লাশ নিয়ে উঠাও হল। রবীন ওদের অনুসরণ করল।

কংসাবতীর কালো জলে আজ জোয়ারের তোড়। স্থলীধাড়ার বিদ্যুৎ বাহিনীর কারদার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে জোয়ারের বুকে ভাসিয়ে দিল। তারপর নিজেদের মাথার আর দু'হাতের কালো কাপড়ের মূখোশ আর দস্তানাগুলো নদীর পাড়ে আগুনে পুড়িয়ে নদীর জলে ছাই ভাসিয়ে দিল।

গভীর রাতে অনমিত যখন বাড়ি ফিরে, তখন ওর কাকিমা এসে দরজা খুলে দিচ্ছেছিল। কোনদিকে না তাকিয়ে ও নিজের ঘরে চলে গেল। বাকি রাতটুকু বিছানার গা এলিয়ে জেগে দুঃস্বপ্নের ভ্রমার মধ্যে কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই মাকে ডেকে ও কলকাতা চলে বাবার কথা বলল। মা অনমিতের চোখমুখ দেখে কিছু না জিজ্ঞেস করেও অনেককিছু অঁচ করতে পারলেন। তবু বাধা না দিয়ে একবার শব্দ বললেন, 'তোরা বাবা ফিরে আসা পৰ্ব্ব শু থাকতে পারাতিস।'

অনমিত বললে, 'না, তা হয় না মা, আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে।' একটা হালকা ব্যাগে গুটি কয় অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল। মা আর কোন বাধা দিলেন না। কাকিমা দরজার কাছে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। 'মা কেবল অশ্বকারে বড় রাস্তা পৰ্ব্ব শু এগিরে এসে বললেন, 'সাবধানে বাস বাবা।' একবার দাঁড়িয়ে, 'তুমি ফিরে যাও মা। ভালো থেকো।' এই বলে আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে এগিরে চলল।

নয়.

সকাল নটায় মেচাদা ধামালি পাওয়ার স্টপেজে বাস থেকে নেমে স্টেশনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে মনে হল একটাবার কামেলার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। একটু আগে যখন গোপন জেরার তরুণ রবীন অর্ক নিজেদের বাড়ির

কথা ভেবে দুর্বল হ'চ্ছিল তখন অনমিত তাদের কাপুরুষের মন বলে ধিকার দিচ্ছিল এবং এখন অনির্দিষ্টকাল পরন্তু আত্মগোপনের জন্য মনোবল যোগাচ্ছিল। যদিও একমাত্র অর্ক কাছাকাছি এক আত্মীয় বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে খবরাখবর নেবে এরকম স্থির হলে অনমিত তাকে একবারের জন্যও বাড়ি যেতে মানা করে এল। অথচ এখন নিজের এরকম ইচ্ছায় নিজেরই ভীষণ লজ্জিত হল। আবার এটাও জানে যে কাফেলার সঙ্গে আজ আর কোনোভাবেই দেখা করা সম্ভব নয়। কারণ অনমিত আগেই জেনেছিল, গতকাল রাতে কাফেলার বিয়ে হয়ে গেছে।

কাফেলার এ বিয়েতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওর বাবা আসরাফ হোসাইন এবং ওর মামারাই এ বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছেন। কাফেলার বড় খালাম্‌মা ওর মামাদের জানিয়েছিল অনমিতের সঙ্গে কাফেলার অন্তরঙ্গতার কথা। সংগঠনের জন্যই ওরা পরস্পর কাছাকাছি এসেছিল। রেজ্জাক ব্যাপারটা মনে নিতে পারেনি। ওর বড় খালাম্‌মা নাগি'সের সঙ্গে অধ্যাপক দেবাশ্রি অন্তরঙ্গতার কিছুটা জানতেন। রেজ্জাকের কাফেলার প্রতি আকর্ষণও তার অগোচর ছিল না। তিনিই বড় মামাদের সঙ্গে আলোচনা করে হিন্দু ছেলের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য রেজ্জাকের সঙ্গেই কাফেলার বিয়ের প্রস্তাব দেন। আসরাফও মনে মনে সেটাই চাইতেন। আর মায়ের স্বভাব বাতে মেয়ের মনে কাজ করতে না পারে তারজন্য কাঁচা অবস্থাতেই কাফেলার মন থেকে ছেলেটাকে সরিয়ে বরং রেজ্জাকের হাতেই ওকে তুলে দেওয়া ভাল।

অনমিত যখন ওর নিজের সংগঠন আর বন্ধুদের নিয়ে গোপন যুদ্ধি আটিকে, সেরকম সময়েই মা-এর কাছ থেকে একদিন জেনেছিল কাফেলার বিয়ের খবর। কিন্তু সে বিয়েতে বাধা দেবার ইচ্ছা অথবা সাহসও তার ছিল না। তবু একটা ব্যথা অনুভব করেছিল হৃদয়ের গভীরে। যদিও সেদিন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এই বলে যে আসলে কাফেলার বিয়েটা রেজ্জাকের সঙ্গে হচ্ছে বলেই ওর মনটা যত আপ্যস্ত করছে। কেননা অনমিত নিজে রেজ্জাককে পছন্দ করে না। এছাড়া সে মনেতে অন্য কিছু ভাববারও মানসিক অবসর ছিল না।

তবু আজ যখন নিরুদ্দেশ যাত্রার বোরিয়েছে, তখন অসম্ভব জেনেও কেন যে মন এমন গুমরে উঠছে। আশ্চর্য মনের গতিবিধি এখন মনে হচ্ছে যেন ও কাফেলাকেই জীবনে একমাত্র ভালোবেসেছে। অথচ তার সঙ্গেই আজ আর দেখা হবার কোনো উপায় নেই। হয়তো জীবনে আর কোনদিনই হবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে ও যখন স্টেশনের বাসস্ট্যান্ডের কাছে চলে এসেছে

সামনের মিনিমার্কেটের গেটের দিকে তাকিয়ে ভাবল, হঠাৎ যদি দেখা হলে
 ষার। 'কিন্তু কি আশ্চর্য'। সত্যি, ঐ তো কাফেলা। চোখকে যেন কিছুতেই
 বিশ্বাস করা ষার না। ও কাফেলাই তো।

কাফেলাও ওর দিকে তাকালো। মূসলিম মেয়েরা নতুন বৌ-এর সাথে
 শাখা পরে না। সিঁদুর দেয় না কপালে। তবু ওকে আজ কি অপরাধ
 দেখাচ্ছে। বেশ ভালো লাগছে দেখতে। অনমিত্র পা কিরকম খেমে গেছিল।
 একটুও চোখের পাতা নড়ে না। তবু কেন মনে হল যেন কাফেলা ইঙ্গিতে
 দাঁড়াতে বলছে। দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর আর সামনে দেখতে পেল
 না। কাফেলা যেন কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে মার্কেটের ভেতর চলে গেল।
 আহত মন নিয়ে অনমিত্র নিজস্ব কয়েকটা পদক্ষেপ এগিয়েই দেখল সামনে
 কাফেলা। অনমিত্র যেন স্বপ্নের ঘোরে, 'কাফেলা তুমি?' 'তাড়াতাড়ি
 এখান থেকে পালিয়ে চলো।' বলে একরকম জোর করে অনমিত্র হাত ধরে
 টেনে আবার উল্টো মুখে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। আর এত দ্রুত হাঁটিছে
 কাফেলা। যেন অনমিত্র ওর সঙ্গে পা মেলাতে পারছে না। আবার খামল
 গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। এবার কাফেলা অনমিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে
 বলল, 'কোন দিকে যাবে?' অনমিত্র কিছু না বুঝেই বলল, 'চলো কলকাতা
 যাই।' পাশে এসে একটা এয়ারকন্ডিশন লাগারী বাস এসে দাঁড়িয়েছিল।
 এবার কোনো বিতর্ক বা কালার আগেই কাফেলা ওর হাত ধরে ওকে বাসে
 তুলল। তারপর সামনের একটা টুঁসীটে বসল দু'জনে। বাসটা একদম
 ফাঁকা। কাফেলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে শরীরটা সীটে এলিয়ে দিল।
 অনমিত্র এতক্ষণ পরে একটা আরামবোধ করে বললে, 'কাফেলা, এভাবে
 তুমি সারাজীবন আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলো।' কাফেলা কোনো উত্তর
 দিল না। কালো কাঁচ মোড়া বাস সৌ সৌ করে বাতাসের ভেতর দিয়ে উড়ে
 চলতে লাগল।

কলকাতার পেঁছা অনমিত্র অনেককষ্টে ডেইলিডকে খুঁজে বের করল।
 কাফেলা প্রথমে যে উদ্যোগ ও সাহসী তৎপরতার সঙ্গে অনমিত্রকে মেচাদা থেকে
 হিঁচড়ে টেনে এনেছিল। একটা নিশ্চিত দরবে পেঁছা যাবার পর তার সে
 তৎপরতা আর রইল না। রহস্যময়ভাবে তার চোখের মণির ভেতর কোথায়
 হারিয়ে গেল। সে চোখে এখন অন্যের আশ্রয়ে কিরকম শান্ত এবং ক্রান্ত যেন।
 গোটা বাসে অনমিত্র কাঁধে মাথা রেখে সে তার সেই ক্রান্তিকে ঘুমেয় ভেতর
 মুছে ফেলতে চাইল। অনমিত্র প্রথমে অনেকটা সময় আচ্ছন্দের মতো ওর
 দিকে তাকিয়ে কাটাল। বাসের আরামের মধ্যে তারও রাতজাগা আতঙ্ক ও
 গল্প চোখ একটু ঘুমেয় শান্তি চাইছিল। যদিও ও কাফেলার মতো নিশ্চিন্ত

ঘুমোতে পারেনি। তবু তন্দ্রা আর নিদ্রা মাথামাথি হয়ে সমস্তটার্কে ভাগ্যভাগি করে নিচ্ছিল।

হাওড়ার এসে বাস থামল। বাস থেকে নেমে অনমিত জিজ্ঞাস করল, 'এখন কোথায় যাবে।'

—'সে আমি কি করে জানব, তোমার হাত ধরে চলে এসেছি, সে দারিদ্র তোমার।'

—'কিন্তু আমি এখন তোমাকে নিয়ে কোথায় যাই?' বলে টেনে টেনে অনমিত চিন্তার ঘারে আচ্ছন্ন হতে চাইল।

—'ওটা পদ্মের মানুষের কাজ। আমার নয়।' কাফেলা খোঁচা দিল। তারপর বললে, 'তাড়াতাড়ি কোথায় যাবে চলো।' ওর কাঁধে নিষ্ঠুরতার হাত রাখল।

অনেক ভেবে অনমিতের ডেভিডের কথাই মনে এল। মাঝে একবার খবর পেয়েছিল গের্টিকন কনসালট্যান্টসে ও কাজ করে। সেখানে এসে অনেক খোঁজ করে ওকে পেল। ডেভিড একটুখানি মৃটিয়ে গেছে। কিন্তু ভেমনই দিলখোলা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করল। তারপর পাশে বসিয়ে সর্বাঙ্গ হুঁতু বসল, 'কি রে বোকা বোকা চোখের অনমিত, গাইরা। শেষ অবদি তুইও মেরের হাতে ফেঁসে গেলি।' বলে ওকে নিয়ে অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এল। প্রথমে ক্যান্টিনে এসে ওদেরকেও খাইয়ে নিল। তারপর সারা দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কলকাতা শহরের এপ্রান্ত থেকে এপ্রান্ত চলে বেড়াল। তারপর সন্ধ্যার উপকণ্ঠে ওদেরকে নিয়ে যমুনা সিনেমা হলের কাছে একটা এ্যাংলো হোটেলে তুলে দিয়ে গেল। যাবার সময় অনমিত ওকে প্রণাম করল, 'ডেভিড, তুই কি এখন দেবদুর্ভাগি কাছে ফিরে যাবি?'

'দূর বোকা। সে তো পুরোনো জীবনের গল্প। চল—বাই।' বলে দরজা বাইরের থেকে টেনে চলে গেল। অনমিত ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল।

কাফেলা সারাদিনের ক্রান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে যোর লাগা কয়েক মূহূর্ত কেটে হাওয়ার পর অনমিত কাফেলার দিকে তাকিয়ে দেখল 'আবার নিশ্চিত আশ্রয়ে পেঁাছে ও ঘুমিয়ে গেছে। অনমিত জানালায় পাশে এসে পাল্লা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকালো। কলকাতা শহর সবে সন্ধ্যার মজলিসে জেগেছে। চারদিকে কত রঙের আলোর রোশনাই। এ পাড়াটা ওর ভেমন পরিচিত নয়। বাইরের দিকে তাকিয়ে ওর এক এক করে অনেক কথা মনে পড়ল। পিছনের ফেলে আসা এই কয়েকদিনের ঘটনা। গোপন বড়বন্দ, কুটিলতা, আশ্রয় রক্তের জিহাংসা। হত্যা-মৃত্যু রক্তকর। আর এইসব শ্বাস রোধ করা পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে সরে এসে নিজের প্রিয় পরিচিত এক আদরের গ্রাম ছেড়ে এসে আজ রাতির এই শহর। বাস্তব কত

বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। স্বপ্নের ভেতরও যা কল্পনা করা যায় না। এই কল্প দিনে তাই ঘটে গেল।

এককম ভেবে ভেবে কত সময় কেটে গেছিল খেলা নেই। পিছন ফিরে দেখল এখনও কাফেলা কি নিশ্চিন্তে ঘূমিরে আছে। ওর ঘূমন্ত শরীরের দিকে তাকিরে ভাবল, গতকাল রাতে এই মেরেটি যখন বিয়ের পিঁড়িতে অন্য পুরুষের পাশে, অনমিত নিজে তখন কি ভয়ঙ্কর এক জিবাংসার যেতেছে। আর আজ কি অস্বুত ভাবে পরস্পর একে অপরের এত কাছে। নিজের হৃদয়ের গোপনে কোথায় এমন করে কাফেলার জন্য প্রেম সঞ্চিত হয়েছিল।

অনমিত এবার পোষাক ছাড়তে বাথরুমে গেল। হাত মুখ শূণ্য না ধুয়ে ও স্নানই করে নিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখে কাফেলা বিছানার বসে হাই তুলছে। ওকে দেখে বললে, 'তুমি তো স্নান করে পোষাক বদলে এলে। আমি কি পরব।'

'তাইতো, তোমার তো ঐ শাড়ি ছাড়া কিছই নেই।' নিরুপায়ের মতো তাকিরে রইল। কাফেলা উঠে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, 'আমি রাতে কিছ খাব না। তুমি খেয়ে এসো।'

এমন সময় বাইরের দরজায় শব্দ হতে অনমিত খুলে ধরল। হোটেল কর জিজ্ঞেস করলে, 'হুয়াটস্ ইম্পোরস্ ডিনার মেন্ড?' অনমিত জড়ানো ইংরেজিতে বোঝালে ওরা কেউ কিছ খাবে না। বর চলে গেল। অনমিত দরজা আঁটরে বিছানার ফিরে এল। কাফেলা বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললে, 'তুমি খাবে না।'

—'না, হোটেল বরকে না বলে দিয়েছি। আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না।'

কাফেলা সামনে এসে বললে, 'আমি কি পরে শোব, এই শাড়ি পরে সারাদিন পরেছি ঘাম গন্ধ করছে?'

'কেন, ওটা ঝুলে দাও।'

'এমনি শোব?'

'হ্যাঁ'...

'আর তুমি ঐ সব পরে শোবে।' বলে কাফেলা ঘরের আলো নিভিয়ে নাইট বাল্ব জ্বলে দিল। অস্বুত গোলাপী লাল আলোর সাহেবী কারদার সাজানো কক্ষ কিরকম মারামর হরে উঠল যেন। অনমিত বিছানা থেকে উঠে জানালা লাগানোর জন্য এগিয়ে গেল। কাফেলা বিছানার উঠল। অনমিত জানালার পাশে এঁটে দিতে গিরে দেখল কাঁচের সার্শি বন্ধ করে দেওয়ার ঘরের ভেতরের নাইট বাল্বের আলো সার্শিতে প্রতিফলিত হয়ে গোটা ঘরকে আরও বেশি আলোকিত করেছে যেন। এবার পিছন ফিরে বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে গিরে দেখল, নরম বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে কাফেলা তার শরীর থেকে শাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে। অনমিতর চোখে চোখ পড়তে কাফেলাও

কিরকম শুষ্ক হয়ে গেল। অনমিত্ত বিছানার কিরে এল। সন্ধ্যাহন উভয়ের চোখে। অনমিত্ত ধীরে ধীরে ওর শরীরের সব সারিরে ফেলল। এমন আশ্চর্য স্পন্দনময় নিরাভরণ শরীর ও আগে কখনও দেখিনি। চোখ, মূখ, শ্বনের গঠন, নাভি, কোটিদেশ, জ্বন—গ্রীক ভাস্কর্বে'র যে অপহৃৎ লিপ্সু স্ফুমার কথা ও শিল্পকলার ইতিহাসে পড়েছে, তাও এমন অসামান্য নয় যেন। নিজের জন্মকালীন গোষাকের শরীর দিয়ে সামনের ঐ অপহৃৎপাকে স্পর্শ করল। দু' ঠোঁট দিয়ে পান করল অথর পরোধর আর নাভিমূলের সমস্ত সুধা। গত রাত্রির সমস্ত পাপ যেন ধূরে মূছে সাফ হয়ে যাচ্ছে প্রিয়নারী শরীরের প্রথম স্পর্শে। কংসাবতীতে স্নান করেও গতরাতে যে গ্রানি ধূতে পারে না। তা আজ আশ্চর্য উত্তাপে গলে যাচ্ছে যেন। অনমিত্ত দু' হাত দিয়ে কাফেলার উষ্মক কোমর জড়িয়ে ধরে দেবীর সামনে নতজ্ঞান হওয়ার ভঙ্গীতে জ্বনে মূখ গুঞ্জে শান্তি পেতে চাইল। তারপর কতো ইতিহাস ও গল্পের যবনিকা ঘটল। পৃথিবী যেন কি দ্রুত তার পরিক্রমা সেরে নিচ্ছে। অনমিত্ত ধীরে ধীরে ওর মূখ নামিয়ে আনল কাফেলার পদযুগলে। সেই অনেককাল আগে, প্রথম কৈশোরে, ভোররাতে কংসাবতীর কোলে দেখা দেবীকে আজ নিজের বাহুবন্ধনে পেয়েছে যেন। পদযুগল চূষন করতে গিয়ে অনমিত্ত দেখল কাফেলার অশ্রুত সুন্দর পায়ের পাতার আঙ্গনা। দেবীর সমস্ত সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করে ও আজ দেবীর বুকের ওপর পরম শান্তির ঘুমে ঢলে পড়ল।

জ্বরগাটা ঠিক কোথায় অনমিত্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। রাত্রির বিজলী-বাতির আলো নয়, আবার দিনের সূর্যালোকের মতো পরিষ্কারও নয়। চাঁদের বুক থেকে চ্যকে পড়া আলো সাদা বরফের আন্তরে প্রতিফলিত হয়ে কি এরকম উজ্জ্বলতা আনতে পারে? অথচ মাথার ওপর কোথাও চাঁদ নেই। বরফ নয়। একটা মাত্র নক্ষত্রের মতো কি জ্বলজ্বল করছিল যেন। বোধ হল যেন একটু ঠাণ্ডা করছে। সাদা মিষ্টি ধোঁয়ায় গোটা পরিবেশ কিরকম আচ্ছন্ন যেন। প্রথম কৈশোরে সূর্যোদয়ের ব্রাহ্মহৃত কংসাবতীর তীরে দেখা সেই নিরাভরণা নিরাবরণা দেবী মূর্তি ওর সামনে, এত কাছে দাঁড়িয়ে। কি মধুর হাসছে। আর এই তুষারখল আলো বিম্বিত তার চোখের চপল চাহনিতে। অথরের বক্ষিরে রাখার। শরীরে অশ্রুত একটা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কটিদেশে কণি। তার ওপর প্রশস্ত বক্ষদেশে স্নোভিত পরোধর। বাগদেবার মতো। সূচিগঠিত স্তন বৃন্ত। মাথার থেকে ঝুলে পড়া বিশাল বিস্তার কালো কেলের প্রান্ত দেশ বাম হাত দিয়ে ধরে গ্রোনদেশ ঢেকে রেখেছে। পদযুগল ধপধপে সাদা রজনীগন্ধার ওপর বিস্তৃত। পায়ের পাতার আঙ্গনা। গোটা মূর্তিটা যেন বাতিফিল্লির আঁকা ছবির মতো। নাকি সেই ছবিই কোন আশ্চর্য বাদ্যমণ্ডে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনমিত নিজেও জন্মকালীন পোষাকে। লজ্জার নিজে কিরকম কুকড়ে গেল যেন। তখন সেই অপূর্ণ দেবীমূর্তি হেসে উঠল। তার হাসি সমস্ত আনন উদ্ভাসিত করে গোটা শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ছড়িয়ে পড়ল। যেন কোন অপূর্ণ পূরণের বলে অনমিত স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছে। আর এই দেবী গান্ধবীকলার নৃত্যে একে প্রীতি করার চেষ্টা নিরুপেক্ষ। তার হাসির লহর। নৃত্যের ভঙ্গিমা, শরীরের দৃঢ়-আলতা রঙের তরঙ্গ শেষ হলে, সেই নারীকণ্ঠ বগে উঠল, 'বৎস, আমাকে স্পর্শ করো, আমি তোমার জড়িয়ে ধরে, আলিঙ্গনে তোমার সমস্ত লজ্জা মুছে দেব।

ও তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এত কাছে। তবু কিছুতেই ধরা যাচ্ছেনা। এত কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে সেই নারী শরীর বলছে, 'আমাকে স্পর্শ করো। অমর, আমাকে জড়িয়ে ধরো।' অথচ অনমিত কিছুতেই একে ধরতে পারছে না। তারপর সেই আলোর ধোঁয়ার আকাশের স্তূপ স্তূপ প্যাজা তুলার মতো, সাদা মেখে সব কোথায় হারিয়ে গেল যেন। অনমিত চিংকার করে উঠল। দু'হাত ছুড়ে দিল শূন্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দ্যাখে, সকাল হয়ে এসেছে। জানালায় শার্শি ডেদ করে বাইরের আলো ঘরে ঢুকে পড়েছে যেন। পাশ ফিরে দ্যাখে বিছানার আর কেউ নেই। ও উলঙ্গ হয়ে শূন্যে আছে। ভোর রাতে খালি শরীরে ঠান্ডা লাগছে। চোখের জড়তা কাটিয়ে উঠে বসল। কাফেলা কোথায়? বুকের ভেতরটা শুক করে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পাজামার পা গলিয়ে পাজামা পরতে পরতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে দেখল। না এখানেও নেই। শাড়ি-শাওয়া-টা-ব্রাউজ কিছুই নেই। এবার দরজার কাছে গিয়ে দ্যাখে দরজা খোলা। বাইরে এসে দেখল কোথাও বায়ান্দার দাঁড়িয়ে আছে কিনা। এপাশ ওপাশ, উপরে উঠে-নীচে নেমে। অন্য কোনো রুমে গেছে কি? রিসেপশনিষ্টকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়। তরতর করে নীচে নেমে এসে সামনের রিসেপশনিষ্ট কাউন্টারে এসে দ্যাখে এখনও হোটেলের কেউ জাগে নি। বাইরের খোলা হাওয়ার কি যেতে পারে। তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে এল, না, ধারে কাছে কোথাও নেই। এবার অজানা ভয়ের আতঙ্কে বুকের ভেতর জ্বরে জ্বরে লুপ্তপ শব্দ হতে শুরু করল। এই নাত সকালেও গা গরম হয়ে উঠেছে। অনমিত দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে মাথার চুলগুলোকে মূর্তির মধ্যে ধরে চাপ দিতে শুরু করল। আবার ছেড়ে দিল। কি করবে? কোন দিকে যাবে? একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, এত সময়ে হয়তো রুমের মধ্যে ফিরে এসেছে। হয়তো ধারে কাছে কোনো রুমে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল কথাটা মনে হতেই আবার ছুটে

হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে দরদাড় করে উপরে উঠে নিজের রুমে এল। না কেউ কোথাও নেই। আর চিন্তা করতে পারছে না অনমিত। এবার খাটের ওপর বসে পড়ল।

অনেকক্ষন কেটে গেল। কোনো কুল কিনারা খুঁজে পেল না অনমিত। কোথায় যেতে পারে। অথবা রাতে, ভোর রাতে কেউ কি নিরে পালাল কাফেলাকে। স্ব রাতে হগে হোটেলের গেট থেকে বেরুবে কি করে! অথবা যদি সাত সকালে ওর ঘুম থেকে ওঠার আগে ও বেরিয়ে যায়। হয়তো সকালে উঠে এমনই দরজার বাইরে বেরিয়েছিল। তারপর কেউ ধরে নিরে চলে গেছে। তা না হলে কাফেলা না জানিয়ে কোথায় যাবে? যাবেই বা কেন? অনেক চিন্তা করল। কিন্তু কিছুই কুল কিনারা করতে পারল না। কেবল মাথাটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে হবিরয়ে এল। হোটেলের রিস্পেসনিটকে জিজ্ঞাসা করল। না কিছুই জানা গেল না। ডেজিডের কথা মনে পড়ল। গেনসকিন কনসাল্ট্যান্সিতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যায়।

রাস্তার বোরিয়ে এসে ঘাদুঘরের সামনে দিলে হে'টে পার্ক'টীট ক্রিশিং-এ এল। সকালের বাস অর্দন্তব রকমের ফাঁকা। একটা বাসে উঠে পড়ল। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নামনে নামল। গেনসকিনের মেন বিল্ডিং-এর নিচের দরজাই এখনও খুলে। একবার গোটা বাড়িটার ওপর দিকে তাকাল। জানালা কপাট সব লাগানো। অফিস পাড়ার এখনও কলকাতা শহর জাগে নি। গোটা কলকাতা শহর এখনও ঘুমিয়ে আছে মেন। অথচ অনমিতর মাথার বাজ পড়ে গেছে। নাকি পড়বে এখনি। গ্রেট ইস্টার্নের ফুটের নীচে এল। একজন চানা ম্যান তার প্রেমিকার হাত ধরে ওর বিপরীত দিকে হে'টে যাচ্ছে। ফুটপাথের দু' একজন হকার মেঝেতে বোঝা নামিয়ে ঝাঁট দিয়ে তার জায়গা পরিষ্কার করছে। ও হে'টে হে'টে এসম্মানেজের দিকে এল। ওদিকের রাজভবনে প্রাচীরের ভেতর সবুজ গাছের মাথার এখনও নীল-হুসর কুয়াশা জমে আছে। দু' একটা বাস পাশ দিয়ে হুস করে চলে যাচ্ছে। ওই দিকে আকাশবাণী ভবনের রাস্তা। নেতাজী একই ভাবে দাঁড়িয়ে সামনে হাত তুলে এগিয়ে যাবার নির্দেশ করছে। কিন্তু কোন দিকে গেলে কাফেলাকে পাওয়া যাবে। শাঁতের শুরুর মাঠে কয়েকজন লোক ছুটে ছুটে শরীর ঝালিয়ে নিচ্ছে এত সকালেও টাটকা রোদ খেতে দু'জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা হাত ধরে পূর্ব হুধে হাঁটছে। ওই দিকে মাতঙ্গিনী হাজরার শ্যাহু, সংগ্রামী মেদিনী-পুত্রের বিপ্লবী চেতনার শ্বাঙ্গর। মাহিষারা গর্ব করে মধ্য কোলকাতার হুকের ওপর রাসমণি আর মাতঙ্গিনীর মর্তি আছে বলে। তার ওপাশে মনুম্যন্ট। কিন্তু তাকে খ্যাপা হাতির সোল মনে হয় না। বরং এত

নিম্পূহ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, অনমিত্রের বেদনা ওকে কোনোদিনই স্পর্শ করবে না। ও সোজা দক্ষিণে হেঁটে চলল। গাম্খীর নত মস্তকের দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। টাইলদারী ঘোড়ার পিঠে পুঁলিশ সওয়ারী হয়ে বসেছে। এইখানে এখনও ট্রামের লাইন পাতা আছে। অকেজো কয়েকটা ট্রাম এখনও স্বাক্ষী হয়ে ইতিহাস বহন করছে। ফোর্ট বিলিংয়ের স্ট্রীং-এর কাছে একদল সৈনিক মার্চ পাশ্ট করে চলে গেল। ওর ও পশ্চিমে গাছপালার মাথা ভেদ করে বিদ্যাসাগর সেতু মাথা উঁচিয়ে আছে। রাস্তা পার হয়ে গড়ের মাঠের ভেতরে ও চলে এল। বিশাল মাঠে ডেজা ঘাসের ভেতর কোথাও শান্তি আছে ভেবে মাঝ মাঠে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। বৃন্দ হয়ে বসে ভাববে একটু।

আবার উঠে দাঁড়াল। মাথার ভিতর অনড় চিন্তারা ভাবতে দেয় কই। ওই দিকে দূরে ভিক্টোরিয়ার মাথার ওপর পরি এই দিকে তাকিয়ে আছে। অনমিত্র সেটা লক্ষ্য রেখে হাঁটতে লাগল। অক্টোবরের শেষের দশটার রোদে মিনিট স্বাদ নেই। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে তেঁতে উঠছে বেন। তবু মাঠের বাতাস বয়ে বয়ে চলে। লাইট এন্ড সাউন্ডকে পাশে রেখে ও এগিয়ে গেল। রাস্তা পার হয়ে ভিক্টোরিয়ার গেটে গেল। এরই মধ্যে অনেক প্রাইভেট কার-টার্মি জমে গেছে। ভেতরে বেশ ভীড়। এরই মধ্যে জোড়ার জোড়ার বোরিরে পড়েছে। অনেক মেয়েকেই দূর থেকে দেখে কাফেলা মনে হয়। কাছে গিয়ে ক্লান্ত ধনু মন নিয়ে হতাশ হতে হয়। পূর্বে থেকে দক্ষিণ হয়ে পশ্চিম ঘুরে উত্তর। ফের দক্ষিণে এভাবেই বেশ কয়েকবার চকর দিল ভিক্টোরিয়াকে। সব মেয়েদের একই রকম মনে হয়। পুরুষের মেয়েদের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সকালের রোদ চাটছিল। আর মাঝখানে শ্বেত পাথরের মেমোরিয়াল হল একইরকম স্থানু হয়ে বসে আছে। কোথাও কাফেলা নেই। অনেককণ মেন গেটের সিঁড়ির ওপর বসে থাকল। তারপর আবার উঠে পূর্বে দিকের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বিড়লা তারামন্ডলের সামনে একটা মেয়েকে পেছন থেকে কাফেলা বলে মনে হল। কাছে গিয়ে দেখল। মদুখোমুখি, না এ আখো ইহুদী, গেরিলার মতো নাক। তবু বাঙালী হবার সাথে শাড়ি পরে সঙ সেজে আছে। অথবা হয়তো তার এই ভালো লাগে।

ফিরে এসে একটা প্রাইভেট বাসে ভীড় ঠেলে ভিতরে সেঁঝিয়ে গেল। একদম ধারে এসে কোনরকম দাঁড়াতে পারল। এই দিকে সব মেয়েরা বসে আছে। যদিও কাফেলা নেই। তাদের মাথার ওপর লেখা, ডর কি ত্রে পাগল আমি তো আছি।' তুমি আছো। কিন্তু কোথায়। অন্তত তোমাকে পেলেও ভাল হত। মেয়ো রোডকাজ'ন পার্ক ঘুরে আবার সেই গেনসকিন, ব্যাক্সম শহরের আরও ব্যাক্স অফিস। না, আজ ডেভিড আর্সেনি অফিস।

কোথার আছে কে জানে। ভেবে দেখল, কোথার কোথার থাকতে পারে। প্রথমে ভাবল কাঁকড়াগাছের সেই পুরোনো ডেরার, যেখানে দেবদত্তীর সঙ্গে—বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হল, আচ্ছা ডেভিডওতো কাফেলাকে নিয়ে পালাতে পারে! মাথার ভেতর অসহ্য রক্তের চাপ আবার দপদপিয়ে উঠল। আগুনের শিখা যেন। অনামিত এক লাফে একটা ছুটন্ত মিনিতে উঠল। শিন্নালদার এত জ্যাম। একটুও গাড়ির চাকা গড়তে চায় না। ঝাইওভার থেকে গাড়ির ভেতর দিয়ে দেখা যার। ওই ওদিকে শিন্নালদহ স্টেশনের নাম বদল করে কলকাতা লিখেছে ওরা।

অনেক সময় পেরিয়ে মানিকতলা হয়ে গাড়ি কাঁকড়াগাছিতে এলে ও নামল যখন, কয়েক মিনিট হেঁটে সেই বর্ষামুখরিত রাতের বাড়ির হাঁদিস কিছুতেই পেল না। সব বাড়ি, সব গলি একইরকম। কলকাতা এক আজব শহর।

হতাশ মন নিয়ে ফিরে এল। আবার মধ্য কলকাতার। গতকাল বিকেলে অনেক সময় কাটিয়ে ছিল ওরা এই মধ্য কলকাতার। মেট্রোর সামনে নেমে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দূর থেকে দেখে কাফেলাই মনে হল। যদিও তার পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। মেট্রোটি সামনে আমেরিকান সেটারের দাঁড়ায় কাছে, সেই দিকে মুখ করে ভিড় ঠেলে ছুটল অনামিত। মেট্রোটি এবার এস. এন. ব্যানার্জী রোড পেরিয়ে ওপাশের ফুটে চলে গেল। ছুটে এস. এন. ব্যানার্জী রোডে অনামিত নামতে বাবে, এমন সময় ট্রাফিক ছেড়ে দিল। আর রাজ্যের বাস টার্মিনাস ম্যাটাডোর হঠাৎ বাধাভাঙা কন্যার মতো হু-হু স্রোতে বয়ে গেল। ইস! আর একটু ছুটে এলে হয়তো রাস্তাটা পেরিয়ে যাওয়া যেত। নিজের প্রতি এত বিরক্ত বোধ হল।

তারপর যখন আবার সব কিছু থামল। তখন রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে হেমন্তের আকাশের অজস্র নক্ষত্রের মতো নারী-পুরুষ, নানা বয়সের, নানান পোষাকের গিজগিজ করছে। আর সব নক্ষত্রের মতো সব মেয়েদের একই রকম দেখতে। ওই দিকে কি সে মেট্রোটি চলে যেতে পারে? অনেকদূরে ওই গ্র্যান্ড হোটেলের করিডোরে একটি মেয়েকে ভিড়ের মধ্যে সেই রকম মনে হল। অনামিত ছুটে ছুটে গ্র্যান্ড হোটেল পেরিয়ে, লাইট হাউসের পাশ দিয়ে নিউ মার্কেটে গিয়ে প্রবেশ করল। অজস্র দোকানের সারি অসংখ্য মানুষের ব্যস্ততা। বিকেলের নিউ মার্কেট—কোথাও কাফেলা নেই। হতাশ হয়ে সারা নিউ মার্কেট ঘুরে বেরিয়ে এসে সামনের মাঠে পা ছাড়িয়ে বসল। ঝাস্ত হয়ে শরীরটাকে ঘাসের সমুদ্রে এলিয়ে দিল। কুখা-ভুজার কখন ঘুম ধরে গেছিল খেলা নেই। অনেক রাতে ঘুম ভাঙল পুলিশের লাঠির গুঁতোয়। বেশ কয়েকটা ঘা দিয়ে সোজা কনস্টেবলের হাত তুলে দিল। অনামিত তাকে কার্কাতি মিনতি করে কাফেলার কথা বোঝাতে চাইল, পুলিশ যদি কোনো

স্বরাহা করে দেয়। উল্টে সেই কনস্টেবল বললে, ‘ও মেয়ে নিয়ে ফুটি’ মারাক্ষলে, বাঙোত। চল শালা জেলের ভিতর ফুটি’ করবি।’ বলে সোজা পুলিশ ভ্যানের সামনে নিয়ে গিয়ে আর একটা অফিসারের হেফাজতে ছেড়ে দিল। তারপর কানে কানে কি সব বলল। সে আর একটা লোককে নির্দেশ দিল। লোকটা কোমর টিপে টিপে দেখল কোথাও টাকা পয়সা আছে কিনা। না পেয়ে একটা ঘুসি মেয়ে পুলিশ ভ্যানের ভেতর চালান করে দিল। হুম্বাড়ি থেয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে আরো কয়েকটা ভেলপূরী, ফুচকাঅলাকে একইসঙ্গে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। অনমিত কোনো রকমে কাঁধের ব্যাগটা কোলে নিয়ে বেঁটিতে বসল। তারপর ব্যাগের ভেতর থেকে গোপনে হাত ঢুকিয়ে টাকা-গলো কোমরে প্যাণ্টের চোরা পকেটে ঢোকাল। গাড়ির ভেতর অশ্বকার। দুপাশের মোটামোটা লোকগুলো এমন চাপ দিচ্ছে যে চিড়ে চ্যাঁটা হয়ে বাওয়ার জোগাড়।

কত রাতে গাড়িটা চলতে শুরু করল খেয়াল নেই। অনেক পরে দম বন্ধ হয়ে আসা ভিড় নিয়ে কোন থানার যে পেঁছাল? গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টিতে পারল এটা বউমাজার থানা। থানার ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা লোক সবাকিছু লিখে নিতে লাগল। অনমিতকে একটা পুলিশ ওঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের গলিতে। তারপর হাজার টাকা চাইল। ও নিজের অসহায়তার কথা জানালে, লোকটা অস্বীকৃত গালিগালাজ করে হাতের ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে পাছার জোরে একটা লাথি মেয়ে তাড়িয়ে দিল।

রাতের কলকাতা মাতাল মানুষের মতো টলমল করছে। এখানে কোথাও শীতের স্পর্শ নেই। অনমিত অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট পেরিয়ে বোর্ডিং স্ট্রীট পেরিয়ে আবার এসম্মানেডের দিকে চলতে লাগল। দুপাশের ফুটপাথে লোক শূন্যে আছে। দিনের জনবহুল রাস্তাগুলোকে গভীর রাতে ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মতো মনে হল। দু’তিনটা লোক সম্মেলনকভাবে স্টেটসম্যানের দিক থেকে ছুটে জেনিন সরণীর দিকে হারিয়ে গেল। জেনিনের স্ট্যাচুর কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুধু রাতে নিজের এই অবস্থার অন্য গ্লানি বোধ হল। আবার হাটতে শুরু করল ট্রাম ডিপোর দিকে। কয়েকটা লোক খুঁচি জ্বালিয়ে বসেছিল। তাদের মধ্যে একটা লোক এত রাতে লাউখলা বাজিয়ে গান গাইছে, ‘পরান কান্দে কান্দে ও পরান কান্দে রে...’ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে অনমিত সেখানে তাদের পাশে বসল। কবুণ গানের স্বর শুনতে শুনতে পূর্বের আকাশে তাকিয়ে দেখল। ঐ দূরে মেট্রোর মাথার ওপর আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে যেন। অনমিত ঐ দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বৃষ্টিতে পারল এটা ভোরের আকাশ।

পরের দিন সকালে উঠে দেখে চারপাশে কেউ লোকজন নেই। সামনে

একটু পোড়া ছাই পড়ে আছে। চারপাশে ব্যস্ততম শহর ইঞ্জিনের শব্দ আর হুইসেলের বিকট আওয়াজের সঙ্গে ছুটে চলেছে। কোথাও কারুর কিছু অভাব নেই। ও রাজভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে আকাশবাণীর গা বেয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশ ধরে হেঁটে স্ট্যান্ড রোড পেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে কেবল জাঁক্সিয়া ছাড়া আর সব খুলে শ্রান করল। পতিতপাবনী কলুষ-নাশিনী কিনা জানা নেই। তবু কিরম শান্তি এল যেন। আর তার সঙ্গে ধেনে এল কি ভীষণ ক্ষুধা, মনে হল নাড়িভাঁড়িশুখ গোটা ঈষ্ঠর যেন ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সামনে হেঁটে বাবুঘাটের লাছাকাছি আসতে দেখল নগ্নরথানার মতো একটা জারুগার দলবেঁধে লোক শাল পাতা পেড়ে বসে গেছে। দক্ষিণ ভারতীয় কোনো একটা ভাষার লেখা কাপড়ের ব্যানার দেখে কিছুতেই বুঝতে পারল না এটা কি উপলক্ষে। ও বসে পড়ল। পাতাও কেউ একটা বাড়িয়ে দিল যেন। যারা দিচ্ছিল ভাবতে করে, তারা ওর দিকে বিস্ময়ের চোখে দেখল। হয়তো ওর চোখের ক্ষুধাই তাদের মারা এনে দিয়েছিল। দু'ভাবু খিঁচুড়ি ঢেলে দিয়ে গেল। অনমিত অন্য কোনো দিকে না তাকিয়েই হাপড় মেয়ে খেয়ে ফেলল, সবটাই। মনে হল কতদিন পরে আজ যেন প্রথম খাচ্ছে। কয়েক বছর আগে বরার সময় ওরা একবার কলেজ থেকে রিলিফ সোসাইটি খুলে পুরুলিয়া গেছিল মানুষদের এই রকম খিঁচুড়ি খাওয়াতে। সেদিন সেই লোকপদুলোর জন্য কিরকম করুণা হাঁছিল। কষ্ট হাঁছিল মানুষের দারিদ্র দেখে। আজ কিন্তু নিজের জন্য ওর কোনো করুণা হল না।

গঙ্গার জলে হাতমুখ ধুয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ আবার হাইকোর্টের সামনে দিয়ে হেঁটে, রাজভবনের উত্তর পাশ হয়ে আবার গেসকিন কনশালটেস্‌সীতে এল। এইমাত্র অফিস বসেছে। অফিসের এনক্সারিজে জানল ডেভিড এসেছে। তবে অফিসে কাজে গেছে, ফিরতে সেই ওবেলা হয়ে যাবে। তবে অফিসেই ফিরবে। এই শেষ আশ্বাসটুকু শুনে অনমিত কিরকম শান্তি পেল যেন।

বাইরে গিয়ে বিবাদি বাগ ঘুরে, জঁপিও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, টি বোর্ড, লাল-বাক্সারের ওদিকে ঘুরে আবার গেসকিনে এল। অফিসের ভেতর এসে ডেভিডকে দেখে চিংকার করে কাছে ছুটে এল। ওর এই অবস্থা দেখে ডেভিডও বিস্তর গালিগালাজ করল। তারপর সব শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির দমকা থামিয়ে দামি স্যাণ্ডের সিগারেট টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ভস্ করে ওর মুখে ছেড়ে দিল। ধোঁয়ার গন্ধে অনমিতর নাক টেপা দেখে বলল, 'হা, দুখ খাওয়া ছেলে মা-র কোলে ফিরে যা। একলকাতা শহর তোর জন্য নয়।'

অনমিত বোকার মতো বললে, 'কিন্তু কাকেলার কি হল?'

‘কাফেলা মরে গেছে।’ অভিজ্ঞের মতো নিশ্চিত মন্তব্য করল ডেভিড।

‘মরে গেছে?’

‘হ্যাঁ মরে গেছে।’

‘যদি না মরে, তুই কি করে জানলি?’ অনমিত ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে ডেভিডের দিকে।

‘না যদি মরে তবে কারুর সঙ্গে ভেগেছে। ওসব মাগিদের আমি চিনি।’

‘ছি, এমন কথা বলছিছ কেন।’ অনমিত চোখ নামিয়ে নেয়।

‘আচ্ছা দাঁড়া’—বলে ডেভিড অফিসের ভিতর গেল। তারপর ওভার কোর্টটা কাঁধে নিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, ‘চল।’ একরকম অনমিতকে ধরে নিয়েই বাইরে এল। এসপ্লানেডের সামনে রেস্টুরেন্টে বসে মোগলাই আর কথা হাসে খাওয়াল। তারপর অনেক কথা বোঝাল। কিভাবে দেবদত্তীকে ছেড়ে এসেছে। তারপর আগে দু’তিনটে এ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে কাটানো ঘনিষ্ঠ জীবনের নিবিট গল্প বলে চলল। মেয়েরা কিরকম মিউ মিউ করে ভালোবাসার অভিনয় করে। একটু হাত বাড়ালে কিরকম শরীর এগিয়ে দেয়। তারপর আবার কত সহজে অন্য পুরুষের কাছে চলে যেতে পারে এই সব। তবে এসব গল্প অনমিতের কাছে কিরকম নিরোঁট মনে হল।

ডেভিড আজ প্রথম ওকে পার্ক স্ট্রীটের নিজের বাসার নিয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর হল, ওর মা আর ওর কাছে আসে না। এলিগট রোড থেকে ও নিজেই চলে এসেছে। এখানটা অনেক বেশি অভিজ্ঞাত মনে হল। চারদিকের রাস্তাঘাট মোটামুটি পরিষ্কার। এ্যাংলো পাড়া বলেই মনে হয়।

ডেভিডের ঘরে দেওয়ালভর্তি নানা ভঙ্গির নারী পুরুষের ছবি। তবে অম্লীল মনে হল না এসব ছবিকে। এই সব ব্যক্তিকর্ম বিদেশী নারী পুরুষের ছবিতে একটা অন্য মেজাজ আছে। যে মেজাজ জীবনকে অনারাসে বিভূষ করতে পারে; চেহারার বলিষ্ঠতার, পোষাকের সংস্কারহীনতার, প্রকাশভঙ্গিতে স্বজ্ঞেখার ওরা সব অন্য পৃথিবীর মানুষ যেন। এক কোণে নিজস্ব একটা কম্পিউটার। আর ঠিক তার ওপর একটা বাধানো কাচে স্যাটেলাইটের সঙ্গে কম্পিউটারের সরাসরি যোগ দেখানো হয়েছে। ‘এ ছবিটা হাতে আঁকা?’ জিজ্ঞেস করতে ডেভিড কফি বানাতে বানাতে উত্তর দিল, ‘না, কম্পিউটার কম্পাঙ্ক করেছে।’

কালো কফি খেয়ে রাতে ওরা আবার বেরিয়ে এল। পার্ক স্ট্রীটের একটা অভিজ্ঞাত পানশালার নিয়ে এল ডেভিড। ভেতরে আসতেই রাতের অন্য এক কলকাতাকে দেখল অনমিত। রঙিন শব্দময় পরিবেশ। সবগুলো টেবিলে গোল হয়ে গিয়ে নারী-পুরুষের সমাবেশ। স্বল্পবাস পরিহিতা সেই সব রমণীদের মতো নারী আর কোথাও দেখেনি ও। একটা মেয়ে

অলিভ গ্রিন রঙের তরল ভর্তি গ্রাস ডেভিডের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওর ডান কালে হাত চুকিয়ে তাকে নিয়ে পর্দা ঘেরা একটা কেবিনের মধ্যে চলে গেল। অনামিত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল সবগুলো টেবিল তাকিয়ে দেখি যদি কোথাও কাফেলা থাকে। সামনের গোল ডারাসের ওপর একটি মেয়ে মোদির পোষাক পরে ইংরেজি গান গায়ে চলেছে। ওর সামনে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। তার ঠোঁটে এত মিষ্টি হাসি, মনে হল মেরেটি যেন কত কালের চেনা। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলে বসাল। সামনে একটা বেশ বয়স্ক লোক, ফুল জ্যাক। তাকে দু'পাশ থেকে তিনটে মেয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। তার ঠোঁটের সামনে নানা ভঙ্গিতে নিজেদের তুলে ধরেছে।

যে মেরেটি ওকে ধরে এনে বসিয়ে ছিল সে হাত দিয়ে ওর চিবুক ধরে নিজের মুখের দিকে ওর মুখ ঘোরাল। একটা উর্দু-পরা লোক ওদের সামনে খালি গ্রাস আর একটা বিলিতি পানীয়ের বোতল রেখে গেল। অনামিত মেরেটের চোখে চোখ রাখল। অনেকটা সেই রাতের কাফেলার চোখের মতো। তবু অনেকটাই আলাদা। এর ঠোঁট লাল করে রাঙানো। চোখের হু প্লাক করা, গালে মোটা করে বুদ্ধ ঘষেছে। মাথার চুল এমন করে এঁটে বাঁধা যে গোটা মুখমণ্ডলটা বড়ো বেশি উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাহুবুগল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। একটা স্লিপ লেন্স টেপ। ডিপ নীল রঙের। এমন ভাবে এঁটে পরেছে। বুক দুটো ফেটে বেরিয়ে আসছে যেন। সামনে থেকে অনেকটাই দেখা যায়। মেরেটি গ্রাসে ঢেলে ওর মুখে তুলে ধরল। অনামিত দু'হাত দিয়ে ধরে একটু ঠোঁটে লাগাতেই এর কড়া কাঁক টের পেল। গোটা জিহ্বা শব্দ পেটের ভেতর সেঁথিয়ে যেতে চায়। অনামিত ক'কিয়ে উঠল। মেরেটি মমতার বাম হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুম্বন দিল। তবু অনামিতর মনে হল সে চুমোর কোনো উদ্ভাপ নেই। বুকোর হাহাকার আরো বেড়ে গেল যেন। কাফেলার অভাব আরো তীব্র অনুভূত হল।

মেরেটির চেন্টার কোনো চুটি ছিল না। তবু ব্রান্ড পান করেও মনে হল এতে একটুও মনের বাধা কমে না। বরং বেড়ে যায়।

কত রাতে যে ডেভিডের ঘরে ফিরেছিল স্মরণ নেই। নেশার একটাই ক্ষমতা হল। অনেকরাত পর্যন্ত নিজের শরীরটা কিরকম হারিয়ে গেছিল যেন। আর সকালের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত পানশালায় সেই মেরেটের ছবি চোখে ভাসছিল।

ডেভিডের অফিসে চলে বাবার পর আবার তেমনই ফাঁকা লাগতে শুরুর করল। আবার মনে হল গোটা পৃথিবীটা কিরকম শূন্য হয়ে গেছে। কাফেলা ছাড়া এ জীবনের আর কোনো দাম নেই। অনেককাল শূন্য শূন্যে নিজের প্রতি ব'গার বিচ্ছার উঠে বেরিয়ে পড়ল। আজ একটু নিজের কলমে এল।

সেই ক্লাসরুম, সেই করি ডোর। একই রকম অধ্যাপকদের কমন রুম। অনেক অধ্যাপকই কাছে ডাকলেন। গারে হাত বুলিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন। অনেকেই কোনো আঁগ্রহ দেখালেন না, পাশ কেটে না চেনার মতো চল গেলেন। সব আছে, তবু সেই দিনগুলো এ ঘর বাড়ি, দেওয়াল, চোরার টেবিল, বেঞ্চ, ঐ বারান্দা কোথাও নেই মনে হ'ল। হতাশ হয়ে ফিরে এল।

একবার কফি হাউসে গেল। বিকেলের কফি হাউস এখনও তেমনই জমজমাট। আরও অনেক বেশি চিংকার চেঁচামেচি মনে হল। এক কাপ ইনফুশনের দাম অনেক বেড়ে গেছে। পকেট থেকে টাকা বের করে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ধরে। সংস্কৃত কলেজের পাশ দিয়ে হেঁটে। মহাবোধী সোসাইটির সামনে এল। স্টুডেন্টস হলে কিসের বক্তৃতা হচ্ছে। অনমিত্র হলে ঢুকে একটা জায়গা পছন্দ করে বসে পড়ল। বক্তা ওরই বয়সী একালের কোনো উরুণ অধ্যাপক হবে মনে হয়। কি একটা জার্মান বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে মনে হল। স্বেচ্ছা'রের দৃষ্ট না কি যন্ত্রণার কথা বলছিল। কি সব আত্মহত্যার কথা বলছে। ওর মনে হল কাকফেলাকে না যদি পায় ও কি আত্মহত্যা করবে? কিন্তু কাকফেলাকে আর পাবে বলে মনে হয় না। আত্মহত্যা কি করা যাবে? কিভাবে আত্মহত্যা করবে। ট্রেনের চাকার পিষে গিয়ে করা যায়। কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর গতিশীল যানটার সামনে যাবার আগেই নিজেকে ক্লিরকম শক্ত হয়ে যায়। অবশ্য পাতাল রেলের থার্ড'পাতে হাত দিয়ে আত্মহত্যা করা সহজ। কিন্তু পাতাল রেলের ভিতর বেরকম গার্ড থাকে ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব হবে কি না সন্দেহ আছে। সেটা করতে গিয়ে আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে। কলকাতার পুলিশ বা অশ্লীল ভাষা বলে।

এবার বক্তা অধ্যাপকটি উইলহেলম নার্ক মেইস্তারের কথা বলছে। এ সব শব্দ অনমিত্র আগে কখনও শুনেনি বলে মনে হল না। তবে মাঝে মাঝে গ্যেটের নাম করছে। মনে হল গ্যেটে সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। কিন্তু ঐ মেইস্তার বক্তৃত্তি কি। আবার হ্যামলেট থিয়েটারের কথা বলছে কেন? হঠাৎ অনমিত্রর মনে হল, এসবের মধ্যে কোথাও কাকফেলা নেই। তার চেয়ে বরং বেশ্যাখানার ঝুঁজলে কেমন হত।

অগত্যা স্টুডেন্ট হল থেকে বেরিয়ে অনমিত্র সেই সম্মুখ হেঁটে এসে সূর্য সেন স্ট্রীট ধরে, আমহাস' স্ট্রীট হয়ে মদন বড়াল লেনে ঢুকল।

অনেক রাত অব্যবহিত গণিকালয়ে কাটাল। প্রতিটি দরজার সামনে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, সার বেঁধে নানা বয়সের নারী শরীরের প্রদর্শনী। বৌনিক্য' সংগঠনের নামে দু' একটা দেওয়াল লিখনও চোখে পড়ল। এপাশ ওপাশ বেশ কয়েকবার ঘুরল। অনেকেই ট্রান্সজেনি' করেছে। তাদের কাউকে দেখে খারাপ কিছু মনে হয়নি ওর। অথচ এখন কলেজে পড়ত, দিনের বেলায় এই গলি

দিয়ে যেতে ওরা কিরকম ঘৃণা বোধ করত, বরং এখানে যে সমস্ত লোকেরা আসছে তাদেরকেই ঘৃণ্য মনে হল। অনেক কম বয়সী বাচ্চা মেয়েকেও দেখে কষ্ট হল। একটা মেয়েকে দেখে ওর লাজবন্ডি ওরফে লাজু মনে হল। ও তাকিয়ে ছিল; মেয়েটা হেসে কাছে এসে ওর হাত ধরে টানাটানি করল। ও ভুল হয়েছে বলে ক্ষমা চরে, আসলে ও যে মেয়েটিকে ওদের পাড়ার লাজবন্ডি মানে লাজু বৌদি ভেবেছে, সেটাই বলতে চাইছিল। মেয়েটা তার খপ্পের নয় বুঝতে পেরে অশ্রীল ভাষার খিঁচি দিতে দিতে আবার সেই জায়গায় গিয়ে একইরকম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে খপ্পের ধরায় মন দিল।

একটা মেয়েকে দেখে কাফেলার মতো মনে হল না। তবু অনমিত তার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটার বয়স কাফেলার থেকে অনেক কম। বরং ওরই সম বয়সী হবে। মেয়েটি এগিয়ে এসে ওকে বলল, 'একশ টাকা'। ও কেবল মাথা নাড়ল। এবার মেয়েটি গামনের দরজা দিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দরজার দু'পাশে আরো তিন চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা একই রকম হেসে ওর দিকে তাকাল। ও মেয়েটির পিছনে পিছনে গেল। ভেতরের অপ্রস্তুত মাটির দালান পেরিয়ে একটা নড়বড়ে কাঠের দাঁড়িতে উঠে বারান্দা দিয়ে ওকে নিয়ে চলল। সামনের ঘরগুলোর ভেতর আলো তার নারী পুরুষের কথা শোনা যাচ্ছে। একটা ধারের রুমের ভেতর মেয়েটা ক'কিরে ক'কিরে কাদছে মনে হয়। ওর সঙ্গে মেয়েটি ওকে নিয়ে একদম কোণের ঘরে ঢুকল। অপ্রস্তুত একটা কক্ষ। কেবল একটা ছোট তক্তাপোষ পড়ে আছে। আর দু'ধারে কোনো জায়গা নেই।

ভেতরে একই মেয়েটি সুইচ টিপে আলো জ্বললে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজের শরীর থেকে এক এক করে সব খুলে ফেলল। অনমিতর দিকে এগিয়ে এসে ওর সব খুলে দিতে গলে অনমিত তার হাত ধরে বলল, 'না, আজ থাক। শোন মেয়ে, রোজ রাতে তো তোমাকে এই কাজ করতে হয়। আজ তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও।' মেয়েটা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বাহানা ভেবে অভ্যাস মতো আবার অনমিতর পোষাক খোলার জন্য ওর দিকে হাত বাড়াল। আবার বাধা পেয়ে এবার কেঁদে ফেলল। এই প্রথম অনমিতর মেয়েটিকে জীবন্ত মনে হল। মেয়েটিকে স্নানও মনে হল। পাশে শুতে ইঙ্গিত করল। বাধ্য মেয়ের মতো এবার সে শুয়ে পড়ল। অনমিত তাকে বলল, 'তুমি তোমার গল্প বল।' বলতে বলতে একটু পরেই মেয়েটি ঘুমায়ে পড়ল। দেওয়াল ভেদ করে ওপাশ থেকে অন্য অন্য রুমের ভক্তাভক্তি কান্না, হাতাহাতির সুর ভেসে এল। অনেক রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে অনমিত আবার হাটতে শুরু করল। একটা রুম থেকে তখনও গানের সুর ভেসে আসছে, 'এ দিল তো কঁড়ি জাগতা নেই—হাম কেন্না করে...'

পাঁচ দিনের দিন মনের অসহনীর ভাবটা ধীরে ধীরে ক্রিয়ক্স হ্যাঙ্কা হয়ে গেছে মনে হল যেন। আজ শনিবার। শহরেও তেমন ব্যস্ততা নেই। মনে পড়ল, শনিবার হলোই কলকাতার মেসে ক্রিয়ক্স ফাঁকা হয়ে যেত। এক ডেভিড থার শ্যামানন্দ বলে সেই ছেলোটো। ছেলোটো ক্রিয়ক্স ইনট্রোডাক্ট টাইপের ছিল। কারুর সঙ্গে মিশত না। কারুর সঙ্গে কথা বলত না। নিজেকে সবার কাছ থেকে ক্রিয়ক্স গুটিয়ে রাখত। মেসে থাকার সময় কোনো দিনই থাকে মানব বলে মনে হয়নি, আজ সেই শ্যামানন্দের কথা খুব করে মনে হল। মেদিনীপুরেরই ছেলে। ঘাটালের দিকে কোথায় যেন বাড়ি। ওর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়। যদি এখনও মেসে থাকে। লাফ্ট বার বোধহয় ফেল করেই গেছিল পরীক্ষার। তাই থাকলেও থাকতে পারে, হরতো নেই। তবে দেখা যাক।

অনেকদিন পরে মেসে ফিরে এল। মেসের সেই পঞ্জারী একই রকম আছে। ওকে কাছে ডেকে বসাল। এখন রান্নার কাজ নেই। সেই সন্ধ্যা। ওকে পেয়ে অনেক গল্প বলতে শুরু করল। দেশের গল্প। নতুন বোর্ডারদের গল্প আর একটা অদ্ভুত গল্প বলল। একজন জাল নোটের কারবারি। ভুল করে যে ছাঁচ তৈরি করেছে তা থেকে টাকা ছেপে দ্যাখে সব পনেরো টাকার নোট। কি করে। এ নোট তো আর শহরে জাল করা যায় না। তো, সে অনেক ভেবে ঠিক করল। গ্রামের লোক এ সব বুঝবে না। তাই গ্রামে এ টাকা চালানো সহজ হবে। সে তার সমস্ত টাকা ব্যাণ্ডে ভরে গ্রামে চলে গেল।

এক অল্প পাড়াগার মধ্যে গিরে, সন্ধ্যার সময় হাটের শেষে এক ছলা-মুড়ি চালকলাই বিক্রির দোকানে, টিমটিম করে কেরোসিন লম্ফোর আলো জ্বলছে। জালি ভাবলে এ লোকটাই ওর উপযুক্ত খোদ্দের হবে। দোকানের ভেতর মূখ বাড়িয়ে বললে, 'দাদা পনেরো টাকার খুঁচরো হবে।'

'হ্যাঁ হবে। তবে এক টাকা বাটো লাগবে।' দোকানী বললে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে।' লোকটা ভাবলে এই মোক্ষম সুযোগ। ভেবে সে তার ব্যাগ থেকে একটা পনেরো টাকার নোট বের করে দোকানীর হাতে দিল। দোকানী সেটা বাঁ হাতে নিয়ে লোকটাকে ডান হাত দিয়ে দুটো সাত টাকার নোট ফেরৎ দিল।

গল্প শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। গল্পের অভিনবত্বে অনমিত থ বনে গেল। এমন সময় শ্যামানন্দ এসে হাজির। তাকে দেখে অনমিত উঠে তার পিছন পিছন গেল। অনমিতকে দেখে আজ শ্যামানন্দ তার রুমের মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর অনেক কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে শ্যামানন্দ নিজের নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলল। এই জীবন সম্পর্কে অনমিতর কোনো ধারণাই ছিল না। স্বাভাবিকভাবে প্রাণারাম। পুরুষ, কুস্তক, রেচক—এ সব কথার

কোনো অর্থই বৃদ্ধি না। শ্যামানন্দ তাকে সব জ্ঞানাল, বর্তমান অশান্ত উৎসৃষ্ট পৃথিবীর মানবের মর্জির একমাত্র পথ যে এই বোগাসনের দ্বারা অর্জিত শান্তির পথ শ্যামানন্দ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে সেই অভিমত বোঝাল। অনিমিত্র মনে হল সে অন্য এক জগতের কথা শুনছে। এই জগৎ এমন একটা জগৎ যার কোনোকিছুই তার কাছে পরিচিত নয়। এবং অশান্ত হ্রস্বকে শান্ত করার এটাই একমাত্র পথ জেনে অনিমিত্র এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠল।

অনেক রাত পর্বন্ত শ্যামানন্দ গল্প করল। আরো অনেক রাত অনিমিত্র বিন্দি কাটাল। ডোরের ঠান্ডা বাতাস জ্ঞানাল্য দিয়ে গারে এসে লাগছে। তন্ত্রার মতো আবশ্যে হঠাৎ সেখে শ্যামানন্দ কোথায় ভেসে চলেছে বাতাসের ওপর দিয়ে। আর এই উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থসর্বস্ব, চিংকার, চেঁচামেচি, খুন জখম রক্তাক্ত পৃথিবীতে অজ্ঞান মানবের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহের ওপর অনিমিত্র একা পড়ে আছে। চারিদিকে পচা গন্ধ, নাক বন্ধ করেও পেটের ভিতর থেকে বমি বেরিয়ে আসছে। অশ্বকার কোনোদিকে আলো নেই। শৃগাল গৃধরা সব যেন শ্মশান নৃত্য করছে। একটা কি ভরষার জন্তু তার গলে বাওয়া চোখ অথচ বিরাট বীভৎস দাঁত বের করে অনিমিত্রকে ত্যাগ করে আসছে। অনিমিত্র জ্বরে চিংকার করে বলছে 'বাঁচাও বাঁচাও'। অথচ কোনো দিকে কোনো লোক আছে বলে মনে হয় না। অনেকক্ষণ একইরকম ভাবে পড়ে আছে মনে হল। শরীরে উঠবার মতও শক্তি নেই। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। কেউ যেন বৃক্কের ওপর চেপে বসে আছে। জ্বর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে ঘুম ভেঙে গেলে ঘেরকম হয় সেরকম হোল। ও দেখে নিজেই হাত দুটোকে পোঁচ দিয়ে বৃক্কের ওপর ধরে রেখেছে। পাশের খাটে শ্যামানন্দ কানাসনে বসে। ওর সারা শরীরে ঘাম দরদর করছে।

সকালে উঠে স্নান করে ও আবার বেরিয়ে পড়ল। আজ রবিবার। পথ-ঘাট একদম ফাঁকা। শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে এসে, তিন নম্বর বাগবাজার প্রীরামপুর বাস ধরে দক্ষিণেশ্বরে এসে নামল। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে কখনও গঙ্গার পাড় ধরে, কখনও পিচ ঢালা রাস্তায় হেঁটে আরও উত্তরে চলে এল। এখানে একটা মন্দিরের মতো ঘরের সামনের গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। আরও কতকগুলো লোককে অনুসরণ করে একটা ঘরের মধ্যে এল। সেই ঘরের ভেতর একজন ধপধপে সাদা সাহেব সম্মাসী ধারে ধারে ইংরেজিতে কি উপদেশ দিচ্ছে। সবাই চুপচাপ, আর পশ্চাসনে বসে। ও নিজেও তাদের অনুসরণ করল। সাহেবী সম্মাসীর ইংরেজী কথাগুলো এবার ওর কানে এল। গতকাল রাতে শ্যামানন্দ যে সব কথা বলছিল, সাহেবের ইংরেজী কথাগুলো সেই সব কথারই ভাষান্তর। ধ্যান করার নানা পদ্ধতির আলোচনা

হচ্ছে। তারপর সেই সাহেব সম্ম্যাসী নিজে করেকটি মূর্তা করে দেখালেন।
কিভাবে শ্বাস টেনে ধরে রেখে আবার ছেড়ে দিতে হয়; তাই দেখালেন।

তার বলা শেষ হলে দৃ একজন প্রণয় করলেন। তিনি তার উত্তরও দিলেন।
তারপর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সভাস্থ সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে
লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন। সম্ম্যাসী এক এক করে তাদের হাতে মিস্টি আর এক
কুচি করে নারকেল দিলেন। আর মূখে বললেন 'ও' তৎসৎ'। অনামিত সেই
প্রসাদ গ্রহণ করে ঘুরে ঘুরে দেখল চারদিক। এই সংঘ একজন ভারতীয়ের
গড়া। এ হল যোগদা সংসঙ্গ মিশন। যিনি গড়েছেন তিনি স্বামী যোগানন্দ।
এই সব সাহেব সম্ম্যাসীরা তাঁরই শিষ্য। আরও জানলেন, আজ যিনি উপদেশ
দিলেন, তিনি সাহেব হলেও নিজের নাম গ্রহণ করেছেন স্বামী ধীরানন্দ।
এখানেই থাকেন; এঁদের মূল অফিস রাঁচিতে।

এই আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলের কোনোকিছুই অনামিতর পরিচিত নয় এদের
কাউকেই ও চেনে না। এমনকি ছেলেবেলা থেকে কোনো দিন কোনো পুজো
পুণ্যপাঞ্জলি দেয়নি। বরং ছেলেবেলার দাঁদর পুজো করার সময় তার পিছনে
কত লেগেছে। মারের বকুনি শুনছে, বাবার আদর পেয়েছে। তবু আজ
এখানে এসে কেন যেন হৃদয় ও মনকে বেশ শান্ত মনে হল। এখানের এই বাড়ি
ঘর, সাধন মন্দির, চারদিকের গাছপালা, সাজানো বাগান—সব কি সুন্দর
শান্তির আশ্রয় মনে হল। এই গঙ্গার তীর কলকাতার কত কাছে। তবু
কলকাতার থেকে কত সুন্দর আর নির্মল আর অগাধ মনে হল এর স্রোতকে।
সমস্ত হৃদয় মন অন্য এক আনন্দে ভরে আছে যেন। দৃপদে এদের সঙ্গে
একত্রে বসে নিরামিষ ভাত খেল। নিরামিষে এতগুলি ব্যঞ্জন আর এমন
চমৎকার রাসা। ওর মনে হল এ এক অন্য পৃথিবী।

সপ্তাহ পরে আজ প্রথম এই একটা সময়কে আবার সুন্দর মনে হল।
বিকলে ব্যারাকপুর রোডে এসে বাস ধরে হাওড়ার ফিরে এল। ঠাকুমার কথা
মনে পড়ল। মা-এর মূখ আবার ভেসে উঠল। মনে হল আবার ও পারবে
নতুন করে নিজের গ্রামকে গড়ে তুলতে। হাওড়া-মেচাদাগামী ট্রেনে উঠে
বসলো। ট্রেনের চেয়েও দ্রুত গতিতে বাড়ির দিকে ছুটে চলল অনামিতর
উদ্ভাস্ত মন।

দিনমাগন

সমীর কুমার রায়

চৈত্র মাস। পড়ন্ত বেলা। কিছুক্ষণ আগেও খটখটে গা-জ্বালানো রোদের সারা আকাশ-জোড়া দাপাদাপি ছিল। এখন ঈশান কোণে মোষের মতো ঘন কালো মেঘের স্নিগ্ধ উপস্থিতি।

মনসী বেরবে। বাথরুমে গিয়ে মাথা ছাড়া গোটা গা ভাল করে ভিজিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিয়েছে। নিজের ঘরে এসে প্রায় সারা দেহে সদ্য-কেনা নতুন পাউডারের কোটা থেকে সাদা মিছারির গুড়োর মতো নরম পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর বাইরে বেরবার অন্তর্বাস এবং শাড়ি-ব্লাউজ পরে। পরনের পোশাকে সেন্ট স্প্রে করে। বিদেশী পারফিউম। যে সব লোকদের হোটেলে মনোরঞ্জন করা ওর কাজ তাদেরই একজন ওকে এটা প্রজেক্ট করেছে। ঠোঁটে গাঢ় লাল রংয়ের লিপস্টিকটা ভাল করে ঘষে জেসিং টেবিলের আয়নায় দেখতে দেখতে জিভ দিয়ে ঠোঁট চটে নেন।

কাঁধের উপর থেকে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোয়। হোটেলে পৌঁছানর সময় এগিয়ে আসছে।

সৌদামিনী বলেন, ‘আকাশ কিন্তু কালো হয়ে এলোরে।’

মানসী এতক্ষণ আকাশের দিকে তাকায়নি। নিজেই নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার মায়ের কথায় আকাশের দিকে তার চোখ পড়ে। কপালে পরপর কয়েকটা ভাঁজ পড়ে। ওর হোটেল এসন্ন্যানেডে। বাড়ি থেকে রিস্তা করে স্টেশনে যেতে হবে, তারপর ট্রেনে হাওড়া, সেখান থেকে ট্যাক্সিতে এসন্ন্যানেড। অনেকটা পথ। যদি মাঝখানে বৃষ্টি নেমে যায়। তবু ওকে বেরতে হয়। আজ একজন বড় খন্দেরের সঙ্গে আপয়েন্টমেন্ট আছে।

মানসী কোথায়, কি ঝঙ্ক করে সৌদামিনী জানেন না। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও তেমন কোন স্পষ্ট উত্তর পাননি।

কিছুক্ষণ বাদে কালবৈশাখীর ঘূনিঝড় চারদিক কাঁপিয়ে নামে। তার কুহেলিকা ঢাকনায় পৃথিবী আবৃত হয়।

সৌদামিনী চেঁচিয়ে ডাকেন, 'অনু'!

'অনু', ছোট মেয়ে অনুরাধার ডাক-নাম। সাড়া না পেয়ে আরও দু-তিনবার ডাকেন। তাতেও জবাব না পেয়ে বিরক্ত হয়ে নিজেই ওঠেন।

'পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন,' নিজের মনেই গজগজ করেন।

সৌদামিনী রান্নাঘরে ছিলেন।

উঠানে যাবার বন্ধ দরজার মাথার টিন ঝড়ের ধাক্কায় শব্দ করে কাঁপে। সৌদামিনীর ভয় হয়। যদি ভেঙ্গে যায়।

যে ঘরে অরুণনাথ শূয়ে থাকেন, তার দুটো জানালাই সৌদামিনী খুলে রেখে এসেছিলেন। এবার বন্ধ করার জন্য সেই ঘরে যান।

অরুণনাথ গত দু-বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী।

বাইরে এখন প্রকৃতির ভাণ্ডব চলছে। সৌদামিনীর মুখের উপর ঝড়ের ঝাপট লাগে। পাল্লা টানতে অসুবিধে বোধ করেন। ঘূনিঝড়ের উত্তোচাপে হাত ফসকে পাল্লা সরে যেতে থাকে।

'থাক', বন্ধ করতে হবেনা, অরুণনাথ শূয়ে শূয়ে বলেন। পক্ষাঘাতে যদিও তিনি শয্যাশায়ী, কথা বলার ক্ষমতা এখনো লোপ পায়নি।

'খলোয় ভরে যাবে,' বাঁদিকের পাল্লাটা হাত দিয়ে টানতে টানতে সৌদামিনী বলেন।

পাশের বাড়ির বাগানের টগর ফুলের গাছটা ঝড়ের দাপটে একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ নুয়ে পড়ছে। গোটা আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। প্রকৃতির কি রুদ্ধ রূপ। সে তার ভাণ্ডব বাহিনী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে।

জানালা বন্ধ করে সৌদামিনী অরুণনাথের মাথার কাছে বিছানায় এসে বসেন।

'এই ঝড়ের মধ্যে মেয়েটা বেয়োল।'

‘যেতে দিলে কেন?’ অরুণনাথ বলেন।

‘তোমার মেয়ে কি আমার কথা শোনে!’

অরুণনাথ বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ‘আমার দোষেই আজ সংসারের এই হাল! আমি যদি বিছানার না পড়ে যেতাম, আজ কি মেয়েকে রোজ-গারের জন্য পথে বেরতে হতো!’

‘এতে তোমার কি দোষ! কারখানাটার ধর্মঘট, লক আউট হলো। এর জন্যতো তুমি দায়ী নও, ইউনিয়ন আর মালিক দায়ী! আর বিছানায় তো তুমি ইচ্ছে করে পড়ানি।’

‘চাকরির বাজার এতো খারাপ, কারখানাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর কোথাও কাজ পেলামনা।’

যাকগে, ওসব ভেবে আর কি করবে! মণিতো সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’

ঝড় ঝামে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। তার পৃথিবী তোলপাড় করা শব্দ সৌদামিনী আর অরুণনাথের কানে পৌঁছয়।

বাইরের ঘাম-ঝরানো প্যাচপেচে গরম এই বরফ-ঠান্ডা ঘরের হাওয়ার বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনা।

মানসী ফর্সা নয় ঝাঁহাত মাথার দিকের হ্যাঙ্গারের দিকে বার্ডিয়ে শোশাক টেনে নেয়।

অনাবৃত লোকটা পরম ভূপ্তিতে বৃন্দ হয়ে এখনো চিং হয়ে শূরে আছে। ঘন কালো লোমশ বৃক। লোকটাকে একটা আদিম জন্তু বোধ হয়।

নিজের পোশাক পরা হয়ে গেলে মানসী তখনো শূরে থাকা লোকটাকে বলে, ‘আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন?’

এই প্রার্থনা মানসী অধিকাংশ ঋতুরের কাছেই করেই থাকে। এবং এ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে এড়িয়ে গিয়েছে। তবুও মানসী প্রার্থনা জানাতে বিরান দেয়না। হয়তো তার প্রত্যাশা, একদিন না একদিন কেউ না কেউ সাড়া দেবে।

‘কেন, তুমিতো কাজ করছো’, লোকটা অজুত নিলিঙ্গভাবে জবাব দেয়।

‘এ কাজ নয়’ কোন ভদ্র চাকরি। আমি গ্র্যাজুয়েট।

লোকটা শব্দ করে হেসে ওঠে। তার হাসি মানসীর কাছে ক্রোড় ঠেকে।

‘আরে কতো গ্র্যাজুয়েট রাজা দিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চেয়ে তুমি তো ডাল আছো। তোমার গত্তরে ঢেকনাই আছে, ঋতুরের অভাব হবে না। মোটা টাকা কামাচ্ছে।’

মানুষের জীবন আঁকাবাঁকা খাদ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই জীবনটাও

তার ব্যতিক্রম নয়। যতদিন বাবার কারখানার চাকরিটা ছিল ততদিন ওর জীবনে সুখ এবং আনন্দ ছিল। সড়কটা ছিল সোজা। তারপর বাবার কারখানার ধর্মঘট। আশা ছিল, ইউনিয়ন জিতে যাবে। মালিক দাবী মেনে নেবে। তা না হঠাৎ একদিন মালিক লক আউট করে দিলো। তারপর কারখানাটাই উঠে গেলো। আর একটা চাকরির জন্য বাবা কত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারানি। জমান টাকা, মায়ের গয়না, সব একে একে নিঃশেষিত হলো। তারপর বাবা স্ট্রোক, পক্ষাঘাত। ও-ই তো দাদার পরে জ্যেষ্ঠ সন্তান। সংসার চালানর দায়িত্ব ওর কাঁধেই তখন এসে পড়ে। বাইরের পৃথিবী যে কত শক্ত, পাথুরে জমি, তখনই ও সেটা হাড়ে হাড়ে টের পার। কোথায় চাকরি। সামান্য একজন গ্রাজুয়েটের সেখানে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়া প্রায় পরিশ্রমণ খুঁজে পাওয়ার মতো ব্যাপার। অবশেষে এই রাস্তায়। চেনাজানা এক মহিলা ওকে এই হোটেলের মালিকের কাছে নিয়ে আসে। এই কাজ নেওয়া ছাড়া তখন ওর সামনে আর কোন পথ ছিলনা। হয় অনাহারে সপরিবারে মৃত্যু, না হয় বেঁচে থাকার এই সড়ক।

কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। রুদ্ধ, খটখটে আকাশ।

হাই-হিল জুতোয় মেঝেতে শব্দ তুলে মানসী তিনতলার রুম থেকে অন্ধকে নির্ভর বেয়ে নীচের একতলার লাইনে এসে পৌঁছায়।

হোটেল-বিল্ডিংটার সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকাংশ ড্রাইভারই মানসীর পরিচিত। বাড়ি-ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে যেতে সে সবসময়ই ট্যাক্সি নেয়।

হোটেল-চত্বর থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়।

লাইনের সব থেকে আগের ট্যাক্সিটা ওর সামনে এসে থাকে।

‘হাওড়া স্টেশন।’

ড্রাইভার পেছনের দরজাটা খুলে দেয়।

রাতের নিঃশব্দ কলকাতা। আলোকমালায় সজ্জিত। নিজের পথঘাট। ফুটপাথে এখানে সেখানে কিছ, কিছু মানুষ নিপ্লিত। মাঝে মাঝে কুকুর ভেঁকে উঠছে।

ট্যাক্সির নীচে মাথা হেলান দিয়ে মানসী চোখ বন্ধে থাকে। বড় ক্লান্ত।

রাতের এই কলকাতা ওর খুব পরিচিত। প্রতি রাতে এই পথ ধরে ট্যাক্সিতে করে ও হাওড়া স্টেশনে যায়। দুপার্শ্বের বাড়িগুলো, বিহান ফুটপাথ, স্কল্ড-শীর্ষে জ্বলতে থাকা আলো, সব সব চেনা। চোখ বোজা অবস্থাতেই ও ট্যাক্সির হাওড়া-ব্রীজে ওঠা অনুভব করে।

প্রতি রাতে এক একজন যাত্রীর সঙ্গে খেলা শেষ হওয়ার পর পেটের

ভেতর হতে বমির দল। উগরে আসার মতোও তাদের উদ্দেশ্যে একটা গালা-গালির শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করে।

বাড়ি ফিরে শাওয়ার খুলে দিয়ে তার নীচে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে দাঁড়ায়। দেহ হতে সব প্রেস খুসে-খুসে সাফ হয়ে থাক।

পরিদিন অনেক বেলা ধরে ওর দিন শূন্য হয়। কর্মময় পৃথিবী তখন বেশ এগিয়ে গেছে। কেউই আগে তাকে ডেকে তোলেনি। বাড়ির সকলেই জানে সে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। তাই কেউ তার সকালের ঘুমের বিঘ্ন ঘটায়না।

ছুই □

এক সময় কলিংবেল বেজে ওঠে। মানসী কিছুক্ষণ আগে সকালের জল-খাবার শেষ করেছে। দরজাটা ও-ই খোলে।

পোস্টাফিসের পিওন পোস্টকার্ডে লেখা একটা চিঠি দিয়ে যায়। মানসী চিঠিটা পড়ে। মাকে লেখা চিঠি।

সৌদামিনী অরুণনাথের কাছে বসেছিলেন। মানসী তাঁর হাতে চিঠিটা দেয়।

‘কার চিঠি?’ সৌদামিনী জিজ্ঞেস করেন।

‘দাদার।’

মানসীর দাদার নাম কৌশিক। পদুশিশের এক কনস্টেবলকে খুনের অপরাধে গত পাঁচ বছর ধরে জেল খাটেছে। যে রাজনীতিতে সে বিশ্বাসী, সে অনুযায়ী পদুশিশ কনস্টেবল খুন করা দেশে বিপ্লব ঘটানর একটা উপায়। সাজা অনুযায়ী, তাকে আরো পাঁচ বছর জেল খাটতে হবে।

‘কি লিখেছে রে?’ সৌদামিনী প্রশ্ন করেন।

এক সময় মানসী দাদার মুখ সমর্থক ছিল। তখনও অরুণনাথের কার-খানায় সেই ধর্মঘট যার পরিণতিতে মালিকের লকআউট ঘোষণা, তা শূন্য হয়নি। অরুণনাথ সেখানে কাজ করছেন এবং নিরমিত মাইনে পাচ্ছেন। এখন অবশ্য মানসীর ধারণা, কৌশিকের হঠকারিতার জন্যই এইভাবে আজ তাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। তাই দাদার উপর তার একমুগুরনের ক্ষোভেরও সন্দিগ্ধ হয়েছে।

‘পড়ে দেখো।’ মানসী সংকিশ্ন জবাব দেয়।

‘চশমাটা দে।’ সৌদামিনী বলেন।

‘ওর-কি ছাড়া পাবার সময় হয়েছে? অরুণনাথ প্রথ্য করেন।

‘সেতো এখন বছর পাঁচেক আরো বাকি,’ মানসী জানায়।

এ সত্য যে অরুণনাথের অজানা তা নয়। আসলে তিনি জানতে চের-

ছিলেন, আগে ছাড়া পাবার কোন ইঙ্গিত কৌশিকের চিঠিতে আছে কিনা।

‘জেলেটা যে কি সম্বন্ধে পথ ধরল,’ সৌদামিনীর কঠম্বরে আপেক্ষ প্রকাশ পায়।

শহরের যে অঞ্চলে এঁদের বাড়ি, সেই পাড়াটাকে বাবুপাড়া বলা হয়। অরুণনাথের বাবা এখানকার ডি. এম অফিসে হেড-ক্লার্কের পোস্ট পর্যন্ত প্রমোশন পেয়েছিলেন। একতলা বাড়িটা তাঁরই করা। তখনকার দিনে জমির দাম এত হয়নি।

এই অঞ্চলে অনেকটা ডিমের আকারের একটা পুকুর আছে। টলটলে পরিষ্কার জল। লাল পদ্ম ফোটে। লোকে বলে পদ্মদীঘি।

এখানকার ডক্টর উৎপল ভৌমিক অরুণনাথের চিকিৎসা করে থাকেন। তিনি এই পাড়ারই বাসিন্দা। সেই হিচাবে দু’পক্ষে আগে থেকে পারিবারিক পরিচয় আছে। মানসীরা তাঁকে ডাক্তারবাবু বলে সম্বোধন করে থাকে। সৌদামিনী ডাক্তারবাবু। তাহলেও অরুণনাথকে চিকিৎসা করার জন্য কি নেন মানসীরাও দিয়ে থাকে।

সপ্তাহে তিনি একদিন অরুণনাথকে দেখে যান। প্রতি বুধবার। সম্বোধন। চেন্ধারে শাওরার আগে এ-বাড়ি ঘুরে যান।

আজ বুধবার।

‘কি কেমন আছেন?’ অরুণনাথের পাশে টেনে দেওয়া চেয়ারে বসে ডক্টর ভৌমিক প্রতিবারে মতই অরুণনাথকে প্রশ্নটা করেন।

উৎপল ভৌমিকের দুই মেয়ে। বড়টির সঙ্গে কৌশিকের বিয়ে ‘দেওয়ার জন্য তাঁর বস্ত আশ্রয় ছিল। ভাল ছাত্র হিসেবে এই শহর কৌশিকের খুব নাম ছিল। তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিলনা। এই বিয়ের ইচ্ছেও তিনি অরুণনাথের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অরুণনাথের ও আপত্তি ছিল না। উৎপলের বড় মেয়েটি সুন্দরী, নম্র ও ভদ্র ছিল। তাকে অরুণনাথ ও সৌদামিনী দু’জনেই পছন্দ করতেন। তখন কি তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, যারা রিভলবার দিয়ে পুলিশ খতম করেছে কৌশিক তাদের দলে ভিড়ে যাবে! সৌদামিনী ও অরুণনাথ জীবনে যত আঘাত পেয়েছেন, এটাই বোধহয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আঘাত। উৎপলও যখন সব জানলেন মেয়েকে নিয়ে সরে গেলেন। কে আর সাধ করে নিজের মেয়ের গলায় কোপ বসাতে চায়। মেয়েটি এখন উত্তরবঙ্গে কসরত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরনী।

‘আমার আর থাকা! এখন ভগবান নিলেই বাঁচি।’

উৎপল স্টেমোস্কোপের সাহায্যে প্রতিবারের মতোই অরুণনাথের বুকে ও পিঠ পরীক্ষা করেন। তারপর সেটা বাস্তবে ঢুকিয়ে রেখে বলেন, জিভটা বের

করুন'। টেবের আলোর সাহায্যে গলার ভেতরটা দেখেন। মামুলী সব পরীক্ষা। প্রতিবারের মতো করা। আসল অসুস্থতার কোন চিহ্নই আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞান বের করতে পারেনি। তাই অরুণনাথের বিজ্ঞানায় শূন্যে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

অধিকাংশ দিনই মানসী সঙ্গে উৎপল ভৌমিকের দেখা হয়না। কারণ, তিনি সচরাচর আর একটু পরে আসেন। মানসী তার আগেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু আজ উৎপল সন্ধ্যার আগে এসেছেন, তাই মানসী এখনো বাড়িতে বেরবার জন্য তৈরী হচ্ছে। নিজের ঘরে বাইরে বের হবার পোশাক পরছে।

এখন না সন্ধ্যা, না বিকেল, সেই সময়। গোছালি। দিনের পড়ন্ত আলো স্নান-মুখে বিদায়ের অপেক্ষার। কী করুন তার মুখছবি। মানসীর বর্তমান মন্থের সঙ্গে অশুভ সাদৃশ্য।

স্কুল এবং কলেজে পড়ার সময় মানসী স্বপ্ন দেখতো। বিখ্যাত নর্তকী হওয়ার স্বপ্ন। গুরুর কাছে ভারত-নাট্য নাচ শিখতো। তবে এখনো নাচে। তাকে নাচতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রেই নির্দেশ মতো নৃত্য ঘরে তার মনোরঞ্জননের জন্য অঙ্গীল নাচ। যার সঙ্গে ভারত-নাট্যম নৃত্যের বিপ্লব বিনয় সম্পর্ক নেই। মানুষের জীবনের ইতিহাস এমনি আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে। কখন কোথায় কোন মোড় নেবে তার আগাম ইঙ্গিত থাকে না। একেই জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলা যায়। মানুষে যাকে বলে, বিধিলিপি।

'কাকাবাবু, বাবাকে কেমন দেখলেন?' উৎপল চলে যাবার সময় মানসী তাকে জিজ্ঞেস করে।

অনেকটা, কিছুক্ষণ আগে অরুণনাথে মস্তব্যারই প্রায় প্রতিধ্বনি করে উৎপল উত্তর দেন, 'ও'র আর এখন থাকার্য্যিক';

ফি নিয়ে উৎপল চলে যান।

তিত

আম্বাট মাস। ভূষণচন্দ্রীর মাঠে এই সময় দিন পনেরের জন্য মেলা বসে। এই মেলা এই অঞ্চলে খুব বিখ্যাত। শূন্য এই শহরে নয়, দূর দূরান্তের গ্রামগঞ্জে অনেক মানুষও এই মেলা দেখতে আসে। খুব ভীড় হয়। একটা সার্কাসও আসে।

হাটু গেড়ে বসে অনুরাধা মাটির উপর প্ল্যাশ্টিকে রাখা কিন্নরকের পুতুল দেখছিল এগুলির কারুকার্য ভাবি সুন্দর, চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা তাজমহলও আছে। সেটাই তাকে সব থেকে বেশী টেনেছে। কেনার আগে

সেটাকে সে ভাল করে দেখে নিচ্ছিল।

এই মেলা দেখার জন্য সে দিদিকে তাগাদা দিয়ে নিয়ে এসেছে।
কয়েক বছর আগেও মানসী উৎসাহে, উল্লাসে, উদ্দীপনায় বাড়ির সকলকে
নিয়ে এই মেলায় আসতো। কিন্তু এখন মানসীর সমস্ত উৎসাহ এবং উদ্দী-
পনা স্তিমিত হয়ে গেছে। কড়ে বিধ্বস্ত পাখীর মতো ও মৃৎ গুঁজে পড়ে
আছে। অনুরাধাই তাকে তাগাদা দিয়ে নিয়ে আসে। দিদির প্রতি সে
এক ধরনের মমতা বোধ করে। তাদের জন্যই নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে
বসেছে সে।

‘কিনবি?’ বোন অত যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে কিন্নকের
তাজমহলটা দেখছে দেখে মানসী বলে।

অনুরাধা মরাল-গ্রীবা পেছন দিকে ঘুরিয়ে প্রসন্ন-মুখে বলে, ‘দিবি?’

‘কেন।’

অনুরাধার মৃৎ খুঁশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে এ-সব শৌখিন জিনিষ-
পত্র খুব ভালবাসে। বাড়িতে তার কেনা বেশ কয়েকটা পুতুল শো-কেসে
ঠাই করে নিয়েছে। গতকাল সে অরূপের সঙ্গে এই মেলায় এসেছিল।
অরূপ শুধু তার সহপাঠী নয়, দূরত্বের মধ্যে একধরনের অন্তরঙ্গতাও গড়ে
উঠেছে। অরূপ ওদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসে। দূরত্ব দূরত্বকে পড়াশোনার
সাহায্য করে।

মানসীর সঙ্গে অরূপের পরিচয় আছে। সে অরূপকে ছোটভাইয়ের মতো
ভালবাসে। তার নিজের ফোন ছোট ভাই নেই। অরূপ সে-স্থান দখল করে
নিয়েছে। ছেলেটি সত্যিই ভাল। স্নেহ করবার যোগ্য। মানসীর মনের
ভেতরে একটুকরো আশা ছোট চারার মতো বাড়তে থাকে। অরূপ হয়তো
একদিন তার ভগ্নীপতি হবে। এই আশা-চারার সাথে একটা শংকাও কালো
মেঘের মতো ঘিরে থাকে। অরূপ যদি কোনদিন মানসীর কাজের আসল
পরিচয় জানতে পারে? সত্যি কত দিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব? তখন কি সে
অনুরাধাকে বিয়ে করতে রাজি হবে? যে অনুরাধার দিদি একজন কল-গার্ল।

কিন্তু মানসীর করার কিছু নেই। নিজেকে এবং পরিবারের আর সকলকে
এই রুদ্ধ পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই পথ ধরা ছাড়া ওর সামনে
আর কোন পথ যে খোলা ছিল না। একটা ভদ্র চাকরির জন্য কম লোককে
তো ধরেনি। কেউ কি দিয়েছে? জীবনের রুদ্ধ, কঠিন মাটির সঙ্গে ওর
তখন ভালরকমের পরিচয় হয়েছিল। জীবনটা একটা সরু, অশ্বকার গলি,
যেখানে এক ফোটা আলোও নেই।

তবে কিনা, সেহেতু কলকাতার হোটেলের কাজ করে, এই শহরে তার
কাজের পরিচিতি এখনো ছড়িয়ে পড়েনি। তাছাড়া, ভদ্র, রুচিশীল মেয়ে

হিসেবে পাড়ার ওর সন্ধান ছিল এবং একলগ আছে। অনেক নেয়েরইতো চাকরির সময় রাতের দিকে। বহু অফিসেই তো শিফটে কাজ হয়।

অনুরাধা কালীমন্দিরের কাছে বাম্ববীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ও ধরে বাম্বিকের রাস্তা, তারা সোজা চলে।

বিকেল। আকাশে কালো মেঘ বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ছড়ান। কিন্তু হাওয়া নেই। গুমট ভাব।

অনুরাধারা কলেজ থেকে ফিরছে। একটু আগে রামপ্রসাদের কাছ থেকে ও আর বাম্ববীরা ফুটকা কিনে খেয়েছে। তার স্বাদ জ্বতে লেগে আছে। মানসী প্রতি মাসে ওকে হাত-খরচ দিয়ে থাকে। দিদির প্রতি ও কৃতজ্ঞ। বাবার চাকরি না-থাকার অসুবিধে সে টের পেতে দিচ্ছে না।

জজকোর্টের নামা উঁকিল বিমলানন্দ সান্যালের হলুদ-রংয়ের দোতলা বাড়ির সামনের মাঠের রাখাচুড়া গাছের ডালে দুটো কাক ল্যাজ ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসে। এঁর বড় মেয়ে কলেজে ওর থেকে এক ইয়ার নিম্নয়ার। মোটের করে কলেজে আসে।

সমরেশ উল্টো দিক থেকে সাইকেলে আসছিল। হয়তো সে অনুরাধাকে এড়িয়ে যেতো। কিন্তু অনুরাধা তাকে সে সুযোগ দেয়না।

‘সমরেশদা !’

এখন সাইকেল থামান ছাড়া সমরেশের সামনে আর কোন গত্যন্তর থাকে না। নইলে ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টি কটু এবং অশোভন ঠেকতো। অনুরাধার সঙ্গে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক একদিন অনেকটা নিজের বোনের মতনই ছিল। আজ অবশ্য সম্পর্ক বলে কিছু আছে কিনা তা ভাবার বিষয়। কেননা যে সূত্রের মাধ্যমে এই সম্পর্কের সৃষ্টি, সেই সূত্র-সূতোটা বেশ কিছুদিন হলো ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। তার আর জোড়া লাগার কোন সম্ভাবনা আছে বলে ওর মনে হয়না।

সমরেশ দাঁড়িয়ে পড়ে।

‘কেমন আছো?’

অনুরাধা ষে-দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে তাকায় তা এক ধরনের প্রকৃতি হিসেবে পদ্যবেষ্ণু বলা চলে। সমারেশদা আগের থেকে কিছুটা রোগা হয়েছে। মুখে এবং চোখে বিষমভার আভাস। পরনে সেই আগের মতনই সাদা পাঞ্জাবী এবং পায়জামা, নিখুঁতভাবে দাঁড়িগোফ কামান। অনুরাধা জানে, তার দিদির সঙ্গে এই সমরেশদার একদিন ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। দুজনকে ভূষণচাঁদীর মাঠে একসঙ্গে বেড়াতে দেখা যেতো। সমরেশদা মাঝে মাঝেই তাদের বাড়িতে আসতো। দিদিকে পড়াশোনাতে সাহায্য করতো। তবে এসবই বাবার অসুস্থ হয়ে পড়ার আগেকার ঘটনা। তারপরেও

সমরেশদা ওদের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু দিদি চাকরি পাওয়ার পর কি যে ঘটলো! সমরেশদাকে আর তাদের বাড়িতে আসতে দেখেনি। দিদি চাকরি পাওয়ার পর একদিনই সমরেশদা এ-বাড়িতে এসেছিল। চলে যাবার সময় দিদি তাকে রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর দিদি বাড়ি ফিরে আসে। সমরেশদা আর কোনদিন আসেনি। দিদিকে সে অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছে, কেন আর সমরেশদা আসে না। কোন যথার্থ উত্তর পায়নি।

অনুরাধা সত্যিই দিদিকে ভালবাসে। তাই সমরেশের সঙ্গে দিদির এই বিচ্ছেদ তাকে গভীরভাবে মর্মান্বিত করেছে। এই দুঃখের মধ্যে মনো-মালিন্যের কারণ জানানর জন্য তার মন আজও আঁকুপাঁকু করে।

‘আপনি আর আমাদের বাড়িতে যাননা কেন, বলুনতো?’

সমরেশ অশ্রুতভাবে অনুরাধার মুখের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং বেদনা এমনভাবে জড়াজড় করে থাকে, যার কোন সংজ্ঞা নেই। অনুরাধার প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সেটাই সে স্থির করতে পারেনা। মানুষের জীবনের যাচাপথে কখন যে কোন ধাক্কা এসে পৌঁছয় এবং তার প্রকৃত কারণই বা কি তা নির্ণয় করা মাঝে মাঝে সেই মানুষেরই সাধার অতীত বলে বোধ হয়। সেদিন মানসী তাকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলোর ভাষাগত অর্থই যে প্রকৃত কারণ এখন সহজ, সরল বিশ্লেষণ করাকে সে মানসীর প্রতি অবিচার বলেই মনে করে। আবার অন্য অর্থও খুঁজে বের করা তার ক্ষমতার বাইরে ঠেকে।

কিন্তু অনুরাধার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া দরকার। এক সময় তো সমরেশ তাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করতো। কোন উত্তর না দিয়ে চলে যাওয়াটা কি রুচতা হবে না?

‘তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করো।’

সাইকেলে চুপে সমরেশ চলে যায়।

দিদিকে কি অনুরাধা জিজ্ঞেস করেনি? সঠিক উত্তর পেলেতো! আবার যদি জিজ্ঞেস করে দিদি ফের তাকে দুর্বোধ্যা ধারার দুর্গম বন্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এক অনাবশ্যক কোড়ুত বোধ করবে কেবল। দিদি কি তাহলে অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে? কিন্তু এরকম মনে করার মতো কোন ইঙ্গিতের এক কথা আঁচও এই কম বছরে অনুরাধা পায়নি। হলে নিশ্চয়ই পেতো। নিজের দিদিতো।

‘দিদি, সমরেশদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো,’ অনুরাধা মানসীকে খবরটা দেয়।

এক টুকরো কালো মেঘ হঠাৎ মানসীর মুখের কোণে দেখা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে গোটা মুখ ছেয়ে যায়। তা লুকানার জন্য মানসীর প্রচেষ্টা

সঙ্গে অনুরোধের তীব্র দৃষ্টি এঁড়ানো। দিদির প্রতি গভীর মমতাবোধে তার অগুর সিন্ধু হয়ে ওঠে। বেচারী! পিতার সংসারের জন্য নিজের জীবনের সুখ বিনষ্ট করে দিচ্ছে। প্রেমাস্পদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পর্যন্ত শিখা করেনি।

যে কাঙ্ক্ষিত পথ থেকে বিচ্যুত হতে হয়ে মানসী আজ ক্লেশের জীবনের আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করতে বাধ্য হয়েছে। সমরেশের নামোচ্চারণ সেই পথের স্মৃতি ফের তার চোখের সামনে টেনে এনে তাকে বিষয় করে তোলে। অতীতকে এখন ভুলে যাওয়াই তার বিবেচনায় শ্রেয়। সমরেশ সেই অতীতেরই অংশ। সমরেশকে মানসী প্রকৃত্তই ভালবেসেছিল। ভালবাসার মতোই যত্নবশত সে। শান্ত, ভদ্র, রুচিশীল। অরুণনাথের অসুস্থতার সময় সে যত্নেত করত। আজও মানসী সমরেশকে ভালবাসে। কিন্তু একসময় সে জীবনের রুদ্ধ বাঁকের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে দাঁড়াতে হয়। প্রেমাস্পদকে নিজের জীবনে ধরে রাখতে হলে, হয় চরম স্বার্থপরতা কিংবা মিথ্যার ছলনা এই দুই কদর্য পথের যে কোন একটাকে গ্রহণ করতে হবে, এই বীভৎস সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রেমাস্পদকে পরিভ্যাগ করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্বার্থপরতা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া এ দুটোই তার কাছে ঘৃণার যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে তাই সমরেশকে তীব্র অপমান করে নিজের জীবনের বস্তু থেকে ছেঁটে ফেলেছে। সেই অস্বস্তিকর ঘটনার সাক্ষী মাত্র দুজন—সে নিজে এবং যাকে অপমান করেছিল সেই সমরেশ। মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটা সেদিন থোকা থোকা ফুলে ফুলে ঢাকা ছিল। প্রকৃতির কি নিমর্ম উদাসীনতা। মানসী নামের এক নিরীহ মেয়ের জীবনে সেদিন চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল। নিজের হাতে সে নিজের মনকে দুঃসহ ব্যথা দিয়েছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের সোঁদিকে ত্রুক্ষেপও ছিলনা। রাশি রাশি ফুলের থোকা নিয়ে সে তখন চারদিকে সৌন্দর্য এবং আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

মানসী হয়তো বোনের সামনে সহজ হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছিলো?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুরোধের কোন আগ্রহ ছিলনা। সে শূন্য দিদির আসল প্রতিক্রিয়া বোকার জন্য উদগ্রীব ছিল। সেই কারণে, এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'তোদের মধ্যে ঝগড়া কেন হলো?'

'ঝগড়াতো কিছু হয়নি।' মানসীর নিরাসক্ত উত্তর।

'তাহলে সমরেশদা আর আসেনা কেন?'

'ব্যস্ত আছে হয়তো। চাকরি খুঁজছে বোধহয়।'

'এঁড়িয়ে যাচ্ছিল, দিদি।'

‘এড়াবার কি আছে?’

‘দুজনে সামনাসামনি কথা বলে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নে।’

কিন্তু কোন ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেবে মানসী? সমরেশের মাননে সে মিথ্যাচার করতে পারবেনা। ভালবাসার যে মূল ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বাস তাতে ফাটল ধরাবার মতো যে কাজ তাকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে তা লুকিয়ে সমরেশকে বিয়ে করার পথ খোলা রাখা তার কাছে এক ধরনের প্রবণতা মাত্র। সমরেশকে সে ঠকাতে রাজি নয়। আর সত্যি কথা যদি বলে তবে সমরেশের তাকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি রাজি হয়ও, তবুও সে নিজেকে রাজি হবেনা। নিজেকে এবং মা, বাবা ও বোনকে লিচিয়ে রাখার জন্য যে নয়লা সে সারা গায়ে মাখতে বাধ্য হয়েছে তার পরে সমরেশকে বিয়ে করার কোন যোগ্যতা তার আছে বলে সে নিজের কাছে স্বীকার করেনা। তার চেয়ে এই সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা ভালই হয়েছে। সমরেশ নিজের জীবনে নতুন খাদ দিয়ে বইতে নিয়ে যাও, মানসী দেখাতে কোন বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে চায়না।

অনুরাধা এই বিষয়টা নিয়ে একদিন অরূপের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। সমরেশ এবং দিদি তাকে এই ব্যাপারে কি বলোঁছিল, তা অরূপকে জানিয়ে সে বলেছিল, ‘দিদির সঙ্গে সমরেশদার কেন ঝগড়া হলোতো?’

অরূপ বেচারা তা কেমন করে বলবে! অনুরাধা যতটুকু জানে তার এক শতাংশও সে জানে কিনা সন্দেহ। সে তাই চুপ করে বসে থাকে। অনুরাধার প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়না।

‘তোমার মাথায় ‘এক ছটাকও বুন্দি নেই,’ অনুরাধা তার নিরুত্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে।

চার □

একদিন সৌদামিনীর পিশতুতো বোন কমলা তাঁর ছেলে সুপ্রভাত ও পুত্র বধু মীনাশীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। তাঁরা যে আসছেন তা জানিয়ে স্বধামরে সৌদামিনীকে একখানা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা এখনও এখানে এসে পৌঁছয়নি। তার ফলে সৌদামিনী বিমিত হয়ে বলেন, ‘তুমি খবর না দিয়ে হঠাৎ?’

আত্মীয়-মহলে কমলার ভেমন সন্দাম নেই। পরনিন্দুক এবং ছিদ্রান্তেবশী হিসেবে তাঁর দর্দাম আছে। এই কারণে তাকে অনেকে ভয়ও করে থাকে। সৌদামিনী সেই দলে। তাই কমলার আসায় তিনি যে খুশি হননি তা খলা বাহ্যল্য।

‘সৌক, আমি তো চিঠি পাঠিয়েছিলাম! তোমরা পার্জন?’

‘নাভো !’

‘দেখো, কি কান্ড !’

পরে আন্তে আন্তে আর সব কথার সঙ্গে তাঁদের আশার কারণও জানা গেলো। সুপ্রভাতের কয়েক বছর হলো বিয়ে হয়েছে। সৌদামিনীরাও সেই বিয়েতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সামসারিক দুর্যোগের জন্য তাঁদের আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মীনাঙ্কীর এখনো কোন সন্তান হয়নি। অনেক ডাক্তার দেখান হয়েছে। তাঁদের সকলেরই রায়, মীনাঙ্কীর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপর থেকে কমলারা ঠাকুর-দেবতার আশীর্বাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যখনই কোন জাগ্রত দেব বা দেবী অথবা দৈবশক্তি সম্পন্ন সাধুর খবর কারও কাছে পাচ্ছেন তখনই সেখানে ছুটছেন। সম্প্রতি শুনছেন, এই শহরে নাকি এক তান্ত্রিক সাধু আছেন যিনি দৈবশক্তি বলে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তাই এখানে আসা। যদি মীনাঙ্কীর সন্তান হওয়ার বাধা দূর করতে পারেন।

এরকম এক তান্ত্রিক সাধুর নাম সৌদামিনীও শুনছেন।

কে, ক্যাপা বাবা ?’

‘হ্যাঁ ! কমলা জানাল।

মানসী সেখানে কিছুক্ষণ বসে ছিল। সে মীনাঙ্কীকে দেখছিল। কেনন একটি বিপন্ন-মুখে সে বসে আছে। যেন অপরাধিনী। মানসী মেয়েটির জন্য সহানুভূতি বোধ করে। প্রায় ওরই সমবয়সিনী। পারবারকে সন্তান দিতে না পারায় দোষীর মতো হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ সেখানে বসে মা আর কমলা-মাসার কথা শোনার পর মানসী উঠে যায়।

উঠানের বাগানে বেশ কয়েকটা লাল গোলাপ ফুটেছে। ঘুরতে ঘুরতে মানসী সেগুলো দেখতে থাকে। এই বাগানটা ওরই শখের।

‘বাঃ ! সুন্দর ফুল ফুটেছে তো !’

মানসী পাশে মৃদু ঘুরিয়ে সুপ্রভাতকে দেখে এটাতো শৃঙ্গর মন্তব্য একটা। কিছু বলার নেই। তবু সে বলে, ‘একটা ফুল নেবেন ?’

‘না, না ! ফুল গাছে থাকলেই ভাল লাগে।’

টুকরো টুকরো কালো মেঘ আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাদিও রোদ দেখা যাচ্ছে, তার তাপ নেই।

মানসীর শালিক-চোখ সুপ্রভাতের মৃথের উপর কয়েক মূহুর্তের জন্য স্থির হয়। কমলা মাসীর যে খালি নিম্বে করে বেড়ান স্বভাব এই কথাটা সৌদামিনীর মূখে সে বহুবার শুনছে। শূনে শূনে তাঁর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা গড়ে উঠেছে। কমলামাসীর আসাটা তাই ভাল চোখে নেয়নি।

এখান থেকে চলে খাবার পর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে মানসীদের সম্পর্কে কি নিশ্চয় করে বেড়াবে তার তো ঠিক ঠিকানা নেই। এসব লোক বাড়িতে আসা ভরের ব্যাপার। তারইতো ছেলে! তাই এর প্রতিও ও প্রসন্ন ছিলনা। সুপ্রভাতের মস্তব্যে সেই কারণে চমকায়। একটু অন্য ধরনের ছেলে মনে হলো। কমলা মানসীর মতো ঠিক নয়।

‘এসে তোমাদের বিরক্ত করলাম!’ সম্পর্কে সুপ্রভাত মানসীর দাদা। সেই কারণে, ‘তুমি’ বলাটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

না. না. বিরক্ত করার কি আছে! আত্মীয়র কাছে আত্মীয়েরা এলে দোষের কিছু হয়না।

সুপ্রভাত একটা গাছের ডগায় হুটে থাকা গোলাপ দেখাছিল লালও নয়। গোলাপও নয়, দূরের মিশ্রণ।

‘আজ বিকেলে তোমাদের শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবে?’

মানসী সুপ্রভাতের চোখের দিকে একবার তাকালো। এই ছেনেটা কতটা সোজা রাজ্যের মানদণ্ড? এর সঙ্গে সহজভাবে কতটা কথা বলা উচিত? তার কাজটা যে রাতে তা বলবে? বাপারটা এই যুবকের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সন্দেহের উদ্বেগ করবে না? সহজভাবে নেবে কি?

‘আমাকে কাজে যেতে হয়।’

‘কখন কাজ?’

‘রাতে।’

এইবার ‘কি কাজ’ এই প্রশ্নটার প্রত্যাশার মানসী কঠিন-মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখা দাক না কেন, এ অন্যের সম্পর্কে কত দূর কৌতূহলী।

সুপ্রভাত কিন্তু এমার নিয়েই যায়না।

‘আজ ছুটি নিয়ে নাও।’

সূর্যর তেজ এখন অনেকটা পড়ন্ত। স্নিগ্ধমান।

সুপ্রভাত, মীনাঙ্কী, মানসী আর অনুরাধা তৈরী হয়ে নেন। মীনাঙ্কী যেতে চাচ্ছিল না। সন্তান না হওয়ার জন্য সে এক ধরনের হীনমান্যতার ভোগে। কিন্তু সুপ্রভাত আর অনুরাধা জোরজোর করে রাজি করায়।

‘তোরা কোথায় যাচ্ছিস? সৌদামিনী জিজ্ঞেস করেন।

‘একটু শহরটা ঘুরে দেখে আসি মামীমা,’ সুপ্রভাত বলে।

কমলা সৌদামিনীর পাশে ছিলেন। মস্তব্য করেন, ‘আমার ছেলে খুব হেঁচো করতে পারে।’

মানসী রিক্সা নেওয়ার কথা তুলেছিল। সুপ্রভাত আপত্তি করে ‘আগে হেঁচো নি খানিকটা। কেমন? তারপর রিক্সায় ঘুরবো।’

আগে এটা মোরাম-বিছান সড়ক ছিলো। তিন বছর থেকে পীড়ের।

দুপাশে সার সার গাছ। কয়েক বছর আগে বৃক্ষরোপণ উৎসবে চারাগুলো পোতা হয়েছিলো। নিরামিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং যত্নের ফলে এখন ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা বেড়ে উঠেছে।

সুপ্রভাত চারপাশ দেখে, বাড়ি, গাছের সারি, রাস্তা মাঝে মাঝে হেঁটে যাওয়া মানুষ। কিরকিরে বাতাস শরীর ছুঁয়ে বয়ে যায়।

‘চারদিকে কেমন একটা নম্রতা আছে, না?’ সুপ্রভাত প্রশ্নটা মানসীকেই করে।

সুপ্রভাতের পাশে হেঁটে যেতে যেতে মানসীর ভেতর অন্য ধরনের এক বোধ কাজ করে চলে। সমরেশও যেন এরকমই ছিল। ঠিক এরকম মৃদু ভাষা, নম্র, সংযত। তাহলে কি সব পুরুষই এরকম? তাই? হঠাৎ থেকে থেকে কাদার নতো হোটেলের বিজ্ঞানায় নিরাবরণ হয়ে থাকা পুরুষদের চেহারা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাদের কাছে ও একটা নারী শরীর ছাড়া আর কিছু নয়, কেবল পণ্য।

‘লেন্না, এখার বাড়ি ফিরি।’

‘আর একটু ঘুরি তোমাদের শহরটা ভারি সুন্দর।’ সুপ্রভাতের কণ্ঠে অনুরোধের সুর।

সুপ্রভাত ওদের সঙ্গে ঘোরে। পথ থেকে পথে, রাস্তা থেকে রাস্তায়। গাছ দেখে, গাছের ফুল, নতুন ওঠা স্ককস্কে বাড়ি, গোখলি বেলার মারাময় পৃথিবী, নীড়ের টানে ফিরে চলা পাখীর দল। কিছুটা পথ ওরা ব্রিক্সাতেও বেড়ায়।

ভূষণচাঁড়ীর মাঠে সবুজ, নরম ঘাসের উপর অনেকটা বৃন্তাকারে চারজন বসে।

অনুরাধা সবসময়ই উচ্ছ্বসিত। সংসারের যাতাকলে সে এখনো পিষ্ট হয়নি। ছোটবেলাকার উল্লাস, হৈচৈ, খুনসুটি তাকে এখনো ঘিরে আছে।

‘সুপ্রভাতবা, এই মাঠে না একটা বড় মেলা হয়।’ অনুরাধা বলে।

‘তাই?’

‘তখন যদি আসতেন, আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাতাম।’

সুপ্রভাত হাসে। তার সব কিছু ডারি ভাল লাগছিল। এই মারাবী আকাশ, গাছপালা, তিনটে মেয়ের সঙ্গ, একটু আগে আকাশপথে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে যাওয়া বউ-কথা-কও পাখী। কলকাতার ফিরলেই আবার সেই সংসারের দৈনন্দিন রুটিনম্যাফিক বাতাপথ, অফিসের পরিচিত একঘেরামি। এখানে সে মুক্তির আশ্বাদ পায়।

‘আপনি কি বিশ্বাস করেন, দৈব ওষুধে মানুষের অসুখ সারে?’ মানসী শুধরে।

‘না’।

‘তবে?’

‘ভাতাররাত্তো সারাতো পারলো না। মা আর তোমার বৌদির বিশ্বাস, তাই ওদের আনলাম।’ ‘কিন্তু এটাতো নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে আপোস।’
‘তা বলতে পারো।’

পরদিন ঘনায়মান সন্ধ্যার সময় অরুণনাথ ছাড়া বাকিরা সকলে ছাদে মাদুর বিছিয়ে বসে ছিল। খিরিকিরে বাতাস খোলা পথ বেয়ে ছাদের সর্বত্র ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মানসী একটু আগে বোরিয়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গেই কথাটা হচ্ছিল। কমলাই কথাটা তুলেছিলেন।

‘মানসী কি কাজ করে?’

‘জানিনা।’

‘সে কি! কমলা বিস্ময় প্রকাশ করেন, মেয়ে কি কাজ করে জানো না! আমার তো ভাই ভাল ঠেকছেন।’

সৌদামিনী চুপ করে থাকেন। কমলা প্রসঙ্গ শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবেন, সেই ব্যাপারে তাঁর ভেতরে একটা শংকা গুরুগুরু করে বাজতে থাকে। ‘মেয়েছেলে রাতবিরেতে বাড়ির বাইরে কি কাজ করে!’ কমলা চোখে-মুখে দৃষ্টিভঙ্গির একটা ভাব ফুটিয়ে তোলেন।

কিন্তু প্রসঙ্গটা আর বেশী দূর এগোতে পারে না। তার কারণ, সুপ্রভাত সেখানে ছিল। মানসী নেই। অনুরাধা আর মীনাঙ্কী ছাদে মা আর সৌদামিনী-মাসীর কাছে বসে। ও আর একা একা কি করে! তাই এসে ওদের কাছে বসেছিল।

‘আজকাল অনেক অফিসে মেয়েদের রাতের শিফটে কাজ করতে হয়। তোমাদের যুগ আর নেই মা।’

মানসীর কাজ সম্বন্ধে তার ধারণা আছে বলে যে সুপ্রভাত একথা বলে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সে তার মাকে চেনে। অপরের বিষয়ে কৌতূহল তাঁকে কোন পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে তার এক ভয়াবহ ধারণা আছে। সেই কারণেই কমলাকে ধামিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করে। কথাবার্তা শুনে মানসীকে তার ভালই লেগেছে। সেই মানসী কোন রসাল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুক, তা চায়নি।

প্রসঙ্গে বাধা পেয়ে কমলাকে স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ দেখায়। কিন্তু নিজের একমাত্র সন্তানকে তিনি ভয়ও করেন। এই প্রসঙ্গ আর চালালে সে হয়তো তাঁর প্রতি কোন রক্ষা মন্তব্য সকলের সামনে করে বসবে। তিনি তা চাননা। তাই চুপ করে যান।

অনুরাধা ঈষৎ বিব্রত বোধ করে। দিদিকে সে ভালবাসে। সেই দিদির চাকরি সম্পর্কে কমলা মাসীর মন্তব্য যে তিস্যক ইচ্ছিত হয়ে নিয়ে আসে তা তার কাছে যথেষ্ট অস্বাভিচার। একবার সুপ্রভাতের দিকে তাকার। ভাগ্যাস সুপ্রভাতলা ধামিরে দিয়েছেন। নইলে কমলা মাসী কি থেকে কোথায় প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে যেতেন তার ঠিক নেই। এই সামান্য কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, কমলা মাসী খালি মানুষের নিন্দে করেন। কেমন বেন।

পর্যদিন মানসীকে একা পেয়ে ও জিজ্ঞেস করে, দিদি, তুই কোথায় চাকরি করিস রে ?

মানসী চমকে ওঠে। মাহের আশের মতো নৃদৃষ্টিতে ছোট বোনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন করছো ?' কাল না কমলা মাসী মাকে জিজ্ঞেস করছিল।

'মা কি বললো ?'

'মা বললো, জানি না। তারপর সুপ্রভাতলা কমলা মাসীকে ধামিরে দিলো। বললো, আজকাল অনেক অফিসে রাতের শিফটে মেয়েরা কাজ করে।'

কমলা মাসী আনার পর থেকে এই ভয়টা মানসীর বৃকের ভেতরে জেগে উঠেছিল। সেটাই তাহলে সত্যি হতে চলেছে।

বিঃলো সৌদামিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'কমলা মাসীরা যাবে কবে ?'

সৌদামিনী মূখে অশ্ভুত ভাব ফুটিয়ে বলেন, 'জানি না।'

মানসীর মধ্যে একটা আতঙ্ক ছাড়িয়ে পড়তে থাকে। কমলাদের চলে যাবার ব্যাপারে অত্যন্ত উপগ্রীব হয়ে পড়ে, যেটা সৌদামিনীর কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে। মানসীতো এমন নয়। মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহার মধুর। যদিও কমলা মানুষটা ভাল নয়। তবুও সে তো এ-বাড়িতে অতিথি। তিনি ভয় পান, মানসী যদি সত্যসত্যই কমলাকে জিজ্ঞেস করে বসে, সে কবে যাবে। যদি তা করে তবে ঘটনাটা খুব কুংসিং দেখাবে। সৌদামিনী সেটা চান না।

ক্ষাপা বাবার আশ্রম শহরের উত্তর প্রান্তে। সৌদামিনীরা কয়েকবার গিয়েছিলেন। অরুণনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর। এসব ব্যাপারে মানসীর বরাবরই অবিশ্বাস। তবুও সেও সৌদামিনীর সঙ্গিনী হয়েছিল। তার মনোভাব ছিল—দেখা যাক না। কাজ না হলেও তো ক্ষতি নেই। ভাতাররা তো কিছু করতে পারছেন না। তাছাড়া, সৌদামিনীকে তো নিয়ে যেতে হবে। একা কি করে যাবেন। সৌদামিনীর বিশ্বাস ছিল। ক্ষাপা বাবা শেকড়, মাদুলি, ঝড়িটুকি দিয়েছিলেন। অরুণনাথের কোন উপকার হয়নি।

মানুষের সব কত অশ্ভুত বিশ্বাস। সৌদামিনীর আস্থা ছিল, অরুণনাথের

অসুখ সেরে যাবে, তিনি আবার সংসারের হাল ধরবেন। সেই বিশ্বাস আজ আর নিশ্চয়ই অটুট নেই। এবার ক্যাপা বাবার উপর একই আশ্বা নিয়ে কমলাতা থেকে কমলা ছুটে এসেছেন। মীনাকীর বর্দি সন্তান হয়।

মানসীর খাবার ইচ্ছে ছিল না। সে কমলাকে ভয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু সুপ্রভাত কিছুতেই ছাড়ে না। খুব জোরাজুরি করে।

ক্যাপা বাবার তখন ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দেবার সময়।

তিনি লাল রংয়ের গালিচার উপর সুবাসনে বসে ছিলেন। পরনে লাল রংয়ের আলখাল্লা ধরনের পোশাক। কাঁচা-পাকা দাড়ি আর গোফ। মাথার চুল জটা করে বাঁধা। তাঁর দৃশ্যে দুজন স্বাস্থ্যবতী যুবতী দাঁড়িয়ে। তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করছে।

আশ্রমের একজন কমলা, সৌদামিনী আর মীনাকীকে তাঁর সামনে নিয়ে যায়।

‘বাবা, এ’রা আপনার কাছে আজি’ নিয়ে এসেছেন।’

ক্যাপা বাবা ঢুলুঢুলু চোখে কমলাদের তিনজনের উপর দিয়ে চাউনি ঘুরিয়ে আনেন। তারপর ফের দৃঢ়চোখ বন্ধ করেন।

সুপ্রভাত আর মানসী পেছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। তারা আর সৌদামিনী-দের সঙ্গে এঁগারনি। অনুরাধার সামনে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সুপ্রভাত আর মানসী না যাওয়াতে সে ওদের দুজনের কাছেই থেকে যায়।

কমলা বাবার পায়ের কাছে একশ টাকার একখানা নোট রাখেন। তারপর তিনজনই গড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করেন।

মানসীর কাছে গোটা ব্যাপারটা অর্থহীন চেষ্টা বলে ঠেকে। সে তো দেখেছে, তার নিজের বাবার বেলায় একই প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা। কোন লাভই হয়নি। মা ছুটে ছুটে আসতো। কাতর প্রার্থনা জানাতো। এই সব তাবিল মাদুলিতে কিছু কাজ হয়নি। সেই সময় থেকেই ক্যাপা বাবার উপর ওর অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এ কিছু জানে না। এর সবটাই হচ্ছে বুদ্ধবুদ্ধি।

আর সুপ্রভাত দেখছিল সমবেত মানুষদের। এদের অধিকাংশই নারী। তাদের চোখমুখের চেহারা ও ঘেঁটু দেখতে পাচ্ছিল তা থেকে তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আঁচ করতে পারাচ্ছিল। ও তো নিজে ঠিক বিশ্বাস করে না। তবে দেখা যাক না, মনোভাবটা এরকমই।

‘আপনার কেমন মনে হচ্ছে?’ মানসী একসময় জিজ্ঞেস করে।

সুপ্রভাত হাসে। কেন হাসে, কে জানে।

ধূপধুনো আর ফুলের গন্ধে গোটা হল-ঘর ভরে আছে। বেসব মহিলারা এসেছেন, তাঁদের অনেকেই দামী পারফিউম পোশাকে ছড়িয়েছেন। তার

সম্মুখ বাতাসে আছে। মানসীর পোশাক, থেকেও দামী, পার্শ্ববর্তী গন্ধ চারপাশে ছড়িয়েছে।

সুপ্রভাত ভাবে, স্বচ্ছল ঘরের মহিলারাও কত সমস্যায় ভুগছে, তারাও সুখে নেই। তাহলে টাকাটাই সব নয়! আবার, টাকাটাকে তুলে করা যায় না। টাকা ছাড়া সুখ নেই, কিন্তু টাকাই সুখ নয়। সত্যিই কি এমন কোন মানুষ আছে যাকে সুখী বলা যায়?

কমলারা যখন করেন, সুপ্রভাত মীনাঙ্কীকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কি দিলেন?'

মীনাঙ্কীর মুখের চেহারাটা সুপ্রভাতের কাছে এই মুহূর্তে অশ্রুত ঠেকে, অনেকগুলো অনুভূতির সমাহার যেন, অসহায় দুঃখী, অপরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

'তিনটে শেকড়: মাদুলি করে পরতে বললেন।'

'মাদুলি কি উনি দিলেন?'

'কালকে এসে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

মানসী কিছু বলে না। কোন প্রস্তাব করে না। এসবে তার আর বিশ্বাস নেই। সে নিশ্চিত এই মাদুলিতে মীনাঙ্কীর কোন উপকার হবে না। নিজের বাবার ক্ষেত্রে ভেবে দেখেছে। কিছু হয়নি।

কমলা আর সৌদামিনী পিছিয়ে পড়েছিলেন। বাকিরা এগিয়ে ছিল। ওদের বয়স কম ওরা নিজেরা গল্প করতে করতে থাক। আর সৌদামিনীরা বদস্ক। তাঁরা আলাদা গল্প করতেন। সৌদামিনী এরকমই ভাবেন। কিছুটা হেঁটে ভবে বাসন্তপেজ।

'মেয়েকে রাতবিরোতে এরকম কাজ করতে পাঠিও না। লোকে নিন্দেদমন্দ করবে। মানুষের মন' কমলা বলেন।

সৌদামিনীর মুখটা ব্যাঙ্গার হয়। তবু বলেন, 'আমাদের পাড়ার লোকরা এরকম নয়, ভাল। 'তুমি ভাবছো ভাল! 'কিন্তু ওরা যখন দেখবে, মানসী রাত করে বাড়ি ফিরছে তখনই কেহনা রটাবে। যতক্ষণ টের পাচ্ছে না, ততক্ষণই ভাল, টের পেলেই দেখবে সঙ্কল পাল্টে গেছে।'

সৌদামিনী বিরক্ত হন। তবু কিছু বলেন না। এরা অর্থাৎ। কয়েক-দিনের জন্য এসেছে। চলে যাবে। তাই চুপ করে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

খড়খড়ি নদীর ওপারে আড়ং ডাহা। পারাপারের জন্য সিমেন্টের পাকা সেতু। বছর কয়েক আগে জেলা পরিষদ থেকে তৈরী করে দিয়েছে। আগে বাঁশের সাঁকো ছিল। বিশেষ করে বর্ষাকালে সেই সাঁকো দিয়ে এপার ওপার করা কিছুটা বিপজ্জনক ছিল। বিশেষতঃ, শিশু আর মহিলাদের পক্ষে।

জলে টাইটুম্বুর নদী। স্রোতের টানও তীব্র। পা হড়কে বা বাঁশ ভেঙ্গে যদি পড়ে যায়। এখন পাকা সেতু হওয়ার পর থেকে সে ভয় কেটেছে। নির্বিঘ্নে যাতায়াত করা যায়।

সুপ্রভাতরা কাল চলে যাবে। সুপ্রভাত আর মানসী সেতুর উপরে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে নদীর জল দেখছিল। আজ ওরা দুজনেই কেবল বোরিয়েছে। অনুরাধা বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কে জানে! হয়তো অরূপ আর ও ঘরে বেড়াচ্ছে। মীনার্ক্ষী বেরতে চায়নি। ও দিনে দিনে বিষম থেকে বিষমভর হয়ে উঠছে।

‘আমাদের ওখানে যেও। তুমি তো কলকাতায় চাকরি করো। সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে অফিসে যেও।’

মানসী নদীর জলের উপরের স্তরের ঠিক নীচে ঘুরে বেড়ান তিনটে ছোট মাছকে নিরীক্ষণ করছিল। তার এই মন-কতা এবং অন্যমনস্কতা, এই দুইয়ের মাঝখানে এক বিন্দুতে ছিল। সুপ্রভাতের কথা শোনে। সুপ্রভাতকে ঠিক কাছেই আত্মীয় বলা চলে না। দূরের সম্পর্ক বলাই উপযুক্ত। মায়ের পিসতুতো বোন, তার ছেলে। মাঝে মাঝে সুপ্রভাতের সঙ্গে সময়ের শের তুলনাটা মনে পড়তে আসে। প্রথম যখন আসে তখন সুপ্রভাতকে সত্যি বলতে চিনতেই না। ছোটবেলায় হয়তো বংশের কোন উৎসবের জমায়েতে দেখে থাকতে পারে। তবে তা মনে নেই। বড় হয়ে আর দেখেনি। একটা ভয় ছিল। কমলা মাসীরতো ছেলে, মায়ের স্বভাবই পাবে। এখন নিশ্চিত, একদম উল্টো স্বভাবের। অনেকটা সময়ের শের মনে পড়ায়। কাল চলে যাবে। একটা দুঃখবোধ মানসীকে আচ্ছন্ন করে।

‘কি ভাবছো?’ উত্তর না পেয়ে সুপ্রভাত শূন্যে।

‘কিছু না,’ মানসী ছোট করে হাসে।

‘আমাদের ঠিকানাটা কিন্তু হারিও না।’

‘না, হারাণ না।’

পাঁচ □

সুপ্রভাতরা চলে গেছে। মানসী বিছানায় শুয়ে ভাবছিল। কিছুক্ষণ আগে ওর ঘুম ভেঙেছে। তবু ওঠেনি। গোটা শরীরে ম্যাজমেজে ভাব। ওর রিস্টওয়াচটা খাটের সাইড-টেবিলের উপর রাখা। বাঁ-হাত বাড়িয়ে সেটা চোখের সামনে এনে সময় দেখে। সকাল নটা বেজে পনের মিনিট।

এখন বিছানা থেকে উঠবে কি উঠবে না, এই প্রশ্নটা নিয়ে ও দু-তিন মিনিট ভাবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়, আরও কিছুটা সময় শুয়ে থাকবে। ভাড়াভাড়া ওঠারওতো কোন কারণ নেই।

কিছুক্ষণ বাদে বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ধাক্কা পড়ে এবং সেই সঙ্গে অনুরোধের কণ্ঠস্বর, 'দিদি, দিদি।'

মানসী বড় করে হাই তোলে। দুপাশে হাত ছড়িয়ে দেয়। তারপর উঠে দরজা খোলে।

'কি?'

'দাদা সাত তারিখে আসবে।'

'সেকি! দাদারতো এখনো দু-বছর বাকি।'

'আগে ছেড়ে দিচ্ছে।'

'কি করে জানলি?'

'সুজয়দা এসেছিল। অবনীদা খবরটা পাঠিয়েছে।'

অবনী দত্ত। কৌশিকরা এ'রই নেতৃত্বে দেশে বিপ্লব আনার জন্য মানুষ খুনের পথ ধরেছিল। যাদের ওরা খুন করেছিল, ওদের ভাষায় তারা ছিল 'শ্রেণীশত্রু'। এই সব কথা মানসী কৌশিকের মুখে একসময় শুনেছে। কৌশিকই ওকে বলতো, 'শ্রেণীশত্রুদের খতম করতে পারলেই দেশে বিপ্লব আসবে, শোষণের অবসান হবে'। সেই সময় মানসী কৌশিকের কথা বিশ্বাস করতো। সমরেশ এ-সব মানতো না। তার বিশ্বাস ছিল অন্য। সে মানসীকে বলতো, 'হিংসা নয় স্বতন্ত্র-অভিযান নয়, গণতন্ত্রের পথ ধরেই মানুষের মুক্তি সম্ভব'। মানসী আজ আর কৌশিকের কথা বিশ্বাস করেনা। কৌশিকদের এক সময়ের নেতা ও পথপ্রদর্শক অবনী দত্ত আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। অবনীর উপর মানসীর এখন প্রচণ্ড ক্ষোভ জন্মেছে। কত ভাল ভাল ছেলের ভবিষ্যৎ এই অবনী দত্তর জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। কৌশিকও তাদের একজন। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। অবনী দত্তর দেখান পথে চলে জেল খাটেছে। পড়াশোনা ভকে উঠেছে। আর যে অবনী দত্ত একসময় বিপ্লব, বিপ্লব বলে এই সব ছেলেদের কেপিয়েছিলেন, তাঁর নিজের বাড়ি হয়েছে এবার অ্যাসেম্বলি ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি উঠছেন। উপরে উঠছেন। কৌশিকের জীবন নষ্ট হয়ে গেলো। আর, মানসীর নিজের জীবন? এই সব কিছুর জন্যই সে অবনীকে দোষী ঠাওরায়।

অনুরোধা একটু অবাক হয়। এত বছর বাদে দাদা বাড়ি ফিরছে। অথচ দিদির ভেতর ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখতে পেল না। কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব। কেন? কেন? মা ও বাবার মধ্যে খুশির ছটা ঝিলিক মেরে ওঠে। তাঁদের মুখে উজ্জ্বল দেখায়। অনেক বছর বাদে বাড়িটা আবার হাসিখুশি চোহারা নেয়। ব্যতিক্রম কেবল মানসী। কৌশিকের আসা, না-আসার তার যেন কিছু যায়-আসে না। সে উদাসীন। নির্লিপ্ত। এটাই বাড়ির আর সকলকে বিস্মিত করে। কেন এটা হচ্ছে?

হোটেলের মানসীদের জন্য একটা ঘর আছে। একটা চণ্ডা খাট, তার উপর পাতা নরম বিছানা, সোফা-সেট, আলমারি একটা—যার ভেতরে হ্যান্ডারে কাপড়-জামা ঝোলান যায়, ড্রেসিং টেবিল একটা—মেয়েরা তার সামনে বসে সাজগোজ করে নেয়। মানসীদের বলতে, সেই সব মেয়েরা, যারা এই হোটেলের সঙ্গে যুক্ত, যাদের পোশাকি পরিচয় তারা এখনকার কর্মচারী, নাম ডিগ্রাইনার, হোটেলের কর্মচারীদের খাতায় নাম থাকে, মাস-মাইনে হিসেবে কিছু টাকা দেওয়া হয়। তবে এসব হলো বাইরে বাইরে, উপরি উপরি। পুলিশের সামনে বাঁচার জন্য। কিন্তু এদের আসল কাজ হলো-হোটেলের পুরুষ আবাসিকরা চাইলে তাদের মনোরঞ্জন করা, তার বিনিময়ে এরা ওই সব বোডারদের কাছ থেকে টাকা পায়। ভদ্র-ঘর থেকেই এই সব মেয়েদের রিক্রুট করা হয়। চেহারা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, এমন কি শিক্ষার মানও দেখে নেওয়া হয়। হোটেলের আবাসিকরা যাতে সন্তুষ্ট হয়।

এখন এই ঘরে মানসী ছাড়াও আর তিনজন যুবতী আছে, অম্বেষা, মিতালি আর বিনীতা। তিনজনেরই বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে।

মিতালি একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দেয়। শুন্যতায় ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বলে, 'আমাদের তো আর বিয়ে হবে না। এভাবেই জীবন কাটবে।'

মিতালি হায়ার-সেকেন্ডারি পাস। আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল। পারেনি। বাবা রেস খেলতো, জুয়াও। মদ মেয়ে আরও নানান নেশা ছিল। বেশ্যা-পাড়ার যাতায়াত করতো। সেই রকম একটা পাড়াতেই এক রাতে খুন হয়। অফিস থেকে প্রচুর টাকা লোন করেছিল। সে সব এই নেশাতেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু থাকেনি। মারা যাওয়ার পর অফিস থেকে যে টাকা পাওয়ার কথা, তা আর পাওয়া যায়নি। লোন শোধ করার পেছনেই খরচ হয়ে গিয়েছিল।

মিতালির এক দাদা। মানসিক প্রতিবন্ধী তার পরেই মিতালি। পাড়ার এক বয়স্ক ব্যক্তিই তাকে এই হোটেলের এই কাজ জুটিয়ে দেন। এটা নেওয়া ছাড়া ওর আর কোন পথও ছিল না। বাঁচতে হবে তো। দাদা আছে, মা, ছোট ছোট দুটো ভাই।

'কেন?' অম্বেষা জিজ্ঞেস করে। সেই এদের মধ্যে সব থেকে বড়। বিবাহিত। ওর বরই ওকে এ লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলাতেই বাবা-মা মারা যায়। সেই থেকে মামার বাড়িতে মানুস। তেমন মানুস হওয়া আর কি। দাসীবৃত্তি করা। শখ-আহ্লাদ মেটাবার উপায় ছিল না। কোন রকমে দু-শুটো ভাত পেটে দিতে পারতো। তাও অনেক লাফুনা-গল্পনা সহ্য

করে। মামা-মামী পড়াশোনা শেখার কোন ব্যবস্থা করেনি।

পাড়ার এক উঠতি মাস্তানের সঙ্গে একসময় ভাব হয়। তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ে, বিয়ে করে, স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর গোতমের আসল কুৎসিৎ চেহারা চোখের সামনে দগদগে ঘায়ের মতো ভেসে ওঠে। রোজগার নেই। তার উপর মন আর মেয়েছেলের নেশা। সেই অশেষবাকে এই কাজে নামিয়ে দিয়েছে। অশেষা অনেক কাল্মাকাটি করেছিল, পায়ে ধরেছিল, আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ওর সামনে তখন আর পথ নেই। মামা-মামী ওকে আর ফেরৎ নেবে না। ওকেতো বাঁচতে হবে। বাচার ওর বড় সাধ। তাই শেষ পর্ব্বস্ত স্বামীর দেখান পথেই ওকে হটিতে হয়েছিল। অন্য কোন উপায় ছিল না।

‘আমাদের আসল যা পরিচয় তা জেনে আর কোন পুরুষ বিয়ে করতে রাজি হবে?’ মিতালি বলে। ঠোঁটের সিগারেটটা এখন হাতে।

‘পরিচয় না জানালেই হয়,’ অশেষা বলে। ‘তাতেতো আরো বিপদ! একদিন না একদিন সত্যিটা ঠিক জেনে যাবে। তখন আমাদের সংসার করা লাটে উঠবে।’

সোফায় গা এলিয়ে মানসী শুনছিল। তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?’ বিনীতা তাকে জিজ্ঞেস করে।

মানসীর ঠোঁটের কোনে এক চিলতে প্রথমা চাঁদ-হাসি ফুটে ওঠে।

‘করলে আর কি হবে।’

‘আমার ভাই বিয়ে করে ঘর-সংসার করার বড় সাধ হয়! বর বাচ্চা থাকবে। আমি হবো সেই সংসারের কন্যা।’

মানসী এবার শব্দ করে হেসে ওঠে।

‘হাসলে যে?’

‘এমনি।’

এই সময় ম্যানেজারের পিওন এসে ঢোকে। তার মোটা, কুচকুচে কালো গোঁফ নিয়ে এই ঘরের মেয়েরা হাসিহাসি করে। কেমন বেতপ গোঁফ।

মানসীকে বলে, ‘মিস, ম্যানেজার-সাব আপনাকে ডাকছেন।’

এই ঘরের মেয়েরা সবাই মিস। যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারাও! মিস থাকলে খন্দেরদের কাছে কদর বাড়ে। তাই বাস্তব-জীবনে যে যাই হোক না কেন, মিস বা মিসেস, এই হোটেলে সবারই পরিচয় মিস হিসেবে।

ম্যানেজার বলে, ‘৩৬ নম্বরে যাও। বোর্ডারের ফটো দেখে তোমাকে পছন্দ হয়েছে। শাসালো মজেল।’

৩৬ নম্বর দোডলার দক্ষিণদিকের স্নাইট। ঘরে ফিরে প্রসাধন করে নিয়ে

লিফটে ঢোকে।

কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কমকম বৃষ্টি। ঘড়িতে এখন রাত একটা। আগেই ছাড়া পাবার জন্য মানসী ছটফট করছিল। ওর বাড়িতো কলকাতায় নয়। ট্রেনে করে যেতে হবে। লাস্ট লোকাল ট্রেনের ব্যাপার আছে। সেটা ধরতে না পারলে আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না। কিন্তু এই সব খবরদের অনেকেই একটা অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। তারা মনে করে, যখন তারা পরসা দিচ্ছে তখন এই মেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোন দাম নেই, তারা মেয়েদের কিনে নিয়েছে। উঠে চলে যাওয়াটা তাই মানসীর ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল ছিল না, লোকটার মজির উপরই তার নির্ভরতা। মানসী যখন ছাড়া পার তখন দেখে হাওড়ার গিরে লাস্ট লোকাল ধরার আর সময় নেই। হোটেল থেকে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করে না। তাহলে? হঠাৎ মনে হলো, সুপ্রভাতের বাড়ি গেলে হয়! আগে একবার গিয়েছিল। লোককে জিজ্ঞেস করে খুঁজে বের করেছিল। সুপ্রভাত যেভাবে ঠিকানা লিখে দিয়েছিল তাতে খোঁজা খুব সোজা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আগেরবার দিনের বেলা ছিল। এখনতো মাকরাত। এই সময় যাওয়া কি ঠিক হবে? সুপ্রভাতের কলকাতার বাসায় বর্তমানে ও আর ওর বো থাকে। দুজনেই ভালো মনের। মানসীর সেরকমই বোধ হয়েছে।

হোটেলের ভেতর থাকার সময় বৃষ্টির এত তোড় বৃষ্টিতে পারেনি। বেরিয়েই দেখে।

পার্টিকোর নীচে দাঁড়িয়ে আকাশ থেকে নেমে আসা জলের ঘূর্ণায়মানতা লক্ষ্য করতে থাকে। এই ঝড় নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ বাদে থেমে যাবে। তখন বৃষ্টি হয় সোজা, কিংবা তির্যক রেখায় পড়তে থাকবে এখন জল আঁকাবাঁকা পথে ধরতে ধরতে নামছে।

সুপ্রভাতের সঙ্গে কথা বলে মানসীর ধারণা হয়েছে, ওর রাতের চাকরি নিয়ে সুপ্রভাতের মনের মধ্যে কোন খারাপ শশয়ের জন্ম হয়নি। এর দরুণ ও স্বস্তিতে আছে। ওখানে যাওয়া যায়। এবং নিশ্চয়ই।

সুপ্রভাতের বাসা ডুবানীপুরে। ভাড়া করা। দু-কামরার ফ্ল্যাট। তাছাড়া, ছোট একটা ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর, টয়লেট ও বারান্দা একটা করে দোতলায়।

কলিবেলের শব্দে সুপ্রভাত আর মীনাক্ষী, দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায়।

মীনাক্ষী তুলনা-জড়িত কন্ঠ বলে, 'কে যেন কলিবেল টিপছে।'

'এত রাতে আবার কে এলো!' সুপ্রভাত বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলে।

ট্যান্ডি থেকে নামার সময় মানসী কিছুটা ভিজে গিয়েছে। পরনের শাড়ি-

রাউজ, মাথা, মৃদু হাত ।

‘আরে, এসো, এসো !’ সুপ্রভাতের আহ্বানে মধ্যে এতটুকু বিরক্তির ভাব ছিল না ।

মানসীর ভেতরে একটা বিধা যে কাজ করেনি, তা নয় । এত রাতে, এই ঋতু-বাদলের মধ্যে সুপ্রভাতের বাড়িতে যাওয়া তাকে বিরক্ত করা হতে পারে । সুপ্রভাত হয়তো অপ্রসন্ন হবে । তাই সুপ্রভাত দরজা খুলে দেবার পর সে তার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করে, এই অসময়ে আসার জন্য সুপ্রভাত বিরক্ত হয়েছে কিনা । সেরকম মনে হয় না ।

মানসী প্রায় দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢোকে । বাইরে বৃষ্টির তোড় এখনো আছে । তার হাত থেকে বাঁচার জন্যই ওর এই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকা ।

‘উফ্, কি বৃষ্টি ।’ ও মন্তব্য করে ।

‘মীনাক্ষী, দেখো, কে এসেছে,’ সুপ্রভাত চেঁচিয়ে ডাকে ।

মীনাক্ষী নাইটি পরে শূয়েছিল । এবার তার উপর হাউসকোটটা চাপিয়ে নেয় । তাঁরপর বাইরে আসে ।

‘আরে, ‘ভূমি !’ সেও উচ্ছ্বসিত, ‘জামাকাপড়’ পাণ্টে নিও । এসো, ভেতরে এসো ।’

‘লাস্ট স্টেনটা মিস করলাম । তাই ভাবলাম তোমাদের এখানে রাতটা কাটিয়ে যাই ।’

‘বশ করেছো । এসো ।’

মানসী মীনাক্ষীর শূকনো জামাকাপড় পরে নেয় ।

মীনাক্ষী গ্যানে ভাত চাপাতে যাচ্ছিল । মানসী বারণ করে, ‘আমি খেয়ে এসেছি ।’

পাশের ঘরে ডিভান ছিল । মীনাক্ষী তারই উপর মানসীর জন্য বিছানা পেতে দেয় ।

সেখানে শূয়ে মানসী বাইরের বৃষ্টির শব্দ কান পেতে শুনতে থাকে । জল ফের জোরে জোরে নেমেছে ।

অন্ধকার ঘর । মাথার উপর ফুলস্পীডে ঘুরতে-থাকা সিলিং ফ্যান । বাইরে থেকে আসা বৃষ্টির ঝঙ্কম আওয়াজ । মানসীর ভারি সুন্দর লাগে ।

হোটেল থেকেই ও বাড়িতে ফোন করে দিয়েছে । বৃষ্টির জন্য ও আজও আর বাড়ি ফিরতে পারবে না ।

অনুপ্রাধাই ফোন ধরেছিল ।

ছয় □

কৌশিক হয়তো বাড়ি ঢুকেই পরিবারের আর সকলের সঙ্গে গল্প করতে

বসতো। কত কথা জমা হয়ে আছে! জেলের জীবনের গল্প, সঙ্গীদের গল্প—যারা ওর সঙ্গে একই মতাদর্শে দীক্ষিত এবং একই জেলে আটক ছিল, অন; সব করেদীদের কথা, তাদের দিনযাপনের ধারা, কৌশিকদের সঙ্গে সম্পর্ক, জেলের ওয়ার্ডার, রাউন্ড-দিতে-আসা জেলারবাবু, করেদীদের লাইন-আপ করার জন্য হেড-ওয়ার্ডারের সেই বিকট চীৎকার, করেদী ফাইল, তারপর গুণগতি। বেশ কয়েকটা বছরের জীবন। তার খুঁটিনাটি ইতিবৃত্ত।

কিন্তু সৌদামিনী বাধা দেন, 'আগে হান করে খেয়ে নেভো, তারপর কথা বলবি। সময়তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে হান করতে করতে কৌশিকের মনে হয়, মাঠিক বলেনি! সময় সত্যিই পালিয়ে যায়, কোনদিন থেমে থাকে না।

ভাত খেতে থাকা কৌশিককে দেখতে দেখতে সৌদামিনী বলেন, 'তুই খোকা, অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিস! ওখানে ওরা তোকে খেতে দিত না, নারে?

কৌশিক হাসে, 'দেবে না কেন? করেদীদের জন্য যে খাবার বরাদ্দ, তাই দিতো।'

অনুরাধা জিজ্ঞেস করে, 'তোকে ওরা মারতো?'

'জেলে মারতো না।'

কত দিন এত যত্ন-স্নেহে বেড়ে দেওয়া খাবার ও খায়নি। ভাতের প্রতিটি দানার মধ্যে সেই মমতা মাখামাখি করে জড়ান। কী তৃপ্তি।

'মণি কোথায় মা?' কৌশিক জিজ্ঞেস করে।

'ওতো অফিস গেছে!' সৌদামিনী উত্তর দেন।

'এই রাতে?'

'ওরতো রাতে অফিস।'

আরও কিছুক্ষণ বাদে কৌশিক জিজ্ঞেস করে, 'ওর কোথায় অফিস?'

'কলকাতায়।'

সৌদামিনী এর বেশী আর জানেন না। মানসী তাঁকে বলেনি যে।

'মেয়েটার জন্য সংসারটা টিকে রইলো। নইলে কি যে হতো? ভোর বাবার অবস্থাটা তো দেখলি।'

পরদিন মানসীর সঙ্গে কৌশিকের সাক্ষাৎ।

'দাদা, তুই এসে গেছিস!'

কৌশিক নিজের ঘরে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গত রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ব্লাস্ট, শ্রাব্য গাছের ডাল, পাতা, ফুল, ফুলের কুণ্ডি, এইসব দেখছিল।

ফিরে থাকিলে মানসীকে দেখে। মানসী কি কিছুটা মোটা হয়েছে? পৃথুলা বলা চলে? ছিপছিপে ভাবটা নেই।

‘তুই কখন এলি?’

‘এইতো। এসেই শুনলাম, তুই এসেছিস।’

‘তোকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।’

‘তোকে ও তো।’

ভাই-বোনে এখন এইটুকুই কথাবার্তা। ‘তুই প্রকৃতি দেখ্। আরি মূখ-
টুখ খুয়ে আসি। তারপর তোর সব গল্প শুনবো।’

মানসী শূধু মূখ-টুখ ঘোয়না, ভাল করে স্নানও করে নেয়। তার মতে
এই স্নান ওর গায়ে লেগে থাকা গত রাতের সব অপবিত্রতাকে মুছে দেয়।
তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে একসময় কৌশিকের মূখোমূখি বসে।

‘এখন কেমন লাগছে রে, দাদা?’

‘কিছু বুদ্ধিতে পারছি না। এই যে আমরা এতো লড়াই করলাম, কত
শ্রমশীল হয়ে পড়লাম, সেসবের কোন ইমপ্যাক্টতো চোখে পড়ছে না। সব
যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেছে।’

মানসী শব্দ করে হেসে উঠলো, ‘তোদের অবনীদাতো এবার ইলেকসানে
দাঁড়াচ্ছে।’

‘ইলেকসানে দাঁড়াচ্ছে?’ কৌশিকের কণ্ঠে বিস্ময়।

‘হ্যাঁ! অ্যাসেম্বলি ইলেকসানে। তোর কাছেই তো শূনেছি, এই
অবনীদা তোদের বোকাডো—নির্বাচন হচ্ছে শূন্যেরের খোঁয়াড়ে ঢোকার
উপায়।’

কৌশিকের চোখে-মূখে-বাঁচি এক বিস্ময় জেগে ওঠে। মানসী যে
সংবাদটা দিল সেটা ওর অজানা। বিশ্বাস করতে মন চায় না।

‘এর কথায় তুই মানুষ খুন করেছিলি,’ মানসীর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ।

‘দরজাটা ভেঙিয়ে দেতো,’ কৌশিক বলে।

সে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘরের বাতাসে
ভাসতে ভাসতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে থাকে।

‘সমরেশ কেমন আছে রে?’

মানসী সচকিত হয়ে ওঠে। ইতিকথার শেষের অংশটা দাদার জানা নেই।
সমরেশ দাদার বন্ধু। তার সঙ্গে মানসীর প্রেমের অধ্যায় দাদার জানা ছিল।
কিন্তু সেটা কাহিনীর প্রথম দিককার ঘটনা।

‘ভালই।’ মানসী কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

‘ও এখন কি করছে?’

‘কলেজে পড়াচ্ছে।’

কৌশিক সারাদিন ঘরে শূন্যে-বসে, গল্প করে কাটায়। একবারও বাইরে
বেরবার তাগিদ বোধ করে না। এতগুলো বছরের ক্লান্তি ও বেন আত্ম

একদিনেই এভাবে দূর করতে চায়। যারা সব ওর আত্মার আত্মীয় তাদের থেকে ও এত দিন বিচ্ছিন্ন থাকার দুঃসহ ভার এভাবেই সরাতে চায়।

পরদিন সকালে বেরয়। মানসীর কথায় ও সংশয়ে পড়েছে। যে অবনীদাকে আদর্শ হিসেবে একদিন গ্রহণ করেছিল, সে আজ অ্যাসেসবল ইলেকসানে দাঁড়াচ্ছে। এমনটা কেমন করে হতে পারে? অবনী ওদের এই শিক্ষাই দিয়েছে, নির্বাচন হচ্ছে একটা ধনাত্মিক প্রতিজ্ঞা, তার মাধ্যমে শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। সে নিজে আজ কি করে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে! মানসী নিশ্চয়ই ভুল খবর পেয়েছে। এটা হতে পারে না। অবনীকে কৌশিক অন্তর থেকে গ্রন্থা করে। সে-ই অবনী এমনটা কিছুতেই করতে পারে না।

কৌশিক চারদিনে তাকায়। সব আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে। ও কোথাও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করে না। আকাশ ঠিক দেই আগের মতই। বাতাসে সেই একই স্পন্দন। গাছের পাতা একইভাবে দুলছে। তবে আগে এ রাস্তাটা ছিল মোরাম বিছান, এখন পাথরকুচি আর তার উপর ছড়ান পাঁচ, পাকা রাস্তা। গাড়ি-বোড়াও বোধহয় একটু বেশী চলছে।

‘কি কৌশিকদা, কবে এলে গো?’ মোড়ের মাথার সিগারেট-বিড়র দোকান থেকে শিবু হাক পাড়ে।

‘কাল।’ কৌশিক একটু হাসে।

অবনীর বাড়িটা সদ্য রং করা হয়েছে। এ-বাড়িটা তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। দোতলা। একতলার বৈঠকখানায় আগে কৌশিক কতবার এসেছে।

সদর দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতর থেকে মানুষের কঠম্বর ভেসে আসছিল। পদা সরিয়ে কৌশিক ঢোকে। এই ক-বছরে এ ঘরের চেহারায় অনেকটা চকনাই এসেছে। রং করা হয়েছে। জানালা-দরজায় সুন্দর্য পদা। মেঝেতে কার্পেট। তিন-পাঁচ সোফা সেট। বড় পীসটায় হাবুল, রতন আর বকো। ছোট এক পীসে অবনীদা নিজে। আর এক পীসে শিবানীদা। মানসীর কথাটা ঠিকই। ঘরের মধ্যে বড় বড় কয়েকটা প্র্যাকার্ড। মেঝের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। কোনটার রঙীন কালিতে লেখা ‘প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জোটের প্রার্থী’ অবনী দস্তকে ভোট দিন,’ কোনটার ‘দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল জোটের বিরুদ্ধে ক জোটের মনোনীত প্রার্থী’ অবনী দস্তকে আসন্ন নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করুন,’ আবার কোনটার বা ‘শোষিত মানুষের স্বার্থে’ আগামী অ্যাসেসবল নির্বাচনে অবনী দস্তকে নির্বাচিত করুন’। এই রকম নানান পোস্টার ঘরের নানান জায়গায় মেঝের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। কর্মীরা গিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে দেবে।

কৌশিক ভেতরে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভূমিভেতর মতো তার অবস্থা। জেলে যাওয়ার আগে এই ঘরে সে অনেকবার এসেছে। অবনী দত্তর কাছে বসে বিপ্লবের তালিম নিয়েছে। ঘরের তখনকার চেহারার সঙ্গে এখনকার এই চেহারার মিল নেই।

অবনী একটা সিঙ্গল-পীস সোফার বসে ছিলেন। তাঁর মূখ দরজার দিকে। তিনিই প্রথম কৌশিককে দেখতে পান।

‘আরে, এসো, এসো।’

কৌশিক কয়েক পা এগিয়ে ঘরের ভেতরে এসে যায়। আর যারা ঘরে ছিল তারা অবনীর আহ্বান শুনেন কৌশিকের দিকে মূখ ঘোরায়ে।

হাবুল, বভান আর বিজিত লম্বা সোফা-পীসটার পাশাপাশি, বসেছিল। অবনী তাদের বলেন, ‘কৌশিককে বসতে দে।’

কৌশিক খোদকটায় বসে তার পাশের সিঙ্গল-পীস সোফায় শিবানী বসে। শিবানী কৌশিকদের পার্টির একজন বড় নেত্রী। অবনীর ডান-হাত। কৌশিক ডাকতো, ‘শিবানীদি।’

মিষ্টি সেন্টের গন্ধ এখন কাছাকাছি বাতাসে। শিবানীদি কি সেন্ট দিয়েছেন? তাঁর সঙ্গে অবনীদার সম্পর্ক নিয়ে একসময় শহরে নানান মূখরোচক গল্প চালু ছিল। এখনও আছে কিনা, কৌশিক জানে না। কত বছর সে শহরের বাইরে ছিল। জেলে।

‘তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো,’ শিবানী কৌশিককে বলে।

‘জেলে ছিলাম যে।’

‘তোমার ছাড়া পাবার খবর সুজয়কে দিয়ে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে-ছিলাম,’ অবনী বলেন।

তাঁর ক’ঠম্বরে কি গর্ব ঐকমিক করে ওঠে? তিনি কি কৌশিককে বর্তমান প্রশাসন এবং শাসক দলে তাঁর প্রতিপত্তি বা সংযোগ বোকাবার চেষ্টা করেন? এরকম একটা সংশয় কৌশিকের মনে দানা বাঁধে।

‘শুনোছি,’ কৌশিকের ক’ঠম্বর শ্লান।

‘আমি এবার অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমার হয়ে ক্যাম্পে নেমে পড়ো,’ অবনী বলেন।

যে অবনী দত্তর নির্দেশ কৌশিক এতদিন বিনা স্বিধায় মেনে এসেছে, আজ তাঁর নির্দেশ মানতে গিয়ে সে স্বিধায় পড়ে। অবনীদার আগেকার বিপ্লবী তত্ত্ব আর এখনকার এই নির্বাচনমুখীনতা এই দুইয়ের মধ্যে কৌশিক কোন ধোয়াসুত্র খুঁজে পায় না। তবু সে অবনীকে কোন প্রশ্ন করে না। অভ্যাস! অবনীদার মুখের উপর কথা? তাঁর কথা যে চরম বাণী। এই শিক্ষাই সে এতদিন মেনে এসেছে।

‘এটাই আমার কেন্দ্রীয় ইলেকসান অফিস। সবাই এখান থেকে ইনস্ট্রাকসান নিয়ে যায়। তুমি রোজ সকালে-বিকালে এখানে বসবে।’

কৌশিক বাড়ি ফিরে দেখে, মানসী এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তার চা-জলখাবারও সারা। এখন নিজের খাটে পা গুটিয়ে হাঁটু-জোড়া খুঁতনিতে ঠেকিয়ে সামনের দেওয়ালে চোখ রেখে চুপ করে বসে আছে।

কৌশিক তার সামনে খাটের উপর বসে। তাকে ওর খুব বিষয় এবং হতাশা ঠেকে। ওর বুকের ভেতর হঠাৎ ধক্ করে ওঠে। এভাবে কি ও এর আগে কখনো বোনের দিকে তাকিয়েছে? সংসারের যে দায়িত্ব ওর নিজের নেওয়া উচিত ছিল, কেমন স্বার্থপরের মতো সেই দায়িত্ব বোনের উপর চাপিয়ে দিয়ে ও কত স্বচ্ছন্দে বসে আছে। নিজেকে দিকার দিতে ইচ্ছে করে। বাবা শয্যাশায়ী, সবচেয়ে ছোট বোন নাবালিকা, ওর ঠিক পরের বোন চাকরি করে সংসার চালাচ্ছে। সংসারের এই হালের কথা ও কি কোনদিন ভেবেছে? ও নিজেকে কেবল বিপ্লব বিপ্লব করে দিন কাটিয়েছে। সংসারের প্রতি ওর নিজের কোন দায়িত্ব নেই?

‘কিছু বলবি?’ মানসী জিজ্ঞেস করে। কোন এক অতল খাদ থেকে তার কণ্ঠস্বর যেন উঠে আসে।

‘না। এমনি ভোর কাছে একটু বসলাম।’

দুঃখনেই পাণ্যপাণি কিছুক্ষণ এক সঙ্গে বসে থাকে। কারও মূখে কোন কথা নাই। দুঃখনেই নিশুপ। বাক্যহীন।

মানসীর হঠাৎ ইচ্ছে করে, দাদাকে বলে ওর চাকরিটা আসলে কি যাতে দাদা বোঝে, সংসারের যে দায়িত্ব দাদার পালন করা উচিত ছিল সেই দায়িত্ব সে কি ভাবে পালন করছে!

কিন্তু সে জিজ্ঞেস করে, ‘কোথায় গিয়েছিল?’

‘কত বছর বাদে এলাম। তাই শহরটা ঘুরে দেখলাম।’

‘কেন? লাগলো?’

‘সব কিছু একই রকম। কোন বদল হয়নি।’

‘একটা বদল হয়েছে। যে পুঁজি কনস্টেবলটাকে অবনী দত্তর নির্দেশে শ্রেনীশঙ্কর হিসেবে তুই খুন করেছিলি, তার বোটা রাজ্যের ফুটপাথে বসে তেলেভাজা বিক্রী করে। আগে করতো না।’

কৌশিক মানসীর মূখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার তার দৃষ্টিতে কোটরে আতংক ডেরা বাঁধে।

‘তুই কি করে জানলি?’

‘ওদের পাড়ায় অপর্ণাদের বাড়ি। অপর্ণা আমার বান্ধবী। সে-ই বলেছে।’

‘ও জানে, আমি খুন করছি ? আমি তোরা দাদা ?’

‘হ্যাঁ।’ মানসীর কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত ঘেন। ‘আমার সম্বন্ধে ওর কি ধারণা ?’

‘সত্যি বলবো ?’

‘হ্যাঁ, সত্যি বলবো ?’

‘হ্যাঁ, সত্যিই তো বলবি।’

‘তোকে ও একজন খুনী মনে করে।’

কৌশিকের মুখ থেকে আলো দপ করে নিভে যায়। ওকে ফ্যাকাশে দেখায়।

মানসী কি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ? দাদাকে আঘাত করে ও মনে মনে কি হৃদয় বোধ করে ? ও কি বদলে যাচ্ছে ? দিনব্যাপনের গ্রানি কি ওকে পাশে দিচ্ছে ? মানসী নিজেই বুঝতে পারে না। নিজেকে বোকা কি অভয় সহজ ? নিজের প্রতি মহাত্মার পরিবর্তনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলোকে ?

কৌশিক চুপ করে বসে থাকে। মাথা কূলে আসে। বোনের ছুঁড়ে নেওয়া আঘাতের তীর তার বুকের ঠিক মাঝখানে গিয়ে লাগে। একজন কনস্টেবলকে খুন করে নিজেকে বিরাট বিপ্লবীর যে আসনে ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই আসনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়।

‘তোরা নিজের কি মনে হয় ?’

‘আমার মনে হওয়াতে কি এসে যায়,’ মানসী অশ্রুতভাবে হাসার চেষ্টা করে, ‘তুই তোরা নিজের বিশ্বেকে জিজ্ঞেস কর।’

মানসীর এও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সংসারের জন্য কৌশিক এতদিন কি দায়িত্ব পালন করেছে, সেটা কি কৌশিক তাকে বুঝিয়ে বলবে ? একবারও কি ভেবেছে, সংসারটা কেমন ভাবে চলছে ? বাবার অসুস্থতার খবরতো ওকে চিঠি দিয়ে জানান হয়েছিল। তাহলে ? এটা স্বার্থপরতা নয় ?

কৌশিক উঠে যায়। তার আর মানসীর মাঝখানে একটা বড় প্রাচীর কি গড়ে উঠেছে ?

রাতে খাওয়ার সময় সৌদামিনী কৌশিককে বলেন, ‘এবার তুই সংসারের হাল ধর বাবা ! মণি আর কতদিন জোরাল টানবে ! ওরও তো বিয়ে-খা আছে।’

সাত □

তুলোর পেঁজির মতো সাদা মেথের গায়ে কালো মেথের আলতো ছাড়িয়ে থাকা। তার মধ্য দিয়েই আলোর ঝিলিক চিকমিক করে ওঠা।

কৌশিক বাগানে ছিল। থোকা থোকা ফুলের পাশ দিয়ে অলস পায়ের

ঘুরছিল। একটা ল্যাজকোলা পাখী ওদের পাঁচিলে বসে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করছিল।

কৌশিক তখন একা ছিল।

কেউ একজন কলিবেল টিপেছিল। কৌশিক শব্দ শুনেতে পেরেছিল। গা করেনি। নানা জনতো আসে। ধোপা, সেল্‌স্‌-য়ের লোক, পূরনো কাগজ ক্রতা। ও সেই গোলাপ ফুলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল—যেটা এত ঘন লাল, সেটা কাল্‌চে দেখাচ্ছে।

‘ধোকা, হাবুল এসেছে,’ সৌদামিনী বলেন।

হাবুল বৈঠকখানায় বসে ছিল। তার পরণে ছিল জীনস্‌-য়ের ফুলপ্যান্ট আর হাফ-হাতা স্পোর্টস্‌ গির্জা।

‘কি রে, কি ব্যাপার?’ কৌশিক শূন্যেয়।

‘অবনীন্দা পাঠালো। তোরতো আর পাত্তা নেই রে। তোকে ডেকেছে।’

‘কেন?’

‘ইলেকসানেরতো আর বেশী দেরী নেই। তোকে এখনই ক্যাম্পেনে জরেন করতে হবে।’

‘বলিস, যাবো।’

মানসী এই সময় বাড়ি ছিল না। অনুরাধাকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। মানসী এরকম মাঝেমাঝে বাজারে গিয়ে থাকে। নিজের পছন্দসই বাজার করে আনে। আজ ইচ্ছে হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে সৌদামিনীর কাছে শোনে, হাবুল এসেছিল। কৌশিক যখন ছেলে যায়নি, তখন কতদিন হাবুল এ-বাড়িতে এসেছে। মানসীর সঙ্গে আলাপ আছে। সৌদামিনী, অনুরাধা আর অরুণনাথের সঙ্গেও। সৌদামিনী ওকে পছন্দ করেন না। ও’র ধারণা, এই হাবুলরাই কৌশিককে এই পথে নিয়ে গেছে। নইলে পড়াশোনা সেরে কৌশিকের এখন ভাল চাকরি করার কথা। কি ছেলে কি হয়ে গেলো।

কথাটা শুনে মানসীর মাথায় রাগ দপ্‌ করে চড়ে উঠলো।

কৌশিক ভাবছিল। অবনী দত্তকে অমান্য করার শক্তি সে হয়তো এখনো অর্জন করেনি। অবনী দত্তর ডাক উপেক্ষা করার সাহস কোথায় তার! হারি নির্দেশে সে একদিন হাতে রিভলবার তুলে নিয়েছিল, তাকে এখনো অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে কি সম্ভব?

‘হাবুলদা নাকি এসেছিল?’ মানসী কৌশিককে জিজ্ঞেস করে।

কৌশিক মাতের আঁলের মতো চোখ তুলে পাশটা প্রশ্ন করে, ‘তোকে কে বললো?’

‘বেই বলুক না! সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘অবনীন্দা ডেকেছে।’

মানসী দপ্পু করে জ্বলে ওঠে। মুখে লাল ডাব জাগে। নাকের পাটা ফোলে।

‘তুই যাবি না,’ বাঘিনীর মতো গজ্বল করে ওঠে।

কৌশিকের চাউনিতে অসহায়তা ফুটে ওঠে।

‘কেন?’

মানসী কাঁচিয়ে ওঠে, ‘কেন যাবি? যখন বাবা প্যারাগ্লিসিসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল তখনতো এরা একটা দিনের জন্যও আমাদের খোঁজ নিতে আসেনি। যখন একটা চাকরির জন্য আমি প্রত্যেকের দরজায় দরজায় মাথা ঝুঁড়েছিলাম তখন কোথায় ছিল তোর এই অবনীন্দা আর হাবদুল? এখন সব এসেছে। যত সব স্বার্থপর।’

কৌশিক মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

মানসীর একবার ইচ্ছে করে, কৌশিককে বলে দেয় ওর চাকরিটা আসলে কি! ঠোঁটের উগায় কথাটা এনেও ও শেষ পর্যন্ত গিলে ফেলে। বলে না।

রাতে শূরে কৌশিক এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে। একটা সিঁধ্যাস্থানতা ওকে আশ্তে আশ্তে গ্রাস করে। ও কিছু ঠিক করে উঠতে পারে না। তাঁর সম্পর্কে ওর ধারণারও বদল ঘটেছে। সেই বদল খারাপেরই দিকে। যে মানুষটোর কথায় ও একদিন মানুষ খুন পর্যন্ত করেছিল, সেই মানুষটা আত্ম বিপ্লবের পথ ছেড়ে দিয়ে নিবঁচনের রাজ্য ধরেছে। তাহলে এত মানুষ খুন, কত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাওয়া, কৌশিকের মতো ছেলেদের জেলে বছরের পর বছর পড়ে মরা, এসবের কি দরকার ছিল? কৌশিকের ভবিষ্যৎ গেছে। সংসারের পুরো বোকা মানসীকে টেনেতে হচ্ছে। সে তার পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি। অবনী নিবঁচনে দাঁড়িয়ে নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার নতুন করে গড়ছেন।

পরদিন ও বেরয়। রাজ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে। একা।

রাস্তার দু-পাশে বৈশ কয়েকটা কুঙ্কড়া আর বাঘাচ্ড়া। অন্য সময় হলেও ফুলগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখতো। আজ দেখেনা। দেখা বলতে যা বোঝায়। ও চিন্তিত। নিজের ভবিষ্যৎ কম্পন্থা নিয়ে ভাবনার নদীতে ডুবে আছে।

উকিলপাড়ায় সব্যসাচীর বাড়ি। সেও কৌশিকের সঙ্গে অবনীন্দার নেতৃত্বে ৫ পার্টির আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। জেলে যাবার পর কৌশিক তার আর কোন খবর পারেনি। নিজের চিন্তার দিশাহারা অবস্থায় কৌশিকের

মনে হয়, সব্যসাচীর সঙ্গে একবার আলোচনা করে নিলে ভালো হয়। সব্যসাচী এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ভাবছে সেটা জানলে হয়।

সব্যসাচী বাড়ি ছিল। ওর বোন চৈতালি দরজা খুলে দিল।

‘কৌশিকদা, তুমি!’

‘সব্যসাচী বাড়ি আছে?’

‘হ্যাঁ। বসো। ছোড়লাকে ডেকে দিচ্ছি।’

সব্যসাচীর বাবা বড় চাকরি করেন। দুই দাদাও কলকাতায় বেসরকারি কামের বড় অফিসার।

বাইরের ঘর ভারি সুন্দরভাবে সাজান। মেঝেজোড়া লাল কাপেট। জানালা—দরজার পর্দাগুলো কী সুন্দর। ফুলদানির রজনীগন্ধা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

কৌশিক সোফায় বসে। এই সব বাড়িতে নামী ছাত্র হিসেবে তার কত খ্যাতির ছিল। এখন সেটার কতটুকু অবশিষ্ট আছে, বা আদৌ কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে সে ভাবিত হয়।

‘কিরে, জেল-জীবন কেমন কাটালি?’ ঘরে সব্যসাচী ঢোকে।

মুখোমুখি বসা সব্যসাচীকে কৌশিক ভাল করে দেখে। থাকে নিরীক্ষণ করা বলে। সব্যসাচীর মুখে ও চেহারায় একটা আরাগের ভাব ফুটে উঠেছে। শরীরের অঙ্গ একটু মেদ জমেছে।

সব্যসাচী যে প্রশ্নটা করেছিল তার কোন উত্তর না দিয়ে কৌশিক নিজে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, ‘এখন কি করছিস?’

কয়েকটা বছর তো নষ্ট হলো। সম্প্রতি বি. এ পাশ করেছে। বাবা বলছেন হায়ার স্টাডিজের জন্য স্টেটস-য়ে যেতে। ভাবছি। ‘নষ্ট হলো’ কথাটা কৌশিককে আলোড়িত করে। তাহলে সব্যসাচী আর কৌশিক দেশে বিদ্রোহ আনার জন্য অবনীন্দ্রের নেতৃত্বে যে আন্দোলন করেছিল সেটা তাদের জীবনের কয়েকটা বছর নষ্ট করা কেবল?

‘নষ্ট করা কেন বলাহিস?’

‘তাছাড়া আর কি! দেশের কোন উপকার আমরা করছি? কয়েকজন সাধারণ মানুষকে খুন করা ছাড়া? তাতে দেশের কি ভাল হয়েছে? উল্টে আমাদের নিজেদের ক্রটি করছি।’

এতদিনে জীবনে আমাদের সেটল্ড হয়ে যাওয়ার কথা। তা না এখনো অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার চালাতে হচ্ছে। তুইতো আমার থেকেও ভাল ছাত্র ছিলি। তোর কোথায় উঠে যাওয়ার কথা। তা না নিজের বর্তমান অবস্থাতো ভেবে দেখতো।’

চৈতালি চা আর ওমলেট কৌশিকের সামনে সেটার টেবিলের উপর রাখে।

‘নাও, খেয়ে নেও।’

চৈতালির সঙ্গে কৌশিকের ভালবাসার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। রাজনীতির ঘণাবর্তে কৌশিক ছিটকে গিয়েছিল।

এসব আমার আনতে গেলে কেন?’

‘লজ্জা করতে হবেনা। খেয়ে নাও। কত বছর বাদে এলে।’ চৈতালি বলে।

মথার উপরে সিলিংফ্যান ফুলস্পীডে ঘুরছে। কৌশিককে বাঁসিয়ে সবাসাচীকে খবর দেবার জন্য ভেতরে খাবার সময় চৈতালিই ফ্যানের সুইচটা অন করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। রেগুলেটোরের কাটা ম্যান্সিয়ামেই ছিল।

চৈতালি সোফার একটা সিঙ্গল-পার্শে বসে। তার দৃষ্টি কৌশিকের মূখের উপর। সেই মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। এখন ফ্যানের হাওয়ায় অনেকগুলোই মিলিয়ে গিয়েছে। টিকস নাকের ঠিক নীচে পাতলা ঠোঁটের উপরে, নিখুঁত ভাবে গোঁফ কামান নরম জমিনের উপর এক বিন্দু ঘাম মূস্তোর মতো এখনো ফুটে আছে।

চৈতালির চাউনিতে কি মূখতা ফুটে ওঠে? ‘আন্দোলন-ফান্দোলন ছেড়ে দিয়ে কৌশিকনা এখন থেকে স্বাভাবিক জীবন চালাও’, চৈতালি বলে।

সবাসাচীদের বাড়ি থেকে কৌশিক যখন বাইরে বেরয়, সে তখন ভেতর শুনাতার অভিশ্র অনভব করে।

আট □

ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে কৌশিকের সাপ্তাহিক ঘটনায় সচরাচর উদাসীন দৃষ্টিরও নজর এড়ায়না।

কৌশিকের বাড়িতে ফিরে আসা বেশ কয়েকদিন হয়েছে। এর মধ্যে সে একদিনও সমরেশকে এ বাড়িতে আসতে দেখেনি। অথচ আগে সমরেশ খুবই ঘন ঘন আসতো। কৌশিক থাকলেও আসতো, না-থাকলেও আসতো। তার আসার লক্ষ্য যে মূলতঃ মানসী, তা বুঝতে কৌশিকের অসুবিধে হয়নি। সে আসলে যে মানসী খুশি হতো সেটাও সে খেয়াল করেছিল। মানসীকে মাঠে-রাস্তায় সমরেশের সঙ্গে যে মাঝে মাঝে দেখা যেতো, সে খবরও ওর কানে পৌঁচাইছিল। অথচ জেল থেকে বাড়ি ফেরার পরে সে একদিনও সমরেশকে আসতে দেখেনি। দুজনের মধ্যে কোন কারণে যে কগড়া হয়েছে এরকম একটা সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়। ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া উচিত

সেরকমই সে মনে করে। এবং এই মেটানোর দায়িত্ব একমাত্র তার পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। মানসী তার অনেকটা পিঠোপিঠি বোন এবং সমরেশ তার বন্ধু।

কৌশিক কয়েকটা ট্রাইশনি নিয়েছে। পড়াশোনায় ভাল ছাত্র হিসেবে এই শহরে তার এক সময়ের খ্যাতি তাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেছে! সে এখন রাজনীতি থেকে বিবৃত। ফলে ছাত্রদের বাবা-মার মনে বর্তমানে এই শংকা নেই যে, তার শিক্ষায় তাদের সম্মানরা বিপক্ষে চালিত হতে পারে।

সেদিন সকালবেলা দুটো ট্রাইশনি সেয়ে সে বাড়ি ফেরে। মানসী তখন লুল আঁচড়াচ্ছিল। তার মন খুব বিষম এবং হতাশাগ্রস্ত। অল্পতম কৌশিকের সেরকমই বোধ হয়েছিল।

‘শোন, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে’, কৌশিক বোনকে বলোচ্ছিল।

‘কি কথা?’

‘তোর ঘরে চল।’

দুজনে মানসীর ঘরে ঢোকে। কৌশিক দরজার পাশা ভেঙিয়ে দেয়।

‘বল।’ মানসী বলে।

‘সমরেশ আর আসেনা কেন?’

‘তা আমি কি করে বলবো? সমরেশদা তোর বন্ধু ছিল, তোরই বলার কথা।’

‘ইয়ার্কি করিস না। সিরিয়াসলি বল।’

‘জানি না।’

‘তোদের কি নিয়ে ঝগড়া? সমরেশতো চমৎকার ছেলে। তার সঙ্গে তোর কি নিয়ে গন্ডগোল?’

‘তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো।’ কথাটা বলে মানসী ঘর থেকে সটান বেরিয়ে যায়।

সমরেশের সঙ্গে একদিন কৌশিকের দেখা হয়ে যায়। রেজিস্ট্রি অফিসের কাছে, প্রায় গা-লাগোয়া, বৃন্দাবনের কাঠ, টিন আর বাঁশের ছোট ঘরের রেস্তোরা মতন। সেখানে চা, ওমলেট—সিঙ্গল আর ডবল, টোস্ট বিক্রী হয়। বৃন্দাবন নিজে তৈরী করে। একসময় কৌশিকরা এখানে বেঞ্চে বসে জোর আড্ডা মারতো। মাঝে মাঝে হাফ-কাপ চা। কত বিষয় নিয়ে যে ইনটেলেকচুরাল ডক-বিক। কৌশিকরা এই রেস্তোরার নাম দিয়েছিল—বৃন্দাবনদার ক্যাফে।

রাশ্তা দিয়ে হাটতে হাটতে কৌশিকের হঠাৎ ইচ্ছে জাগে—বৃন্দাবনদার ক্যাফেতে গিয়ে একটু বসার। সে তখন সেখানে ছিল সেখান থেকে রেস্তোরাটা মিনিট তিনেকের মতো হাটা পথের দূরত্ব। কত দিন বসেনি।

চেহারাও আগের থেকে যে খুব বেশী ঢকনাই হয়েছে ভেমন নয়। অনেকটা আগের টেবিলের মতোই আছে। তবে সামনে বেশি আর টেবিলের সংখ্যা বেড়েছে। ভীড়ও বেশী। দোকানের যে উল্লীত ঘটেছে সে বিষয়ে কৌশিক নিঃসন্দেহ হয়।

একটা বেঞ্চে উচ্চ বিকাশ আর সমরেশ নসে ছিল কৌশিককে দেখে উচ্চ আর বিকাশ চেঁচিয়ে ডাকে, 'আরে আর আয় কৌশিক।'

ওরা তিনজনে একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে কৌশিককে বসার জায়গা করে দেয়।

বিকাশ হাঁক পাড়ে, 'বৃন্দাবনদা, ভোগার পুরনো খন্দের কৌশিকের জন্য এক কাপ চা দাও।'

চা দেবার সময় বৃন্দাবন কৌশিককে হেসে বলে, 'কত দিন বাদে এলে। অনেকটা রোগা হয়ে গেছো।'

কৌশিকও হাসে। পরিচিতির হাসি। সে দেখে, বৃন্দাবন আগের থেকে মোটা হয়েছে, মাথার বেশ কয়েকটা সাদা চুল। বৃন্দাবনের বয়স হয়েছে। সেটা স্পষ্ট।

চারের কাপে চুমুক দিতে দিতে কৌশিকের ফেলে আসা ছাত্রজীবনের স্মৃতি মনে পড়ে। কত কথা, কত গল্প, কত আলোচনা। এখানেই তার সিগারেটে প্রথম হাতে খড়ি।

'তুই নাকি প'লিটিক্স থেকে সরে এসেছিস? সত্যি?' উচ্চ জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।' কৌশিকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'ব্রেভো ওয়েল ডান,' বিকাশ শুন্যে ঘূঁষি চালায়। 'অনেক দিন বাদে তুই একটা সত্যিকারের কাজ করলি। ছাত্রজীবনে পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করার থেকেও একটা বড় কাজ।'

'তুমি এখন কি করবে?' সমরেশ জিজ্ঞেস করে। কৌশিক খেয়াল করে সমরেশ তাকে 'তুই' না বলে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে।

'এখনো পরিস্কার করে কোন সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। আমার বাড়ির অবস্থাতো ভালো নয়। বাবা শয্যাশায়ী। মণির রোজগারে সংসার চলে।'

বেশ কিছুক্ষণ বাদে কৌশিক ওঠে। সমরেশের দিকে ঘুরে বলে, 'ভোর সঙ্গে একটু কথা ছিল। আসবি?'

'চল।'

দুজনে হাটতে হাটতে একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'মণির সঙ্গে ভোর কি হয়েছে?' কৌশিক সমরেশের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে

দেয়

সমরেশ ধর্মকার । তার ফস'া মূখে এক দলা লাল রং হুটোপুটি খেয়ে ওঠে । বকের ভেতর খোকা খোকা অপমান কাদার মতো কিলবিল করে । 'তোমার বোন আমাকে বলেছে আমি ঘেন তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন না দেখি আমি তার অবোধ্য, একটা অপদার্থ' ।

কৌশিকের কাছে গোটা ব্যাপারটাই বিরাট দুর্বোধ্যতার চোঁহারা নিয়ে দাঁড়ায় । মণি এই রকম অসভ্যার মতো কথা বলেছে এবং তাও সমরেশকে ? এটা কি সত্যি সম্ভব ? মণি বলতে পারে ? কৌশিক বিশ্বাস করতে চায় না । কিন্তু সমরেশ কেন শূধু শূধু এই বিষয়ে মিথ্যে কথা বলতে যাবে ? মণি আর ও দুজনে পরস্পর পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসতো ।

কৌশিকের মনে বিদ্রোহের মতো একটা সন্দেহ কিলিক মেয়ে ওঠে । তবে কি মানসীর জীবনে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ ঘটেছে ? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সেই পুরুষটি কে ? যে সমরেশকে এভাবে পরাজিত করলো ?

অনুরাধা দরজা খুলে দিওঁছিল । কলিংবেলের শব্দ বাড়ির ভেতর পর্বত চলে আসে ।

'আরে সুপ্রভাতদা, আসুন, আসুন ।' অনুরাধা সব সময়ের মতো উচ্ছ্বাসিত ।

ক্ষাপা বাবাকে বোকে দেখিয়ে সুপ্রভাতরা সেই ঘে চলে গিওঁছিল, তার পর এই প্রথম সুপ্রভাতের এ-বাড়িতে আসা ।

'কেমন আছো তোমরা সবাই ?'

'ভালো । মীনাক্ষী বৌদিকে আনলেন না কেন ?'

'ওর শরীরটা একটু খারাপ । তাই এলো না ।' মানসী কলকাতায় গিয়ে বেশ কয়েকবার সুপ্রভাতের বাড়িতে গেছে । ঐ বাড়িতে গিয়ে ও বেশ তৃপ্তি পায় । পরিচ্ছন্ন, সভ্য-ভব্য ব্যবহার । অন্যের ব্যাপারে কোন অনাবশ্যক কৌতূহলের অস্তিত্ব নেই ।

'মানসী কই ?'

'আরে, ভেতরে আগে আসুন, তারপর সবাই খোঁজ করবেন ।'

মানসী নিজের ঘরে বসে ছিল । অনুরাধা সুপ্রভাতকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলে, 'দিদি, দেখ' কে এসেছে ।'

সুপ্রভাতকে দেখে মানসী উঠে দাঁড়ায়, 'আরে এসো, এসো ! কত দিন বাদে গরীব খানায় তোমার পদাংগণ ঘটলো ।'

অনুরাধার মনে হলো, পুরনো দিদিকে অনেক দিন বাদে দেখা গেলো ।

অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে কৌশিক অরুণনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল । মানসীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িওঁছিল । সেখান থেকে সে তার অপরিচিত সুপ্রভাত এবং খুশিতে উজ্জ্বল মানসীকে দেখে । জেল থেকে

ফেব্রুয়ার পরে সে মানসীর এত খুশি খুশি মুখ এর আগে আর কোনদিন দেখিনি। তার মনে হঠাৎ এই সম্প্রহটা দানা বেঁধে ওঠে—এই কি সেই পুরুষ যে মানসীর কাছ থেকে সমরেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে? সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকের মনে সুপ্রভাতের প্রতি বিরক্তির জন্ম হয়। অরুণনাথের ঘরে ফিরে যায়।

‘বসো’। মানসী সুপ্রভাতকে বলে। সুপ্রভাত খাটে বসে।

‘আজ আমাদের এখানে থাকতে হবে কিন্তু,’ মানসী অনেকটা নিদেঁশের টংয়ে বলে। ‘পাগল’ সুপ্রভাত হাসে, ‘আমার অফিস নেই? তোমার কাছে আসবো বলে পি. সি. এল করে এসেছি।’

‘পি সি. এলকে সি. এল করে নাও।’

‘তাই বটে! এতো সোজা না? এটা সুপ্রভাতের অফিস, বুকলে মশাই?’

তার কথা বলার ধরনে মানসী আর অনুরাধা দুজনেই হেসে ওঠে।

‘ওঃ’ কাজ করে তুমি উল্টে দিচ্ছে,’ মানসী বলে।

আজ হঠাৎ সুপ্রভাতের মানসীদের বাড়িতে আসার একটা কারণ ছিল। মানসী কিছুদিন আগে তাকে একটা চাকরির জন্য বর্জ্যেছিল। তারপর সুপ্রভাত পরিচিত অনেককেই চাকরির কথা বলেছিল। যদি একটা চাকরি দিতে পারে।

আজ সেই হেতু আসা।

‘বেসরকারি ফর্মে’ কাজ করবে?’ সুপ্রভাত প্রশ্নাবটা মানসীর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

মানসীর দৃঢ়তা চকচক করে ওঠে। একটা ভদ্র চাকরির প্রত্যাশা, দৈনন্দিন অপমান আর লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি আর সুস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তনের আশা সেই চাউনিতে মিলেমিশে থাকে। তার সঙ্গে বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতাবোধ।

‘হ্যাঁ।’

তাহলে পরশু আমার বাড়িতে চলে এসো। আমার এক বন্ধু অশোক একটা ফর্মে’র বড় একজাকিউটিভ। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার অফিসে লোক নেবে। তার রেকর্মেডসানই সব। আমি তোমার কথা বলে রেখেছি। তোমাকে পরশু ওর অফিসে নিয়ে যাবো।’

সুপ্রভাত কিছুক্ষণ বাদেই চলে যায়। তাকে অফিসে যেতে হবে। তাড়া আছে। সে চলে যাবার পর কৌশিক মানসীকে জিজ্ঞেস করে, ‘ছেলেটা কে?’

‘মার পিশতুতো বোনের ছেলে।’

কৌশিক আর কোন কথা বলেনা। মার পিশতুতো বোনের ছেলে—সেতো অনেকটা দূরের সম্পর্ক।

নয় ০

রৌদ্র স্নাত বলমলে দিন। আকাশ-ভরা পেঁজা তুলোর মতো থোকা থোকা সাদা মেঘের দলায় ভেসে ভেসে বেড়ান। মাঝে মাঝে আকাশের নীচে চিল, কোথাও তিনটে, কোথাও বা চার-পাঁচটা, চক্কা করে পাক খাচ্ছে। কোথাও কোথাও সূতোর ডগায় বাঁধা ঘুড়ি।

সুপ্রভাত ট্যান্সি ডাকে। অফিসের গাড়ি এসে সুপ্রভাত আর তার কয়েকজন সহকর্মীকে এই অঞ্চল থেকে সকাল নটা নাগাদ অফিসে নিয়ে যায়। আজ সুপ্রভাত গাড়িকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, ও দেবী করে অফিস যাবে।

মিটার ডাউন করে ট্যান্সি দাঁড়িয়ে যায়।

‘এসো।’ সুপ্রভাত মানসীকে ডাকে।

কলকাতার এই অঞ্চল বি-বি-ডি বাগ নামে পরিচিত। আগে নাম ছিল ডালহৌসী স্কোয়ার।

একটা মার্টিন্টোরোও বিল্ডিং। স্বক্কে, ডকডকে। বাইরে থেকে ছাই ছাই রংয়ের।

সুপ্রভাত মানসীকে নিয়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ায়। লিফটের আরো-থাক নীচের দিকে। উপর থেকে নীচে নামছে।

সুপ্রভাতরা থার্ড ফ্লোরে লিফটের ভেতর হতে বেরিয়ে আসে। তারপর মার্বেল পাথরের করিডর ধরে বাঁদিকে কিছুটা হেঁটে যায়।

‘এই ঘর।’ সুপ্রভাত বাঁদিকের একটা ঘরের সামনে দাঁড়ায়।

মানসী সেদিকে তাকায়। নেনব্রটে নাম এ. চ্যাটার্জি, ইংল্যান্ডে।

সুই ডোর ঠেলে মানসীকে সঙ্গে নিয়ে সুপ্রভাত ভেতরে ঢাকে। সেখানে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক চেয়ারে বসে। সামনে একটা সানমাইকা-টপ মাঝারি আকারের টেবিল। তার উপর কম্পিউটার, দুটো টেলিফোন—একটার রং সাদা, আর একটার চকোলেট রং। বাতাসে এয়ারকন্ডিশনের শীতলতা।

‘সাহেব আছে?’ সুপ্রভাত সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে।

‘হ্যাঁ।’

‘বলুন আমি এসেছি।’

ভদ্রলোক অশোকের সেক্রেটারি। সুপ্রভাতকে অশোকের বন্ধু হিসেবে চেনেন। একটা টেলিফোন তুলে নেন।

‘স্যার, সুপ্রভাতবাবু একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।’

ওধারের ফোন থেকে কি কথা আসে সুপ্রভাত তা শুনতে পায়না। তবে ভদ্রলোক ফোনটা রেখে সুপ্রভাতকে বলেন, ‘ভেতরে যান।’

সেক্রেটারির ঘরটা আসলে একটা কিউবিকল। মূল ঘর থেকে কাঠের

পাটিমান দিয়ে আলাদা করা। দুটোর মাঝখানে একটা সুইংডোর। তা
ঠেলে সুপ্রভাত ভেতরে ঢাকে। পেছনে মানসী।

‘আয়!’ ঘরের উত্তরদিকে হুল দেহ। কালো পুরু গোফ, চোখে
লালচে আভা, পরনে স্কাট-টাই যে ভরলোক চেয়ারে বসে ছিল। সামনে
টেবিল—উপরটা চকচকে, যেন সদ্য সানমাইকা করা, কিছুটা উচ্চকণ্ঠে
সুপ্রভাতকে আহ্বান জানায়।

মানসী সুপ্রভাতের পেছনে ছিল। তাই ভরলোকের পুরো মূখটা
দেখতে পারনা। একটা অংশ কেবল চোখে পড়ে। তাতে মুখের চোখাটা
ধরতে পারেনা।

মেসেজোডা পাররা-গলা-নরম কার্পেট। ঘন লাল রং। প্রায় কানচের
সীমানা যে’বা। তাতে পায়ের পাতা হুঁবিয়ে হুঁবিয়ে মানসী সুপ্রভাতের পেছন
পেছন সেই মানসীটির দিকে এগোয়।

‘বোস,’ ভরলোক বলে।

সুপ্রভাত একটু বাঁ-দিকে সরে যায়, যাতে মানসী অশোকের চোখের সামনে
দৃশ্যমান হয়। তারপর বলে, ‘এই আমার বোন, যার কথা ভোকে বলছি।’

অশোক সুপ্রভাতের দিক থেকে চার্ভিন সরিয়ে মানসীর উপর দৃষ্টি
স্থাপন করতে করতে বলে, ‘বসুন।’ তখনও তার ডাকানর ধরন নিছক
মামুলি, দেখা বলতে আসলে যা বোঝায় সেরক্যাটি নয়। সে তারপরে
সুপ্রভাতের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

সুপ্রভাত আর মানসী পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে। সেখানে পাশে
পাশে একই ধরনের চারটে চেয়ার ছিল, সেগুলো অভ্যাগতদের জন্য এবং
গৃহগত মানে যে চেয়ারটায় অশোক বসে ছিল তার থেকে বেশ কিছুটা খারাপ
হলেও ততটা নিকৃষ্ট নয়।

এইবার হঠাৎ অশোকের স্মৃতিতে কি একটা চকমকি যেন ঝিলিক খেয়ে
ওঠে এবং সে আবার মানসীর দিকে ঘুরে তাকায়।

‘আপনাকে আমি যেন আগে কোথাও দেখেছি’ সে মানসীকে বলে। এই
সময় তার চার্ভিনিতে একটা তীক্ষ্ণতা ভীড় করে, যা কিনা কিছু একটা খুঁজে
বেড়ায়।

‘কোথায় আবার ওকে দেখাবি! সুন্দরী মেয়েদের দেখলেই তোর চেনা
চেনা মনে হয়।’ সুপ্রভাত ফার্জলিমি করে।

অশোক এই ইয়ার্কির ধার দিয়ে যায়না। তার দৃষ্টি মানসীর মুখের
উপর নিবন্ধ এবং সে বেশ কয়েকবার বলে, ‘কোথায় যেন দেখেছি।’

মানসী অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। যদিও সে নিজে এখনো অশোককে
কোথাও এর আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারেনা, তবুও এক অজানা

আশংকায় তার মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে।

হঠাৎ অশোক হেসে উঠে একটু জোরে বলে ওঠে, 'মনে পড়েছে।' তখনও তার দৃষ্টি মানসীর মূখের উপর নিবদ্ধ ছিল। মানসী খেয়াল করে, এই মন্তব্যটা করার পরেই অশোকের চাউনিতে ক্লেশের তাজিলোর ভাব ফুটে ওঠে।

অশোক সুপ্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নিজের বোন?'

'না।' সুপ্রভাত বলে। একটু থামে। সেও একটু সংশয়ের এবং বিস্ময়ের মধ্যে ভুবেছে। একটু থেমে থাকার পর সে যোগ করে, 'আমার মামাতো বোন।'

'আপন মামাতো বোন?'

সুপ্রভাত একটু বিরক্ত হয়, 'ব্যাপারটা কি বলতো? আপন না পর। এত সব প্রশ্ন কেন?'

অশোক হো হো করে উচ্ছ্বরে হেসে ওঠে।

গোটা পরিবেশের রং থেকে মানসীর মনে হয়, এই লোকটা তার পরিচয় জানে। ফার্মের বড় অফিসার, হোটেল-টোটেলে নিশ্চরই থাকে সাথে রাত কাটিয়ে থাকে তাহলে? তাহলে কি?

অশোক একটা সিগারেট ধরায়। সুপ্রভাতকে একটা অফার করার সৌজন্যও সে দেখাতে ভুলে যায়। চোখ দুটো কুঁচকে মানসীর মূখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটের কোণে একটুকরো বিবাক হাসি কিলবিল করে।

নাঃ! এবার আর মানসীর কোন সংশয় নেই। এই ক্লেশের চাউনি এবং হাসির টুকরো তার সব সংশয়কে দূরে সরিয়ে দেয়! তাহলে তবে এই। তার মনে হয়, মানুষের এই পৃথিবীটা বড় ছোট। এখানে কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

'আপনি তো একটা কাজ করেন। আবার চাকরি খুঁজছেন কেন? অশোকের দৃষ্টি এখনো মানসীর মূখের উপর।

মানসী চেরার থেকে উঠে দাঁড়ায়। সুপ্রভাতকে বলে, 'আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

গোটা ঘটনাটা সুপ্রভাতের কাছে খুব বিস্ময়কর ঠেকে। ব্যাপারটা কি? 'হ্যাঁ চলো।' সেও উঠে দাঁড়ায়। অশোককে কোন সম্ভাবনা না করে সে আর মানসী হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাষ্ট্রায় নেমে সুপ্রভাত মানসীকে বলে, 'কি ব্যাপার বলোতো? আমাকে বলোছিনো, তোমাকে চাকরিটা দেবে। এটা নামী ফার্ম।' তোমার উন্নতির অনেক স্কোপ ছিল।

মানসী কোন মন্তব্য করেনা। অশোকের ক্লেশের হাসি ওর গোটা শরীরে কেঁদার মতো কিলবিল করে বেড়াতে থাকে।

রাত্তা দিয়ে মিছিল চলেছে।

কৌশিক রামুর পান-বাড়ি-সিগারেটের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে তার এক ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছে। টাইশনি।

বোনের ভাপ অনেকটা কমে গেছে। আকাশে যদিও আলো আছে, তবু তা দ্বিময়। পাখীর ঝাঁক সার বে'ধে ফিরছে।

এখন সংখ্যা না, আবার বিকেলও না। না—সংখ্যা, না—বিকেল, এটা সেই সময়, যার নাম গোখলি।

একটা চাকরির জন্য কৌশিক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক লোককে বলেছে। কিন্তু এখনও একটা জুটোতে পারেনি। সবাই 'দেখবো', 'দেখছি' বলে। কিন্তু আজ পব'ন্ত দেয়নি। কৌশিক তার এই অভিজ্ঞতার ফলে এই রকম সিদ্ধান্তে এসেছে—চাকরি জোগাড় করার থেকে মানুষ খুন করা অনেক সহজ কাজ। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে নিজের অসুবিধেগুলো সম্পর্কে ও সচেতন। গ্র্যাঞ্জারেট নয়! খুন করার জন্য জেল খেটে এসেছে। এমন ছেলেকে কে চট করে চাকরি দিতে চাইবে। তবু চেষ্টা করছে। একটা চাকরির যে দরকার। বোনের ঘাড়ে সংসারের বোকা চাপিয়ে বড় ছেলে হয়েও কেমন করে বসে থাকবে! টাইশনির সংখ্যা আরো তিনটে বাড়িয়ে নিয়েছে। যাতে মারের হাতে বেশী করে টাকা দিতে পারে। নিজের জন্য যে খরচটা হয় সেটাতো ওরই বগুয়া উচিত। নিজের পেটে খাবার দেবার দায়িত্ব ওর নিজেরই। তার জন্য বোনের উপর কেন নির্ভরশীল হতে যাবে! ওর নিজের আত্মসম্মান নেই:

মিছিল এগোতে থাকে। যে সব ছেলেরা এই মিছিলে রয়েছে, তাদের অনেকেই কৌশিকের চেনা। কৌশিকদের পার্টি'র নাম ছিল ঝ পার্টি। এই সব ছেলেরা অবনী দত্ত আর ঝ পার্টি'র তীব্র বিরোধী ছিল। কৌশিকরা এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল বলতো। মিছিলের ছেলেরা কেউ কেউ কৌশিকের দিকে তাকায়। তারাও কৌশিককে চেনে। তবে এখন কৌশিক যে আর রাজনীতিতে নেই সে খবর ওদের জানা। অবনী দত্তর ঝ পার্টি এখন ক'লস্টে যোগ দিয়েছে। ক'লস্টের প্রার্থী হিসেবে অবনী দত্ত এই কেন্দ্রে থেকে অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সেই নির্বাচনের ফল আজ ঘোষিত হয়েছে।

মিছিল থেকে একজন আওয়াজ তোলে, 'হারলো কে?'

সেই ছেলেটা মিছিলের সমান্তরাল দূলাইনের মাঝখানে। ডান হাত মূর্গটবন্ধ করে উপরে শূন্যে তুলে আওয়াজ দেয়।

ছেলেটির কাছাকাছি থাকা মিছিলের লোকেরা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেয়,

‘অবনী দত্ত, আবার কে !’

কৌশিক নিব্বাচনের খবর এর আগে পায়নি। অবশ্য আজই ভোট গণনা হয়েছে। মিছিলের স্লোগান হতে সে ফলাফল জানতে পারে। অবনী দত্তর পরাজয়ের খবরে তার কোন দুঃখ হয়না। যে অবনীদাকে সে একদিন জানতো, সেই অবনীদা আজ আর নেই। তার জয়-পরাজয়ে কৌশিকের তাই কিছু এসে যায়না। বরং সে যেন একটু খুশিই হয়। কত ভাল ভাল ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার জন্য অবনীদা দায়ী। আর সেই অবনীদা এখন নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরীর চেষ্টায় ব্যস্ত।

কৌশিককে অভিনন্দন করে মিছিল সামনে এগিয়ে চলে। কৌশিক মৃদু-গল্লো দেখে।

মিছিলের মাঝখান থেকে একজন যুবক উচ্চস্বরে বলে, ‘জিতলো কে?’

অন্যরা জবাব দেয়, ‘স্বপন সেন, আবার কে!’

মিছিল চলে গেলে কৌশিক ফের ছাত্রের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করে।

স্টেশন রোড। পাকা রাস্তা। নবীনের রিক্সা নয়া সড়ক থেকে বাঁক নিয়ে সেই রাস্তায় ঢোকে।

মানসী রিক্সায় বিষয়ভাবে বসে। নবীনের সঙ্গে তার মাসকাবারি বন্দোবস্ত আছে। সে মানসীকে রোজ তার রিক্সায় করে গোখলিবেলার স্টেশনে নিয়ে যায়। আবার রাত বারটা—একটা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এ-জন্য মাস হিসেবে তাকে মানসী টাকা দেয়। নইলে অত রাতে এ স্টেশনে রিক্সা থাকে না। তখন একা মেয়েমানুষ, মানসীর পক্ষে বাড়ি ফেরা সমস্যা হয়ে উঠতো। যা দিনকাল। যুবতী মেয়ে। সেই কারণ বিবেচনা করেই মানসী নবীনের সঙ্গে মাসকাবারি বন্দোবস্ত করেছে। যখন তাকে রোজই কাজে বেরতে হয়।

সুপ্রভাতের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। সে হয়তো গোটা ব্যাপারটা জেনে গেছে। অশোক বলে লোকটা তাকে না জানিয়ে কি রেখেছে! এমন একটা খোশগুণ। সংকোচে মানসী আর সুপ্রভাতের বাড়ি যায়নি। আর বাবার প্রহণও ওঠেনা। ওর সম্বন্ধে ছেলেটা কুৎসিৎ ধারণা করেছে, ও একটা খারাপ মেয়ে। মীনাঙ্কীকেও নিশ্চয়ই বলেছে। বলার কথাইতো। স্রামী স্ট্রীকে বলবে না? ও-বাড়িতে আর মানসীর ঢোকার রাস্তা নেই।

‘দিদি, আপনি কোথায় কাজ করেন? নবীন শূদ্রোয়।’

সেই এক প্রশ্ন। নবীন মাঝে মাঝেই করে থাকে। কেন করে কে জানে। হয়তো ওর কথা বিশ্বাস করেনা। তাই বারবার প্রশ্ন করে। যদি কোনদিন ফস করে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর বেরিয়ে আসে। এই প্রশ্নটার হাত থেকে মানসী অব্যাহতি পেতে চায়। পাবে কিনা কে জানে! না পাওয়াটাই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে টিঁকে থাকবে।

‘কলকাতায়।’

‘কিসের অফিস দিদি? এত রাত করে কাজ করেন?’

‘ইওরোপিয়ান ফার্ম।’ মানসী হাস নিয়ে বলে। ব্যাপারটা নবীনের মাথার কোষে ধাঁধার মতো লেগে থাকে। কিছু বুকে ওঠেনা।

‘মেয়েছেলেদের এত রাত করে বাইরে কাজ করা বিপদের দিদি।’ প্রতিদিন মানসীকে রিস্তা করে বাড়ি থেকে স্টেশনে এবং স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরৎ নেওয়ার ফলে মানসীর সঙ্গে তার এক ধরনের নৈকট্য সৃষ্টি হয়েছে। পরিচয়ের নৈকট্য। আর তাছাড়া নবীন ছেলেটা বক বক করতে ভালবাসে। প্যাডেল পা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে সে সারাক্ষণ কথা বলে যায়। তার কথা বলার অনেক বিষয়বস্তু। তার বাবা-মার কথা, ছোট ছোট ডাই-বোনের কথা, দেশ-পারের কথা। কত যে বিষয়। তেমনি কোতুহল মানসীর ব্যাপারে। কত যে জিজ্ঞাসা। কত যে প্রশ্ন।

এখন স্টেশন-চক্স রিস্তা, সওয়ারি, দোকান পত্তর, খন্দেয়-রেলের কর্মচারী কুলি, প্যাসেঞ্জারে গমগম করছে। এখনকার চেহারা দেখে রাতে মানসী যখন প্র্যাটফর্মে নামে তখনকার চেহারা কল্পনাই করা যাবে না। চারদিক ফাঁকা। গা ছমছম করে। প্রায় সবগ্রাসী অশ্বকার আর নৈশশব্দের বাতাবরণে চারদিক ঢাকা। রিস্তান্ত্যাণ্ডে একা নবীন তার রিস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এপারো □

মানসী যখন রাতে বাড়ি ফেরে, বারটা বেজে গেছে। ক্লাবের থাবা তাকে গ্রাস করে আছে। প্রতিদিনের মতো। রোজকার ব্যাপার। বাড়ির আর সকলে এই সময় ঘুমে অচেতন। কেবলমাত্র সৌদামিনী ছাড়া। তিনি জেগে আছেন। রোজ যেমন থাকেন। তাঁকে থাকতে হয়। বড় মেয়ে ফিরবে, তাকে দরজা খুলে দিতে হবে।

বাড়ি ফেরার পর এই গহন রাতে মানসীকে নিতানৈমিত্তিক কয়েকটা কাজ সারতে হয়। তার বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করা। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা। তারপর পরনের সব পোশাক ঘুমে ফেলা। এসব করার পর তবে তার নিজের ঘরে যাওয়া, বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা।

সৌদামিনী জেগে থাকেন। যদিও মানসী তাঁকে বলে থাকে, ‘যাও, তুমি শূতে যাও।’ তিনি ভবু দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়ের ক্রান্ত পদক্ষেপ দেখেন। শোনে। বাথরুমে শাওয়ার হতে জল পড়ার শব্দ, টুকটাক আওয়াজ, কখনও বা মানসীর কণ্ঠনিসৃত গালাগালির অর্থহীন শব্দ। কাকে যে নে উদ্দেশ্য করে এই সব গালাগাল দেয়, কেনই বা দেয়, বোঝেন না। মাঝে মাঝে

একটা সন্দেহ দানা বেঁধে তাঁর ভেতর উঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি সেটাকে জেগে উঠতে দেননা, গলা টিপে হত্যা করেন। এটাকে মাথা তুলতে দেওয়া যে পাপ। কেমন করে তিনি স্বীকার করতে পারেন, এই সন্দেহটা বাস্তব। তাহলে যে তাঁর নিজেরই অপমান। শব্দ একটা বড় দীর্ঘশ্বাস প্রতি দিন প্রতি রাতে গিলে ফেলেন। তার শব্দ যেন কেউ, এমন কি তাঁর নিজের কানও শুনতে না পায়। তারপর একসময় নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েন। রাত গড়াতে থাকে বাড়ে।

মানসী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে। ছিটকিনি তুলে দেয়। দেওয়ালে ঝোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেকে ভেংচায়, কখনও বা বলে, 'তুই মর! তুই তো একটা রোঁড়ি।' তারপর কখনও বা পৃথিবীর সবাইকে গালাগাল দেয়। তারপর একসময় নিজের বিছানায় আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে অঝোর ধারে কাঁদতে থাকে।

পরদিন রোজকার মতো বেলা বেশ গড়িয়ে যাওয়ার পর মানসীর ঘুম ভাঙে। চোখ খোলে। বড় করে হাই তোলে। দুপাশে অনাবৃত দুহাত ছড়িয়ে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে।

তারপর বাইরে বেরোয়। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন। নিজের শোরার ঘরে ফিরে হয় বিছানার উপর, না—হয় খোলা জানালার সামনে থাকা বা পাছচারি করা।

তা এখন ও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এমনিই তাকিয়েছিল। বাইরে আকাশের খন্ড খন্ড মেঘ পাশের যমুনা মাসীদের বাড়ির পাঁচিল, তাঁদের চিলে কোঠা, স্ট্রিট ল্যাম্পপোস্টে বসে থাকা দুটো কাক, এই সবের উপর দিয়ে তার চাউনি ঘুরে ঘুরে যায়।

দিদি, ভোর চা। স্ট্রেটের উপর রাখা কাপে ধূমায়মান চা এক হাতে, আর এক হাতের স্ট্রেটে মাখন-মাখান টোস্ট, অনুরাধা ঢোকে। খাটের পাশের ছোট বেড-সাইড টেবিলে সেগুলো রাখে।

কাকের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মানসী ঘরের দরজার দিকে ফেরে। অনুরাধাকে দেখে, চা আর টা দেখে। তারপর মশর-পায়ে খাটের দিকে এগোয়।

অনুরাধা দাঁড়িয়ে থাকে। দিদির মুখে সে'তে থাকা বিষমতা নতুন কিছু নয়। এটা একটা স্বাভাবিক ছবি। রোজকার। এটা তাকে বিস্মিত করেনা। 'কিছু বলবি?' মানসী জিজ্ঞেস করে। তার ডান হাতে এক টুকরো টোস্ট। 'কাল সন্ধ্যাতে সমবেশদা এসেছিল।' মানসীর চোখ দুটো কি বিষমভার মোড়ক খুলে হঠাৎ চিকচিক করে ওঠে? খুঁশির কিলিক উঁকি দেয়? এসব হয়তো অনুরাধার অনুরোধ।

মানসীর কাছ থেকে সে কোন মন্তব্য প্রত্যাশা করেছিল কি? তাই কি কথাটা বলার পর কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ হয়ে থেকেছিল? কিন্তু যখন দেখে মানসী মাথা নীচু করে চারের কাপে চুমুক দিতে বাস্তব হয়েছে তখন বলে, 'নেমস্ট্রম করভে এসেছিল।'

এবার মানসী কথা বলে, 'কিসের নেমস্ট্রম?'

'সমনেশদার ধিয়ে।'

অনুরাধার ঘর থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত মানসী কোনরকমে নিজেকে সংযত রাখে। তারপর বালিশে নুখ গুঁজে বিছানায় উপড় হয়ে ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদে। বেশ কিছুক্ষণ। একটা সর্বব্যাপী শূন্যতা ওকে ঘিরে ফেলে।

অম্যাবস্যার রাত। অশ্বকার জীবন্ত শরীর ধরে চারদিকে পরিব্যাপ্ত।

হুইস্‌ল দিয়ে ট্রেন চলে যায়। এক নারীমূর্তি বাইরে না বেরিয়ে প্র্যাটফর্ম থেকে লাইনে নামে। সে একটু আগে ওই ট্রেনটা থেকে নেমেছে। লাইন বরাবর সে পশ্চিম দিকে হেঁটে চলে। ওদিকেই ট্রেনটা চলে গেছে। তার পর ট্রেনে পেছনের আলো অশ্বকারের গভীর গহ্বরে মিলিয়ে যায়। তবু সেই নারী সেদিকেই পায়ে পায়ে হেঁটে চলে। বিষয়, স্তম্ভ, গম্ভীর। তার কোন লক্ষ্য আছে কিনা বোঝা যায়না। হয়তো আছে, হয়তো বা নেই। তবু সে সেই গহন-কালো অশ্বকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একাকিনী। □

With Best Compliments from :

Contractor's Association

[Contai—I Block Unit]

Digha Road □ Contai □ Midnapore □ 721401

ক্রেতা পরিসেবা আমাদের ঐতিহ্য....

ফোন : শোরুম : ৬২৬৮৪

বাড়ি : ৬২৪০০

দেড়শত বৎসরের অধিক অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যমণ্ডিত

অপ্রতিদ্বন্দ্বী জুয়েলাস'

সাহা অলস্কার ভবন

বড়বাজার ● মেদিনীপুর-৭২১১০১

পরিচালনায় : বিজয়কুমার সাহা ● ইন্দ্রজিৎ সাহা ● প্রসেনজিৎ সাহা

With best compliment from

GUCHHAIT ENGINEERING

Civil, Mechanical, Electrical, Engineering, Transport

Contractor and General Order suppliers

Regd office : Basudevpur : P.O. Khanjanchak

Haldia : Midnapore : W. B.

Specialist in : conveyor stacker Reclamer, Wagan Tripler.

Towers and Types of structural Job

Pipelines (Water & Gas) & Air-Pollution Control-unit

Fabricatin, Ercetion

Commissioning with Painting and Material Handling.

SITE ☐ KTPS ☐ MECHEDA ☐ MIDNAPORE

সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা.....

নির্মাণ জগতে একটি নাম

সারথীস

আপনার স্বপ্নের বাড়ীকে আরো সুন্দর ও মজবুত করতে

হলে আমাদের কাছে আসুন—

টাটা, কোণারক, ব্রীদুর্গা সিমেন্ট পরিবেশক

প্রাঃ ● পার্থসারথী দাস

প্রধান কার্যালয় : ভুবানীচক বাজার, ● বাসুদেবপুর ● মেদিনীপুর

কাঁথি ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ-কাঁথি, জেলা-মেদিনীপুর, ৭২১৪০১

কাজী নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাশ'এর জন্মশতবর্ষে

দু'জন আলোর কবিকে জানাই

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

সার্বিক জনকল্যাণে আমাদের আত্মনিয়োগ

পঞ্চায়েতকে আরও গণমুখী করতে আমাদের প্রয়াস

মানব সম্পদের পূর্ণ বিকাশে আমাদের দায়বদ্ধতা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আমাদের সহনশীলতা

ত্রি-ধারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম সংসদের মাধ্যমে সকল প্রকার

উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা

এলাকার সমস্ত নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর, সচেতন ও সক্ষম করতে

আমাদের আন্তরিক আহ্বান... “মেদিনীপুরের একটা সুর

নিরক্ষরতা করবোই-দূর।”

শ্রাবণী ধর

সেক আসেকউদ্দিন

রতন জানা

নির্বাহী আধিকারিক

সহকারী সভাপতি

সভাপতি

খৈরাগুা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ



পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত মিনি ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার্ড অফিস : খৈরাগুা হলদিয়া, পাটনা, মেদিনীপুর।

শাখা : বালকবাড়, মঙ্গলপুর, সাদীহাট, মঙ্গলপুরহাট, গোবরা

প্রায় দেড় কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন নিয়ে

আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

শ্রী গিরিধারী দাস

শ্রী বনবিহারী ডুঞা

সম্পাদক

চেয়ারম্যান

উৎসবে ও আনন্দে
নিত্যদিনের সঙ্গী
তৃষ্ণার অঞ্জলী
যাবতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ের সরবরাহ আমরাই করি।
আপনাদের সেবায়
কিরণ এজেন্সী

পরিচালক : পার্থসারথি দাস
সাতমাইল বাজার : মেদিনীপুর : ৭২১৪৫২

শতফুল বিকশিত হোক
যত আগাছা নির্মূল হোক
বালার্ক-র বই মানেই

সচেতন ও সাহসী প্রকাশনা বিশ্বায়ণ ও সংস্কৃতি
বিশেষ দ্বিভাষিক সংখ্যা প্রকাশের অপেক্ষায় মূল্য ৬০ টাকা

পরিবেশক

গ্রন্থনা

৮বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দূরভাষ : ৪৪০ ৪৩৯২

বাংলাদেশ

লোক প্রকাশনী

৭৯-৮০ আজিজ সুপার মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

লেখক সমাবেশ, ঢাকা - ১০০০

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, সূর্যসেন স্ট্রীট

ক্রান্তিক, কলেজ স্ট্রীট

কথাসিঙ্গ, কলেজ স্ট্রীট

পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট

সম্পাদক

সুধীন বসু

বালার্ক সাহিত্য প্রকাশনা

১৮ ওলিভেরী থার্ড লেন

উদয়পুর, নিমতা, কলিকাতা - ৪৯ দূরভাষ : ৫৪১-৪৮৩২

NIHM

Offers
Hotel Management Course
The Road To
A

Successful Global Career

NOBLE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
(A Project of Noble Education & Service Trust)

Barrister Colony

P.O. Digha, Dist. Midnapore

West Bengal (Pin 721428)

Ph. : 03220-66521

এগরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার্যাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

এগরা : মেদিনীপুর : ফোন - ৪৪-৩৫০

এই সমবায় সমিতি আপনার। একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি হয়েও আমানত সংগ্রহে অদ্বিতীয়। এই সমিতিতে বিভিন্ন আর্কষণীয় প্রকল্পে টাকা জমা রাখুন।

সমিতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সময় মত ঋণ পরিশোধ করুন।

কার্যকরী মূলধন : ১০ কোটি টাকার অধিক

কানাইলাল মাইতি

তপনকান্তি কর

দিলীপ কুমার সাউ

সভাপতি

সম্পাদক

ম্যানেজার

আপনি কি উচ্চ মাধ্যমিকে বসতে চান?

তাহলে ২০০১ পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড থেকে বসুন।

বিবেকানন্দ কলেজ কলেজ

এগরা (কলেজ রোড) : মেদিনীপুর

**বিঃদ্রঃ—B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., ও
L.L.B. ত এক চাপে পাশ করুন। নোটস, সাজেশান ও কোচিং 100%**

গ্যারান্টি সহকারে দেওয়া হয়।

যোগাযোগের সময় : সকাল ৭-০০টা হইতে বিকাল ৫-০০টা, রবিবার বন্ধ।

মেদিনীপুর জেলা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা
সিপাইবাজার, মীনডবন, মেদিনীপুর
আকর্ষণীয় সরকারী অনুদান ও স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী
ব্যাঙ্কঋণের মাধ্যমে আপনার পণ্ডিত
পুকুরটি সংস্কার করে গলদা চিংড়ি সহ মিশ্র মাছ চাষ
করুন। বিশদ বিবরণের জন্য সঙ্কর সংশ্লিষ্ট
পক্ষায়েত সমিতি ঈশ্বর চন্দ্র জন চেতনা কেন্দ্র জেলার মৎস্য
দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সভাপতি	নির্বাহী-সহ-সভাপতি	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
ডাঃ পুলিন বিহারী বাক্ত	এম.ভি.রাও (আই. এ. এস)	ইউ. কে. পাঞ্জা
সভাধিপতি	জেলা শাসক	জেলা মৎস্য অধিকর্তা
মেদিনীপুর জেলা পরিষদ	মেদিনীপুর	

উৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

রামনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজিঃ নং—০৬/২৭/৭/৯৫

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা)

হেড অফিস : শংকরপুর, বোধড়া মেদিনীপুর ৭২১৪২৩

শাখা : রামনগর দেউলীহাট, মির্জাপুর।

যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সুদের হার ১% বেশী

সঞ্চয় প্রকল্প

ঋণদান প্রকল্প

- ১। সেভিংস ডিপোজিট
- ২। কারেন্ট ডিপোজিট
- ৩। রেকারিং ডিপোজিট
- ৪। মিনি ডিপোজিট
- ৫। ফিক্সড ডিপোজিট
- ৬। বিবিধ



- ১। ইন্দ্রিয়া বিকাশ পত্র
- ২। কিস্তান বিকাশ পত্র
- ৩। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট
- ৪। কর্প বন্ধকী
- ৫। বিবিধ

বিঃ দ্রঃ—স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা জমা নেওয়া হয়।

অনিল দে, সভাপতি

With Best Compliments from...

S.T.D. 03220

Ph. 64-344

64-580

For better acomodation

a solitary enjoyment...

Your own resort,

Your's comfortable destination

Saikatshree Hotel & Lodge

(Sankarpur Fishing Harbour Complex)

Sankarpur ● Bodhra ● Ramnagar

(Midnapore : West Bengal)

মেদিনীপুর জেলায় সর্বপ্রথম এবং আজও প্রথম প্রতিষ্ঠান—

সাঁতরা একোয়ারিয়াম

এখানে একোয়ারিয়াম, রঙীন মাছ, মাছের বাবার এবং আধুনিক

মাছ চাবের যাবতীয় সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

কালিম্পং এর নানারকম ক্যাকটাস ও সাকুল্যান্ট পাওয়া যায়।

আজই অর্ডার দিন।

দোকান : বটতলাচক/মেদিনীপুর/৭২১১০১

(কালী মন্দিরের পাশের রাস্তা)

বাড়ী : সিপাইবাজার চক, সুভাষনগর

(বয়েজ ক্লাবের পেছনে) মেদিনীপুর

দীঘা কেন্দ্র : মীনাস্কী, দীঘা : মেদিনীপুর

প্রকাশ উদ্মুখ লিটল কবিতার অসাধারণ সংকলন গ্রন্থ
লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী
কবি কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত

লিটল ম্যাগাজিনের বাছাই কবিতা দাম : ৫০ টাকা

১৫৭ মেন রোড, ওয়েস্ট

নবব্যারাকপুর : উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২৭৬ : দূরভাষ : ৫৩৭২৪৯১

আশির দশকের বিশিষ্ট প্রতিবাদী এবং তরুণ তুখোড় কবি এস. মহীউদ্দিন ও
দেবাশিস প্রধানের গ্রন্থগুলি পড়ুন, সংগ্রহ করুন দেবাশিস প্রধান-এর কবিতার বই

মধ্যদিনের খরদাহ (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ১৫.০০

শুভেচ্ছায় আছো নীল পাতা (বাকপ্রতিমা) ২০.০০

প্রকৃতিপাঠ (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ১৫.০০

ঝরা বিলে খই ফুটেছে (সুজন) ২৫.০০

প্রেম গান শুদ্ধ বিচরণ (সিংভূম সাহিত্য) ৩০.০০

এস. মহীউদ্দিন

নিজস্ব ভাবনার দিনরাত্রি এবং অন্তরা (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ১৫.০০

মেদ কমইবার সর্বাধুনিক উপায় (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ২৫.০০

হ্যালো কমরেড (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ২৫.০০

আমাদের বিতর্ক সভার কার্যবিবরণী (উত্তাপ) ১৫.০০

স্বপ্নের আমি স্বপ্নের তুমি (কবিতার কাগজ প্রকাশ) ২৫.০০

গল্পের বই

নীল আকাশের তারা (৪৮টি ভিন্ন স্বাদের আধুনিক গল্পের সম্ভার)

(সিংভূম সাহিত্য) ১৩০.০০

(অনিল ঘড়াই এস মহীউদ্দিন গৌতম রায় শিবানী গুপ্তা মনোরঞ্জন রায় বিষ্ণুপদ
বিশ্বাস প্রমুখ) .

(এ সময়ের গল্পের স্বল্প সংকলন) তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, এস. মহীউদ্দিন
ভগীরথ মিত্র, দেবাশিস প্রধান, বিধান মাঝি, গৌতম রায়, বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, কৌশিক
গিরি, শোভন সামন্ত, সমীর রায়, চিন্ময় দাশ, সসীম কুমার বাড়ে, স্বপ্নময় চক্রবর্তী
আফসার আমেদ, শিবানী গুপ্তা, মিতা বসু কর্মকার, সুজয় জানা প্রমুখ গল্পকারের অনন্য
গল্পের সংকলন "উত্তাপ সরণী থেকে ঠাকুরতলা বৃত্তান্ত" ৭৫.০০

কবিতার কাগজ প্রকাশ

উত্তাপ সাহিত্য পরিষদ

কাঞ্চি : মেদিনীপুর-৭২১৪০১

বাঁচার তাগিদে হাতিয়ার ধরি
হইনাকো দিশেহারা
হাতিয়ার হলো বই ও কলম
নিয়মিত লেখাপড়া

বুনিয়াদী সাক্ষরোত্তর
ধারাবাহিক শিক্ষার জন্য প্রতি
গ্রাম সংসদে,

ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র

গড়ে তুলুন।

নির্বাহী আধিকারিক

সেক দানিশ
সহ সভাপতি

গীতা হাঁসদা
সভাপতি

সবং পঞ্চগয়েত সমিতি
সবং : মেদিনীপুর

**THE MOST TRUSTED HOUSE
NOW IN YOUR TOWN**

A house of Prawn seed. Prawn feed. Aqua
Culture Medicines, Aqua-Culture Inputs, all
kinds of Sea food Supplier

EASTERN SEA FOOD

(Prop. D.K.Rai)

We can feel your pond's voice....

Office : Dhandighi Digha Bye Pass Road (Crossing)
Contai, Midnapore, 721 401, W.B. Ph. : 56994

With Best Compliments From :

*A Vast Fish Culture with a certain aim
to achieve Socio Economical Status*

*Please contact your fishery office at
DIAMOND HARBOUR Range*

Ph. 03174-55236

03174-55455

Fax - 91-03174-55455

S.K.GANGULY

Project Officer

□ BENFISH □

Diamond Harbour. 24 Parganas(South)

অধ্যাপক ভাস্কর দেব

জ্যোতিষ গবেষণায় ডঃ মেঘনাদ সাহা স্বর্ণপদক
ভারতের সেরা জ্যোতিষদের একজন



কাঁচি - নন্দন লজ, দীঘা বাস স্ট্যান্ড - ইং ৮,৯ তারিখ

এগরা - রোশনাই মঞ্জিল, কলকাতা মোড় - ইং ৭ তারিখ

মেদিনীপুর - বি/২, কংসাবতী কোর্টার্ডার অর্জকোট, ইং ১,২,৬,১০ তারিখ

শুভেচ্ছা এসে গেলে
শুভেচ্ছা মানেই মধুর অনুভূতি, নতুন প্রতিভা
শান্তদীপ্যাক দিনগুলিতে
জলখাবারে আশ্রয় নতুন স্বাদ

ব্যবহার করুন

দুগ্ধমুক্ত প্রকৃতি থেকে সরাসরি আহরণ করা

সুন্দরবনের খাঁটি মধু মৌবন

(পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের একটি উৎকৃষ্ট উপাদান)

এই মধুর স্বাদ ও আসল রং নিজেই পরীক্ষা করুন।

২০০ ও ৫০০ গ্রাম বোতলে পাওয়া যাচ্ছে।

বিপণনে :

মর্টন ফুড প্রোডাক্টস

পালপাড়া, চন্দননগর। দূরভাষ : ৮৩৫৩৮১, ৮৩৯৫২৯

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

তত্ত্বজ্ঞ ভবন, ব্লক ডি. ডি. নং-১৮/৪, সেক্টর-১, বিধাননগর, কলিকাতা-৬৪

আধুনিক ডিজাইন বর্ণাভেই উজ্জ্বল! ব্যংগ্যার তাঁতের কাপড় আকর্ষণীয়
রূপ, মটিক পরিমাণ, উজ্জ্বল রঙ, মসৃণ বুনন, ন্যায় দাম, আর
সবার উপর নতুন নতুন চটকদার ডিজাইন শাড়ী (সিল্ক, মূতি,
পলিয়েস্টার, প্রিন্টেড), শাটিং, শাটিং ও মূতি, গৃহমজ্জার সামগ্রী,
বিছানার চাদর, ঢাকা (মূতি ও ছাপা)।



এস্তা

বাংলার তাঁতের কাপড়

বিশেষ আকর্ষণ

স্যাণ্ডেলের কার্মিজে, তৈরী পোশাক

বই

যাঁরা পড়েন
এর কথা যাঁরা ভাবেন
কে যাঁরা ভালবাসেন

সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্পকলা, বিজ্ঞান বিষয়ক
পুস্তকের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মল্লিক পুস্তকালয়

শিববাজার : মেদিনীপুর-৭২১১০১
তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে

উৎসবের অটেল সম্ভার

মণ্ডল ব্রাদার্স

(এ্যাটাচি ও ব্যাগের পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা)
এগরা শহর : মেদিনীপুর

তাই তোমার আনন্দ আমার পর...
তুমি তাই এসেছো নীচে...
আপনার পড়াশুনোর নিত্য সঙ্গী

প্যাপিরাস

পুস্তক বিক্রেতা
রামকৃষ্ণবাজার : কালিকাখালি : মঠচণ্ডীপুর : মেদিনীপুর

তরুণ প্রজন্মের কবি সোমনাথ প্রধানের
পঞ্চম কবিতার বই “ভীলোবাসা যে নামে ডাকো” ৩৫ টাকা
আপনার নিজস্ব পাঠাভ্যাসকে আমূল বদলে দিবে। আজই পড়ুন।

কবিতার কাগজ প্রকাশ

জুনপুট : মেদিনীপুর : ৭২১৪৫০

উৎসবের অনাবিল আনন্দে সবাইকে জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



নির্মলচন্দ্র গিরি

দক্ষিণ শিবপুর □ শ্যামপুর
হাওড়া-৭১১ ৩১৪

প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে উৎসর্গীকৃত অমল গোলাপ
এই সময়ের অহংকারী সাহিত্যপত্র...

সাহিত্য সম্প্রতি/প্রণব মহিতি, অল্টাচল/মনোহরচক, কাঁথি/মেদিনীপুর, ফোন : ৫৫২৯৩
কবিতার কাগজ/সেবাসিস প্রধান / ঠাকুরতলা/মেশদত্তবাড়/জুনপুট/ মেদিনীপুর-৭২১৪৫০

ছিন্নপত্র/অসীমা মহান্তি/বালিঘাট/মেদিনীপুর

চতুর্দোলা/যানস প্রধান/চন্দনপুর/বাদলপুর/সাতমাইল/মেদিনীপুর

দ্বিধলপত্র/সুন্দরন বাটুয়া/দ্বিধলভিলা/মুখী ব্রেনচন্দ্র সরসী/কচুড়ি/রাইপুর পশ্চিমবাড়
কাঁথি/মেদিনীপুর/৭২১৪০১/দূরভাষ : ৫৮৬২৫

বাহার/মঞ্জুশ্রী পাল/কিশোরনগর/কাঁথি/মেদিনীপুর/৭২১৪০১

জ্বলদর্শি/অদ্বিক ত্রিপাঠী/নুগবেড়িয়া/মেদিনীপুর

সংক্রান্তি/রাজকুমার পণ্ডা/বিপ্রস্বতি ভবন/রাজাবাজার/কাঁথি/মেদিনীপুর/৭২১৪০১
কাগজে কলমে/মণুমিতা হাঁসদা/মনোহরচক/কাঁথি/মেদিনীপুর

কবি দেবশিস প্রধান'এর কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহে রাখুন

□ মধ্যদিনের খরদাহ □ শুভেচ্ছায় আছো নীল পাতা

□ প্রকৃতিপাঠ □ স্বরা বিলে খই ফুটেছে □ প্রেম গান, শুদ্ধ বিচরণ

কবিতারকাগজপ্রকাশ

জুনপুট □ মেদিনীপুর □ ৭২১৪৫০

সাম্য মৈত্রী ঐক্য প্রগতি

শান্তির পথ ধরে—

আমরা চলেছি, আমরা চলবো,

যুগ যুগান্ত ধরে...

ওধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার

সার্বিক লক্ষ্য উন্নয়ন—২২ বছরের চেতনায় এ

আমাদের গভীর অনুভব।

তাই একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি আমাদের চুবিনয় উচ্চারণ...

“হাতে হাতে গড়ে ঘাই মানব শৃঙ্খল

ধর্মের ভেদ ভাঙ্গি, মনের দেওয়ালে

শিক্ষা প্রযুক্তি কৃষি আর স্বাস্থ্যের আর স্বাস্থ্যের শপথে

উড়িয়ে নিশান গড়ি নতুন শতক।

নন্দীগ্রাম-৩ পঞ্চায়েত সমিতি

যুগলকিশোর জানা

সূভাষ কোনার

একাদশী বর্মন

সহ-সভাপতি

নির্বাহী আধিকারিক

সভাপতি

গ্রামীণ জনজীবনের বিকাশে, প্রাণী সম্পদের ভূমিকা...

আজ্ঞে হ্যাঁ, কৃষি প্রধান আমাদের এই দেশে যে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করে আছে তার মধ্যে প্রাণী সম্পদ অন্যতম। আমরা প্রাণী সম্পদের সঠিক বিকাশের মাধ্যমে গড়ে তুলতে চাই সার্বিক গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন। প্রাণী সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত বিকাশে, সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রাণী সম্পদ পালনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিল্পের সম্ভাবনা। এছাড়াও গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, সাদা ওকর পরিকল্পিতভাবে পালন করলে দেশের সম্পদ আরও বৃদ্ধি হবে। এই কাজকর্মে চাই সমস্ত স্তরের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও বাস্তবানুগ প্রকল্প রচনার উদ্যোগ। স্বল্প আয়ের মানুষদের সরকারী ঋণ দিয়ে এই সব প্রাণী পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন এবং প্রাণী সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসার ঘটিয়ে গ্রামীণ বেকারত্ব তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ নিন।

কাঁথি মহকুমা প্রাণী সম্পদ বিকাশ আধিকারিক

কিশোর নগর (বহির্পাস রোড) : কাঁথি : মেদিনীপুর

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী

উমা আমার কত কৈঁদেছে...

ওধু মাতৃপূজার দিনগুলিতে কেন, নিত্যদিনের আহারের সংস্থানে চাই
উন্নতমানের চাল! বাজারের যে কোন 'চাল' আড়ৎ-এর চাইতে আরও
ভাল পরিষেবা এবং আরও ভাল 'চালের' জন্য গৃহিনীদের প্রথমেই
'শ্রদ্ধাঞ্জলী'র কথা মনে থাকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলী রাইস কর্ণার

(চির পরিচিত বাঙালী চাল আড়ৎদার

শ্রী বীরেন্দ্র নাথ খাটুয়া

রথতলা : কাঁথি (ইউ বি আই গলি) : মেদিনীপুর

অন্যধারার লেখক

কালীপদ প্রধান 'এর প্রগতিশীল পুস্তকগুলি আপনার সংগ্রহে রাখুন...
হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ (কাব্যগ্রন্থ), আমনত (উপন্যাস), নবাকুর
(সম্পাদিত কাব্য সংকলন), সপ্তর্ষি (সম্পাদিত কাব্য সংকলন),
পঞ্চবটী (সম্পাদিত কাব্য সংকলন), মিত্রাক্ষর (কাব্যগ্রন্থ) যন্ত্রস্থ,
কাম্বা-হাসি রহস্য (গল্প সংকলন) যন্ত্রস্থ, কয়েদী (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ।

সাহিত্যাকুর প্রকাশন

বাসিহাটি : সিমলা : হুগলী

উৎসবের সেরা সঙ্গী

সকাল থেকে সন্ধ্যা

সেরা পাদুকা

Asthaleathers

আস্থা লেদার্স

পাঁজামার্কেট : সরস্বতীতলা : কাঁথি : মেদিনীপুর

পরিচালক : দুর্গাপদ দাস (হটেন)

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ...

সমস্ত শিশুর সার্বিক বিকাশে ৬ বছরই শিশুর জীবন গঠনে বৃন্যবাদ তৈরীর আদর্শ সময়! আমাদের এই প্রকল্পে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ শিশু মৃত্যু, রোগ-ভোগ, অপুষ্টি ও তাদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার হ্রাস করা। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব সহকারে মায়েদের সক্ষম করে তোলা।

এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য কর্মসূচী পরিপূরক পুষ্টি প্রতিষেধক টিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষা চিকিৎসা প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষা, অবিধিবদ্ধ প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় মৌল উপাদান সমূহ সরবরাহ ও সার্বিক সফলতার সুনিশ্চিতকরণ।

শিশুর চাই অপার অনাবিল মাতৃস্নেহ। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার।

এইলক্ষ্যে পৌছতে চাই আপামর জনগণের আন্তরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা।

আসুন সবাই মিলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি!



মোশাররফ হোসেন

শিশু বিকাশ অধিকারিক
রামনগর-১ ব্লক, মেদিনীপুর।

সমবায় আন্দোলন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নে চাই সার্বিক উদ্যোগ... শরতের আঙিনায় আমাদের সদস্য সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ডিস্ট্রিক্ট ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস

এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ

ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : প্রশাসনিক ভবন, কেরানীতলা

ডাক ও জেলা : মেদিনীপুর, ৭২১১০১

(শ্রী দিলীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত।)

এগরা পৌর সংস্থা

এগরা : মেদিনীপুর

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানই উন্নত অভিনন্দন।

সাথে সাথে পৌর নাগরিকদের নিকট আবেদন কুষ্ঠ রোগ আমাদের জাতির লজ্জা, একে সম্পূর্ণ নির্মূল করার দায়িত্ব আমাদের।

আপনার বকেয়া কর মিটিয়ে দিন। শহর উন্নয়নে সহযোগিতা করুন।

নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলুন, শহর পরিষ্কার রাখতে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌরসভার সহিত সহযোগিতা করুন।

পানীয় জলের অপচয় করবেন না এবং পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করতে পৌরসভার সহিত সহযোগিতা করুন।

যত্র তত্র পায়খানা না করে পৌরসভার আই.এল.সি.এস প্রকল্পে স্যানিটারী পায়খানার সুযোগ গ্রহণ করুন।

উচ্চ বর্ণ ও তপশীল জাতির মধ্যে অসর্বণ বিবাহের ক্ষেত্রে দম্পতি পিছু ২০০০.০০ টাকা অনুদান প্রাপ্তির জন্য পৌর সভার যোগাযোগ করুন।

বিদ্যুতের সূত্র সম বন্ধনে সহযোগিতা করতে বকিং ও বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করুন।
নবকুমার মাইতি
উপ-পৌর প্রধান

তপন কান্তি কর
পৌরপ্রধান

রোগ ও রোগীর সেবায়
Dr. Tushar Kanti Ghosh
Kusputa Ghatal Midnapore
CHILD SPECIALIST
Ghatal Sub-Div. Hospital
M.B.B.S. (Cal) D.C.H. (Cal)
সুস্থ সবল শিশুর জন্য চাই উপযুক্ত
পরিচর্যা। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাই
কু-সংস্কার অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে
বিজ্ঞান মনস্তত্বায় শিশুর সেবা একান্ত
জরুরী।

ডাঃ তুষারকান্তি ঘোষ
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

শারদ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানই
মৎস্যজীবীদের আর্থ সামাজিক
মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ
করে চলেছে,
কাঁথি কেন্দ্রীয়
মৎস্যজীবী সমবায়
সমিতি লিঃ

মীনভবন : কাঁথি : মেদিনীপুর

সমরেশ দাস
সভাপতি

আনন্দগোপাল সরকার
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

দেড়শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ
ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

সাহা অলঙ্কার ভবন

বড়বাজার • মেদিনীপুর

ফোন : ৬২৪০৩ (বাড়ী), ৬২৫৮৪ (দোকান)

পরিচালনায় - বিজয় কুমার সাহা, ইন্দ্ৰজিৎ সাহা, প্রসেনজিৎ সাহা



- শেটের পর সাফন বা
জাই দিতে হাত সেন।
- চটি পরে ঘরে
বাইরে যান।
- কলের ছালে খালা
ফল সেন।
- পুড়লা পায়খানার
তুলতে ও. আর. এস.
সবক দিন।

শেটের অসুখ থেকে বাঁচতে - প্রতিদিন ৩০ মিনিট সাবমর্সি
- প্রতি বছর শৌচাগার তৈরী করুন, সবকলে ব্যবহার করুন।



পশ্চিমবঙ্গ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পঃ বঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা)

১৩৫-এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ত্রিতল), কলি-১

জাতীয় যোজনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে জাতীয় তফসিলী জাতি ও বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায়ুক্ত আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে আবেদনকারী সকল তফসিলী জাতি ও আদিবাসী ব্যক্তির পারিবারিক সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে ৩১,৯৫২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪২,৪১২ টাকার মধ্যে হতে হবে। অন্যদিকে, পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে (এস. সি. পি. ও টি. এস. পি.) আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ঐ আয় যথাক্রমে ১৫,৯৭৬ টাকা ও ২১,২০৬ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

বর্তমানে এই নিগম পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে (এস.সি.পি. ও টি.এস.পি.) সর্বোচ্চ প্রকল্প মূল্য ৩৫,০০০ টাকার মধ্যে শতকরা ৫০ টাকা (সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকা) অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকে।

জাতীয় নিগমের ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্য সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। কাঠের কাজ, রূপোর গহনা তৈরী, অটো রিক্সা প্রভৃতি নানা অর্থকরী প্রকল্প এর আওতাভুক্ত। এ ছাড়াও, এই নিগম বর্তমানে জাতীয় সাফাই কর্মচারী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের পক্ষে এই রাজ্যে কাজ শুরু করেছে। সাফাই কর্মচারীদের, তাঁদের প্রথাগত পেশা থেকে সরিয়ে এনে নানা অর্থকরী প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিতে বিভিন্ন প্রকল্পে স্বল্প সুদে ঋণ এবং অনুদানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য নিগমের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও প্রতিটি জেলা শহরে এই নিগমের শাখা অফিসগুলিতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

With Best Compliments From
Allied Engineering

(Govt. Contractor)

112/B, Ananda Palit Road,
Calcutta 700 014

ব্যবহার করুন

রশ্মি সিমেন্ট

RASHMI 
CEMENT

জাফরী, টাইসল ও

গুণগত মানের নির্ভরযোগ্য সিমেন্ট

সালু এন্টারপ্রাইজ

কালিকাখালি : মঠ-চণ্ডীপুর : মেদিনীপুর

bajaj Auto Ltd.

PIONEER MOTORS

পাইওনিয়ার মোটরস

Egra & Contai Midnapore
Authorised Service & Spare Parts
Dealer bajaj Auto Ltd.
&

Authorised S.S.O. Amit Motors
Inda, KGP.

bajaj Auto Ltd এর সমস্ত প্রকার মোটর সাইকেল ও স্কুটার প্রভৃতি ক্রয়
এবং কোম্পানীর ট্রেনিং প্রাপ্ত মেকানিক দিয়ে সার্ভিসিং করানোর জন্য সকলকে
আমাদের Show room গুলিতে আসার আমন্ত্রণ জানাই।

কর্তৃপক্ষ

শরৎ এর আঙিনায় নতুন বইর গন্ধ মেখে
প্রকাশিত হ'ল

ডাঃ রমেশচন্দ্র বেরার প্রথম কবিতার বই

দেহেশা

[দেহজ কামনা বাসনায়, জবজবে রক্তাক্ত, হৃদয়ের সুনিপুন উপস্থাপনায়
দেহজ্জ্বের নীলে অবতীর্ণ কবিতার সংকলিত প্রকাশ।]

আজই সংগ্রহ করুন/পড়ুন/গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখুন।

কবি ও কবিতা প্রকাশন

মেছেদা : মেদিনীপুর

With Best Compliments from

CONTAI BLOCK III
CONTRACTORS ASSOCIATION

Estd.—1993

Marishda, Midnapore

For Your Better Service
We are always at your door step...

S.T.D. 03220

Ph. 50247

BHAITGARH NACHINDA S.K.U.S. LTD.

Regd. No.—Cont.3 / Dated-17.4.70

P.O.-NachindaBazar, Contai, Mldnapore

Banking Deposit Scheme
Petrol Pump Services at Contai Bye Pass more

Subodh Chandra Patra	Subhendu S. Das	Abya Kumar Bhunia
Chairman	Secretary	Manager

উৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

স্নেহাংশু শেখর ঘোড়াই

(গভঃ রেজিস্টার্ড)

ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কন্ট্রাক্টর

কন্দর্পপুর : কাঁথি : মেদিনীপুর

৭২১৪০১

মেদিনীপুর জেলা নোলাজল মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা মীনভবন, কাঁথি, মেদিনীপুর

নোলাজল মাছ চাষে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং প্রশিক্ষণের জন্য
নিকটস্থ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক
অথবা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, নোলাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা,
কাঁথি, মেদিনীপুর অফিসে যোগাযোগ করুন।

এম. ভি. রাও, (আই. এ. এস)

জেলাশাসক, মেদিনীপুর

ও

নোলাজল মৎস্যচাষী

ডাঃ পল্লিন বিহারী বসু,

সভাপতি,

সহ-সভাপতি

কিশোর নাগ

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

নোলাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা

সভাপতি

নোলাজল মৎস্যচাষী
উন্নয়ন সংস্থা

With Best Complements from

Phone 62226

62257

Nezami

(Rekha Sea Food Centre)

All Kinds of Sea Food

SUPPLIERS & COMMISSION AGENT

Prop Mir. Momraj Ali & Brothers

Vill+P.O Kalindi.

P.s. Ramnagar, Midnapore

সেরা জিনিসটি দেখুন আসল জিনিসটি কিনুন



এখন আপনার প্রিয় শহর কাঁধিতে ঘরকণ্যের টুকিটাকি এবং
নান্দনিক উপকরণের জন্য চাই, আসল জিনিস!

ঐতিহ্য সম্পন্ন উৎপাদক গোষ্ঠী সমূহের অফুরন্ত সত্তার! কাঁথির সম্ভ্রান্ত
মানুষদের জন্য আমরাই সরবরাহ করি....

☐ লাওপালা ☐ ইয়েরা ☐ বোরোসিল গ্লাস ☐ ভাঙেনা-
মোচড়ায়না এমন বাসনপত্র ☐ বোন চায়নার কাপ-প্লেট ☐ টি-
সেট ☐ ডিনার সেট ☐ ফুলদানি ☐ ক্যাকটাস পট ☐ ফ্ল্যাস্ক
☐ হটপট ☐ রঙ বেরঙের কৃত্রিম ফুল। আরো অনেকানেক গৃহ
সজ্জার দেশী-বিদেশী উপকরণ!

কসমস গ্লাসওয়ার

দেওয়ান মার্কেট ☐ কাঁথি ☐ মেদিনীপুর ☐ ৭২১৪০১

গ্রাহক পরিষেবায় : সুনির্মল মাইতি, সুকমল মাইতি, সুকুমার মাইতি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

(Directorate of Distance Education Courses)



★ ব্রীজ কোর্স—বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোচিং, নোটস ও সাজেশান দেওয়া হয়।

★ এম.এ. : বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোচিং, নোটস ও সাজেশান দিয়ে ভালো রেজাল্টের জন্য প্রতি রবিবার ক্লাস দেওয়া হয়।

★ অভিজ্ঞ শিক্ষক / শিক্ষিকা ও অধ্যাপক দ্বারা ক্লাস করানো হয়।

★ FORM FILL UP-এর দায়িত্ব আমাদের।

আশা করেসপনডেন্স কলেজ

(গতঃ রেজিঃ নং-৫৭৭৬৪) ● স্কুল বাজার (N.C.C. অফিসের দোতলায়)

কাঁথি ● মেদিনীপুর ● প্রতিদিন খোলা ● ফোন-(০৩২২০) ৫৬০৪২

★ এম.এ ক্লাস বাংলা ও ইংরাজী প্রতি রবিবার সকাল ৮টায় ও এম.এস.সি ক্লাস প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায়। ★ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (প.ব. ও বিহার) বোর্ড ও কাউন্সিল ★ বি.এ./স্পেশাল বি.এ./অনার্স (কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ★ এম.এ./এম.কম./এম.এস.সি (কলিকাতা / বর্ধমান / বিদ্যাসাগর) ★ এম.এস.সি (অঙ্ক) আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় ★ এল.এল.বি. (৩ বৎসর) উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ★ বি.এড. ও বি.পি.এড—উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ★ পি.এইচ.ডি (বর্ধমান ও কল্যাণী)

একচাপে নিশ্চিত পাশের জন্য সরাসরি

যোগাযোগ করুন।

দীঘা গামী ভায়া কাঁথি যেকোন বাসে এসে কাঁথির যেকোন বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে রিক্সায় ৫ মিনিট, বলুন N.C.C. Office School Bazar যাবেন। দোতলায় আমাদের কলেজ।

USHA



The undisputed leader in fans

শ্রেষ্ঠ মূল্যে সর্বোত্তম প্রযুক্তি উৎপাদন একেবারে মূল্যবোধ মূল্যে
বাঁজাজ ওয়েভ, টোস্টার, গীজার

HOME APPLIANCES

মিক্সার গ্রাইণ্ডার • ড্যাকুমাম ক্রিনার • ওয়াটার ফিল্টার
স্টীম আয়রণ গীজার • ইমারশন হিটার • রুম হিটার
ও পাখার ফাইবারের ভি. আই. পি মোডেলড চেয়ার টেবিল

ভি. আই. পি. অ্যারিস্টোকেট সুটকেস

LAOPALA CROCKERY খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

জেলার একমাত্র পরিবেশক :-

দূরত্ব : ১- ৬২১৪৬/৬২৯১৫

ড্রাক্স হাউস

বড়বাজার (সেলস এণ্ড সার্ভিস সেন্টার) • মেদিনীপুর

আমাদের কোন শাখা নেই



Ajanta®

HAWAI & SHOES

With Best Compliments

Ph. 483-7790

From

**KERNEL INFORMATION SYSTEMS
&
INFOSOFT SYSTEMS**

390, Rashmoni Bagan
Santoshpur ● Calcutta 700 075

With Best Compliments

S.T.D. : 03228

PH : 50354

ALLIANCE ENTERPRISE

**A reputed Firm deals in : Fishing Net,
Prawn Feeds & I.M.C. Food Suppliers.**

Osiur Rahaman
Director

**SHANTIPUR ● MECHEDA
MIDNAPORE ● 721 131**

কবিতার কাগজ প্রকাশ এর বই

মানেই মননের সুবাস...

কবিতার বই

সুভাষ চন্দ্র মামা

এক মুঠো আলোর পৃথিবী ২৫ টাকা

রঙিন মশাল ৩০ টাকা

আবদুল মাম্মান

পাখি পাহাড়ের মেয়ে ২৫ টাকা

দীপক হোতা

শস্যের ভূগোল ২০ টাকা

সুমিত সাহা

এবং চোরাবালি ৩০ টাকা

গল্পের বই

প্রণবকান্তি ভট্টাচার্য

ম্যাডামের বদলে মালা ২৫ টাকা

কবিতার কাগজ প্রকাশ

জুনপুট : মেদিনীপুর : ৭২১৪৫০

দূরভাষ : ০৩২২০-৫৭০২২

গ্রাম সংসদের সার্বিক উন্নয়নী চিন্তা

চলো পড়াই, কিছু করে দেখাই।

সাক্ষরোত্তর পর্যায়ে আরও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে আপামর জনগণের সহযোগিতা চাই।

৪নং মঞ্জুশ্রী গ্রাম পঞ্চায়েত

এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতি

বালিঘাই : মেদিনীপুর

কৃষ্ণগোপাল জানা

পঞ্চায়েত প্রধান

আর নয়, কোনভাবেই নয়

পারমাণবিক বিচ্ছেদরণ ও বিবাক্ত পরিবেশের অবতারণা!

সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে আমাদের বিকল্প চেতনার বিনম্র উপস্থাপনা হোক

উন্নয়নের চাবিকাঠি...

‘আসুন, সবাই মিলে প্রতিরোধ করি-পারমানবিক বোমার মতো—

‘পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র’ স্থাপনের দানবীয় পরিকল্পনা।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিরোধ মঞ্চ

কাঁথি : মেদিনীপুর : ৭২১৪০১

দূরভাষ : ৫৫-৪১৮

অনুপান সংগ্রহের ঝামেলামুক্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার
জটিল রোগ দীর্ঘস্থায়ী নিরাময়ের জন্য আসুন

পাহাড়ী আয়ুর্বেদ ফার্মেসী

কাঁথি : মেদিনীপুর

বাহিরী

অনুমোদিত ডিলার

কলিকাতা

দেউলবাড় : মেদিনীপুর

বেহালা (চৌরাস্তা) কলিকাতা

ডিলার : বৈদ্যনাথ ঝাটু, সি. কে. সেন এণ্ড হজ্জা প্রভৃতি নারী কোম্পানী।

বিঃদ্রঃ— ডাকঘোষে চিকিৎসা ও পাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এবং চিকিৎসকদের বিশেষ
সুবিধার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

With Best Compliments from :

BIRENDRANATH S. B. & H. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL.

399, Netaji Subhash Road, Contai, Midnapore, Pin : 721401

Conducted by— Indian-Rural Medical Association & Govt. of W.B.

Affiliation to—WRMA Geneva Switzerland.

Supoorted by—UNICEF & WHO (World Health Organisation)

Established—Under WHO Declaration on 1962. W.B. Govt. Regd. No.—S/63388

Recognised by—U N O vide resolution N—3515515/XIII80

Estd—1989-90 Regd Under West Bengal Govt. Act.—XXV of 1961

আমাদের মূলনীতি

সবার জন্য সুস্বাস্থ্য

দারিদ্র দূরীকরণ/বাসস্থান

আত্মনির্ভরতা

জ্ঞানলাভ

স্বচ্ছসেবা

বাসস্থান-এর ব্যবস্থা করা

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

AFFILIATED COURSES OF—

INDIAN COUNCIL OF ALTERNATIVE MEDICINES (I.C.A.M.) Regd. in the Govt. of W.B. Based on Cnetral Govt. Act. Internationally. Regd. W.B. & other & Gentral Govt. Self Employment Scheme. WHO call HEALTH FOR ALL by 2000 A.D.

1. Registered Medical Practitioner—RMP.

2. Indo Allopathy—DIASM / BIASM / MD.

3. Electro Homoeopathy—DEH-2 years / MDEH-3 Years.

4. Bio-chemic Courses—DBSM-2 years / MBBS (Bio)-3 Years / MD (Bio)-4 years.

5. ACUPULSER Certificate Course / one week / eligibility—1 year Med. Training.

6. PHARMACY—Two Years. / one week / eligibility—1 year Med. Training.

7. PHYSIOTHERAPY—One. / one week / eligibility—1 year Med. Training.

8. Pathology Technician—DMLT 10 Months one week /eligibility—1 year Med. Training.

বিঃদ্রঃ—সমস্ত প্রতিষেধক টিকা, পোলিও, ট্রিপল এন্টিজেন প্রভৃতি দেওয়া হয়। সার্ভিস
চার্জের বিনিময়ে যন্ত্রাদি ঔষধ ও পুস্তকাদি সরবরাহ করা হয়।

অনুসন্ধান অফিস

৩৯৯, নেতাজী সুভাষ রোড, হরেকৃষ্ণ ধাম।

পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কাঁথি, পিন-৭২১৪০১, এস.টি.ডি. : ০৩২২০, ফোন : ৫৫৬৭৯

With Best Compliments From

Contai Sub-Division Contractor's Association

Saraswatitala, Contai,
Midnapore, 721401

প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

ফোন : ৪৪-২৬৭

সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার
স্বর্ণালঙ্কারের বিশ্বস্ত শিল্পী
অর্ধ শতাব্দী খ্যাত স্বর্ণশিল্পী

মেসার্স নলিনীকান্ত কামিল্যা

প্রোঃ তাপস কুমার কামিল্যা

এগরা বাজার : মেদিনীপুর

☐ অত্যাধুনিক ডিজাইনের সোনার গহনা প্রস্তুতকারক ☐

With Best Compliments From

Ph 64364/64374

S.T.D 03220

Maa Tara Ice Plant (P.) Ltd.

S.S.I. Registration Unit

Vill-Quliata, P.O.-Bodhra (Sankarpur Road)
Dist-Midnapore

মাছের উৎপাদন ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানে
জুনপুট মৎস্য-খামার কারিগরি কেন্দ্রের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের অধীন জুনপুট
মৎস্য খামার কারিগরী কেন্দ্র এমন একটি সুপরিচিত সংস্থা
যেখানে প্রায় চার দশক ধরে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মিষ্টি জলে দেশী
ও বিদেশী প্রজাতির মাছ চাষের পাশাপাশি নোনা জলের মাছ
চাষ চলে আসছে। এই পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘরে ঘরে
মাছ চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

খটি প্রকল্পে মৎস্য খটিগুলিতে কর্মরত মৎস্যজীবীদের
সুযোগ সুবিধার দিকে এই কেন্দ্র বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। এর
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিসেবার লক্ষ্যে
ডাক্তার নিয়োগ, বিনামূল্যে ওষুধপত্র সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন
ইত্যাদি। বর্তমানে এই প্রকল্প কাঁথি মেরিন অফিসের
পরিচালনাধীন।

সম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের যৌথ
উদ্যোগে এই রাজ্যে একুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে।
রাজ্যপাল এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারী করেছেন।
জুনপুট মৎস্য খামার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর
ফলে স্থানীয় তথা রাজ্যবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে
উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ আসছে।

ডঃ উৎপল কুমার সর
সহ মৎস্য অধিকর্তা

জুনপুট মৎস্য-খামার কারিগরি কেন্দ্র

জুনপুট : মেদিনীপুর : ৭২১৪৫০

With Best Compliments From.....

Phone S.T.D 03220
Plant 64574
Office 64364
Resi 64374

Sankar ice plant (P) Ltd.

(A reputed ICE Manufacturer & order Suppliers)
Shankarpur ● Ramnagar ● Midnapore

সবাইকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

‘মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক-

আমি তোমাদেরই লোক!’

সূর্যতপা গিরি

আঠিলাগড়ি : কাঁথি : মেদিনীপুর

পিনকোড : ৭২১৪০১

With Best Compliments From

Phone 244-2531
245-3712

Fax (033) 245-0204

Wel Come all of the Tourist New Travels India

165A/A.J.C BOSE ROAD

CALCUTTA-700014

HOTEL BOOKING LUXURY BUS

LUXURY CAR PACKAGE & TOUR OPERATER

HOTEL TRAVELS LODGE

GANGTOK (SIKIM) TIBAT ROAD

PHONE 03592-23858

গ্রাহক পরিষেবায় আমাদের অঙ্গীকার

আমাদের অগণিত গ্রাহক বন্ধুদের আর্থিক সহযোগিতায় সারা মহকুমাজুড়ে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে আরও বহু সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মীদের নিরন্তর প্রয়াসে উজ্জীবিত তথা দৃঢ় হোক সমস্ত স্তরের মানুষজনের অটুট সম্পর্কের বন্ধন। শারদকালীন দিনগুলি হোক সুখ সমৃদ্ধিময়। যোগাযোগ ব্যবস্থা হোক অনাবিল-অটুট-আনন্দময়।

বীরেন্দ্রনাথ গায়েন

এস.ডি.ও (টেলিকম)

কাঁথি, মেদিনীপুর

With Best Compliments From

B. G. ENTERPRISE

CABLE CONTRACTOR & GENERAL
ORDER SUPPLIERS

Lake Town □ Calcutta

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম কর্তৃক প্রকাশিত
তিনটি অমূল্য গ্রন্থ :

১। সাঁওতাল হল, ১৮৫৫—মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

২। শায় সেরমা রেনাঃ অনড়হে—মূল্য ৬০ টাকা মাত্র।

(শতবর্ষের সাঁওতালী কবিতা সংকলন-বঙ্গানুবাদসহ)

৩। হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা—মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র।

যে কোন বই একত্রে পাঁচ কপি ক্রয় করিলে আকর্ষণীয় ছাড়।

আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—
পরিচালন অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার (৪র্থ ও ৫ম তল) কলিকাতা—৭০০০০৬৯

(দূরভাষ : ২৪৮-৮৮২০, ২৪৮-১২৬৬)

With best compliments from

FIVE STAR TRADING AGENCY

Prop. Lions SK. Mujaffar

Ranichak, Haldia, Midnapur.

AUTHORISED DEALERS OF :

Procter & Gamble, Godrej Ltd. Wipro Ltd, Cadbury India Ltd. H. P. Textile Mills, E.C.E, Industries Ltd. Dvaiz Chemical & Chemical Twigs, Latex, Rech Nutrifoods Ltd. Vidyut Matrials Ltd.

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই

কৃষি ও কৃষক বন্ধুদের স্বার্থে

আমাদের আন্তরিক উদ্যোগ.....

হিন্দুস্থান ফার্টাইলজারস

সমস্ত প্রকার সার, কীটনাশক ঔষধ, উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, স্প্রে মেশিন, হ্যাণ্ড পাম্প মেশিন আমরাই সরবরাহ করি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পরিচালক : নারায়ণ বড়াই

কাঁথি ১ নং মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, কুমারপুর, কাঁথি

শারদীয়ার দিন ওলি আনন্দে ও সুখে ভরে উঠুক....

আমাদের সমস্ত কর্মী বন্ধুদের পাশে

সমবায়ের সহযোগিতা নিয়ে আবহমান সেবা ও সততায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

অধিক নিরাপত্তা ও সর্বাধিক আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি

কাঁথি ১ ব্লক কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

কাঁথি ১ ব্লক প্রশাসনিক ভবন, কাঁথি, মেদিনীপুর

মুক্তিপদ পাণ্ডা

সম্পাদক

সুনির্মল মণ্ডল

সভাপতি

স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছবি দেখতে আসুন

বাবুয়া সিনেমা

পোঃ-বেতাই

জেলা :- নদীয়া

সিনেমা স্লাইড দিতে হলে উপরের ঠিকানায় বিশিষ্ট আইনজীবী
দেবাশিস মুখার্জী (MSC. LL.B) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

‘পৃথিবী মহামূল্যবান সম্পদ মানুষ। মানুষের সম্পদ তার স্বাস্থ্য,
সুস্থ শরীর। সুস্থ শরীর পুষ্ট করে মনন, মননের আলোকে
আলোকিত সত্তা বহন করে সভ্যতার বিজয় রথ।
স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচীর সফল রূপায়নে সকলের আন্তরিক
সহযোগিতা কামনা করি।

জয়দেব ঠাকুর

নিবাহী অধিকারিক

করিমপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি

মহিষবাথান : নদীয়া, ফোন : ০৩৪৭১/৫৫১৩৫

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কাঁথি, মেদিনীপুর ৭২১৪০১

ফোন : ৫৫-০২৩

আমানত ও বিনিয়োগের মাপকাঠিতে পূর্ব ভারতে শহরাঞ্চলীয়
সমবায় ব্যাঙ্কের শীর্ষে...

সমগ্র মেদিনীপুর জেলা-সহ কলিকাতার বড়বাজার ও তৎ
সংলগ্ন ওয়ার্ড সমূহ এই ব্যাঙ্কের এলাকাধীন।

১ গ্রাহক পরিবেশায় ও আমানত সুরক্ষায় আমরা অতদূর প্রহরী।

সর্বোচ্চ হারে সুদসহ রয়েছে আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প।

৩। আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত - এগরা ও নন্দকুমার শাখায়
রয়েছে নিত্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প।

৫। পুরীতে ব্যাঙ্কের নিজস্ব 'ইলিডে হোম'।

কম্পিউটার পরিবেশায় অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক।

কাঁথি ☐ রামনগর ☐ এগরা ☐ হেঁড়িয়া ☐ মঙ্গলামাড়া ☐ বেলদা
দুর্গাচক ☐ পাঁশকুড়া ☐ মহিষাদল ☐ নন্দকুমার
বাড়বরিষা ☐ নন্দীগ্রাম ☐ বড়বাজার (কলিকাতা)

সব শাখায় লকার পাওয়া যায়

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় কর সোহনজ্যোতি মাইতি হৃদয়ংগু শেখর সুর

সভাপতি

সহ-সভাপতি

সম্পাদক

With Best Compliments From



Fax - (033) 2454219
Ph.- STD-03228, 50278
50337/50338

Blue Star Civil Engg. Co. Pvt. Ltd.

**(Civil & Mechanical Contractor &
general order suppliers)**

MECHEDA • MIDNAPORE

With Best Compliments From

CIVIL & MECH

**(‘A’ Class Contractor, Handling civil works
and general order suppliers)**

Prop. TIRTHAPADA MAITY

Durgachak (New Market) Haldia, Midnapore

দূরভাষ : ৫৮৩৩৭

রাজ কুমার পেপার হাউস

স্কুল, কলেজ ও অফিস স্টেশনার্সের বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

সমস্ত নামীদামী কোম্পানীর পেন' এর বিপুল সস্তার

দীঘা রোড : কাঁথি (পার্ক হোটেলের পাশে)

বিঃদ্রঃ—গোল্ডেন ইগল খাতার হোলসেলার এবং ডিসট্রিবিউটর

*With Best Compliments on the Eve of Vijaya
Dashami & Dewali to all our students & Gurdians.*

Contai Public School

Kishorenagar □ Contai Bye-Pass

Gopinathpur □ Junput Road □ Contai □ Midnapore.

Dial-03220 56-551

শারদীয়ার পূন্য লগ্নে জানাই আন্তরিক আমন্ত্রণ

মা নাচিন্দা মন্দিরের

সুস্থ পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে

আমরা এগিয়ে চলেছি।

সমস্ত ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থীদের

আত্মিক সহযোগিতায়

নাচিন্দা মন্দির হয়ে উঠুক আরও পবিত্র পূণ্যভূমি।

আশুতোষ জ্ঞানা, সত্যজিৎ দাস

ম্যানেজিং সেবাইত

নাচিন্দা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, নাচিন্দা □ মেদিনীপুর

অনিল কুমার মাস্তা

সভাপতি

মেদিনীপুর জেলায় কঁথি মহকুমার উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে-ওঠা আদর্শ প্রতিষ্ঠান

কাজলা জনকল্যান সমিতি

স্থাপিত: ১৯৪৫ সাল, পোঃ সারদা : মেদিনীপুর

—প্রকল্পভূক্ত এলাকা—

(ক) কঁথি (খ) রামনগর (গ) ভগবানপুর (ঘ) বেজুরী

বর্তমান কার্যক্রম শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রকল্প, শিশু রক্ষণাগার, প্রাথমিক স্কুল, কোচিং

সেন্টার, গ্রামীণ পাঠাগার, সামান্য পাঠাগার।

স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্প : এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র, প্যাথলজি বা রোগ-নিরূপণ কেন্দ্র, প্রসূতি কল্যাণ কেন্দ্র, বনৌষধি চিকিৎসা কেন্দ্র।

বিকল্প কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প : জৈব সার তৈরী ও প্রয়োগ, সুসংহত উপায়ে কীট নিয়ন্ত্রণ বনসৃজন প্রকল্প, মৎস্যচাষ প্রকল্প, গৃহ-সংলগ্ন সজীবগান, মাটি পরীক্ষা।

স্ব-নির্ভর প্রকল্প : (১) বিভিন্ন কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আর্থিক সহায়তা—পুণ্যপালন, কৃষিকাজ রিক্সা (২) বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা, উলনিটিং টেলারিং House Wiring & Repairing

সাংস্কৃতিক বিষয়—ফোরাম থিয়েটারের মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ, সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিভার উন্মেষ, বিশিষ্ট স্মরণীয় দিনগুলি মর্যাদাসহ পালন, শিশুদিবস, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ক্রীড়া পরিচালনা : বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সৈন্যদল খেলাধুলার ব্যবস্থা, ব্রডচারী পরিকল্পনা।

সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প : আইন সম্পর্কীয়, উন্নয়ন সম্পর্কীয়, নেতৃত্ব বিকাশ সংক্রান্ত, মনীষীগণের আদর্শ-সম্পর্কীয়, মহিলা সংগঠন সম্পর্কীয়।

সামাজিক কাজকর্ম : রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, রক্তদান, রাস্তা মেরামতীকরণ।

নেটওয়ার্কিং : শিক্ষাবিভাগ কৃষিবিভাগ।

সম্পাদক : স্বপন পণ্ডা

সংগঠিত : পণ্ডপতি নন্দী

শারদ শ্রীতি ও আন্তরিক ওভেচ্ছা জানাই

ফোন : ৪৪-২৬৭

সোনার হাতে সোনার কাঁকন-কে কার অলঙ্কার

স্বর্ণালঙ্কারের বিশ্বস্ত শিল্পী, ৫০ বছরের অধিক আপনাদের সেবায়

মেসার্স নলিনীকান্ত কামিল্যা

এগরা বাজার : মেদিনীপুর

অত্যাধুনিক ডিজাইনের সোনার গহনা প্রস্তুতকারক

With Best Compliments from

Dr. B.B. Dev Roy

MBBS (CAL) FRCS (EDIN), FICS (USA)

CONTAI □ MIDNAPUR 721401

শারদ উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই...
উৎসবে আনন্দে ও প্রতিদিনের আমল্য স্বাদের মেজাজ পাবেন-

তিরুপতি গুঁড়া মশলায়
গহিনীদের সবার পছন্দের গুঁড়া মশলা
হলুদ, লঙ্কা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
আজই পরীক্ষা করুন...
খুচরো ও পাইকারী পাওয়া যায়

তিরুপতি স্পাইস কোম্পানী



ঘাটুয়া বাঁধ (কাঁথি-দীঘা রোড)
কাঁথি, মেদিনীপুর ৭২১৪৩৩

With Best Puja regards to all

☎ 52233 STD-03220 Gram - BCCB

BALAGERIA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

SATMILE & MIDNAPORE
GOVT PARTNERED 'A' CLASS BANK

Estd 1926

A BANK

- ☐ Closely Associated with the Agriculture and rural Development ☐ Offers various plants to suit your dreams and desires ☐ Transacts all kinds to Modern Banking
- ☐ Having Locker Facilities with all the Branches ☐ Fax facility at Contai Branch
- ☐ Service open in Sundays at evening Branches

Contai

Ph-55097

Ramnagar

Ph-65265

Egra Evening

Ph-44244

Balageria

Balighai

Nachinda

Ph-50236

Evening(Contai)

Ph-55407

Deulihat



Bank Authority



দুখশির চলুন উদ্ধার দেশে

অজির সব দিলে গাণ এবং পে-কমে এখন জায়ালাপক ও
কলিচি কারিকের বিপদ হওয়া। জায়ালাপক, বটিক, গুস,
সিখ, টাকিল, অরোয়াস, পাতিপুটী, বালাচী ও মালিন।
জায়ালাপক কত কী। নতুন কীজাইনে পদা দিয়ে গুস। জায়া
এ-সাই জায়ালাপক অনেক কমে গিয়েছে। ফলে জায়ালাপক
জায়ালাপক যে-কোনও দিলে গাণ বা পে-কমে। হলে হলে
একোয়ে নতুন যোগ — উদ্ধার দেশে।

২০% রিবেট



উদ্ধার

(পরিচালক জায়ালাপক ও কলিচি লাল)
— জায়ালাপক জায়ালাপক

For Your Better Service
We are always at your door step...

S.T.D. 03220

Ph. 50247

BHAITGARH NACHINDA S.K.U.S. LTD.

Regd. No.—Cont.3 / Dated-17.4.70

P.O.—NachindaBazar, Contai, Midnapore

BANKING DEPOSIT SCHEME

Petrol Pump Services at Contai Bye Pass more

Subodh Chandra Patra **Subhendu S. Das** **Abya Kumar Bhunia**
Chairman Secretary Manager

113 years of making every weeding 'wow'

SHAW WALLACE Salutes the Union of hearts.

A Company that knows your tasty and
Preference and symbolizes the true Indian spirit.

That's Shaw Wallace for you

SHAW WALLACE & CO.

since 1886

HALDIA AGRI & CHEMICAL DIVISION, DURGACHAK
Midnapore-721502

'যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী উমা আমার কত কৈঁদেছে'...

শারদীয়ার দিনগুলি আনন্দমুখর হোক!

প্রিন্স ফুয়েল সেন্টার

ডিজেল, পেট্রোল প্রভৃতির জন্য আমরা সর্বদা জাগ্রত প্রহরীর মত কাজ
করে চলেছি একান্ত বিশ্বস্ততায়।

দীঘা বর্ডার : যেদিনীপুর।

সেবাসিন প্রদান, সম্পাদক 'কবিতার কাগজ' ঠাকুরতলা, সেনানিবাস, জলপট্টা, যেদিনীপুর-৭২১৪০০
প্রকাশিত, নিউ সুখার নারায়ণী হোস, ১৬ মার্ফাস লেন, কলিকাতা-৭, ছবি সেলার্স, কাঁচি কর্তৃক মুদ্রিত।



S E R O B A C T O D I A G N O S T I C S E R V I C E S

FORMERLY SEROBACTO CLINICAL LABORATORY GOVT. REGD.
ORGANISED BY :

Late DR. J.N. MISRA M.B.

S.N. MISRA B.SC., M.B.B.S., D.O.M.S. (CAL), M.A.M.S. (VIENNA)

F.R.S.M. (LONDON), F.C.L.I.

B. ROYMAHAPATRA M.B.B.S. (CAL), W.B.H.S.

H. MISRA B.SC, BIOL, D.M.L.T., F.I.A.G.P. (INDIA), M.I.S.C.L.T. (USA)

P.O. CONTAI, DT. MIDNAPORE, PIN : 721401, WEST BENGAL, INDIA

☎ (STD 03220) 56-600, 55-358

পথে ঘাটে
এই সব চিহ্নই
আপনার রক্ষাকবচ



আজই ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করুন।

সাক্ষরতার ভাগীদার হোন।

কাঁচি (দিঘা বাস স্ট্যান্ডের পাশে)

মেদিনীপুর - ৭২১৪০১

কন্টাই আইডিয়াল মোটর ড্রাইভিং স্কুল

শারদীয়ার দিনগুলিতে চাই সমস্ত শিশুর আনন্দের অধিকার...

রাষ্ট্রসংঘ প্রবর্তিত সমস্ত শিশুর নিজস্ব অধিকার ভোগ।

উপযুক্ত পরিবেশ, শারীরিক-আনন্দিক সামাজিক বাতাবরণ।

আইনগত সুযোগ সুবিধা প্রদান।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ—এই প্রশ্নে তাদের সুরক্ষা, লালন পালন, শিক্ষা
ও পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ।

অল্প বয়স্ক শিশুর চাই অপার মাতৃস্নেহ।

শিশুর চাই অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের অধিকার।

সামাজিক অবহেলা, নিষ্ঠুরতা বন্ধনা থেকে শিশু ও মাকে রক্ষার দায়দায়িত্ব
আমার আপনার সবার। এই কর্মযজ্ঞে চাই সবার সহযোগিতা।

শতফুল বিকশিত হোক / শরতের আনন্দ ধারায়....

অমলেন্দু মাইতি

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

রামনগর ২ ব্লক : বালিসাই : মেদিনীপুর

“শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি”....

মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি

মগরাহাট ২৪ পরগণা (দঃ)

আমরা মগরাহাট পঞ্চায়েত সমিতি একটি সুস্থ চেতনা সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার তাগিদ
বহন করছি জন্মলগ্ন থেকে। তাই আমরা আছি যারা বঞ্চিত অবহেলিত তাদের
জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি সেচের উন্নয়ন, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দান,
হস্তশিল্পের গ্রামীণ স্বরাজের প্রাথমিক সোপান। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও রোগ
প্রতিষেধ কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারকে
সুনিশ্চিত করতে পেরেছি। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ ছিল আমাদের
সর্বোচ্চ লক্ষ্য। শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সংস্কার,,
কুসংস্কার সহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধিগুলো অপসারণের মাধ্যমে আমরা
অনেকটা সে লক্ষ্যে কাছাকাছি। আমরা স্বপ্ন দেখি ও স্বপ্ন দেখাতে ভালবাসি যে
একদিন নতুন সূর্যের ভোর আসবেই। সবাইকে জানাই শরৎকালীন শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন...

আবজল আহমেদ শ্রীমতী গায়ত্রী সরদার চন্দ্রেশ্বর নন্দর
নির্বাহী আধিকারিক সহঃ সভাপতি সভাপতি

মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি।

‘প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায়/ভেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয়, আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ—নজরুল
ইসলাম

কবির জন্মশতবার্ষিকী দীঘার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভ্রমণার্থীদের জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন...

দীঘা সার্ভিস স্টেশন

কিয়াগেডিয়া : দীঘা : মেদিনীপুর

দূরভাষ : এস.টি.ডি : ০৩২২০, ৬৬-৩৫২

সমস্ত প্রকার পেট্রোলিয়ামজাত ইউ.এল.পি, ডিজেল, পেট্রোল,
মোবেল আমরাই সরবরাহ করি।

দূরভাষ : ০৩২২০/৫৬-২৪৭

জীবন বোধের কবি জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সফল হোক...

প্রেরণা করেসপণ্ডেন্স সেন্টার

কিশোরনগর (রাখালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ সন্নিহিত), কাঁথি, মেদিনীপুর
বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল ও ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ, এম.এস.সি,
এম.কম, বি.এড্, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, ফার্মাসিস্ট, এম.ফিল,
পি.এইচ.ডি, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক, রেগুলার ও প্রাইভেটে
পরীক্ষা দেওয়ার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ঘরে প্রতিদিন, নিজ ব্যবহার্য কাঁসা পেতলের বাসন কোসনের জন্য

খাটুয়া বাসন ঘর

কাঁথি, মেদিনীপুর, ৭২১৪০১

(কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামনে)

প্রোঃ পরমেশ্বর খাটুয়া

(অধরচন্দ্র খাটুয়া)

মৈশালী, ধানগাঁ

ACC



times change, our values don't

*Yet we understand that to grow we need to
whatever be your specifications for cement.*

P. MAITY & CO.

ACC Cement Dealer

P.O. Contai

DIST. MIDNAPORE

Tel (O) 55595, (R) 55046

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

পর্ষৎ প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি বই

ইলেকট্রনিক্স	অনাদি নাথ দাঁ	৫০.০০ টাকা
শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যায়		
রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি	ভাগবত দাশগুপ্ত	৪০.০০ টাকা
সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী	৯০.০০ টাকা
সংখ্যার মজা আর মজার সংখ্যা	বসন্ত কুমার সামন্ত	৬০.০০ টাকা
সাংখ্য পাঠঞ্জল দর্শন	কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০ টাকা
চার্বাক দর্শন	দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী	৫৫.০০ টাকা

কার্যালয় : আর্থ ম্যানসন (নবমতল), ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলি-১৩

বিপণনকেন্দ্র : বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ১ম তলা) কলি-৭৩

With Best Compliments from :

Phone : 4137

DAS CONSTRUCTION

(Govt. Contractors and order Suppliers)

HEAD OFFICE

ACHINTYA LODGE

Durgachak

Haldia

Midnapore

C.F.C.L. Site (Near Shaw Wallace) Cluster-17

SITE OFFICE

I.O.C. Gate No.1

I.O.C. (E.T.P. Site) PL

I.O.C. (MD Gate)

I.O.C Eastate Office &

With Best Pujan Greetings to all...

*In the business of Quality Prawn Feed
always use*

AVANTI FEEDS

**'A' Class Feeds by Avanti Feeds Ltd.
Feed orders or technical service contact-**

LATIKA SEA FOODS

Khadalgobra, Digha, Midnapore
Nearest office cum sales centre Karkuli (Behind of
P.K.College) Contai, Midnapore 721401



AVANTI
FEEDS LIMITED



With Best Compliments from...

M/s Menaka Enterprise

Prop. Sudip Kumar Roy

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Vill. Maitana, P.O. Battala,

Dist. Midnapore

With Best Compliments From...

Phone 55031

Pranama to our

Great Poet—Nazrul Islam...

GERMS ELECTRONICS

A Reputed House of Electronics Casate & C.
D. Please Contact & Visite our Show-Room.

Prop. Swapnadip Paul.

Rathtalamore ● Contai ● Midnapore

ঝাড়াই ডাল, কলাই মশলা ও প্রসাধন সামগ্রী বিক্রেতা

ভগবতী

ঘানির খাঁটি সরিষা তেল পেতে হলে

শ্রীরাম অয়েল মিল

সুপার মার্কেট (পশ্চিম)

কাঁথি : মেদিনীপুর

সবাইকে জানাই শারদ অভিনন্দন.....

নেতাজী পাঠচক্র

একটি আদর্শ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

পূর্বচড়া : টিকানী : মেদিনীপুর

কর্মসূচী : স্বল্পব্যয়ে পায়খানা, ঘর নির্মান, স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মান রাস্তা মেরামতি
সার্বিক সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিবেদ অভিযান মা ও শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিবার
পরিকল্পনা সমষ্টি স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিদ্যালয় স্বাস্থ্য প্রকল্প, মহিলা সচেতনতা শিবির
আলোচনাচক্র যুব সম্মেলন পাঠাগার শরীর চর্চা দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ দুঃস্থ
ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্য নলকূপ স্থাপন শিশু রক্ষাগার লৈশব শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধ আবাস
ভীতবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (ভীত, টেলারিং, উলবোনা, রাজমিস্ত্রির
কাজ, ডিম্বেল ইক্সিন ও পাম্পসেট মেরামতির কাজ ইত্যাদি) আই, আর, ডি, পি,
প্রকল্প পুকুর সংস্কার বৃক্ষরোপণ ও মৎস্য চাষ প্রকল্প।

স্বপন কুমার মণ্ডল, সম্পাদক

A Step To Better Service for our

Tourists.....

ANANNYA SHOPPING COMPLEX

Nivedita Confrance Cum Festival Hall

Nivedita Lodge

Saikat Hotel and Restaurant

Solicites Your Kind Co-operation

Prop. Smt. Nandita Dey

Sri Subhendu Sekhar Dey

Contai Digha Bus-Stand □ Contai □ Midnapur

ঐতিহাসিক কাঁথি শহরের সর্বাধুনিক সু-চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির
বিশ্বস্ত সেবাপ্রতিষ্ঠান

কুসুমজ্যোতি মাতৃসদন

(একটি-নির্ভরযোগ্য আদর্শ নার্সিং হোম)

দারুয়া রোড □ কাঁথি □ মেদিনীপুর-৭২০ ৪০১

ডাঃ পি. এল. মাজী (এম. বি. এস. ডি.) ক্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

চেয়ার : সবস্বতীতলা □ কাঁথি □ মেদিনীপুর

এক-দু'দিনের নয়, এল চিরদিনের সম্রাট

স্বপ্নের ভিত্তি...

Resl : 55811/
S.T.D. : 03220



DURGAPUR

বিড়লা সিমেন্ট

দুর্গাপুর IS/ISO 9002

স্টকিস্ট : কন্টাই হার্ডওয়াস

সরস্বতীভালা : কাথি : মেদিনীপুর

(সেন্ট্রাল এক্স-রে ক্লিনিক ও পি.এল. মাস্তির চেম্বারের সামনে)

নতুন বিড়লা
সিমেন্ট সম্রাট।
এল ই-পাতের
শক্তি নিয়ে।
শক্তিই হোক বা
স্থায়িত্ব। সম্রাট সব
সময়েই সবার উপরে।
ঢালাই যেমন মজবুত,
তেমনি টেকসই। ক্ষয়
বা সংকোচনও
অনেক কম। যে
কারণে যুগের পর যুগ
সম্রাট মাথা উঁচু করে
থাকতে পারে।



**BIRLA
CEMENT
SAMRAT**



২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রচারণা



যেমন শক্তিশালী, তেমন টেকসই

“শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে”

ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা-সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রগুলির
স্বেচ্ছাসেবক এবং পড়ুয়া ও গ্রামবাসীদের জানাই
শারদ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমাদের বিশ্বাস — সাক্ষর হায়ের ছেলে নিরক্ষর থাকে না!
এসো পড়াই, কিছু করে দেখাই...

শ্রীমতী অমিতা পাল

পঞ্চায়েত প্রধান

আমতলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (কাঁথি-২ ব্লক)

ঢোলমারী : মেদিনীপুর

With Best Compliments from

Ph 03224

Off. 75219

Fac 52840

Resi. 75507

POWER BRICKS

(Quality of “Power” Bricks Maker)

Prof. Prasanta Kumar Das

Kumarchak ● Khanjanchak ● Haldia
Midnapore ● 721 602

আন্তরিকতাই মানুষকে কাছে টানে
 ভ্রমণার্থীদের জন্য নিরন্তর জাগ্রত প্রহরী...
দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

দীঘা ● মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের এই সমুদ্র সৈকত শহরকে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পর্যটন শহররূপে গড়ে তুলতে দীঘা উন্নয়ন পর্ষদ নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিমগ্ন। এরজন্য কয়েকটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে, আরো কয়েকটি রূপায়ণের অপেক্ষায়।

রূপায়িত প্রকল্প

অমরাবতী উদ্যান ও লেক, সর্পোদ্যান নৌকাবিহার

রূপায়ণের অপেক্ষায়

সুসংহত প্রয়ঃপ্রণালী দ্বিতীয় জলাধার প্রকল্প রোপতুরে প্রকল্প সমুদ্র বিহার প্রকল্পগুলিকে সার্থক রূপায়ণ করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং মতামত কাম্য।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যনির্বাহী অধিকারিক

দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।

With Best Compliments form



S.T.D-03229

55256

Manilal Thakkar

(Merchants & Order Suppliers)

Belda □ Midnapur

With Best Compliments From,
AKHTAR AHMED

B. Com. L. L B.
Enlisted Class.1 Govt. Contractor
and Transporter.

Councillor—Contai Municipality
Contai ● Midnapore



ADDRESS
ASHIYANA

Darua ★ Contai ★ Midnapore
Phone (03220) 55291

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহন করুন

‘সম্রাট’ ১৬৫ ডি পাওয়ার টিলার

সম্পূর্ণ চীন সরকারের উদ্যোগে নির্মিত

১৬ হর্স পাওয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিন

২ রোটারী গিয়ার বিশিষ্ট প্রতি ঘন্টায় ৭৫ শতক জমি চাষ করে!

ভারতের একমাত্র পরিবেশক

ইউনিভার্সাল ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড ট্রেডার্স

৪র্থ তল, রুম নং—৬৫ (কমার্স হাউস)

২ গনেশ চন্দ্র এডিনিউ কলিকাতা—৭০০০১৩

ফোন : ২৩৭-৮২৯০/২২১-৯১৮৫

With best compliments from:

UNITED TRANSPORT & CO.

(Govt. Agent)

Head office : Geonkhali : Midnapore

CALCUTTA-HALDIA EXPRESS BUS SERVICE

(Via-Roychak—Kukrahati Ferry)

Calcutta—to—Haldia

Booking Office:

1. Goomty Esplanade Bus Stand (near
Bhabanipur Club Calcutta)
2. Haldia Township Bus Stand, Haldia, Midnapore

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহন করুন...

সমবায় আন্দোলন, গ্রামোন্নয়ন ও আর্থিক বনিয়াদ রচনায়

ঘাটুয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পোঃ-টগরিয়া, কাঁথি—১ মেদিনীপুর, ঘাটুয়া বাঁধ, কাঁথি, দীঘা রোড

১) ঋণ সভ্যদের কৃষি ঋণ দান, ২) জমা সেভিংস ও স্থায়ী আমানত

সংগ্রহ এবং দৈনিক জমা প্রকল্প।

নীলকণ্ঠ দলাই

সম্পাদক

অসীম কুমার গিরি

ম্যানেজার

With Best Compliments From

☎ (03220) 66-208

LODGE ANANDAM

Prop. Suprakash Maity
Somprakash Maity

SIBALAYA ROAD • DIGHA • MIDNAPORE

আপনার ব্যাঙ্ক

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্সপ্রাপ্ত "এ" শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক)

রেজিঃ হেড অফিস - মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর

পরিষেবার দৃঢ় শাখাসমূহ - প্রধান শাখা মুগবেড়িয়া, কাঁথি, জলাগেছিয়া, ভগবানপুর,
বাজকুল, ইটাবেড়িয়া ও ভনকা, মাধাখালি (সান্দা), হেঁড়িয়া।

আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- সমস্ত প্রকার আদানভের উপর অকল্পনীয় সুদের হার।
- আপনার জমা টাকার সহযোগিতাই এই এলাকার হাতেই নিয়োজিত
- আমানত সম্পূর্ণভাবে গোপনীয় ও স্বাধীনভাবে সুরক্ষিত।
- কর্তৃত্বকর্তা, এন এস. সি., কে. ভি. পি.-তে দ্রুতের সুযোগ আছে।
- গান, পান, মাছচাষ, গাভী, টুপার, পাওয়ার টিলার-এ অংশের সুযোগ আছে।
- চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ীদের তথ্য বৈধতা হয়।
- মুগবেড়িয়া, কাঁথি, জলাগেছিয়া, বাজকুল, ভগবানপুর, হেঁড়িয়া শাখায় লকারের ব্যবস্থা আছে।
- ন্যাচার্ড, রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনে অর্থ পিনিয়োগ করা হয়।

আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি

কর্তৃপক্ষ

শারদীয়ার দিনগুলিতে চাই সমস্ত শিশুর আনন্দের অধিকার...
 প্রথম ৬ বছরই শিশুর জীবনে সার্বিক বিকাশের বুনিয়াদ তৈরীর আদর্শ সময়।
 এই নবম নবম শিশুর সার্বিক বিকাশের উপযোগী পরিচর্যা দানের নুনবহু
 শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (গর্ভবতী মহিলা প্রসূতি মা
 ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সের শিশু ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মহিলাদের)
 ১) ০—৬ বছরের শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নত করা। ২) শিশুদের
 শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের বুনিয়াদ তৈরী করা। ৩) শিশু-
 মৃত্যু, শিশু রোগের প্রাদুর্ভাব, শিশু অপুষ্টি ও তাদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার
 হ্রাস করা। ৪) শিশুর বিকাশের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের
 সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধন
 করা। ৫) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা দানের মাধ্যমে শিশু ও পরিবারের
 স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে যত্ন নিতে মায়েদের সম্পূর্ণ সক্ষম করে তোলা।

... এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়নের জন্য কর্মসূচী...

পরিপূরক পুষ্টি প্রদান, প্রতিষেধক টিকা প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয়
 চিকিৎসা ও প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষা, অবিধিবদ্ধ প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষা
 প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল মৌল উপাদান সমূহ পরিবেশন ও সার্বিক
 সফলতার সুনিশ্চিত করণ।

এই বিশাল প্রকল্পের সকল রূপায়নের জন্য চাই সকল স্তরের পঞ্চায়েত
 প্রতিনিধি মহিলা সমিতি ও কাঁধি-১ ব্লক এলাকার কল্যাণকামী অন্যান্য
 যেকোনো সংগঠন কর্মীদের আন্তরিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা।

গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসুন, সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে
 সার্বিক শিশু বিকাশ ও কল্যাণে তথা দেশের মানব সম্পদের সুখম বিকাশ ও
 স্বাস্থ্যোচ্ছল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি...।



নারায়ণ পয়ড়া

শিশুবিকাশ প্রকল্প আঞ্চলিক (সি ডি পি ও)

কাঁধি-১ ব্লক, আই সি ডি এস স্ট্রীম

শ্রীকৃষ্ণ ক্লাব : ক্রিশিবাড়ি : বড়বাড়ি (এন.জি.ও)

নায়কভবন : শ্রীকৃষ্ণ সিনেমা রোড : কাঁধি : মেদিনীপুর : ৭২১৪০১

শরৎ তোমার অরুন আলোর অঞ্জলী...

রামনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতি

বালিসাই □ মেদিনীপুর

ফোন : ৬২২৪৬

ত্রিভুজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে, সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা যেমন এলাকার মানুষের সার্বিক ও কৃতিগত অনেক উন্নতি হয়েছে, তেমন গড়ে উঠেছে পঞ্চায়েতের উপর মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, দূর করেছে গরীব খেটে খাওয়া মানুষের অনেকটা খাদ্যাভাব আবার বর্তমান সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিবেদন কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে মানুষজনের স্বাস্থ্য জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। সুবাহ্যের লক্ষ্যে বিজ্ঞান সম্মত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজে অবক্ষয় সমাজের মানুষ জনের মনে এসেছে প্রাণবন্ত জোয়ার এবং এলাকার মানুষজন তাঁদের গ্রামোন্নয়নের নিজস্ব ও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা তুলে দেওয়ার জন্য বিগত গ্রাম সংসদ সভাসমিতিতে তাঁদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক। আগামী দিনে নেতাজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার সমস্ত লিখিত সমাজ গণ সংগঠনগুলি ও প্রশাসনকে সাথে নিয়ে বিগত দিনের চেয়ে আরও বেশি বেশি করে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেবাশিস চক্রবর্তী

বিমলা ঘোড়াই

অরুণ কুমার দাস

নিবাহী আধিকারিক

সহঃ সভানেত্রী

সভাপতি

আমাদের পঞ্চায়েত

গণচেতনার অন্য নাম.....

এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বায়ত্বশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও ভূগমুলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। আমাদের এলাকাভূক্ত সমস্ত মানুষদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সদা সতর্ক প্রহরী। গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত

অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য

পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত....

আমাদের পঞ্চায়েত সমিতিও পিছিয়ে নেই সাক্ষরোত্তর অভিযানে।

আসুন, সবাইমিলে পড়াই কিছু করে দেখাই...!

রতন জানা

সেখ আসেক উদ্দিন

প্রাবণী ধর

সভাপতি

সহঃ সভাপতি

নিবাহী আধিকারিক

কাঁধি-১, পঞ্চায়েত সমিতি। কাঁধি, মেদিনীপুর-৭২১ ৪০১

দূরভাষ : ৫৫২১৪

নতুন সহস্রাব্দের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

যান্ত্রিক যে কোন ব্যবস্থার পরিষেবায়

বেরা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস

(একটি আধুনিক এস. এস. আই. ইউনিট)

লক্ষ, সোনাবোট, যে কোন মেশিনের কাজ আমরাই করি।

দীঘা বাস স্ট্যাপ ॥ কাঁথি ॥ মেদিনীপুর-৭২১ ৪০১

বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন

ইংরেজী প্রধান ছাত্রবাসযুক্ত বিদ্যালয়

(শিশু শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত)

ফরিদপুর : দক্ষিণ ডাউকি : মেদিনীপুর, দূরভাষ : ৫৬-১৯০

বর্তমান সমাজের সমস্ত রকম অবক্ষয়, অশান্তি ও মূল্যবোধহীনতার মূলে আছে প্রকৃত শিক্ষার অভাব। তাই বিগত দুই দশকের বেশী সময় ধরে সমাজসেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন” স্থাপন করেছে নতুন শতাব্দীর প্ররস্তে একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছাত্রবাসযুক্ত বিদ্যালয়। আগ্রহী অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীগণ যোগাযোগ করুন।

ফরিদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন, এর একটি অনন্য উদ্যোগ।

বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন

গ্রাম—ফরিদপুর, পোঃ—দক্ষিণ ডাউকি, জেলা—মেদিনীপুর

কোন—(০৩২২০) ৫৬১৯০

বিগত দুই দশক ধরে গ্রামোন্নয়নে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান

প্রকল্প সমূহ

দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অস্ত্রোপচার শিবির

বৃদ্ধাবাস ও বৃদ্ধদের দিবাবকাশ যাপন কেন্দ্র, শিশু রক্ষণাগার

মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

সুলভ শৌচাগার নির্মাণ

বৃক্ষরোপণ ও বিশেষ জাতীয় দিবস পালন

ক্রীড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিশিকান্ত জানা

সভাপতি

ব্রজগোপাল সাহু

সাধারণ সম্পাদক

আসছে আবার আসছে পূজা
 ঢাকের বাজনা শুনেতে পাই
 ঢাক ওড় ওড় বাজনা বাজে
 ছেলে বুড়ো নাচছে তাই
 সাজো সাজো রব পড়েছে
 নতুন জুতো জামা চাই
 পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপে সব
 চাই তো আলোর রোশনাই
 কিন্তু এমন আলোক ছটা
 নিয়ম মতন হওয়া চাই
 বে-নিয়মে হলে পরে
 ঘুচবে পূজার মজাটাই।

পূজা মণ্ডপে বিধিসম্মত
 উপায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিন...

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বসুমতীর গ্রন্থসম্ভার

কাশীরাম দাসের মহাভারত (২ খণ্ডে)	১১০.০০ টাকা
দেবেন্দ্রনাথ বসুর শ্রীকৃষ্ণ	১০০.০০ টাকা
(এর পাতায় আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত রঙিন ছবি)	
শ্রীমদ্ভাগবত (পয়ার)	১৪০.০০ টাকা
নীতা গ্রন্থাবলী (পঞ্চবিংশতি)	৭০.০০ টাকা
শ্রীশ্রীচন্দী (মূল সহ বঙ্গানুবাদ)	১৫.০০ টাকা
শ্রী তারকনাথ সাধুর উপেক্ষিতের উপকারিতা (২ খণ্ডে)	৩৫.০০ টাকা
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	৬৫.০০ টাকা
বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র	৬৫.০০ টাকা
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী (২ খণ্ডে)	৮০.০০ টাকা
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত রাজভাষা (ইংরাজি ভাষা-শিক্ষার উচ্চমানের বই)	৩০.০০ টাকা

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

BASUMATI CORPORATION LIMITED

166, BIPIN BEHARI GANGULY STREET, CALCUTTA-700 012

PHONE 350 9462, 7540, 9435

চাষী ভাইদের জন্য সুখবর
ধান/পান/গম/আলু/সরিষা/তরমুজ/শশা প্রভৃতি ফসলের
অনুখাদ্যের অভাবে যে রোগ হয় তা প্রতিরোধ করতে ও ফলন
বাড়াতে ব্যবহার করুন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত
ভারতবর্ষের কৃষি জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনুখাদ্য

ট্রাসকো সয়েল ও ট্রাসকো—৫

REGD, NO. R-F-M 48/97—2000

প্রস্তুতকারক



সুপার এগ্রো ইণ্ডিয়া

২২/বি, সৎচাষী পাড়া রোড, কলিকাতা-৭০০০০২

এগরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার্যাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

এগরা : মেদিনীপুর : ফোন : ৪৪-৩৫০

এই সমবায় সমিতি আপনার। একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি হলেও
আমানত সংগ্রহে অদ্বিতীয়।

এই সমিতিতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রকল্পে টাকা জমা রাখুন। সমিতির
অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সময় মত ঋণ পরিশোধ করুন।

কার্যকরী মূলধন : ১১ কোটি টাকার অধিক

কানাইলাল মাইতি
সভাপতি

তপনকান্তি কর
সম্পাদক

দিলীপ কুমার সাউ
ম্যানেজার

ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতি

কাজলাগড় (ভগবানপুর) মেদিনীপুর

ভগবানপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাম ফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে এবং মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সুযোগ্য নেতৃত্বে স্ব-এলাকার সকল নির্বাচকগণকে নিয়ে গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমে এলাকার সকল উন্নয়ন মূলক কাজের সফল রূপায়নে বদ্ধপরিকর। সাথে সাথে এলাকার সমস্ত নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর, সক্ষম ও সচেতন করতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী।

প্রণব বিশ্বাস

নিবাহী আধিকারিক

মধুসূদন গুচ্ছাইং

সভাপতি

ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতি

খেজুরী ১ পঞ্চায়েত সমিতি

কামারদা : মেদিনীপুর

গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা সংস্কৃতির লক্ষ্যে

কৃষি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে সবার

সহযোগিতা কামনা করি।

সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ অভিযানের সার্বিক সকলের জন্য চাই
আপামর মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা, চাই আপনার সহানুভূতি ও
পরামর্শ।

স্মৃতিকণা বাগ

সভানেত্রী

বিশ্বনাথ পাল

নিবাহী আধিকারিক

খেজুরী ১ পঞ্চায়েত সমিতি, কামারদা, মেদিনীপুর

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে....

কাঁথি ও পঞ্চায়েত সমিতি

ফোনঃ নাট্টিদা-৪২

মারশদা মেদিনীপুর

আমাদের সঙ্কল্প—নিরক্ষরতা দূরীকরণ

আমরা সর্বদাই জনসাধারণের স্বার্থে গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্রতী
আসুন সবাই মিলে গ্রামোন্নয়নের সব প্রকল্পের কাজে আরও ব্যাপকভাবে
সহযোগিতা হাত প্রসারিত করি

সহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সংস্রীতির বাতাবরণ বচনায়, সার্বিক উন্নয়নের পথে.....

মৃণালকান্তি নরুন্ন	রানুবালা বর	অবন্তী কুমার গিরি
নির্বাহী আধিকারিক	সহঃ সভাপতি	সভাপতি

কাঁথি ও পঞ্চায়েত সমিতি

আলোক কেন্দ্র সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

আলোককেন্দ্র : মেদিনীপুর

গ্রামীণ উন্নয়নে সমিতি সর্বদাই নিত্য নূতন কর্মসূচী গ্রহনের
মাধ্যমে উন্নতি সাধন করছে।

আমানত সংগ্ৰেহে সমিতি অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।

তারাপদ দে	সেখ সিরাজুদ্দিন	সুশান্ত চক্রবর্তী
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

শরৎ তোমার অরুন্ন আলোর অঙ্কলি....

শুভ বিজয়া ও দেওয়ালীর শুভেচ্ছা জানাই....

দূরভাব ৫৫১৯৮

এস. টি. ডি. ০৩২২০

শীতের মরশুমে সমস্ত প্রকার হাইব্রীড, ও. পি. সজী বীজ লাগান এবং
অধিক ফলন ফলিয়ে সমৃদ্ধ হোন। বাজারের সেরা বীজ

অন্নপূর্ণা বীজ ভাণ্ডার

কাঁথি ১ নং মিউনিসিপ্যাল মার্কেট স্টল নং—১১৮

ANANDALOK

**USING MEDICAL SCIENCE
FOR MANKIND'S BENEFIT**

Medical science has made tremendous progress over the past few decades but it has failed to benefit people at the grassroots. Anandalok has been making unparalleled efforts to take the fruits of progress of medical science to the poorest of the poor to make them truly beneficial to mankind.



Anandalok

CK-44, Salt Lake City, Calcutta-700 091 % 359-0742

CL-88, Salt Lake City, Calcutta-700 091 % 337-7750

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠান রূপে গ্রাম বাংলার উন্নতির নিয়োজিত
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়ার সরণী, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

টেলিফোন নং : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ ফ্যাক্স নং : ২৪৭-৭১২৩

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কসিতাই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের
প্রসারে কৃষিজ পরিবহনের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের অগণ পরিকল্পনা
বিভিন্ন সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১২০.০০ কোটি টাকা অগণের পরিকল্পনা
বিভিন্ন উন্নতিসাধনে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণে, প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যক্তি
হতে সাথে আছে আর্থিক সুদের সুবিধা।

ভগবানপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি

ডাক : ভূপতিনগর, মেদিনীপুর

শিক্ষা সংস্কৃতি সংহতি ও সাফল্যের প্রসারে আমাদের অক্লান্ত উদ্যোগ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণে

গ্রামোন্নয়নে আমরা চাই সার্বিক বিকাশ সাধন।

পাউশি এ.ডি কাটক্যানেল পুনঃখনন গ্রামীণ শিল্পে মধ্যমেয়াদী ঋণ নন্দীচক ব্রীজ নির্মাণ, এলাকার প্রাইমারী স্কুল ঘরের উন্নয়ন গ্রামীণ রাস্তা সংযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস নির্মাণ নুইস কালভার্ট মিঠা জলে মুক্তা চাষ পরিকল্পনা গোবিন্দচক ব্রীজ নির্মাণ, বারুগী চেতনা কেন্দ্রের পুকুর খনন ওচ্ছ অগভীর নলকূপ প্রকল্পে জলসেচ ইন্দ্রিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণ টাইসেম ট্রেনিং সেন্টার গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প ও তারা হ্যান্ড পাম্প এর সার্বিক প্রচলন সামাজিক বন সৃজন প্রকল্প জওহর রোজগার যোজনায় সজিবাগান সহ আরও নানা প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার অপেক্ষায় আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি। আসুন সবাই মিলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করি।

কাজল বর্মণ
সভানেত্রী

সুমিত্র প্রধান
সহসভাপতি

ফজলে রউক
নির্বাহী আধিকারিক

গ্রামীণ পরিসেবার মূর্তপ্রতীক নয়াপুট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কাঁথি মহকুমার সমবায় সমিতির মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম নাম।

নয়াপুট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

- নয়াপুট অঞ্চলবাসীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সহস্র ও প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রামীণ পরিসেবার কাজে ব্রতী হয়েছি। আমরা গ্রামীণ পরিসেবা করতে বদ্ধপরিকর।
- আমানতের টাকা আমানত বীমা দ্বারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।
- গ্রাহক পরিসেবায় ও আমানত সুরক্ষায় আমরা অতন্ত প্রহরী।
- সর্বোচ্চ হারে সুদ প্রদানে সকলের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প।
- কৃষি লোনের মাপকাঠিতে সমগ্র কাঁথি মহকুমার কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির শীর্ষে।

গোবিন্দপ্রসাদ জানা
সভাপতি

অশোককুমার করণ
ম্যানেজার

রবীন্দ্রনাথ মাঝি
সম্পাদক

শরতে আজ কোন অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে...
শরৎকালীন শিউলি কাশের সঙ্গে আপনার সুনিশ্চিত আর্থ সামাজিক পুনর্নির্মাণ রচনা
মহিলাদের পাশে সদা জাগ্রত আমাদেরই সমবায়...

কন্টাই মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

হরিপদ পাহাড়ী সরণী : কাঁথি : মেদিনীপুর-৭২১৪০১
(কাঁথি বড় পোস্ট অফিসের পেছনে, গৌরী হোটেলের দ্বিতলে)
নতুন নতুন সদস্যের নাম নথীভুক্তিকরণ এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ দিন। আজই
কার্যালয়ে আসুন, আপনারাতির নিরলস সেবার প্রতীক্ষায়...

লীলা মিশ্র
সম্পাদিকা

কবিতা পাহাড়ী
সভানেত্রী

*With best compliments from
Socio Economical Problem?
Dont Worry!*

*Join in Prawn Culture with self-confident.
For better, modern education & Result*

UNIQUE TIGER

UNIQUE AQUA FARMS LIMITED.

Renuka Nibas Karkuli Contai Midnapore-721401

ওভেচ্ছা ও অভিনন্দন কবিতার কাগজ'এর বন্ধুদের...

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (হেমিও চিকিৎসক)

গ্রাম ও ডাক : শ্রীনগর (মল্লিক বাজার) : মেদিনীপুর : ৭২১১০১

পৃথিবীর বহুদেশের বিজ্ঞ হেমিওপ্যাথরা তাঁদের দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধে বলেছেন 'ডাঃ
প্রকাশ মল্লিক পৃথিবীর প্রথম স্ত্রীর হেমিওপ্যাথদের মধ্যে একজন'।

অপর দিকে ডাঃ মল্লিককে ধরে একটি প্রোগ্রামের জন্ম হয়েছে যা হল 'যে রোগ সারেনা কোন
প্যাথিতে সে রোগ সারে হেমিওপ্যাথিতে এবং ডাঃ মল্লিক-এর চিকিৎসায়।

এবাদপ্রতিম চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এর প্রকাশিত বই

হেমিও. চিকিৎসা পরিচয় ৩০ টাকা

চর্মরোগ চিকিৎসায় হেমিওপ্যাথি ৫০ টাকা

স্ত্রী-রোগ ও হেমিওপ্যাথি ১১ টাকা

হেমিও পশু চিকিৎসা ১২ টাকা

হৃদরোগ ও হেমিওপ্যাথি চিকিৎসা ১২ টাকা।

Cancer and its Homoeopathic treatment Rs. 11.00

সাক্ষর মায়ের ছেলে নিরক্ষর থাকে না...

এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য চাই

শিক্ষা ও সচেতনতা।

আমাদের গ্রাম সংসদ ও পিঙ্করচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র' নিয়মিত আসুন, পারস্পরিক
বোঝাপড়া, সম্প্রীতি...

সবার আগে চাই সাক্ষরোত্তর অভিযানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সফলতা।

এলাকার উন্নয়নে আসুন,

হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটি,

এসো, শেখাই, কিছু করে দেখাই।

গুডেচ্চাসহ ও অভিনন্দনসহ

শ্রী বেলীমাধব পয়ড্যা

পঞ্চায়েত প্রতিনিধি

৮নং মাজিলাপুর গ্রামপঞ্চায়েত

জুনপুট : মেদিনীপুর : ৭২১৪৫০

কামারপুট : জুনপুট

মেদিনীপুর : ৭২১৪৫০

'সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে

আমরা এগিয়ে চলেছি দৃঢ় পদক্ষেপে'—

৩৫টি শাখা, ২টি পে অফিস সহ মেদিনীপুর শহরে সাক্ষ্য ব্যক্তিং-এর মাধ্যমে

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায় নিয়োজিত

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক

মুখ্য কার্যালয় : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষ : ০৩২২২-৬২৪১৭, ৬২৪১১, ৬২৭৪৪, ৬২৭৫৯

ফ্যাক্স : ০৩২২২-৬২৪১১

গ্রাম : VIDCOB

সজলকান্তি ঘোষ
জেনারেল ম্যানেজার

মৃগাঙ্কলেশ্বর কর
সভাপতি

With Best Compliments from :

Ph. (R) 74272

(O) 52729

Fax. 03224-52729

KARAN CONSTRUCTION CO.

Civil, Mechanical, Electrical Engineering & Contractor.

H/O. P.O. : DURGACHAK

HALDIA : MIDNAPORE

COME AGAIN & AGAIN... AT 'DIGHA'

Your Healthy Dream Resort Sunny Sea-Shor of India

DIGHA DEVELOPMENT AUTHORITY

Wel come you to come again and stay at Digha, enjoy you holidays with your family on well cherish. The calm beach, green forestry and Amarabati Park, Snake Garden, Science city etc.

Anandmoy Banerjee

C.E.O.

Digha Development Authority

Digha : Midnapore (W.B.)



Love of Love
Sanjiv

a-ha

Distributors : All kinds of 'PEPSP—Renge Products

NATIONAL DISTRIBUTORS

College More ☐ Contai ☐ Midnapur-721401

S.T.D. 03223, Ph : 55-519



SAVE THROUGH BETHEL FOR BETTER RETURN OF YOUR INVESTMENT

DAILY MONTHLY
FIXED
DEPOSIT SCHEME

- ☼ SHORT DURATION
- ☼ MAXIMUM BENEFIT
- ☼ LOAN FACILITIES

Available Here

B. H.S. CORPORATION
H/O - ROURKELA

* Z/O MIDNAPORE
BRANCH  CONTAIN

হলদিয়া পৌরসভা

হলদিয়া শিল্পনগরীর

সঠিক নাগরিক পরিষেবাই আমাদের লক্ষ্য।

হলদিয়া পুনর্ভাবের এক প্রধান শিল্পনগরী হিসাবে আরো পরিচিতি।
হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি সতত চেষ্টা করছে এই প্রাদুর্ভূমিক শিল্পনগরীর নাগরিক
জীবনকে আচ্ছন্দময় করে তোলায়।

একনজরে হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়ণ পরিকল্পনা

- ❖ আচ্ছন্দ্য পরিদেবা, ভাল সবরবাহ, আবাসন প্রকল্প।
- ❖ বাস্তাসার্টি, প্যান্টন কেন্দ্র এবং ইয়ুথ হোস্টেল।
- ❖ আরেকটি কমার্শিয়াল (কমার্শিয়াল মার্কেট), স্টেশন পল অফিস এবং একটি টাউনশিপ (বাস
স্টেশন, স্ট্রাটো টা শপিং কমপ্লেক্স)।
- ❖ রোপাটিস কমার্শিয়াল
- ❖ বিদ্যুত যন্ত্র
- ❖ কানিগরী কলেজ
- ❖ মিউনিসিপ্যালিটি
পরিচালিত
উচ্চমাধ্যমিক
স্কুল (জুনিয়র নগর)।
- ❖ UBSP'র মাধ্যমে
শহর একাধার
বিস্তারনা মা ও
শিশুদের জন্য।
- ❖ নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প
নিবেদিত প্রায়মাণ
- ❖ চিকিৎসা কেন্দ্র
- ❖ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র
- ❖ কমলতা মহিলাদের
জানা হোস্টেল



হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

বেড়াতে চলুন

হলদিয়া



আধুনিক শিল্পনগরী হিসাবে হলদিয়ার কথা সকলেই জানেন।
কমোপদ্যগরের উপকূলে, হলদি নদীর তীরে হলদিয়া পর্বত
কেন্দ্রে হিসাবেও মন্ডারম। দু-চারমিনিরে অবকাশে সপরিবারে
মিথি কাটিয়ে আসতে পারেন হলদিয়ার। স্বকরকে খেলা
আকাশের নিচে ছড়িয়ে থাকা শান্ত নদী, ঢেউতোলা জাহাজ
কিনবা পালতোলা নৌকার অলস যাত্রা পতি দেখতে দেখতে
কাটিবনের নিবিড়ে চতুর্ভুজি এক আলো অনুভূতি।
থাকার অন্ত সরকারী, আশা-সরকারী, বেশরকারী
সর্বস্বকার উত্তাপ মিলিত হয়েছে এখানে।



হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

সম্পাদনা দেবশিস প্রধান

ঠাকুরতলা, দেশদত্তবাড়, জুনপুট, মেদিনীপুর ৭২১৪৫০ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত